বাঙালির চিন্তাধারায়
ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশ(১৯২৬-১৯৮৮)ঃ একটি পর্যালোচনা

গবেষক

মোঃ শফিকুল ইসলাম

রেজিস্ট্রেশন নং-১২, সেশন- ২০১১-২০১২

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা-নির্দেশক

অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর পরিপূর্তিরূপে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

মোঃ শফিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে আমাদের তত্ত্বাবধানে "বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশ (১৯২৬-১৯৮৮)ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পরীক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেছেন। তার রেজিস্ট্রেশন নং ও সেশন ১২/২০১১-২০১২।

তার এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোন অংশ কোথায়ও ছাপা হয়নি।

(অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক
বিশ্ব ধর্ম সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক)
কো-তত্ত্বাবধায়ক
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করার পর থেকেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক জনাব কাজী নূরুল ইসলাম ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের নির্দেশনায় ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ শাসনামলের প্রবীণ সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও গবেষকদের কাছে গিয়ে গবেষণার বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তাঁদের নিকট আমার গবেষণার শিরোনাম 'বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশ (১৯২৬-১৯৮৮)ঃ একটি পর্যালোচনা' বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনুসন্ধান করে অনেক জায়গা ও ব্যক্তির নিকট থেকে কার্যকর কিছু পাইনি। তবে যারা পথ-চলতে আমাকে দিশা দিয়েছেন আর যে সকল সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, সম্পাদক, গবেষক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নানান তথ্য অবহিত করে, এমনকি কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাদি আমাকে সস্নেহে উপহার দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে সার্থক করে তুলতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি। আমার এ গবেষণা কর্মটি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ধরণের কাজের জন্য তথ্য সরবরাহ করে তাঁরা জাতীয় দায়িত্বই পালন করেছেন।

যাঁরা তথ্য সরবরাহ না করলে আমার গবেষণা নানাদিক থেকে দুর্বল ও অপূর্ণ থেকে যেত, তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি কয়েকটি উজ্জ্বল নামঃ

ড. অজয় রায়, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অনুপম সেন, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
আলী আনোয়ার, অধ্যাপক (অবঃ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক (অবঃ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আমিনুল ইসলাম, দর্শন বিভাগ, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আজিজুননাহার ইসলাম, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আবুল বাশার খান (নিউটন), সহযোগী অধ্যাপক, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ড. ইসরাইল খান, গবেষক ও লেখক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ড. কালিপ্রসন্ন দাস, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সাভার, ঢাকা
ড. করুনাময় গোস্বামী, বুদ্ধিজীবি
কামাল লোহানী, ভাষা সৈনিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক (অবঃ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
দিলারা চৌধুরী, অধ্যাপক (অবঃ), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. নীরু কুমার চাকমা, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বদরুদ্দীন উমর, বুদ্ধিজীবী
ড. ভূঁইয়া মনোয়ার, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারি, অধ্যাপক, উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক (অবঃ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. রতন লাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক (অবঃ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তনু মজুমদার, অধ্যাপক (অবঃ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সনজিদা খাতুন, অধ্যাপক (অবঃ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সনৎ কুমার সাহা, অধ্যাপক (অবঃ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এবং যে সমস্ত গ্রন্থাগারে কাজ করেছি তার মধ্যে উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এ সব গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আমাকে যে সহযোগিতা দান করেছেন তা অতুলনীয়।

লেখক ও গবেষক ড. ইসরাইল খান ও তার সহধর্মিনী ফারজানা ইয়াসমীন খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আজিজুননাহার ইসলাম, অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. শফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ বাংলা একাডেমিতে কাজের সময় ধর্ম, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহসহ নানাবিধ দিক নির্দেশনায় আমাকে মূল্যবান সহযোগিতা দান করেন। গবেষণার অবকাশ ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার স্ত্রী সুমাইয়া ইসলাম ও আমার একমাত্র কন্যা রওজা ইসলাম। তাদের সহযোগিতা ব্যতীত এ কাজ কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হতো না।

অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন ও মুদ্রণকালে সময়-অসময়ে নানান ব্যাপারে বিরক্ত করেছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ও অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম মহোদয়কে। তাঁদের ঋণ মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরিশোধনীয় নয়।

তাছাড়া আমার সহকর্মী জনাব মোঃ মুনীরুজ্জামান, সহকারী রেজিস্ট্রার, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সানন্দ-সহযোগিতা দান না করলে আমার এই অভিসন্দর্ভ মুদ্রণের কাজ এতো তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভবপর হতো না।

অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনকালে সশ্রদ্ধচিত্তে সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
জুলাই, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

গবেষণার উদ্দেশ্য ও অনুসন্ধানের বিষয় এবং পরিকল্পনার পরিকাঠামো সম্পর্কে ব্যাখ্যা পৃ. ৭-৯

প্রথম অধ্যায়

ধর্মের স্বরূপ ও বাংলাদেশের প্রধান ধর্মসমূহ পৃ. ১০-২৪

ক. বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম

খ. বাঙালির জীবনে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব

গ. বিভিন্ন মনীষীর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশঃ একটি আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক পরিক্রমা পৃ. ২৫-৫৪

ক. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঃ সংজ্ঞা নির্ধারণমূলক একটি আলোচনা

খ. হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর রাষ্ট্র দর্শনঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব

গ. বিশ্বে ধর্ম প্রবক্তা, রাষ্ট্র নায়ক ও দার্শনিকদের চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ

ঘ. মানব কল্যাণে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ভূমিকা

ঙ. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সংবিধানঃ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারত

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালির চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার ক্রমবিকাশের ধারা পৃ. ৫৫-৮৪

ক. ব্রিটিশ শাসিত বাঙলার রেনেসাঁস ও হিন্দু সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা
রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ

খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সন্ধানে মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দ
মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, কাজী ইমদাদুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস. ওয়াজেদ আলি, কাজী মোতাহার হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশের এক মহেন্দ্রক্ষণঃ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, ১৯২৬-১৯৩৮ পৃ. ৮৫-২০০

ক. ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা

খ. মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা
কাজী আনোয়ারুল কাদির , কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ

গ. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও আজাদ
মোহাম্মদী গোষ্ঠী ও রেনেসাঁস সোসাইটির প্রতিক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. বাঙলার নবজাগরণের কাণ্ডারী 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-কারীদের প্রতিরোধ সৃষ্টি প্রয়াসী সংরক্ষণবাদীদের ক্রিয়াকলাপসমূহ

ঙ. স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গঠনে ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ (১৯৪৭-১৯৭১)
পাকিস্তান-পূর্ব বাংলা সম্পর্ক, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মতবাদ, পাকিস্তানে নতুন করে সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িক ভাষা আন্দোলন ও ধর্মনিরক্ষেতার বিকাশ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, পত্র-পত্রিকার চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা

চ. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে রেনেসাঁসের চেতনায় সমৃদ্ধ সাহিত্য- সংস্কৃতির উদ্বোধন (১৯৪৭-৭১)

ছ. পাকিস্তান আমলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের সাহিত্য ও সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভূমিকা
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতাঃ ১৯৭২-১৯৮৮ পৃ. ২০১-২৪৩

ক. সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন

খ. বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাতৃভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

গ. সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান

ঘ. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে সংবিধান পরিবর্তন ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহারঃ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এবং বাঙালির চিন্তা-চেতনায় এর প্রভাব পৃ. ২৪৪-২৬৭

মূল্যায়ন ও মন্তব্য পৃ. ২৬৮-২৭২

গ্রন্থপঞ্জি পৃ. ২৭৩-২৮১

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

গবেষণার উদ্দেশ্য ও অনুসন্ধানের বিষয় এবং পরিকল্পনার পরিকাঠামো সম্পর্কে ব্যাখ্যা

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে ইউরোপে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের ধর্মের নামে অধর্মাচরণে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল জনগণ। তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করেই জন্ম লাভ করে Secularism নামক দার্শনিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব। মূলত ধর্মযাজকদের অবাঞ্ছিত জুলুমের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ ও তাদের ধর্মের নামে অধার্মিক অনুশাসনের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের উদ্ভব হয়। সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'। Secularism ল্যাটিন শব্দ Secularis থেকে উদ্ভূত। সেকুলার শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহলৌকিক, জাগতিক, পার্থিব, ইত্যাদি।

বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে বুঝায় এমন এক মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যানধারণা ও ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে মানবীয় বিবেচনায় সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মতবাদ। ধর্ম থাকবে ধর্মের ব্যক্তিগত জীবনে। রাষ্ট্রের পরিচালনায় ধর্মকে গ্রহণ করা হবে না। সরকার কোন ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ভূমিকা পালন করবেনা। এক ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের উপর জুলুম জবরদস্তি করতে পারবে না। ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শ অবলম্বন করা হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব ও বিকাশ

মানুষের বৈষয়িক জীবন ও জগতের, উপাদান ও জীবিকার সমস্যা ও জটিলতা আর এসবের বহুমাত্রিকতা-সৃষ্ট পরিবেশ প্রতিবেশ থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ও মতাদর্শ বিকশিত হয়। ইউরোপের রেনেসাঁসের আগেই ইব্নে রুশদ, ইব্নে খালদুন, ইবনে সিনা প্রমুখ মনীষী ধর্মগতভাবে মুসলমান হয়েও ধর্মীয় গোঁড়ামীর বাইরে গিয়ে এবং মোল্লাতন্ত্রের কট্টর সমালোচনার মোকাবিলা করে জ্ঞানের স্বার্থে, জীবন-জগতের বিকাশ ও কল্যাণের তাগিদে ও প্রয়োজনীয় বস্তুবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইহজাগতিক চিন্তা ও দর্শন প্রচার করেছেন। অন্যদিকে ইউরোপে চার্চ ও স্কলাস্টিক চিন্তাদর্শনের এবং সামান্তবাদী ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্বের দাবিদার, রাজতন্ত্রের বিপরীতে সংগ্রামরত মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্বকারী চিন্তা-দর্শনরূপে বিকশিত হয় মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা।

ইউরোপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকে মানুষই সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু ও প্রধানতম শক্তি। এই চেতনার বিকাশ মানবিক স্বাধীন অস্তিত্বশীল বলে স্বীকৃতি পাবার পর জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভৌগলিক আবিষ্কার ইত্যাদির সাথে সাথে মানুষ জীবন-জগৎকে আর আগের মত ঈশ্বর-সৃষ্ট, ধর্ম-নির্ভর, ভাগ্য ও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত, পূর্ব নির্দিষ্ট ও অজ্ঞেয় ইত্যাদি বলে মেনে নেয়নি। ইউরোপে রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন বস্তুবাদী, ইহজাগতিক চেতনার বিকাশে এবং ধর্ম ও ঈশ্বরতন্ত্রকে পিছনে ফেলে ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শ বিকাশে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। লুথার, ক্যালভা প্রমুখ ধর্মসংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, লিওনার্ডো দ্যা ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস প্রমুখ চিত্রকর অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিকগণ তাঁদের চিন্তা ও কর্ম দ্বারা ধর্মন্ধতার মূলে আঘাত হেনেছেন উপুর্যুপরি কয়েক শতাব্দিকাল ধরে। মূলতঃ সময়ের বিবর্তনে ধর্ম, চার্চ ও ঈশ্বর নিয়ে বহুকাল ধরে বাকবিতন্ডা, ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড পর্যন্ত সংঘটিত হতে দেখা গেছে। ধর্মের নামে মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে মানুষ ক্লান্ত হয়ে ধর্মের অপব্যবহারের হাত থেকে নিস্কৃতি খুঁজেছে। শিল্পবিপ্লবের মধ্যে দেখা দেয় রাজনৈতিক বিপ্লব, যেমন- ফরাসী বিপ্লব। গণচেতনার ধারায় দানা বাঁধে আধুনিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ।

ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যে ধর্মের ও চার্চের পরাজয় এবং ক্রমে ঐশ্বরিক তত্ত্বের বুলিবাগীশ রাজতন্ত্রের বিনাশ সাধিত হয়। রেনেসাঁস-রিফমের্শন আন্দোলনের প্রগতি, ভৌগলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনের বিকাশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপক উন্মেষ বিকাশ ঘটে। ধর্মের স্থলে ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিকতা মানুষকে স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও প্রশ্নকারী অস্তিত্বে রূপান্তরিত করে। মানুষ তাদের

Dhaka University Institutional Repository

জীবন-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ প্রচেষ্টার নিরন্তর সাধনার ভেতর দিয়ে আজকের এ অবস্থায় পৌঁছায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাব বিস্তৃত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে। বাঙলার রেনেসাঁসের উদ্ভব হয় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে এবং হিন্দু ও মুসলমান দুটি ধর্মীয় স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত হয়। এর মধ্যে রেনেসাঁস দেখা দেয় প্রথম হিন্দু সমাজে, পরে মুসলমান সমাজে।

যদিও ঔপনিবেশিক আমলের শুরুতে বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু ইংরেজদের সাথে নানাভাবে সংযোগ- সহযোগিতার ফল-স্বরূপ হিন্দু সমাজের একটি অংশ নিজেদেরকে পুণর্গঠিত করতে সক্ষম হলেও বাংলার মুসলিম সমাজ একটি কঠিন আর্থ-সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হয়। চেতনাগত দিক দিয়ে তাদের ঘটে চরম বিপর্যয়। নিদারুণ স্থবিরতা তাদেরকে প্রায় গ্রাস করে ফেলে। সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কার প্রায় গোটা সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে হিন্দুদের তুলনায় একটু বিলম্বে হলেও বাংলার মুসলমান সমাজেও ধীরে ধীরে শুরু হয়ঃ ১. স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ২. ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, ৩. পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে আন্দোলন ৪. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ৫. ধর্মাধীন থেকেও কুসংস্কার বিবর্জিত ও আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সংযোগ স্থাপনের আন্দোলন এবং ৬. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি. শোষণমুক্ত সমাজ, মানবতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" একদল মুসলমান তরুণ এই স্লোগান নিয়ে এগিয়ে এসে শুরু করলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। এদের মধ্যে প্রধান হলেনঃ কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ। কয়েকজন সমাজ সচেতন ও প্রগতিশীল মুসলিম বাঙালি বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন যাত্রার সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এস ওয়াজেদ আলি, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ। অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলামের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত ও ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িকতা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা। বলাবাহুল্য উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাঙালির মানসভুবনে মূলতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে বিশাল আলোড়নের সৃষ্টি হয় সেটাই বাঙলার নবজাগরণ বা বেঙ্গল রেনেসাঁ নামে খ্যাত। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একমত যে, এই আন্দোলনের ফল স্বরূপ এই উপমহাদেশে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার উন্মেষ ঘটে।

পরবর্তীকালে এসকল বুদ্ধির মুক্তির প্রবক্তা ও মননশীল লেখকদের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজে রেনেসাঁসের ভাবধারা বিকশিত হয়। আর এই রেনেসাঁসের মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার সন্ধান এবং ধর্মনিরপেক্ষতা দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ। এই বিকাশের ধারা অনুসরন করে এবং বহুমাত্রিক গতি পথের বিস্তৃতি, বিকৃতি এবং সামনের অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষণ করা এ গবেষণা কাজের গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয়।

উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা ভাষায় রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা। আলোচ্য সময়ের লেখকের চিন্তাধারা, ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে (১৯৭২) ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৮৮ সনে রাষ্ট্রশাসনে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান ও পতন পর্যালোচনা করা।

পরিধি

গবেষণার প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য সংকলন করা হলেও এ-অভিসন্দর্ভে মূলত ১৯২৬ সনে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯৮৮ সনে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মরূপে ইসলামকে গ্রহণ পর্যন্ত সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই সময়ে চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মপন্থীদের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বাদ-প্রতিবাদ, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত বিরোধ, সমাজরক্ষণশীল শক্তির সঙ্গে প্রগতি শক্তির বিরোধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাময়িকপত্রে, সংবাদপত্রে প্রতিফলিত বিরোধ বা বিরোধের চিত্র ইত্যাদি কালক্রম অনুযায়ী পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯২৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে এ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

গবেষণা-পদ্ধতি

মুদ্রিত পুস্তকাদি, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, লিফলেট, বুকলেট প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি অবলম্বন করে তথ্য বিবরণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি, রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কার্যবিবরণ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রবীণ চিন্তাবিদদের এবং রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করেছি (পরিশিষ্ট দ্রঃ)। মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করেছি এবং পর্যালোচনার সময়ে ঐতিহাসিক যুক্তিমূলক ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা সতর্কতার সাথে অবলম্বন করার চেষ্টা করেছি।

অভিসন্দর্ভ-গঠন পরিকল্পনা ও উৎস

ক. প্রস্তাবনা ও গবেষণার উদ্দেশ্য খ. ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ, গ. বাংলা ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ক্রমবিকাশঃ নূতন সাহিত্য সৃষ্টি ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ঘ. ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও আজাদ পত্রিকা গোষ্ঠির প্রতিক্রিয়া, ঙ. মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলন, চ. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন লেখক সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ছ. ছয় দফা আন্দোলন ও ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের ধর্মনিরপেক্ষতা, জ. মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ঞ. ৭২ শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা, ট. বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ১৯৭২-১৯৭৫, ১৯৭৫-১৯৮২, ১৯৮২-১৯৮৮, ঠ. মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় শক্তির পুনরুত্থান ও সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম গ্রহণ।

এসব বিষয় বর্ণনার সময়ে লেখকদের চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তাধারা এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গবেষণা কাজ অগ্রসর হয়ে অধ্যায় পরিকল্পনার পুনঃবিন্যাস করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভ-গঠন পরিকল্পনায় গবেষণা অভিসন্দর্ভের রূপরেখা উপরোক্ত দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীতে গবেষণা কাজের অনুসন্ধান ও বাস্তবায়নের স্বার্থে নানা আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণার মৌলিক বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিধায় গবেষণার প্রস্তাবনায় অধ্যায় বিভাজনের বিষয়টি পুনঃবিন্যাস করার সুযোগ থাকায় আমার গবেষণা কাজে দশটি অধ্যায় থেকে গবেষণার মৌলিক দিক বিবেচনা করে ছয়টি অধ্যায়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি।

তাছাড়া লেখকদের রচনাবলী, রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচার পত্রগুলোর পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে থেকে যাঁরা লিখিতভাবে দলিল সংরক্ষণ করেছেন তাঁদের রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ধর্মের স্বরূপ ও বাংলাদেশের প্রধান ধর্মসমূহ

পৃ.১০-২৪

ক. বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম

খ. বাঙালির জীবনে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব

গ. বিভিন্ন মনীষীর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

ক. বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম

ধর্ম কি? এবং কেন? ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত (ধৃ+মন=ধর্ম) এর অর্থ করা হয়েছে ধ্রিয়তে লোকে অনেন, ধরতি লোকংবা অর্থাৎ যা লোককে ধারণ করে এবং লোক যা ধারণ করে চলে তাকেই ধর্ম বলা হয়, যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তা-ই ধর্ম। মহাভারতের মতে, ধারণাব্দ মমিত্যাশু অর্থাৎ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। কারো কারো মতে, লৌকিক ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট নিবৃত্তির উপায়কে ধর্ম বলে।[১] ইংরেজিতে ধর্মকে বলে religion, এই শব্দটি re-ligere থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধন। অর্থাৎ একটা আইনের বন্ধনের মধ্যে জীবন-যাপনকে religion বলে। অনেকে ঐশী প্রার্থনা বা ঈশ্বরের উপসনাকে ধর্ম বলেছেন।

দার্শনিক কান্টের মতে, religion is morality. ফিক্তের অভিমত হল religion is knowledge ডুরখায়েমের ভাষায়, পবিত্র বস্তু এবং করণীয় ও অকরণীয় কার্যের প্রতি বিশ্বাস এবং কর্মের বিশ্বাস এবং কর্মের সমন্বয় রূপকে ধর্ম বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় ধর্ম বা religionএর প্রতিশব্দ নেই। পবিত্র কুরআনে ধর্মের জন্য দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বীন হলো সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বিচার নীতি এই চারটি মূল নীতির সংক্ষিপ্ত রূপ। আর সাধারণ অর্থে দ্বীনের অর্থ প্রতিফল, আনুগত্য, হিসাব, বিজয় ক্ষমতা বা রাজত্ব, প্রার্থনা, চেষ্টা, ধর্ম ব্যবস্থা, মন্দ থেকে রক্ষা পাওয়ার ইচ্ছা, নিয়তি, ন্যায় বিচার, অভ্যাস প্রভৃতি।

এই সমস্ত অর্থালোকে সামগ্রিকভাবে দ্বীনের যে অর্থ দাড়ায় তা হল, যে বিধি ব্যবস্থাকে ধারণ করে একান্ত অনুগত হয়ে একটা বিশেষ ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মানুষ প্রার্থনা এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে মন্দ থেকে রক্ষা পেয়ে সৎ অভ্যাসের ক্ষমতা অর্জন করে এবং এই পৃথিবীতে ন্যায় বিচারের নীতিতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনে ব্রতী হয়ে এবং পরিণামে বিজয়ী হয়ে নিয়তির অমোঘ বিধান শেষ বিচারের হিসাব নিকাশের দিনে উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ করে জীবনকে ধন্য করে তাই হলো দ্বীন। প্রচলিত অর্থে ধর্মের এই সূত্রটিতে দ্বীনের একটি উদ্দেশ্য আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃতে ধর্ম এবং ইংরেজীতে religion যে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বীন তথা ধর্ম শব্দটি তদ্রুপ ব্যবহৃত হয়নি। কুরআনে সর্বত্র দ্বীন শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

জগৎ জীবন কী? সৃষ্টি কী? মানুষ কোথা থেকে এল? কাল কী? সৃষ্টির পরিণতি কোথায় ইত্যাদি সকল মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। এ সম্পর্কে মানুষের জানার কৌতূহল ছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। আদিম মানবেরাও ধর্ম নিয়ে ভাবতেন। ধর্মের উৎপত্তির এক ক্রম-ইতিহাস রয়েছে। এ ক্রম-ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বেশ কয়েক শতাব্দি পূর্ব থেকে। ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন ইশ্বর ও আল্লাহ অথবা God - এর প্রত্যাদেশ (Divine Revelation) থেকে ধর্মের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন বিচার বুদ্ধি তথা প্রজ্ঞা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি।[৩]

যুগ যুগ ধরে মানুষ এসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে এসেছে কখনও ধর্মকামী হয়ে কখনও দার্শনিক হয়ে কখনও বিজ্ঞানী হয়ে। তবে একথা সত্য যে, ধর্মকামী, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের সত্য অনুসন্ধান করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্ম এক ধরনের দর্শন তবে তা অনেকটা বিশ্বাস নির্ভর। বিজ্ঞানীদের সত্যানুসন্ধান সম্পূর্ণ ব্যবহারিক পরীক্ষা নিরীক্ষা নির্ভর। দার্শনিকের সত্যানুসন্ধান যুক্তি নির্ভর। দার্শনিকেরা মনে করেন, বিশুদ্ধ মননচর্চা এবং যুক্তিবাদের মাধ্যমেই প্রকৃত সত্যে উপণীত হওয়া যায়। ধর্মকামীরা মনে করেন মানুষের পক্ষে পরম সত্যকে জানা কখনই সম্ভবপর নয়। তাদের বিশ্বাস পৃথিবীতে যুগে যুগে পরম সত্যের বার্তাবাহী পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, তাদের বাণীই চিরন্তন এবং চরম ও পরম সত্য। তাদের প্রদর্শিত পথই সত্যের পথ। জীবন কালের চাহিদায় অসংখ্য ধর্ম প্রবর্তক পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, হযরত মুসা (আঃ), গৌতম বুদ্ধ, যিশু-খ্রিষ্ট, হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুহম্মদ (সাঃ) প্রমুখ। ধর্ম মূলত একটি সার্বভৌম বিষয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, ধর্ম হলঃ

এক. আত্মবিশ্বাস এবং কল্যাণ লাভের আগ্রহ

দুই. বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সত্যকে জানার পথ

Dhaka University Institutional Repository

তিন. মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সমূহকে সংশ্লেষণাত্মক করা
চার. সকল উপাত্তগুলিকে পরমনীতির মাধ্যমে মূল্যায়ন
পাঁচ. পরমতত্ত্ব বা পারম সত্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞান লাভ করা [৪]

ধর্ম কোন আপেক্ষিক বস্তু নয়। ধর্ম হচ্ছে বিশেষ কিছু সনাতনিক নিয়ম-যা স্বাভাবিক, যা সহজ সরল, যা মানবিক বৃত্তিকে গঠন করে। আমরা সকলেই একটি জায়গায় একমত পোষণ করি। আর্থাৎ নিজ নিজ ধর্মকেই বেশী বড় মনে করি এবং অন্য ধর্মকে ছোট মনে করি। এটা নিছক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বর্তমান বিশ্বে তুলনামূলক ধর্মের চর্চাও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এলক্ষ্যকে ধারন করে ইতিমধ্যে বাংলাদেশসহ ইউরোপ আমেরিকাতে ধর্মকে বেছে নেয়া হয়েছে তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য এবং এ লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব হল প্রচলিত ধর্ম গুলিকে নিরপেক্ষ এবং পর্যাপ্তরূপে যুক্তির আলোকে তুলনা করা, যেখানে তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, সংযোগ এবং সম্বন্ধ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[৫]

সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট, ইসলাম, জৈন, শিখ ও পারসিক ধর্ম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট এবং ইসলাম ধর্মের অনুগামী সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশ তথা বহির্বিশ্বেও এ সব ধর্মের অনুসারীরা যথেষ্ট পরিমান বসবাস করছেন। এজন্য এসকল ধর্মগুলিকে বিশ্বজনীন ধর্ম হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সুদীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন অনুসারীদের ধারন এবং তাদের লালন করে আসছে। তবে বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি বা সহাবস্থান নিয়েও তর্ক রয়েছে। কারণ ইংরেজ শাসনের 'ভাগ করো এবং শাসন কর' (ডিভাইড এন্ড রুল) নীতির ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-মারামারি পরিণতিতে দেশত্যাগ ইত্যাদি হয়েছে বলেই সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি প্রচেষ্টা গবেষণার বিষয় হয়েছে। [৬]

পৃথিবীতে মানুষের জীবন-যাপনের দিক নির্দেশনা এবং সাম্য-মৈত্রীর বাণী নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মের আগমন ঘটেছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মের আদিভূমি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্মের নামে মানুষ রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে আবার এই ধর্মই মানুষকে করেছে সুসংহত, মানবতাবাদী। বিশ্বজগতে অনুসরণীয় বিশ্বজনীন ধর্ম রয়েছে আর সে ধর্মগুলো হলো ঃ

১. ইব্রাহিমীয় ধর্ম ২. ভারতীয় ৩. ইরানীয়ান ৪. দূর প্রাচ্যের ধর্ম (পূর্ব এশিয়া) প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বাঙালির জীবনে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব

বাঙলার প্রথম স্বাধীন রাজা বলা হয় শশাঙ্ককে যাঁর রাজত্ব ছিল সাত শতকের গোড়ার দিকে।[৭] তারপর কিছুদিন অরাজকতার পর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশ এখানে চারশো বছর রাজত্ব করেন, তারপর অপেক্ষাকৃত কম সময় রাজত্ব করে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মীয় সেন বংশ। বাঙলা অঞ্চলে প্রথম ইসলামের প্রচার হয় দ্বাদশ শতকে সুফী ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা। পরবর্তীতে বাঙলায় প্রায় সব অঞ্চলেই দ্রুত ইসলামের প্রসার ঘটে।[৮] ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নেই বখতিয়ার খিলজী সেন বংশের রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাঙলার এক বিশাল অংশ দখল করেন। অতঃপর দিল্লীর বিভিন্ন সুলতান রাজবংশ ও তাদের অধীনস্থ স্থানীয় সামন্ত রাজারা বাঙলায় রাজত্ব করেন। ষোড়শ শতকে মুঘল সেনাপতি ইসলাম খান বাঙলা দখল করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দিল্লীর মুঘল সরকারের নিযুক্ত শাসকদের হাত ছাড়িয়ে আপাত-স্বাধীন মুর্শিদাবাদের নবাবদের রাজত্ব শুরু হয়, যারা দিল্লীর মুঘল সরকারের শাসন কেবল নামে মাত্র মানত।

অবশেষে যেদিন মানুষ এই পলিমাটির দেশে জল-কাদা ভেঙে জমি হাসিল করে বসতি স্থাপন শুরু করলো, যেদিন থেকে বাঙালি পরস্পরের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রাচীন বাঙলার আদিমতম রূপ ব্যবহার করতে শুরু করলো সেদিন থেকেই শুরু হয় এই অভিযাত্রার সূত্রপাত। তারপর নানান চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠি এগিয়েছে। আর এই পথ পরিক্রমার ধারায় সমস্ত উপমহাদেশে বাঙলা ও বাঙালি নিজস্ব বিশিষ্টতার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় বাঙলায় আর্য-উপনিবেশ স্থাপনের আগে বাঙলায় প্রচলিত ছিল যোগ সাধনা, তন্ত্রাচার, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি। পরে বাঙলার কাছেই বেদ বিরোধী জৈন ও বৌদ্ধমতের উদ্ভব। বাঙলার সাথে এই এলাকার যোগসূত্র তখন নিবিড়।

১৯২৫ সালে ১৮ ডিসেম্বর কলকাতার দর্শন মহা-সভাতে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দেশের (বাঙলার) প্রকৃত দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনিও বলেন আমাদের মধ্যে যে সত্য তাতেই এই বিশ্বের সত্যতা। তিনি বাউল গান উদ্ধৃত করেন। বাংলাদেশে এই উপলব্ধির মধ্যেই সাধনা। প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ-এটাই বাঙলার একান্ত কথা। বিশেষ করে মরমীবাদ হলো বাঙলার নিজস্ববাদ, এ কথা মূলতঃ লালন ফকিরের কথা। এই মরমীবাদ শুধু যে প্রাচীন বাঙলারই বৈশিষ্ট্য তাই নয়, পরবর্তীকালে যে ধর্ম এসেছে তাতেও ক্রমে ক্রমে প্রভাবিত হয়েছে মরমী মত ধারা।

মূলত বাউল কবির যে কথা এখানে উদ্ধৃত করা হলো তার মর্মার্থের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, বাঙলার মানস-জগতের বৈশিষ্ট্য। জবরদস্তি নয়, প্রেমই হলো ধর্মের প্রাণ। বাঙলার মাটির সাথে নাড়ির যোগাযোগ বাউলদের। বাঙলার বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে সার্থক ভাবে অভিব্যক্ত তাদের মধ্যে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'- এটাই বাঙলার প্রকৃত কথা, প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। বাঙলার বাউলদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যই অভিব্যক্ত। বাউলদের মাঝে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই। হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমানদের শিষ্য হিন্দু এটাই পরস্পরা

বাউলেরা জাতি পঙক্তি, তীর্থ-প্রতিমা
শাস্ত্র বিধি, দেব-আচরণ মানেন না।
তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশোদে।[৯]

মধ্যযুগের এক পর্যায়ে বাঙলার সমাজে যখন ক্ষয়ের লক্ষণগুলি নানাভাবেই ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন বখতিয়ার খিলজি বাঙলার রাজধানী লক্ষণাবতী দখল করে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করেন। লক্ষণ সেন পূর্ব বাঙলায় পালিয়ে যান। সমগ্র বাঙলায় মুসলিম দখল বিস্তৃত হতে আরও প্রায় একশ বছর লাগে। অবশ্য রাজনৈতিক দখলের আগে থেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচারকরা বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় আসতেন ও সেখানে ধর্ম প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

করতে শুরু করেছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশের সমাজে-মননে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বাঙালি জাতি গঠনের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ রূপ পেতে শুরু করে। গবেষকদের মতে,

> বাঙালি জাতির অভ্যুদয় প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা নয়। হিন্দু-বাঙালি, বৌদ্ধ-বাঙালি, জৈন-বাঙালি তথা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে 'মুসলমান-বাঙালি' ও বাঙালি-জাতি গঠনে উপাদান সরবরাহ করেছিলো। তাই বাঙালির ইতিহাস বা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসের আলোচনায় 'প্রথমেই বাঙালি জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়'। ..... 'যতদিন বাঙলা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, ততদিন বাঙ্গালী জাতি বলিয়া একটা কিছুর কল্পনা করা যায় না। বাঙালি জনগণের পূর্বপুরুষ যখন অন্য ভাষা বলিত, তখন তাহাদের ঠিক বাঙ্গালী বলা চলে না।' বাঙ্গালী জনগণের গঠনে কী কী উপাদান আসিয়াছে, তাহার আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে ও হইতেছে; ..... কয়েকটি বিভিন্ন race বা জাতির সমবায়ে বাঙালি জনগণ গঠিত হইয়াছে; এবং এই গঠনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে কত সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা জানা যায় না। ..... বাঙালা ভাষা তাহার আধুনিক অর্থাৎ বাঙালা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল খ্রিস্টিয় ১০০০-এর দিকে;..... খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালার সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে; মনে হয়, সেই সময়ে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট চীন-জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্য্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট nation বা জনগণ-এ পরিণত হইয়াছিল। সমভাষিতাকে আশ্রয় করিয়া কিন্ত nationhood অর্থাৎ জাতীয়তা বা এক রাষ্ট্রিকতার ধারনা তখন পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় নাই - ভারতেও নহে। - এইভাবে বাঙালি জনগণের পত্তন হইল - বাঙালির সংস্কৃতি তাহার আদিমরূপ গ্রহণ করিল। .....আনুমানিক দশম হইতে প্রাচীন বাঙালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ চর্যাপদকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাস আরম্ভ হইল। ..... তুর্কি বিজয়ের পরে বাঙালি পণ্ডিতজন এবং বাঙালি জনগণ পরস্পর বিরোধী টানের মধ্যে পড়িল.... ইসলাম ধর্ম আসিয়া দেশে নূতন ঝড় বহাইয়া দিল, ... নূতন আগত ইসলামের সহিত সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হইল। .... শরীয়াতি ও সুফিয়ানা – এই দুই প্রকারের ইসলামের মিলিত প্রভাব আসিয়া মুসলমান রাজশক্তির সহিত যোগ দিল এবং বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। বাঙালির জীবনে ইহার ফলে আর একটি নতুন ভাবধারা (ইসলামী ভাবধারা, বিশেষ করিয়া সূফী মতের ভাবধারা ও আদর্শ)... আসিয়া মিলিত হইল।[১০]

বাঙলা ভাষা,সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রেও তুর্কিদের বিজয় তথা ইসলামের প্রসার যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলো। তুর্কি-বিজয় থেকেই বাঙলায় মধ্যযুগের উন্মেষ, আর প্রাচীন যুগের অবসান। যেমন- পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির পরাজয়েই আধুনিক যুগের উন্মেষ। এ যদি সত্য ও স্বীকৃত হয়, তাহলে বলতে হবে প্রাচীন যুগের অবসানের মূলে ছিল ইসলাম, যেমন-মধ্য যুগের বিলুপ্তির মূলে রয়েছে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য ও কৃৎ কৌশল।[১১]

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কোন মর্তমানবের কাছে মাথা নত করে না। তারা কেবল স্রষ্টা উপাস্যের কাছে তাদের দেহ-মন-আত্মা সমর্পণ করে। তাদের ভাব-চিন্তা, কর্ম-আচরণ, তাদের সব পার্থিব দায়িত্ব-কর্তব্য ও বাসনা আল্লাহর অদৃশ্য অশ্রুত অভিপ্রায়ক্রমেই চলে বলে তাদের ধারণাঃ

> এজন্যই তারা উন্নত শির, অকুতোভয়, অঙ্গীকারে অনড়, সংকল্পে অটল। ভয় এবং পরাজয় কাকে বলে তারা জানে না। এক কথায় তাদের জীবন-মরণ, কর্ম-আচরণ, সবই ওই অমোঘ বিশ্বাস চালিত। তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করে তাদের ব্যাক্তিজীবনে আল্লাহর অদৃশ্য ইচ্ছাই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ রূপায়িত হচ্ছে। ... এ হচ্ছে প্রমূর্ত ঈমান। সেদিনকার কেবল মালাবারের (সিন্ধু বিজয়ী, মুহম্মদ বিন কাসিম,৭১১খ্রিঃ এর ঘটনা স্মর্তব্য) আরব সৈনিক শাসক-সদাগরদের দেখে ওই এলাকার লোকের মনে হয়তো এ ধারণাই দানা বেঁধেছিল যে বিজেতাদের শক্তির উৎস ওই একক উপাস্যই। বহু দেবতার পূজারিরা তাই ওদের কাছে পরাভূত। বিজয়ী ও বীর্যবান ইংরেজদের দেখে বহু শতাব্দী পরে হয়তো এমনিভাবেই রামমোহনের মনেও জেগেছিল একশ্বেরবাদের প্রতি আকর্ষণ, তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন একক উপাস্য মহিমা। সেদিনকার শুধু গণমানব নয় শাহ-সামন্ত আর ধনী-মানি-বেনেও ইসলামি সাম্যে ভ্রাতৃত্বে ও মুসলিমের বলবীর্যে এবং চরিত্র শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম বরণ করে।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুসলমানদের শ্রেণীগত অবস্থান নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এই বিতর্ক বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩৮-৯৪) সৃষ্টি করেন। তিনি লিখেছিলেনঃ

> প্রথমে কোন বংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙালি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ..... ইংরেজ এক জাতি, বাঙালিরা বহু জাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালি বলি (১৮৭১ সনের লোক গণনা অনুযায়ী, বঙ্কিমের কালে বাঙলা-ভাষির সংখ্যা ছিল তিন কোটি ছয় লক্ষ) তাহাদের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালি পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালি মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙালি সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙালি অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙালি মুসলমান; উপরের স্তরে কেবলই আর্য্য। এজন্যই দূর হইতে বাঙলার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।[১৩]

মুসলমান সমাজের বিকাশ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র মন্তব্য করেন ঃ

> এখন-ত দেখিতে পাই, বাঙলার অর্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা ইহারা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক--কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণীর হইবে ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, অল্প সংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব, দেশীয় লোকেরা যে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্ব-ধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলামন হইল? কোন জাতীয় এরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙলার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।[১৪]

উপরের প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজার জন্য নীহাররঞ্জন রায়ের (১৯০৩-৮১) আলোচনা অবলম্বন করা যেতে পারে। তিনি ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম শাসন বিস্তারের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, তথা, সার্বিক পরিস্থিতির যে নির্মোহ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, - একাদশ দ্বাদশ শতকের বঙ্গীয় শাসক-শ্রেণীর সমাজকাঠামো বলবৎ রাখার কোনো শক্তিই ছিল না। নানা প্রকার দুরাচারে অবক্ষয়-কবলিত ঐ সমাজ তখন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলো। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের তৎকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেনঃ

> সে শুভোদয়ার সাক্ষ্য যদি প্রামানিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন রাষ্ট্র ও সেন-রাজ সভার চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না। সভাকবি উমাপতিধর ও মহাকর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র এই চরিত্রহীনতার দুইটি দৃষ্টান্ত মাত্র। পৃথিবীর সর্বত্রই তো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির এই একই চিত্র - প্রচীন গ্রীসে, রোমে, অষ্টাদশ শতকের প্যারিসে, অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগরে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতায়। সে চিত্র সামাজিক দুর্নীতির চারিত্রিক অবনতি, মেরুদন্ডহীন ব্যক্তিত্বের, কামপরায়ণবিলাসলীলার, শৃঙ্গার রসাবিষ্ট, অলংকারবহুল, মদির-বিধুর শিরপ ও সাহিত্যের, তরলরুচির ও দেহগত বিলাসের, অতিমাত্রায় ভেদ-বৈষম্যের, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিশ্বাসঘাতকতার। একাদশ, দ্বাদশ শতকের রামাবতী, বিজয়পুর, নবদ্বীপেও সেই একই ছবি দেখিতেছি।[১৫]

বল্লাল সেন, লক্ষণ সেনের রাজ্য শাসন-ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদবুদ্ধির ও নানা অনিয়মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে নীহাররঞ্জন রায় বাঙালায় ইসলাম ধর্ম বিস্তারের কারণ সম্পর্কে বলেন, বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরাও সেন রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না; এবং সে বর্মণ রাষ্ট্রও বৌদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ও সহানুভূতি পোষণ করতো না। রাষ্ট্রের আদর্শও বৌদ্ধ স্বার্থবিরোধী ছিলো।

> বর্ণভেদবুদ্ধি এবং এই শ্রেণী ভেদবুদ্ধি একত্র জড়িত হইয়া নবগঠিত বাংলাদেশ ও জাতিকে, সেন রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দেয়, সমান্ততন্ত্র এবং অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত আমলাতন্ত্র বিন্যাস সেন-বর্মণ রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভেদবুদ্ধির দুর্বলতা, স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের দুর্বলতা ..... তাহার উপর বর্ণ ও শ্রেণীগত এই ভেদবুদ্ধি, সমাজাদর্শগত ভেদবুদ্ধি বৈদেশিক আক্রমণকে প্রশ্রয় দেয় নাই, সহজ করিয়া দেয় নাই, তাহা কে বলিবে? ..... শুধু তো এখানেই শেষ নয়। আর্যতের ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং তন্ত্রধর্মের বিকৃতি এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্ম ও সমাজকেই স্পর্শ করিয়াছিল এবং উভয় ধর্মেরই আচারানুষ্ঠানকে নানা প্রকার যৌনাতিশয্য ব্যাধিগ্রস্থ করিয়াছিল। বোধ হয়,

Dhaka University Institutional Repository

> তাহারই ফলে সমাজে বিশেষভাবে উচ্চ বর্ণ শ্রেণীগুলিতে নানা প্রকারের কাম ও যৌনবিলাস দেখা দিয়াছিল। .... বস্তত, যৌন আচার-ব্যবহারে কোন প্রকার শ্লীলতাজ্ঞান এই সমাজে ছিল বলিয়াই মনে হয় না। .... পাল আমলের মেসের দিক হইতে তাহা দেখা দিল এবং সেন আমলে সমগ্র সমাজদেহকে তাহা কলুষিত করিয়া দিল। বিলাস ও আড়ম্বরাতিশয্যও এই সময় নগরসমাজকে গ্রাস করিয়াছিল।[১৬]

উপরিউক্ত সমাজ-পরিস্থিতির কারণেই মুসলিম শাসকশক্তির বিরুদ্ধে 'হিন্দু রাষ্ট্র শক্তিপুঞ্জ' কোনো সামগ্রিক প্রতিরোধ রচনা করতে পারেনি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই নিম্নগামী প্রবাহকে রোধ করিবার মতন সাহস ও শক্তি, বুদ্ধি ও চরিত্র, দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, না সেন রাজসভায়, না বৃহত্তর সমাজে। সকলেই যেন অনিবার্য গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।[১৭]

নবদ্বীপ জয় করার একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা তৎকালীন রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণামেই ঘটেছিলো। তবে লোকসংখ্যার অনুপাতে কী হারে বৃদ্ধি হচ্ছিলো, তা ঠিক পরিসংখ্যানের ভাষায় বলা সম্ভব নয়। কারণ, মধ্যযুগে লোক গণনার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর মুসলমান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আর নির্ণয় করার উপায় নেই।

মুসলমান আমলে এদেশ সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেসবে প্রধানত রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনী প্রধান্য লাভ করেছে, জনসাধারণের কথা প্রায়ই স্থান পায়নি। ব্রিটিশের শাসন-আমলে ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং পণ্ডিতগণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সনে প্রথম 'আদমশুমারি' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সনে দ্বিতীয় এবং ১৮৯১ সনে তৃতীয় ইত্যাদি দশ বছর অন্তর-অন্তর নিয়মিতভাবে লোকগণনার রীতি চলতে থাকে। ১৮৭২ সনের সেন্সাস-রিপোর্ট অনুযায়ী মূল বাঙলার মুসলমানের সংখ্যা, ১,৭৬,০৯,১৩৫ এবং হিন্দু সংখ্যা ১,৮২,০০,৪৩৮ জন। শতকরা হিসেবে হিন্দু মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮.৮%। ১৮৮১ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ বেশি হয়। ১৮৯১ সনের সেন্সাস-রিপোর্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও অধিক দেখা যায়।[১৮]

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা পুরোপুরি হয়নি। অনুমান করা যায় .... হিন্দু-অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিনে কৌলিণ্য ও জাতি বিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্বদেশে বৌদ্ধ-মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে ছিল। মোসলেম-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ববঙ্গের ধর্মীয় রূপ বদলে দেয়। বাঙলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে কোন দিনই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেনি, রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ইসলামের প্রচারের মধ্যে বৌদ্ধমানসের ক্রিয়া তাই সুস্পষ্ট––সেই জন্যই এ প্রান্ত প্রদেশে মুসলমানের প্রাচুর্য্য।[১৯]

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেশীয় এবং ইউরোপীয় (অথবা ভিনদেশীয়) পণ্ডিতগণ মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং কোন কোন এলাকায় কম বা বেশি হবার কারণ নিয়েও সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ও প্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন। মুসলমান চিন্তাবিদদের মধ্যে আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, আহমদ শরীফ, কাজী আবদুল মান্নান ও ওয়াকিল আহমদ প্রমুখ গবেষক সেসব তথ্যের বিশ্লেষণপূর্বক বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। তাঁদের গবেষণার আলোকে বলা যায়, বাঙ্কিমচন্দ্রের '*আনন্দমঠ*' রচনার সমকালেই বাঙলাভাষী জনগণের অর্ধেক মুসলমান ছিলেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমান ও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বেশি হবারও অনেক কারণ ছিল। উন্মেষ যুগের লঘিষ্ঠ মুসলমানেরা বিত্ত ও বিদ্যার অভাবে অনুজ্জ্বলও ছিল। আবার নব্যগঠিত মুসলমান এর সমাজকাঠামোর মধ্যে ভারতীয় বর্ণ বৈষম্যবাদও বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিত্তিক চর্তুবর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পাল্টিয়ে 'আশরাফ', 'আতরাফ', 'আফজাল', প্রভৃতি নামে টিকে ছিলো। সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীভেদ প্রধানত 'খানদান' বা রক্তধারা দিয়ে নির্ণীত হয়েছে। বিত্ত ও বিদ্যা সমাজ স্তর গঠনে প্রভাব ফেলতে পারেনি।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্মের বিকাশের ইতিহাসকে যিনি যে-দৃষ্টিতেই দেখে থাকুন, আর সামাজিক বিবর্তনের যে-দুর্বল মুহূর্তেই এই ধর্ম ও সম্প্রদায় এই দেশে বিস্তৃতি লাভ করুক না কেন, এই সত্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি প্রগতিশীল ধর্ম হিসেবেই 'ইসলাম' বিকশিত হতে পেরেছিল। আর জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ বা হিন্দুর সনাতন ধর্মের তুলনায় ইহা আধুনিকতমও বটে। শিক্ষার অভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানের ধর্মীয় জ্ঞান কেবল মৌখিক নির্দেশ ও সংস্কারের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিলো। একারণে ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান ও দেশীয় হিন্দুর সংস্কৃতিতে ব্যাপক সাদৃশ্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে শিক্ষিতজনের মধ্যে বিদ্বেষ ও বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। চিন্তাবিদ আহমদ শরীফ সেকালের এবং একালের শহুরে সাহিত্যে 'রাজশক্তিসম্পৃক্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে'ই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বা বিদ্বেষের পরিচয় দেখেছেন। তিনি গাঁ-গঞ্জের সাধারণ দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের চিত্রও সমাজে সাহিত্যে পাওয়া যায় বলেও মন্তব্য করেন।[২১] সৈয়দ মুজতবা আলী ও হিন্দু-মুসলমানের অসম্প্রীতির পরিচয় তুলে ধরেছেন 'বড়বাবু' শীর্ষক গ্রন্থে;

> ষড়দর্শন নির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্র-পৌত্রেরা মুসলমান আগমণের পর শত বৎসর ধরে আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শন চর্চা করলেন, কিন্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় ঐ সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতিনিজম্ তথা কিন্দী, ফারাবী, ইব্নে সিনা, আল গায্যালী, ইবনে রুশদ প্রমুখ মনীষীগণের দর্শন চর্চা হল তার কোন সন্ধান পেলেন না এবং মুসলমান মৌলানারা কম গাফিলতী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো আরিস্ততলের দর্শন চর্চায় সোৎসাহে জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। .... হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। [২২]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান-নীতি সম্পর্কে, অর্থাৎ অসম্প্রীতির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বলেন ঃ

> মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামী যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য, যবন বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিস ব্যবহার করিত না। তৃষ্ণার্ত মুসলমান পথিক জল চাহিলে বাসন অপবিত্র হইবে বলিয়া হিন্দু তাহা দেয় নাই; ইব্ন-এ-বতুতা এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচারণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও তেমনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুতঃ উভয়পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই-যুক্তি বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। কিন্তু ন্যায্য হউক বা অন্যায্য হউক পরস্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহ্য হইয়া যায়, যেমন সতীদাহ বা অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার আনিতে পারিত না। হিন্দু-মুসলমানও তেমনি এই সব সত্ত্বেও পাশাপাশি বাস করিয়াছে, কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা স্থায়ী প্রীতির বন্ধনও প্রকৃতরূপে স্থায়ী হয় নাই।[২৩]

এইরূপ পার্থক্যসূচিত হওয়ার কারণ-মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শের ভিন্নতা। মুসলমানদের পূর্বেও অনেক বিদেশী ও বিধর্মী জাতি-ভারতে বসতি স্থাপন করে। যেমন গ্রীক, সিথীয় (শক), পার্থীয়, মোঙ্গলীয়। কিন্তু 'তাহাদের বংশ দুই তিন পুরুষ পরেই হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়, ... মুসলমান-বিজয়ের পর এইরূপ মিলন ও একত্রীকরণ বন্ধ হইল। হিন্দুধর্ম ইসলামকে নিজস্ব করিয়া, মুসলমান জাতিগুলিকে হজম করিয়া ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করিতে পারিল না। কারণ, ইসলামের মূলমন্ত্র একেশ্বরবাদ। .... অতএব, হিন্দু ও মুসলমান (পরে হিন্দু ও খ্রিস্টান) একই দেশে শত শত বর্ষ বাস করিয়াও সমাজে জীবনে এক হইতে পারে নাই। ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়ের দ্বার ভারতের দিকে বন্ধ, ভারতের বাইরের দিকে খোলা।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এসব উক্তিতে সত্য রয়েছে এবং তাঁদের অগ্রগতির বিলম্বিত হওয়ার কারণ এগুলোই। তবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে মুসলিম সমাজব্যবস্থা সত্যিই বিরাট বিপুল সদর্থক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। আচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং যদুনাথ সরকার এ সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেনঃ মুসলমান যুগের দেওয়া শান্তি ও ঐশ্বর্যের ফলে হিন্দী বাঙলা মারাঠী প্রভৃতি নব্য-ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং সংস্কৃতের ব্যবহার প্রায় লোপ পায়।[২৫]

বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সমস্যার মূলে এখনও দেখা যায়, শ্রেণীস্বার্থবোধ কার্যকর রয়েছে। কালে কালে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে, সোজা কথায়, প্রাক্তন সেই শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধি এবং হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণাই প্রাধান্য পেয়েছে। উচ্চশ্রেণী উদ্ভূত লেখক-সাহিত্যিকদের রচনায় নিম্ন শ্রেণীর প্রতি তাচ্ছিল্য এবং আপন শ্রেণী সম্পর্কে গর্ববোধ উনিশ শতকেও বাঙালির চিন্তাচেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল। বাঙালি মুসলমান কারা? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আভিজাত্য অভিলাষী মুসলমান বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনি উচ্চ-শ্রেণীউদ্ভূত হিন্দুর কাছ থেকে সত্য পাওয়া গেলেও, তাকে মেনে নেবার মতো ঔদার্য সমাজে দেখা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বিভিন্ন মণীষীর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার পরিচয়

বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের নানা পর্বে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলয়েড, ভোটচীন, নেগ্রিটো এবং সেমেটিক, আর্য ইত্যাদি নানা নরগোষ্ঠি বাংলায় এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। এরা নানা আদিম আচার বিশ্বাস, ধর্মমত ও পথ-পন্থায় বিশ্বসী ছিলেন। এদের রক্তধারা ও সাংস্কৃতিক ধরণ-ধারণ-উপকরণও বহু বিচিত্র। তবু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও বোধ বিশ্বাস এবং কর্ম-নীতিতে কোন অলঙ্ঘনীয় বিরোধ বা সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি না হয়ে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লক্ষ্যে সমন্বিত জীবন ধারাই যে গড়ে ওঠেছে সেটাই ইতিহাসের সত্য। এখানেই বাঙালি জাতির অসাধারণ গ্রহণ ক্ষমতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং বাস্তব জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মত-পথ-বিশ্বাসে ছাড় দিয়ে সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন এই ঐতিহাসিক বিকাশ ধারার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং মধ্যযুগের ইউরোপের তীব্র ধর্মীয় হানাহানি ও ধর্মযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে। ফলে রেনেসাঁস, শিল্পবিপ্লব-রিফর্মেশন-আলোকায়নের প্রজনন জাতি রাষ্ট্রের ধর্মই হয়ে ওঠে- আমরা যাকে বলি, ধর্মনিরপেক্ষতা বা পাশ্চাত্য অভিধারায় সেক্যুলারিজম। এই সেক্যুলারিজমের সৃষ্টিতে দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তক মিল, কোঁত, রুশো, ভলটেয়ারের অবদান অনেক বড়। তাঁদের প্রভাবে শিক্ষিত নগরবাসী বাঙালিদের মধ্যে আলোকায়নের কিছু স্পর্শ লাগলেও গোটা দেশ জুড়ে সমন্বিত জাতীয় সাংস্কৃতিক সত্তানির্মাণে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক, নাথযোগী, বাউল-সুফি কবিয়াল-বয়াতিদের ভূমিকাই প্রধান। পাশ্চাত্য সেকুলারিজম তাই বস্তুতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী আর আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা হৃদয়-সংবেদী। বাঙালির আত্মিক বিকাশের সঙ্গে এর ওতপ্রোত সংযোগ। বলা চলে, বাঙালি জাতিসত্তাই গড়ে ওঠেছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আশ্রয় করে। ফলে, যে দেশজ চিন্তা-চেতনা ও দর্শনে বাঙালির বাঙালিত্ব বা দেশগতসত্তা তার ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতায়; অন্যকথায় ধর্মনিরপেক্ষ না হলে বাঙালি হওয়া সম্ভব নয়।[২৬]

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ না হলে গণতান্ত্রিকও হওয়া যায়না। এটা একটা সর্বজননী সত্য। বাংলার ইতিহাসেও এর প্রমাণ মিলে। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় তার রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু এই শিব-ভক্ত রাজার রাজত্বের শেষেই বঙ্গে দেখা দেয় মাৎসন্যায়। এই অবস্থার অবসানকল্পেই দেশের মানুষ 'গোপাল' নামে এক সজ্জন সাধারণ ব্যক্তিকে বাংলার রাজা নির্বাচন করেন। বাঙলার ইতিহাসে জনগণের পছন্দে রাজা নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা শুধু ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ই নয়, বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার এক প্রাচীন নিদর্শনও বটে। স্বৈরাশাসক আইয়ুব খাঁ এবং বাংলাদেশের কোন কোন সেনানায়ক যে বলেন, পাশ্চাত্য বা নির্বাচনের গণতন্ত্র আমাদের জনগণের মেধার সঙ্গে যায় না এ ঘটনা তাকে অসার প্রতিপন্ন করে। গোপালের পর পালরাজারা বাংলায় প্রায় চারশত বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ে বাংলার-শিল্প- সংস্কৃতি, চিত্রকলা-ভাস্কর্যের অসামান্য বিকাশ ঘটে।[২৭]

বাংলা ভাষার উৎপত্তিও ঘটে এই পালদের রাজত্বকালে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের আমলে ধর্মীয় উগ্রপন্থার নিপীড়ন হয়নি। কিন্তু দশম-একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের সেন রাজারা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রীয় ধর্ম-দর্শনের বিকাশ ঘটালেও তাঁদের সময়েই ধর্মীয় নির্যাতনে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা দেশ ছেড়ে নেপালে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এজন্যই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ মাত্র শতাধিক বছর আগে (১৯০৯) নেপালের রাজদরবার থেকে উদ্ধার করেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সেন রাজাদের ধর্মীয় উগ্রশাসনের পরবর্তীকালে দুশ বছরের যে 'অন্ধকার যুগে'র সৃষ্টি হয় তার দায় উগ্রহিন্দুত্ববাদী সেন রাজাদের এবং প্রথম দিকের বহিরাগত মুসলিম দখলদার উভয়ের উপরই বর্তায়। তবে রাষ্ট্রপরিচালনায় বহু মত-পথ-গোত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য ধমনিরপেক্ষতার কোনো বিকল্প নাই। ভারতবর্ষে শাসন করতে এসে মুসলিম শাসকরা এ বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেই ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বের পরিবর্তে বাস্তব সমস্যা মোকাবিলার উপযোগী রাষ্ট্রতত্ত্ব বা পরোক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র শাসননীতির উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে বহু আগে থেকেই নিচু স্তরে নানা

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মমতের সহ-অবস্থান থাকলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবর্তক মুসলিম শাসকেরাই। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য প্রামাণ পাওয়া যায় মুসলিম ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বারনির ১৩৫০খ্রিস্টাব্দে লেখা তিনখানা বইয়ে। বইগুলির নামঃ *তারিখ-ই ফিরোজশাহী, ফতোয়া-ই জাহানদারী*, এবং *শাফিয়া-ই-নাট-ই আহমদি।* তারিখ-ই ফিরোজশাহীতে বারানি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ

> "আমার প্রভু ইলতুৎমিশ বলতেন যে, সুলতানের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস মেনে রাষ্ট্রশাসন করা সম্ভব নয়; ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করতে পারাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। সুলতানের ঘোষিত আদর্শ ছিল *'ন্যায় বিচার।'* মধ্যযুগের ভারতে ন্যায় বিচারের অর্থ ছিল ঃ 'সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষা; সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায়ের এক অংশ যেন অন্য অংশের উপর আধিপত্য না করে এমন ব্যবস্থা' বারানি আলাউদ্দিন খলজির (১২৯৬-১৩১৬) মত উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি বলেছিলেন, "শরিয়তে কি লেখা আছে, তার পরোয়া না করে রাষ্ট্রের স্বার্থে যা করা উচিত বলে মনে করবেন, সুলতানের তাহাই করা উচিত।"[২৮] একেই বলা হয়েছে 'জাহানদা*রী*' বা ইহজাগতিকতা অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা।

রাজ্য বিস্তার, ভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভ ও শাসন পরিচালনার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া অন্য কোনো লাগসই বিকল্প তাঁরা খুঁজে পান নি। এমনকি রাজা ও প্রজা উভয়ই মুসলমান এমন দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিল অপরিহার্য রাষ্ট্রনীতি। উদাহরণ, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ। ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি আর শিল্প-সংস্কৃতির অপূর্ব-বিকাশ ঘটে এবং ধর্মান্ধতা এমনকি ধর্ম-প্রবণতার ফলেও সামাজিক বিপর্যয় ও সংস্কৃতির অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখিত আলোচনায় আরো স্পষ্ট হবে বাংলায় সুলতানী আমলের ইতিহাসের দিকে তাকালে। দিল্লীর মতো বাংলার সুলতানরাও ছিলেন বিদেশী, বিভাষী ও বিধর্মী। তবে তাঁরা শাসক হলেও শাসিতের দেশে নিজ ধর্মের প্রয়োগে জোরজুলুম ও জবরদস্তি করেন নি। বরং বাংলা ও বাঙালিকে ভালোবেসে এদেশকে আপন করে নিয়েছিলেন। হোসেন শাহী আমলে বাংলায় এক নবভাব বিপ্লবেরই সূচনা হয়েছিল। একদিকে শ্রীচৈতন্য দেবের হিন্দু ধর্মের গণমুখী সংস্কারমূলক ভক্তিবাদী আন্দোলন ও ধর্মীয় ছুঁৎমার্গমুক্ত মানবপন্থী সাধনধারা; অন্যদিকে মুসলিম মরমী সুফি-সাধকদের অধ্যাত্মচেতনাপ্রসূত মানবতাবাদ বাংলায় সামাজিক জীবনে এনেছিল এক নবতর সাংস্কৃতিক উজ্জীবন। এই ভাব-আন্দোলনকে হয়তো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলার নবজাগরণ বলে আখ্যাত করা চলে। কারণ, বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। সুলতানদের উদারতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মহাভারত ও ভগবতে এই প্রথম সংস্কৃত থেকে বাঙলায় অনূদিত হয়। ভগবত অনুবাদ করে মালাধর বসু সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ'র কাছ থেকে *'গুণরাজখান'* উপাধিতে ভূষিত হন।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই নীতি সমন্বয়বাদী বাঙালি জাতিসত্তা গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তাই নয়, বহিরাগত এই মুসলিম সুলতানেরা বিকাশমান বাঙালি জাতি গঠনে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন ইতিহাসনিষ্ঠ কোনো বাঙালির তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। একথা বলাই বাহুল্য যে এই জাতি গঠন প্রক্রিয়াটি নৃ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে শুরু করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। বাঙালি জাতি ও বাঙালিত্ব নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কারও বোধ করেছেন এঁরা। সেজন্যই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিজেকে *'শাহে বাঙালিয়ান'* বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাবরাও বাঙালিদের দেশজ উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সুলতানদের প্রবর্তিত ধারাকে আরো গভীরতা দান করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ও আলীবর্দী খাঁর বেড়াভাসান উৎসব, বাংলা নববর্ষে পুণ্যাহ উৎসবে যোগদান এর প্রমাণ বহন করে। অতএব, বঙ্গদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি নির্মাণে মুসলিম শাসকদের অবদান দিকনির্দেশক। দিল্লী ও বাংলার সুলতানদের এই প্রয়াসকে একটি গ্রহণযোগ্য ও চলমান ঐতিহাসিক ধারা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েই নেহেরু-মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ স্বাধীন ভারতে এবং বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দিন ও তাঁদের সহযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নবীন গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন।[২৯]

বস্তুতঃ দুই পাকিস্তান ভিত্তিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব-বাংলার বাঙালি বুঝতে পারে তারা প্রতারিত হয়েছে। এখন তারা শোষণ-নির্যাতন ও জাতিগত নিপীড়ণের শিকার। তাই অতি দ্রুতই ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি শুরু করে নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা ভিত্তিক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সে আন্দোলনে বাঙালির সংস্কৃতি ও রাজনীতি একাত্ম হয়ে যায়। ফলে বাংলা ভাষা ও বাংলার ভূ-প্রকৃতি ভিত্তিক নবচেতনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপটি নির্ধারণ করে দেন এই ভাষায় ঃ

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন দাগ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জোটি নেই'।[৩০]

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তা এই তাত্ত্বিক সূত্র ধরে নিজেই সংকুচিত ক্ষেত্র থেকে মূল আন্দোলন শুরু করেন। তাঁকে অনুসরণ করে পূর্ব-বাংলার নব প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের সক্রিয়বাদীরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। এই ধারায় ২৩ বছরের উপনিবেশ-বিরোধী স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, ১৯৬২-এ *দেশ ও কৃষ্টি* শীর্ষক পাঠ্য বইয়ের বাঙালি জাতিসত্তা-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামকে গুণগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্তরে উন্নীত করে ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে। এই গণঅভ্যুত্থান ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জণের ড্রেস রিহার্সাল স্বরূপ। অবশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর যোগ্য সহযোগী তাজউদ্দিনও অন্যান্যদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের, সংগ্রামের, সাধনার, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্যমূলক অর্থনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। পাকিস্তান বন্দি শিবির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন ঃ

> "আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা। এদেশের কৃষক শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"

এর আগে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে ১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গৃহীত হয় এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করা হয়। তাতে সুষ্টভাবে বলা হয় ঃ

> "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবয়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার এবং কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হলো।"

এমন এক রাষ্ট্র গঠন ও সংবিধান রচনা বাঙালির ঐতিহাসিক বোধ, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বাঙালি জাতির এর চেয়ে বড়ো সাফল্য, বড়ো অর্জন ইতিহাসে আর নাই। বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রশংসা করে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Center for Inquiry-Transnational-এর শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালক ড. অস্টিন ডেইসি বলেন ঃ

> "Thomas jefferson could have learnt a lot about secular democracy from Sheikh Mujibur Rahman"।[৩১]

উল্লেখ্য উনিশ শতকের হিন্দুজাগরণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে মুসলিম সমাজের ভিতরে চঞ্চলতা ফিরে এল, সে-কথা বলা হয়েছে। পত্র-পত্রিকা বের করে বাঙালি মুসলমানেরা সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা তথা মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করলেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় তাঁরা দক্ষতা দেখাতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

নি। ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে এই বিতর্ক অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে চলেছিলো যে, তাঁদের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিত- উর্দু না বাঙলা। ১৯২৭ সনে প্রকাশিত *'শিখা'* এবং ১৯৩৩ সনের *'বুলবুল'*-এ বিতর্ক চলে বলে অনুমান করা যায়। বাঙলা সাহিত্যচর্চায় মুসলমানেরা কোনো দক্ষতা দেখাতে দেরী করেছিলেন। তাছাড়া স্বদেশী-আন্দোলনের কালে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ পৃথক হয়ে পড়ায় আর বঙ্কিম-সাহিত্যে তা প্রকটভাবে প্রকাশ পাওয়ায় মুসলমানেরা তাঁকে সহজ ভাবে নিতে পারেননি। কারণ বঙ্কিম-সাহিত্যের সত্যিকার প্রতিপাদ্য মানবতা হলেও তিনি ছিলেন প্রবলভাবে হিন্দুত্বের প্রচারক। একালে তাঁর প্রচারক ভূমিকাই কার্যকর ভাবে অনুসৃত হয়েছে। ফলে হিন্দু-সমাজে প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা-কীর্তন যেমন হয়েছে, তেমনি এই একই কারণে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে নিন্দাও কুড়িয়েছেন প্রচুর। বঙ্কিম-বিরোধিতার প্রচণ্ডতা আরম্ভ হয় বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয়ে যাবার পরে, এর লিখিত সমালোচনা চলে কবি মোজাম্মেল হক থেকে আরম্ভ করে ইসলমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ইদ্রিস আলী পর্যন্ত। অনেকেই অকথ্য ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রকে গালিগালাজ করেছেন। ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন বঙ্কিম-সমালোচনার সিরিজ বের করেছিলেন খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে। *'আনন্দমঠ বা নন্দের ফন্দী'* (১৯২২)-এর প্রচ্ছদে লেখা ছিলঃ

> 'দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদীয় গ্রন্থ/রাজবুদ্ধির অর্জন/দাসবুদ্ধির বর্জন-বঙ্কিম-সমালোচনা যে পড়িবে, সেই করিবে'। নিবেদনে বলা হয়েছিল- যেন হিন্দু রচিত কোন গ্রন্থ মুসলমানদিগকে পড়ান না হয় আর যদি একন্তই পড়ান হয়ে তবে হুজুগ উঠিলে সে দোষ তোমার'।

ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেনের বঙ্কিম-সমালোচনার নমুনা রয়েছে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। বিষবৃক্ষ, কপালকুন্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের ওপর ছোট ছোট স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, বঙ্কিম-বিদ্বেষী আবুল হোসেনের পাঁচটির বই-ই বের হয় ১৯২২ সনে। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায়-নন্দিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯২৮ সনে। ১৯৩৮ সনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অনুসারি বুদ্ধিজীবী লেখকেরা মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে আনন্দমঠের বহুৎসব করেন কলকাতায়। মুসলমানদের বঙ্কিম বিদ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই ঘটনায়, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে। বিবেক সম্পন্ন মুসলমানেরা এই সমস্ত ঘটনাকে অনুমোদন করতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গ বহরমপুরের রেজাউল করিম (১৯০৩-৯৫) এবং কাজী আবদুল ওদুদের ন্যায় পণ্ডিতবর্গ সেদিন এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে লিখেছিলেন অনেক। *'শাশ্বতবঙ্গ'* গ্রন্থে কাজী আবদুল ওদুদের এবং রেজাউল করিমের *'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ'* গ্রন্থে মুসলমানদের এই নিন্দনীয় কাজের সমালোচনা করা হয়েছে। হিন্দু সমাজের একশ্রেণীর লেখক বুদ্ধিজীবীও (প্রধানতঃ তরুণ) বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। অগ্রগতি পত্রিকায় 'বঙ্কিম কি মারা গেছেন?' শীর্ষক একটি কড়া সমালোচনা লিখেলিন নির্মলঘোষ দস্তিদার।এই লেখার কারণে মামলা দায়ের হয় কলকাতার কোর্টে। *'দৈনিক আজাদ'* এটি পুনর্মুদ্রণ করে এবং মামলার বিষয়েও তাঁরা ইন্টারফেয়ার করেন।[৩২]

তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যও চেষ্টা কম হয়নি। কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদের রচনার উল্লেখ করলেই এঁদের প্রচেষ্টার কথা মনে আসে। অপ্রধান লেখকেরাও এতে অংশগ্রহন করেছেন - শ্রীবিপিনচন্দ্র সরকার *'দেশের গীতি'* নামে বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন। *'হিন্দু মুসলমান'* শীর্ষক গানটির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলেই এ ধারার সাহিত্যপ্রয়াসের স্বরূপ বোঝা যায়। *'হিন্দু মুসলমান'* দেশের কল্যাণ, যদি কর বাসনা; ভাই ভাই মিলি শুদ্ধ নিরিবিলি-মনে প্রাণে মেশনা।[৩৩]

হিন্দু - মুসলমাননের বিরোধ- বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন অনেক লেখক- সাহিত্যিক, আবার সম্প্রীতি বর্ধনের চেষ্টাও করেছেন বহু জনে। একালে (১৮৭০ - ১৯৩০) মুসলমান সমাজে সাহিত্যিকদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, হিন্দুদের মধ্যেও উনিশ শতকের ধারায় লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেই চলে। সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর দে প্রমুখের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থ ও আলোচনাদিতে হিন্দুদের রচিত সাহিত্যের বিশদ বিবরণ সুলভ্য। মুসলমান সাহিত্যিকদের কর্ম ও সৃজনের বিবরণ দিয়েছেন মুহম্মদ এনামুল হক,

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আহমদ শরীফ, কাজী আবদুল মান্নান,আনিসুজ্জামান, ওয়াকিল আহমদ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ।

১৯৩০ পর্যন্ত যে সমস্ত মুসলিম লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন,তাঁদের শ্রেণীকরণ করা আছে নানা দৃষ্টিকোণে মুসলিম গবেষকদের গ্রন্থাদিতে। ফলে বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বালা যায়, প্রধান ও অপ্রধান প্রায় দেড় শতাধিক মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক বাঙলা সাহিত্যের মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মীর মোশাররফ হোসেনের *'রত্নাবতী'* ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, আর এ - ধারায় লিখেছেন পরে, তাঁরা হলেন - কায়কোবাদ, শেখ আবদুর রহিম, মোজাম্মেল হক, আকরম খাঁ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এস ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজীবর রহমান, শেখ ফজলুল করিম, কাজী ইমদাদুল হক, একরামুদ্দীন, শেখ হবিবুর রহমান, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ, মুহম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ফজলুর রহীম চৌধুরী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, মিসেস এম. রহমান, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুল জব্বার, মুহম্মদ বরকত উল্লাহ, কাজী আকরম হোসেন, ইব্রাহীম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, মাহবুবউল আলম, ওহীদুল আলম, দিদারুল আলম, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, জসীমউদ্দীন, মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদির, মুহম্মদ আজরফ, মহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মহম্মদ হবীবুল্লাহ, শামসুন্নাহার মাহমুদ, আকবরউদ্দীন, কাজী কাদের নওয়াজ, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ।

এই তালিকা দীর্ঘতর করা চলে অগেই বলা হয়েছে। তবে সে প্রয়োজন নেই, এখানে মুখ্য প্রয়োজন কেবল এটাই স্পষ্ট করে তোলা যে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা, সাময়িক পত্র, সাহিত্যিক- সাংস্কৃতিক সংগঠন (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি, বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ওয়াকিল আহমদ ও অন্যান্যের প্রসঙ্গিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি) ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানেরা বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উৎকর্ষতা নিয়ে একযোগে কাজ আরম্ভ করায় বাঙলার জাগরণে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ লক্ষ্যযোগ্য, শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে ত্রিশের প্রান্তে এসে। কাজী আবদুল ওদুদ *'বাঙলার জাগরণ'* গ্রন্থে ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার *'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'*র চিন্তা ও কার্যাবলির মাধ্যমে রামমোহন রায় কর্তৃক সূচিত নবজাগরণের সাধনায় বাঙলার মুসলমানরা সামিল হলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশঃ

১. *জৈমিনি সূত্র*
২. *আল কোরআন*, সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯
৩. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
৪. মোহাম্মদ আবদুল হাই, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃষ্ঠা ৮-৯
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. "*শশাঙ্ক*" [বাংলাপিডিয়া] এশিয়াটিক সোসায়টি অফ বাংলাদেশ। সংগৃহীত ২০০৬-১০-২৬
৮. "*Islam (in Bengal)*" [বাংলাপিডিয়া] এশিয়াটিক সোসায়টি অফ বাংলাদেশ। সংগৃহীত ২০০৬-১০-২৬
৯. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি- ২০০৫।
১০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস*, কলকাতা ১৯৭৬, পৃ ২০-৩৩
১১. আহমদ শরীফ, *বাঙালির চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা*, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৩
১২. তদেব, পৃ. ৪৭
১৩. বঙ্কিম চট্টোপধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, *বঙ্কিম-রচনাবলি*, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, নবম মুদ্রণ, কলকাতা ১৩৯২, পৃ. ৩৬১-৬৩
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪০
১৫. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, কলকাতা (৩য় সংস্করণ) ১৯৮০, পৃ. ৫৫৫
১৬. তদেব, পৃ. ৫৫৪
১৭. তদেব, পৃ ৫৫৪-৫৫৭
১৮. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪
১৯. হুমায়ুন কবির, বাংলার কাব্য, ঢাকাই সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃ. ১৪
২০. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
২১. আহমদ শরীফ, *বাঙালির চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা*, পৃ ১০০-১০১।
২২. উদ্বৃত, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ/দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৭ (৪র্থ সং) পৃ. ৮-৯ (ভূমিকা)
২৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, উপরিউক্তি, পৃ. ৩২৪-২৫
২৪. যদুনাথ সরকার, *ভারতে মুসলমান*, প্রবাসী, ৩০ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৭
২৫. যদুনাথ সরকার, উপরিউক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের '*সামাজিক-প্রবন্ধ*' শীর্ষক গ্রন্থে ও জাতীয়তার বিকাশে মুসলিম অবদানের আলোচনা আছে।
২৬. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত '*মুক্তবুদ্ধি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল*' মনন প্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ-২৬
২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭
২৮. সৈয়দ নূরুল হাসান
২৯. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত '*মুক্তবুদ্ধি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল*' মনন প্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ-২৯
৩০. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, কার্জন হল, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮, সভাপতির ভাষণ
৩১. দি ডেইলী স্টার ১৭ মার্চ ২০০৬
৩২. আশু চট্টোপধ্যায়, *কল্লোল যুগের পরে*, কলকাতা, ১৯৯৩ এবং ইসরাইল খান, *তিরিশের দশকের সাহিত্য আন্দোলন ও সাপ্তাহিক অগ্রগতি লোকায়ত*, ঢাকা, ১৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৫
৩৩. বিপিন চন্দ্র সরকার, *দেশের গীত*, রঘুনাথ গঞ্জ, ১৩৩০ (ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতায় সংরক্ষিত)।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ ঃ একটি আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক পরিক্রমা

পৃ.২৫-৫৪

ক. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঃ সংজ্ঞা নির্ধারণমূলক একটি আলোচনা
খ. হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর রাষ্ট্র দর্শনঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব
গ. বিশ্বে ধর্ম প্রবক্তা, রাষ্ট্র নায়ক ও দার্শনিকদের চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ
ঘ. মানব কল্যাণে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ভূমিকা
ঙ. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সংবিধানঃ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারত

Dhaka University Institutional Repository

ক. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঃ সংজ্ঞা নির্ধারণমূলক একটি আলোচনা

ধর্মনিরপেক্ষতার ইংরেজি শব্দ Secularism এর উৎপত্তি Secularise হতে। আর বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' শব্দ দিয়ে। তাহলে দেখা যাক সে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বুঝায়? ছোট্ট একটি প্রশ্ন, কিন্তু তার উত্তর চাই সুস্পষ্ট, নিখুঁত ও বিস্তারিত। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রত্যেকের জানা থাকাও জরুরী। এ পর্যন্ত সেকুলারিজমের উপর বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, আমাদের কর্তব্য শুধু সঠিকতাকে জানা এবং তদনুযায়ী কাজ করা। এবার প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করি, কারণ পাশ্চত্য দেশ সমূহের লিখিত অভিধানগুলো আমাদেরকে সেটার অর্থ খোঁজা ও সন্ধান করার কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে।[১] ইংরেজী অভিধানে Secularism এর যে অর্থ পাওয়া যায় তা হলোঃ

১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।
২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয়।
৩. দ্বীন পালনকারী নয়।[২]

অর্থাৎ এর অর্থ হলো বৈষয়িক, অস্থায়ী, প্রাচীন ইত্যাদি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ইহলৌকিক, ইহজাগতিক, পার্থিব এবং পরকাল বিমুখতা। আভিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে বৈষয়িকতাবাদ ইহলৌকিকতাবাদ এবং জাগতিকতাবাদ। যা নর্ডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজে বলা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলোঃ 'যা ধর্ম বা আধ্যাত্মিক পবিত্র বলে বিবেচিত নয়; যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়; নয় কোন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত।' তিনি আরো বলেনঃ Rejects all forms of religious faith অর্থাৎঃ এটি হলো এমন দর্শন যা সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়।[৩]

ENCYCLOPEDIA OF BRITANICA তে Secularism এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ

Secularism is the principle of the separation of government in institutions and persons mandated to represent the state from religious institutions and religious dignitaries. One manifestation of secularism is asserting the right to be free from religious rule and teachings, or in a state declared to be neutral on matters of belief, from the imposition by government of religion or religious practices upon its people.[৪] Another manifestation of secularism is the view that public activities and decisions, especially political ones, should be uninfluenced by religious beliefs and/or practices.[৫]

ENCYCLOPEDIA OF BRITANICA - তে Secularism এর সংজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from other worldliness to life on earth ... এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়।[৬]

CAMBRIDGE DICTIONARY এর মতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো The belief that the state morals, education should be independent of religion.[৭] অর্থাৎঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্র, নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু ধর্মমুক্ত থাকবে।

OXFORD DICTIONARY Secularism এর সজ্ঞা দিয়েছে [৮]-

No. I- Secularism means the doctrine morality should be based solely on regard to the well being of mankind in the present life to exclusion of all considarations drawn from belief in God or in future state; অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস বা পরকাল বিশ্বাস নির্ভর সকল বিবেচনা থেকে মুক্ত মানব জাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

No. 2- The belief that religion should not be involved in the organization of society, eduction etc. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন একটি বিশ্বাস যে, ধর্মকে কোনরূপ সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রভৃতি বিষয়ে যুক্ত হওয়া উচিত নয়।

The belief that life can be best lived by applying ethics, and the universe best understood, by processes of reasoning, without reference to a god or gods or other supernatural concepts.

The belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country.

Not concerned with religion, not sacred, worldly secular education, secular music.

সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। সেকুলার শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহলৌকিক, ইহজাগতিক, পার্থিব, পরকালবিমুখ, আখেরাত বিমুখ ইত্যাদি। আভিধানিক দিক দিয়ে সেকুলারিজম হচ্ছে বৈষয়িকতাবাদ, ইহলৌকিকতাবাদ, ইহজাগতিকতাবাদ। এটি এমন একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক দর্শন, যা ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। অন্যকথায় যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধী যারা সেকুলারিজম বা ইহজাগতিকতাকে বিশ্বাস ও লালন করে তারাই সেকুলার বা ইহজাগতিক।

কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। পারিভাষিক অর্থে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন একটি মতবাদ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস, যা পারলৌকিক ধ্যানধারনা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শণ যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়।

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার সংজ্ঞাও অনুরূপ, অর্থাৎ যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং আধ্যাত্মিকতা, জবাবদিহিতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ।

অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশোনারীর মতে, সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারে না এমন বিশ্বাসই হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism is the belief that religion should not be involved in the organization of society, eduction etc.)[৯]

ধর্মনিরপেক্ষতাঃ ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বাংলা ভাষায় নবীন আগন্তক। এতই নতুন যে, তা কোন বাংলা অভিধানে এখনো প্রবেশাধিকার পায়নি। শব্দটি ইংরেজি সেকুলারিজমের অনুবাদ। সেকুলারিজম শব্দটি ইংরেজি ভাষায় চালু হয়েছে উনিশ শতকের মধ্যভাগে এবং এর মূলে আছে সেকুলার কথাটা। প্রাচীন ফরাসি থেকে শব্দটি মধ্যযুগের ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছিল অন্তত পনেরো শতকে। যে ল্যাটিন শব্দটি থেকে এর উৎপত্তি, তার অর্থ মূলে ছিল প্রজন্ম বা যুগ। তার থেকে খ্রিস্টীয় ধর্ম বিষয়ক রচনায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু অর্থাৎ ইহলোক ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপার বোঝাতে। যে বাড়ি ঘর উপাসনার জন্য নির্মিত নয়, তা সেকুলার; যে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের পাঠ দেয় না তা সেকুলার, যে ভাবধারা পার্থিব বিষয়ে সীমাবদ্ধ, তা সেকুলার। অতএব সেকুলারিজম বলতে বোঝায় ইহজাগতিকতা। তবে বাঙালিদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তায় তিনি ছিলেন এই চেতনার অধিকারী।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন ডানবুরি ব্যাপ্টিস্টদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নীতিব্যাখ্যা করে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটিকে ভিত্তি ধরে আমেরিকান সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে প্রথম সংশোধন করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর উদ্ভব ঘটে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের পর। ভাষায় ও সাহিত্যে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ লেখক জর্জ জ্যাকব হলিয়াক

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে। এর একশ বছর পর এই উপমহাদেশে সেকুলার শব্দটি রাষ্ট্রচিন্তায় প্রথম ব্যবহার করেন জওহারলাল নেহেরু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। ভারত বিভাগের পূর্বাহ্নে ও পরে মহাত্মা গান্ধীও শব্দটি ব্যবহার করা শুরু করেন।[১০]

ধর্মরিপেক্ষতার স্বীকৃতিই হল ধর্মের প্রথম পরাজয়। ধর্মের আবির্ভাবের সাথে সাথেই সমস্ত সমাজে ও সমস্ত যুগে ধর্মকে অস্বীকারের প্রবণতাও দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের ইতিহাস সমান দীর্ঘ। এই দীর্ঘ ইতিহাসে ধর্মকে গ্রহণ না করা বা ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দেবার যত চেষ্টাই হয়ে থাক, পরিণামে ধর্মের জয় হয়েছে। নাস্তিক্য কোথাও কোন প্রতিষ্ঠা পায় নি। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম হয়ে থেকেছে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মনিরপেক্ষতাই প্রথম ধর্মের অস্বীকৃতি।

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এই তিনটি ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ব্যক্তির মনে ধর্মের আশ্রয় তার মানসিক ও সামাজিক গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের অবস্থান সেই সমাজের সামগ্রিক কার্যকলাপের ওপর নির্ভরশীল। নাস্তিক্যের ধাক্কায় ব্যক্তি জীবনে ধর্মের দরজা অনেক সময় বন্ধ হয়েছে। কিন্তু নাস্তিক নাগরিক সামাজিক কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে নিজেকে ধর্মীয় ধারায় অঙ্গীভূত করতে বাধ্য হয়েছে। বিজ্ঞান পর্যন্ত দীর্ঘকাল ইশ্বরের মহিমা স্বরূপ উদঘাটন করাকে তার লক্ষ্য হিসাবে মনে করেছে। বিজ্ঞানীরা এই অর্থে প্রায় সকলেই ছিলেন ধার্মিক। অনেক খ্রিস্টান পাদ্রীর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মতো ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়। কাজেই মানুষের কাছে সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রই ছিল না ধর্ম থেকে মুক্ত। জন্মগ্রহণ, শিক্ষারম্ভ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, বিবাহ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও মৃত্যুর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্ম একেবারে দন্ডায়মান। ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, বিধান মানুষের জীবনকে একেবারে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ হল এই ধর্মীয় বেষ্টনী থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মুক্তি।

প্রশ্ন হল ধর্মনিরপেক্ষতা কী, ধর্ম হীনতা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এর ব্যাখ্যা এভাবে উল্লেখ করা যায় যে, শব্দগত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা দুটি পৃথক কথা। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থে ধর্মশূণ্যতা ও ধর্মহীনতা তো অবশ্যই আছে। রাষ্ট্র যেহেতু সর্বশক্তিমান সুতরাং সে ধর্মহীন হলে তার পক্ষে ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করাও সম্ভব। কিন্তু *'ধর্মনিরপেক্ষতা'* কথার ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের ভূমিকায় না থেকে বিরত রাখা হয়েছে। সামাজিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম আচরণের উপর হস্তক্ষেপ না-করার মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ নিহিত। শুধু রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে বিবেচনা করলে, সেখানে যে ধর্ম নেই তা নিঃসন্দেহ। একমাত্র মাও সেতুঙ-এর চীনে রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে নতুন অর্থ আনার চেষ্টা হয়েছিল। সেখানকার রাষ্ট্রীয় সনদে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছিল, প্রত্যেকের ধর্ম আচরণের অধিকার থাকবে, ধর্ম আচরণ না-করার অধিকারও থাকবে এবং ধর্মের বিরুদ্ধতা করার অধিকারও থাকবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কোন রাষ্ট্র সংখ্যাগুরুর ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতাকে বোঝায়। কোন কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সব ধর্মের প্রতিই রাষ্ট্রীয় সহনশীলতাকে বোঝায়। এই জাতীয় চিন্তা আসলে ধর্মের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে না আসতে পারার ফল। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া এই জাতীয় *'সর্বধর্ম গ্রহণীয় ধর্মনিরপেক্ষতা'* শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় রাষ্ট্রের চরিত্র অর্জন করে। যদিও আধুনিক কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই পুরোপুরি ধর্মীয় রাষ্ট্র হওয়া আজ আর সম্ভব নয়। কারণ সব ধর্মই নিদারুণভাবে অনাধুনিক।

ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তি চার্চের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে নামতে বাধ্য হয়েছিল। জমির মালিকানায় চার্চগুলি ছিল প্রধান ভূমিকায়। চার্চের জমিগুলো অধিগ্রহণকেই ইউরোপে বলা হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। ফ্রান্স, জার্মানিতে এই কাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ধর্মনিরপেক্ষতা জীবনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার উত্তরে এক বিশেষ নীতিবোধ হিসাবে দেখা দিল। ধর্মীয় কার্যক্রমের প্রাধান্যকে তা অগ্রাহ্য করে। অভিজাত শ্রেণী ও ধনীদের অত্যাচার ধর্মীয় গোঁড়ামির নানা সূত্র ধরে চার্চের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের উপর নেমে আসত। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হল।

বলাবাহুল্য,নিরপেক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অপেক্ষারহিত; এতে কর্মসম্বন্ধহীন, প্রয়োজনরহিত বা উদাসীন বোঝায়। ধর্মের সঙ্গে যে বিষয়ের সম্পর্ক নেই, তা ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মের সঙ্গে যে-রাষ্ট্রের সংস্রব নেই, তা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তবে নিরপেক্ষতা শব্দের ব্যাপকতর প্রচলিত অর্থ পক্ষপাতহীনতা। তাই অনেকে মনে করেন, নাগরিকদের মধ্যে প্রচলিত একাধিক ধর্মের মধ্যে রাষ্ট্র যদি পাক্ষপাত না করে, তাহলেই বোধ হয় সে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হল। যেমন, টেলিভিশনে একই সঙ্গে কুরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করলে বোঝা গেল রাষ্ট্র কোনটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে না। আসলে রাষ্ট্রের পক্ষে কোন ধর্মের বা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সংস্রবহীনতাই হল ধর্মনিরপেক্ষতা। আমাদের বহু নেতা ও মনীষী বহুবার বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। একথা ভারতীয় নেতা ও মনীষীর অনেকের মুখেও শোনা গেছে। কিন্তু এতে ঠিকমতো বোঝা যায় না রাষ্ট্র ধর্মীয় ব্যাপারে জড়িত হবে না, ধর্ম থাকবে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয় হয়ে এই হল রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা।

আবার কেউ কেউ বলেন, মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ না হলে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে না। একথা গ্রাহ্য নয়। যিনি ধার্মিক, তিনি অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়- অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কেননা বেশির ভাগ ধর্মেই জোর দেওয়া হয়েছে পরলোকের ওপরে -সেখানেই অনন্ত জীবন লাভের সম্ভাবনা। খুব কম ধার্মিক মানুষই পরলোকের ভাবনা ত্যাগ করে ইহলোকমুখী হয়েছেন।

কিন্তু ব্যক্তি যা পারে না, রাষ্ট্র তা পারে। ধর্মের বিষয়ে মাথা না গলিয়েও রাষ্ট্র চলতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেভাবেই চলে। সেখানে ধর্ম ব্যক্তিগত বাপার নয়। ব্যক্তির ধর্মপালনের স্বাধীনতা সেখানে থাকে আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আর দশটা স্বাধীনতার মত ধর্মীয় স্বাধীনতাও শর্তাধীন হয়ে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয়, নাগরিকের ইহজীবনকে সুখী ও সার্থক করে তুলতে সাহায্য করা।

সেকুলারবাদকে নিয়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের রায়ে বলা হয়েছে ঃ

It may well be that these words are used in a speech to promote secularism or to emphasise the way of life of the Indian people and the Iadian culture or ethose, or to criticise the policy of any political party as discriminatory or intolerant' এখানে `Indian people' ও `Indian culture' কথা দুটির তাৎপর্যায়ের মধ্যেই রয়েছে ভারতীয় সেকুলারিজমের মূল আদর্শ। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।`It asserts the freedom of religion, and freedom from religion.Within a state that is neutral on matteers of belief, and gives no state privileges or subsidies to religion ..... Sayin a prayer on religious bearing derived from religious test or visiting a place of worship are examples of non secular activites' কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্রই আমরা দেখি। আসলে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই তাত্ত্বিক সেকুলারবাদ অনুপস্থিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ (২ক) উল্লিখিত হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।' এটি একটি কপটতা, অসৎ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতারণামূলক বাক্য। কেননা একটি ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় প্রতিপন্ন করে অন্যগুলির সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা যায় না। রাষ্ট্রের শিরোনামের অভ্যন্তরে যেমন 'গণপ্রজাতন্ত্রী' শব্দটির অপপ্রয়োগ চলছে (কারণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেউ কারো প্রজা নয়), তেমনি রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম রেখে সমঅধিকার নিশ্চিত করার কথাও একটি প্রতারণামূলক অপব্যাখ্যা।

খ. হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর রাষ্ট্রদর্শন ঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারনার উদ্ভব

মহানবী (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী প্রশাসন পরিচালনায় তাকওয়া বা খোদাভীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের কাজটি সম্ভব হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্বই হচ্ছে ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক মানুষকে পরিচালনা করা এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। এসব কাজ ইসলামী প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজেই মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহবায়ে কেরাম বা খোলাফায়ে রাশেদা তাঁরই অনুসৃত পথে প্রশাসন পরিচালনা করেছেন। নবী (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক। দক্ষ প্রশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার চালু থাকায় দিকে দিকে ইসলামের সুমহান আদর্শের বাণী সহজে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। অমুসলিমরাও নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা পেয়েছে। ফলে দুনিয়ার ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদার রাজত্ব কাল এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সেরা শাসনকাল বা স্বর্ণযুগের খেতাব পেয়েছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমির হাসান সিদ্দিকী মদিনা রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'It was a unique welfare state ever designed by mankind.'[১১] লুথার গুলিক ও জেমস পোলক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ দু'জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাদের একটি রিপোর্টে বলেনঃ Islamic culture is one of the best bases for a strong and successful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times.[১২] আধুনিক প্রশাসন ও বিজ্ঞানের জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে তত্ত্ব ও প্রয়োগে। সুতরাং ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের মৌলিক বিষয়াবলী রয়েছে যা অনুসরণীয় এবং আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষেও ছোঁয়া রয়েছে যা একটি সুন্দর দক্ষ প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা

মহানবী (সাঃ) একাধারে ধর্মীয় শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, পাশাপাশি একজন সফল রাষ্ট্রপতি, দক্ষ প্রশাসকও বটে। এটি সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে একটি মুসলিম দেশেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থা চালু নেই। অথচ এক সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং এর বাইরেও ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছিল। প্রথম হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (৬২২ খ্রিস্টব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর) মহানবী (সঃ) এর মদিনা গমণ ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করেছিল। তখন পর্যন্তও মক্কায় বসবাসরত নওমুসিলমগণ বিরামহীন নির্যাতন ও হয়রানীর মধ্যে নিপতিত ছিল। কিন্তু মদিনায় মুহাজির নওমুসলিমগণ মহানবী (সঃ) প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে শুধু আশ্রয় পেলেন তাই নয়, তাদের সহায়-সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হল। [১৩]

মহানবী (স.) এর মদিনায় হিজরতের অব্যবহিত পরই কিতাব অথবা মদিনার সনদ জারি করা হয়। সনদের ভিত্তিতেই মূলত মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সনদে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, 'এটি আল্লাহর রাসুল (স.) কর্তৃক প্রণীত কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মধ্যে সকল বিশ্বাসী ও মুসলমানদের এবং যাঁরা তাঁদের অনুসারী এবং এভাবে যাঁরা তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যাঁরা তাঁদের সাথে জিহাদে শামিল হয়। ' সনদের ১২ থেকে ১৯ অনুচ্ছেদে মদিনার সকল অধিবাসীকে সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।[১৪] লক্ষ্যণীয় যে, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সঃ) এর প্রশাসন নীতিতে পরিবর্তন আসে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মহানবী (সাঃ) আরবের গোত্রগুলোর সরাসরি সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করতেন এবং এতে কেউ ব্যর্থ হলে কমপক্ষে তিনি তাদের নিরপেক্ষতা চাইতেন।[১৫] মক্কা বিজয়ের পরবর্তী চুক্তিগুলোতে মদিনার রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি ছিল আবশ্যক শর্ত। মক্কা বিজয়ের পর নবীজী অমুসলিমদের প্রতি সামান্যতম আধিপত্য দেখান নি বরং মক্কা বিজয়ের পরক্ষণেই কা'বা শরীফের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'আজ আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরীব কারো প্রতি কারো আধিপত্য নেই। মর্যাদার দিক দিয়ে সকলেই সমান।' এ কারণেই

সেখানের ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, ১০ হিজরীর জিলহজ্জ (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ) মাসে মহানবী (স.) এর বিদায় হজ্জ নাগাদ উত্তরে সিরিয়া-সীমান্ত থেকে দক্ষিণে ইয়ামানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূল থেকে পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ইরান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র আরব উপদ্বীপ শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বই মেনে নেয়নি, মহানবী (স.) কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামী উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশেও পরিণত হয়েছিল।[১৬]

মহানবী (স.) এর বিদায় হজ্জ

১০ম হিজরীতে হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর নবুওয়াতী জীবনের প্রথম ও সর্বশেষ হজ্জ করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ বিদায় হজ্জ সম্পর্কে হাদিসে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হজ্জ কিভাবে সম্পন্ন করা উচিত তা রাসূলে করিম (সঃ) এই হজ্জে নির্দিষ্ট করে দেন। তাই হজ্জের ইতিহাসে বিদায় হজ্জ, এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। যিলহজ্জ মাসে এই হজ্জ সম্পন্ন হয়। তখন থেকে 'নাসী' প্রথার বিলোপ সাধন করে খাঁটিভাবে যিলহজ্জের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন হজ্জের জন্য নির্ধারিত হয়।[১৭]

তেইশ বছর আগে হেরার গুহায় জ্বলে উঠেছিল নবুয়তের সত্যের আলো। আজ তা পূর্ণতায় উপণীত। এক কঠিন দায়িত্বভার নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন মহানবী (স.)। তেইশ বছরের কঠিন সংগ্রাম, অপরিসীম ত্যাগ কুরবানীর মাধ্যমে তা আজ সমাপ্তির পথে। যে মিশন নিয়ে এসেছিলেন মানবতার মুক্তিদূত, সে মিশন আজ শেষ হতে যাচ্ছে। বস্তুত পূর্ণতার স্তরে দাঁড়ানো মহানবী (স.) তাঁর দায়িত্ব শেষ। এবার বিদায়ের পালা। তাই মহানবী (স.) এসেছেন মক্কা নগরীতে। উদ্দেশ্য হজ্জ সম্পাদন। সঙ্গে তাঁর প্রায় দুই লক্ষ মানুষ। একই পোশাকে শোভিত সমগ্র জনতা। নিরহংকার, বিনয় আর আল্লাহ প্রেমে আকুল সবাই। এবারের হজ্জ সম্পূর্ণ ইসলামি পদ্ধতির হজ্জ। সমস্ত মলিনতা ও পুরনো জাহিলিয়াতমুক্ত এবারের হজ্জ অনুষ্ঠান। এবার শুধু তাওহীদবাদীরাই এসেছেন হজ্জ কেন্দ্রে। পূত-পবিত্রতা- ভাবগাম্ভীর্য হজ্জ অনুষ্ঠানকে করেছে মহান, তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহ। আজ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ঃ লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক- হাজির, প্রভু হে! তোমার দরবারে আমরা হাজির, নিনাদিত হচ্ছে উষর মরুর প্রান্তরে আবেগঘণ লক্ষ কণ্ঠে তাওহীদের ঘোষণা। আত্মসমর্পিত লক্ষ মানুষের করুনণ সুরের মূর্ছনায় প্রকম্পিত হয় মক্কার আকাশ-বাতাস। মহানবী (সা.) প্রথমেই আল্লাহর মহিমা ও প্রসংসার বাণী উচ্চারণ করেন, মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তারপর তাঁর ভাষণ পেশ করেন।

বিদায় হজ্জের ভাষণ

১. হে লোক সকল। আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কেননা এ বছরের পর আমি হয়ত তোমাদের সাথে এখানে মিলিত হতে পারব না।

২. মূর্খতা যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধবিশ্বাস এবং সকল প্রকার অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত - মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হয়ে গেল।

৩. আজকের এই পবিত্র হজ্জের দিন যেমন মহান, এই মাস, এই নগরী যেমন পবিত্র, তোমাদের এই প্রাণ, সম্পদ, সম্ভ্রম ও তেমন মহান প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র ও অলঙ্ঘণীয়। স্মরণ রেখো! তোমাদেরকে একদিন আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে এবং তিনি তোমাদের কাজের হিসাব নিবেন।

৪. হে জনমণ্ডলী! নারীর ওপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, তেমনি পুরুষের ওপরও নারীর সেরূপ অধিকার আছে। তোমরা দয়া ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আচরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর জমিনে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তারা তোমাদের জন্য বৈধ হয়েছে।

৫. আর তোমাদের দাস-দাসী! সাবধান, এদেরকে নির্যাতন করো না, এদের সাথে রূঢ় আচরণ করো না। তোমরা যা খাবে এদেরকেও তা খেতে দিবে, তোমরা যা পরবে, এদেরকেও তা পরতে দিবে। মনে রেখো, এরাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদের মতোই মানুষ।

৬. হে লোক সকল! স্মরণ রেখো, তোমাদের আল্লাহ এক, তোমাদের আদি পিতা এক। হুঁশিয়ার! কোনো আরবের ওপর যেমন কোনো অনারবের প্রাধান্য নেই। তেমনি কোন অনারবের ওপরও কোনো আরবের প্রধান্য নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর যেমন কৃষ্ণাঙ্গের প্রাধান্য নেই তেমনি কোনো কৃষ্ণাঙ্গর ওপরও কোনো শ্বেতাঙ্গের প্রাধান্য নেই। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। হ্যাঁ, তাকওয়া ও সৎকর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে মর্যাদার পার্থক্য হতে পারে।

৭. সুদ অবৈধ ঘোষিত হলো! মূর্খতা যুগের সমস্ত সুদ রহিত করা হলো। আমি সর্ব প্রথম আমার চচা আব্বাসের প্রাপ্য সকল সুদ রহিত ঘোষণা করছি।

৮. জেনে রেখো, একজনের অপরাধে অন্যকে দন্ড দেয়া যায় না। পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না। আজ থেকে জাহেলী যুগের অনুসৃত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ নিষিদ্ধ হলো। আজ আমার নিজ বংশের ইবনে রাবিয়া ইবনে হারিসের রক্তের দাবি রহিত করলাম।

৯. আর জেনে রেখো, এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। আর সকল মুসলমান নিয়ে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। তোমার ভাই ইচ্ছাপূর্বক কোনো জিনিস তোমাকে না দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে না, জোর করে কোনো কিছু নিতে পারবে না।

১০. সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। শিরক করো না, চুরি করো না, মিথ্যা, বলো না, ব্যভিচার করো না। সর্বপ্রকার মলিনতা হতে মুক্ত থাকবে, পবিত্রভাবে জীবনযাপন করবে। হে লোকসকল! শয়তান নিরাশ হয়েছে যে, সে আর কখনো তোমাদের দেশে পুজা পাবে না। কিন্তু সাবধান, অনেক বিষয়কে তোমরা ক্ষুদ্র বলে মনে করে থাক, অথচ শয়তান এসবের মাধ্যমেই অনেক সময় তোমাদের সর্বনাশ করে থাকে। এগুলো সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে।

১১. সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এ বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১২. হে মুসলমানগণ! নেতার আদেশ অমান্য করো না। যদি নাক কাটা হাবশি গোলামকেও তোমাদের আমির নির্বাচিত করা হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে তাহলে তার আদেশ মেনে চলবে।

১৩. বংশের গৌরব করো না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয় তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসে।

১৪. তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোজা রাখবে এবং আমি যা নির্দেশ দিয়েছি তা পালন করবে। এর দ্বারা তোমরা তোমাদের পারওয়ারদিগারের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

১৫. হে আমার উম্মত! আমি যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে তোমাদের পতন হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।

১৬. নিশ্চয়ই জেনো, আমার পরে আর কোন নবী নেই। যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিত সকলের নিকট আমার এ সকল বাণী পৌঁছে দিও। হয়তবা উপস্থিত কারোর চেয়ে অনুপস্থিত কেউ এ থেকে বেশি উপকার লাভ করবে। [১৮]

মহানবী (সাঃ) ভাষণ শেষ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল আলোকাদীপ্ত হয়ে উঠলো। কণ্ঠস্বর ভাবগাম্ভীর হয়ে আসল। আকাশের দিকে তিনি মুখ তুলে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি আপনার বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি? লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হলো- নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তিনি তখন অধিকতর কাতর হয়ে বললেন, হে প্রভু! শ্রবণ করুন, সাক্ষী থাকুন, এরা বলছে, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। ভাবের আতিশয্যে মহানবী (সাঃ) নীরব হলেন। বেহেশতি নূরে তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জল হয়ে উঠল। এ সময় পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হলো, "আজকের এই দিনে তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন রূপে মনোনীত করলাম।[১৯] মহানবী (সাঃ) ক্ষণকাল নীরবতা অবলম্বন করলেন। বিশাল জনতা নীরব-নিস্তব্ধ। তিনি জনতার দিকে তাকালেন, গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বিদায়, বন্ধুগণ বিদায়'।

মহানবী (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণে বিধৃত হয়েছে ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে মৌল নির্দেশনা। তিনি এ ভাষণে মানবজাতির অখণ্ডত্বের ধারণা তুলে ধরেছেন মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ। এ ভাষণে মহানবী (সাঃ) নারী-পুরুষ সম্পর্কেও তাদের পারস্পরিক অধিকার, দাস-দাসী তথা অধীনস্ত মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ, সামাজিক নিরাপত্তা, আইনের শাসন, সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান, সামাজিক অনাচার দূরীকরণ নেতৃত্বের আনুগত্য এবং কুরআন-সুন্নাহর চূড়ান্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাই মহানবী (সাঃ) -এর বিদায় হজ্জের ভাষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নির্দেশনা। আজকের যুগেও এর উপযোগিতা হারিয়ে যায়নি।

হযরত মুহম্মদ (স.) এর বিদায় হজ্জের বাণীর মর্মানুসারে অনেক পরে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করতে থাকেন। অতঃপর ষোড়শ সতের শতকে এর বাস্তবায়ন কোনো কোন দেশে হতে দেখা যায়।[২০]

ধর্মীয় প্রশাসন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

ধর্ম, রাষ্ট্র ও প্রশাসন ছিল পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর ব্যক্তিগত চরিত্রে একযোগে ধর্মীয় সংস্কারকের গুণাবলী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সকল মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী প্রচার করা। তিনি কখনও তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র নিস্পৃহ হননি এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন নিজে মানুষের কাছে ইসলাম প্রচার করেছেন। মক্কার মতো মদিনার জীবনেও তিনি শুধু ইসলাম প্রচারের জন্য কয়েকটি দল গঠন করে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন জায়গাতে, এমনকি বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে দূত, স্থানীয় সরদার ও শাসকগণের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। উদাহরণস্বরূপ - আবিসিনিয়ার নাজ্জাসী, বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিশরের আল-মুকাওকিস, পারস্যের খসরু, বাহরাইনের মুনযির ইবন মাওয়া, ওমানের জায়ফারও আবদ এবং ইয়ামানের বিভিন্ন শাসকগণ। সবগুলোতেই প্রথমত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এরকম ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম প্রচারক দেখতে পাওয়া যায় না।

ইসলামের শুধু প্রচার নয়, ধর্মের রীতিনীতিগুলো ইসলাম গ্রহণকারীগণের মনে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করার জন্য কুরআন শরীফে আদেশ দেওয়া হয়েছে, 'মুমিনগণ সকলে একসঙ্গে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেকে দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তাঁরা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।[২১] বিষয়টি গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাসুল (সাঃ) সব সময় সাহাবীগণেকে ধর্মীয় শিক্ষাদান করতেন এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষণে যত্নশীল হতেন। এজন্য নবীজী মক্কার *'দ্বারে আরকান'* কে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপদান করেন। *'সুফফা'* এবং *'দারুল কোরবা'* নামে মদিনায় আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ ধারণা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন, মাদ্রাসা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেছে। রাসুল (সাঃ) এর আমলে মাদিনাতে কয়েকজন

মুফতি বাস করতেন, তাঁরা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আইনগত পরামর্শ ও রায় প্রদান করতেন। এ ছিল রাসুল (সাঃ) এর বাস্তব জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন নীতি। তিনি নিজ জীবনকালেই কুরআন ও সুন্নাহর একদল ব্যাখ্যাকারী সৃষ্টি করে যান, যাতে তার পরবর্তীতে, বিশেষ করে পরিবর্তিত অবস্থায় এবং নতুন পরিস্থিতিতে ধর্মীয় প্রচার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে।

আল্লাহর নবী এবং চার খলিফা সকলেই একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং মসজিদের ইমাম ছিলেন। এটি ইঙ্গিত করছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি ইমামেরও যোগ্যতা থাকতে হবে। অন্যদিকে আধুনিক প্রশাসনের দিকে নজর দিলে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে পাশ্চাত্যের আদি সমাজচিন্তায় ধর্মের সরাসরি প্রভাব ছিল। এমিলি ডুরখেইম সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় শ্রমবিভাজনের চেয়ে ধর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। সিস্টেমের ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে খিলানের মত আচ্ছাদন সৃষ্টিকারী ধর্মীয় সিস্টেম থাকা প্রয়োজন- যা সমাজের অসম/পৃথক উপাদানসমূহের পরিচয় নির্ধারণের জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টি করবে।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় পুরোপুরি ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা মূলত আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শক্তির সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এই সংঘর্ষে শেষ পর্যায়ে বিশ্ব রাজনীতিতে পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি সুচিন্তত আধ্যাত্মিক মতবাদের বিকাশ ঘটে। পোপ তার প্রধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে New Testament অপেক্ষ Old Testamet কে অধিকতর উপযোগী বলে মনে করেন। রাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে Old Testamet এর শিক্ষাই হল এই যে, আইন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি; সরকারি শাসনের ব্যাপারে সাধারণ কর্মচারীদের চেয়ে পুরোহিতদের গুরুত্ব অধিক; যাজকতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুসারে রাজার ক্ষমতা সীমিতঃ যেসব রাজা নবী ও পয়গম্বরদের অধিক অনুগত তারা পার্থিব জীবনে অধিক সাফল্যের অধিকারী এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক ক্ষমতার নিকট পার্থিব ক্ষমতার অধীনতা বিধাতার শাসন পরিকল্পনারই একটি অংশ। চতুর্থ শতাব্দীতে গীর্জার সম্পত্তির উপর কর আরোপের প্রশ্ন নিয়ে পোপ অষ্টম বোনিফেসের সাথে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ দি ফেয়ারের সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে পোপের পরাজয় ঘটে। সকলেই যেন রাজার নেতৃত্বে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফিলিপ পোপের আসনকে রোম থেকে ফ্রান্সের এভিগননে স্থানান্তর করলেন। এটিই ইতিহাসে 'ব্যবিলোনীয় বন্দীত্ব' নামে পরিচিত। এভাবে রাজনীতি ও প্রশাসন থেকে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা।

গ. বিশ্বে ধর্মপ্রবক্তা, রাষ্ট্রনায়ক ও দার্শনিকদের চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক ধর্ম প্রবক্তা/ধর্মযাজক এবং দার্শনিকগণ কি বলেন এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলেই একটু পিছনের দিকে এগুতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টি আমাদের বাঙালি জীবনে আসার পূর্বে ইউরোপে এর প্রথম আবির্ভাব। তাছাড়া রেনেসাঁস শুরুর পূর্বে মানবজীবনে নানা কর্মকান্ডে ধর্মনিরপেক্ষতা শুরু হয় পশ্চিমা দেশে। বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি হঠাৎ করে আসেনি। অনেক চড়াই উৎরাই শেষে পশ্চিমা দেশেই প্রথমে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জনের ফলেই ইউরোপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে গণতন্ত্র অর্জনের ফলেই মানুষ তাঁর নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য নিজের মূল্যবোধ, কর্মবোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে।

তাই বলা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থ ধর্মহীন অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন রাষ্ট্রীয় রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি। নিজ ধর্মে আসক্ত থেকে অপর ধর্মকে সহ্য করা নয়। রাষ্ট্রকর্তৃক সব ধর্মকে সমানভাবে উৎসাহিত করা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব।

ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ইউরোপ এবং বাঙালিয় জীবনে দার্শনিক, রাষ্ট্র নায়ক এবং ধর্ম প্রবক্তারা কিভাবে উন্মেষ ঘটিয়েছেন তার দুটি দিক তুলে ধরা হলোঃ

ইউরোপের ধর্মপ্রবক্তা, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসার, ইউরোপ ভু-খণ্ডে খনিজ সম্পদের সন্ধান লাভ, শিল্প উৎপাদানে সূত্রপাত ইউরোপে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে থাকে। এই সমৃদ্ধির প্রভাবে বস্তুগত পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তার জগতেও আলোড়ন ওঠে। সঙ্গে সৃজনশীলতার জোয়ার আসে। বাণিজ্য বিপ্লবের অনুবর্তী হয়ে পর পর ঘটে গেল রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন, ধর্মযুদ্ধের অবসান। এলো যুক্তিচর্চার কাল, তাকে অনুসরণ করল আলোর দীপ্তি বা এনলাইটেনমেন্ট। কত রকম ভাবনা ও ধারণার চর্চা করলেন দার্শনিকেরা যা ধর্মের সংশ্লিষ্টতা, মুক্ত উদারনৈতিক ও ইহজাগতিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন তৈরিতে সাহায্য করেছে।[২২]

আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ভূমি ইউরোপ তার আধুনিক জ্ঞান-যুক্তি, বুদ্ধি, মন-মনন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-প্রকৌশলের উন্মেষকালে ঐ বাঁধাও পিছুটান বাস্তবেই অনুভব করেছিল। প্রতাপে প্রবল ধর্মধ্বজী -শাস্ত্রপতি সমাজসর্দার, যাজকদের ও শাহ-সামন্তদের হুকুম-হুংকার, হুমকি-হামলা রূপে পীড়ন-নির্যাতন, দেহ-মনে অনুভব ও ভাব-চিন্তায় উপলব্ধি করেছিল। শাস্ত্রীর ও সমাজপতি শাসকের ও ধর্মধ্বজীর দেয়া বাধা-নির্যাতনই মুক্তবুদ্ধি প্রগতিবাদী বিজ্ঞানী-মানীষীদের-দ্রোহী করেছিল। এ দ্রোহীদের শ্লোগানের,অবলম্বিত উপায়ের, নির্বাচিত পন্থার আর গৃহীত আদর্শের নামই হলো '*সেকুলারিজম*'। [২৩]

উল্লেখ্য ইউরোপের লোক যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তখন ধর্মগুরু ও ধর্মসঙ্ঘের প্রতি তাদের সকলের আনুগত্য দেখে খ্রিস্টেনডম বা খ্রিস্টরাজ্য নামক ধারণাটি মানুষের মনে বসে যায়। রাজ্য একাধিক, কিন্ত পোপ এক। রাষ্ট্র একাধিক, কিন্ত চার্চ এক। প্রত্যেক দেশেই পোপের অধীনস্থ ধর্মযাজকের দল একজোট হয়ে কাজ করে যায়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলি হয়, ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা করে, ল্যাটিন ভাষায় নাম রাখে। চার্চের তুলনায় রাষ্ট্র অনেকটা ক্ষীণবল, রাজা অনেক সময় চার্চের হাতের পুতুল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চার্চ নিজেই তার আদালত বসায়, বিচার করে, দন্ড দেয়, আগুনে পোড়ায়, খাজনা আদায় করে। এমন এক সময় আসে যখন দেখা যায় পোপের হাতে কেবল নৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতাও এসে পড়েছে। কেউ যদি বিধর্মী হয় তাকে তিনি কেবল সমাজচ্যুত করে ক্ষান্ত হননি, ধনে-মনে-প্রাণে ধ্বংস করেছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ পৃথিবীর চার দিকে সূর্য ঘুরেছে, কেউ যদি এই তত্ত্ব অস্বীকার করে বলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরেছে, তা হলে আর রক্ষা নেই। অমনি বিধর্মী হয়ে গেল। চিন্তার স্বাধীনতা, বাকের স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা,

সবকিছু ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ধর্ম বলতে বোঝায় 'ধর্মগুরু' ও 'ধর্মসঙ্ঘ' এবং তাঁদের হাতে ইহলোকের পারলোকের সব রকম যন্ত্রণার যন্ত্র।

হাজার বছর ধরে এই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট চলল। এর ভালো দিক ছিল না যে, তা নয়। মধ্যযুগের অসভ্যতার অন্ধকারে সভ্যতার দ্বীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল চার্চে, যদিও তাতে অন্ধকার যায়নি। বহুচারী ক্ষত্রিয়দের এক বিবাহে বাধ্য করাও সামান্য কীর্তি নয়। প্রায় দু হাজার বছর আগে রোমান চার্চ যা পেরেছে প্রায় দুই হাজার বছর পরেও দিল্লির কংগ্রেস সরকার তা পারছেন না। হিন্দু রাজ, মোগল রাজ, ব্রিটিশ রাজও তা পারেনি। করাচির নয়া মুসলিম রাজ তো তার কাছ দিয়েও যাচ্ছেন না। কাজেই রোমান চার্চের কৃতিত্বের প্রশংসা করতেই হয়। তা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের অর্ধেক দেশ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সামাজিক মানসিক বাচনিক স্বাধীনতার অভাবে। রেনেসাঁস তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। রেনেসাঁসের ন্যায়সঙ্গত রিফর্মেশন। পোপের বিরুদ্ধে, রোমান চার্চের বিরুদ্ধে, ল্যাটিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পোপের রাজকীয় ক্ষমতায়ই তার কাল হলো। গুরু মহারাজ যদি সত্যিকারের মহারাজ হয়ে ওঠেন তাহলে সত্যিকারের মহারাজের দল কি তা সহ্য করতে পারেন? ইংল্যান্ডের অস্টম হ্যানরি যে প্রজা বন্ধু ছিলেন তা নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থেই তিনি পোপের শত্রু হন। তাঁর প্রজারা তবু তাঁকে সমর্থন করেন। ইংল্যান্ডের খ্রিস্টানরা দেখতে দেখতে প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে যায়। ক্যাথলিকরা হয়ে দাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আবাক কাণ্ড! ইংল্যান্ড নয়, জার্মানি, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি বহু দেশে পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিজেদের এক একটা চার্চ খাড়া করে। সেখানেও শেষ নয়। সরকারি চার্চ প্রায় রোমান চার্চের মতো হস্তক্ষেপকারী বলে সরকারি চার্চ থেকেও বহু লোক নাম কাটিয়ে নেয়। তাদের ছোট সম্প্রদায় না মানে গুরু মহারাজকে, না মানে রাজা মাহারাজকে- অবশ্য এ সকল ঘটনা ঘটে ধর্মের ক্ষেত্রে।

এসব একদিনে হয়নি, বিনা দ্বন্দ্বেও হয়নি। ঘোরতর মারামারি কাটাকাটি ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে চলে। আমরা আর কতটুকু রক্তারক্তি করেছি। মানুষের মাংস তো আর খাইনি। জার্মানরা নাকি তাও করে দেখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্থির হলো যে, ইংল্যান্ডের মতো দেশে পোপের চেয়ে রাজা বড়ো, রাজার চেয়ে প্রজা বড়ো। প্রথম চার্লসের মাথা কেটে ও দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ইংল্যান্ডের লোক কেবল পোপকে নয় রাজকেও সমঝিয়ে দেয়ে যে, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। প্রজা প্রভাবিত রাষ্ট্রই হলো চার্চের চেয়ে বড়। প্রজাদের রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সেকুলার স্টেট হয়ে ওঠে।

এক শতক পরে যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার মূলনীতি হয় সেকুলারিজম। তার কিছুদিন পরে যখন ফরাসি বিপ্লব ঘটে তখন সেকুলারিজমের জয় জয়কার। ইংল্যান্ডে যা প্রচ্ছন্ন ছিল ফ্রান্স তা প্রকট হলো। প্রজারা যদি নাস্তিক হয়, ধর্ম বলে কিছু না মানে, তা হলেও তারা রাজ্যের অধিকারী। রাষ্ট্র তাদের চিন্তায় বাকে ও আইনসঙ্গত কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না। চার্চ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো রকম পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করবে না, বিশেষ অধিকার প্রত্যাশা করবে না। প্রজাদের কার কী ধর্ম, আদৌ কোনো ধর্ম আছে কিনা, এ প্রশ্ন উঠবে না। ধরে নিতে হবে যে ধর্ম তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। পাবলিক নয়, প্রাইভেট ব্যাপার। যার কোনো ধর্ম নেই সেও সরকারি চাকুরী করতে পারে, সেনাপতি হতে পারে, সেও নির্বাচনে দাড়াতে পারে, প্রেসিডেন্ট হতে পারে, সেও দেশ শাসন করতে পারে, প্রধানমন্ত্রী হতে পারে।

ফরাসি বিপ্লবের পর আরো এক শতক লাগল এ নীতি বলবৎ করতে। উল্লেখ্য যে, ফরাসিদের দেশে দ্রে'ফু নামে এক ইহুদি মিলিটারি অফিসার ছিলেন, তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি ইহুদী। ঐ অপরাধে তাঁকে সৈন্যবিভাগ থেকে বিদায় করা যায় না। মিথ্যা মামলা সাজানো হলো, তাও প্রকাশ্য আদালতে দায়ের করার মতো সৎ সাহস ছিল না, সামরিক আদালতের বিচারে বা অবিচারে দ্রেফু হয়ে গেল দিপান্তর। দুনিয়ার লোক জানল বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত দন্ড হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা বিবেকী ব্যক্তি তাঁরা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন নিরপরাধের সাজা হলে কেউ নিরাপদ নয়, নিরাপরাধ এক্ষেত্রে ধর্মভেদের জন্য দন্ডিত, সুতরাং সেকুলার স্টেট বিপন্ন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এমিল জোলা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অপরিচিত এক ইহুদি অফিসারের পক্ষ নিয়ে বিশ্বের জনমতের সামনে নিজের

দেশের রাষ্ট্রনায়কদেরই অভিযুক্ত করলেন, তখন রাগের চোট পড়ল জোলার উপরে। জোলার আত্মত্যাগ ব্যর্থ গেল না। শিক্ষিত ফরাসি মাত্রেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেন একটি মানুষের প্রতি সুবিচারের উপর একটি জাতির সুনাম দুর্নাম নির্ভর করছে। বারো বছর ধরে অবিরাম আন্দোলন চলে। দ্রেফুকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়।

দ্রেফু যদি ইহুদী না হয়ে ক্যাথলিক হয়ে থাকতেন তা হলে ব্যাপার এত দূর গড়াত না। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স, সেখানেও মানুষের ধর্ম সম্প্রদায় বিচার করে মামলার বিচার হয়। এই বারো বছরে ফ্রান্স তার আত্মাকে আবিস্কার করল। ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করল। সেকুলার স্টেট এই অগ্নিপরীক্ষায় সীতার মতো উত্তীর্ণ হলো। পশ্চিম ইউরোপে ফরাসি বিপবের আদর্শ এদিক দিয়ে জয়ী হয়েছে। রুশ বিপ্লবের পর রুশ পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নেও। আমেরিকার তো কথাই নেই। ফরাসি বিপ্লবের আগে আমেরিকার স্বাধীনতা, গোড়া থেকেই সেখানে সেকুলার স্টেট। নিছক ধর্মবিশ্বাসের দরুন সেখানকার কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের দরবারে ছোট বা বড় নয়, ধর্মাধিকরণে তো নয়ই। কে ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্ট্যান্ট, কে ইহুদি এসব বাছবিচার ঘরে চলতে পারে, বাইরে চলে না।[২৪] বর্ণ-বিদ্বেষ অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

'সেকুলার' ও *'সেকুলারিজম'* শব্দ দুটি মুখ্যত রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বলা হয়, রাষ্ট্র হবে *'সেকুলার'*। বলাবাহুল্য, ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা অনুসরণ করেই এ কথা বলা হয়। ইউরোপের রাষ্ট্রচিন্তায় 'Secular State' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে মুখ্যত 'Non-ecclesistical' অর্থেই, অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে চার্চ তথা যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাব হতে মুক্ত - এই অর্থেই। এই রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব হয়েছে স্পষ্টত ষোড়শ শতাব্দে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সময় থেকে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ-এর ধর্মযাজকদের ভ্রষ্টাচারে যখন খ্রিস্টীয় ধর্মে গ্লানি প্রবেশ করে তখন, রেনেসাঁসের সময়ে ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই, খ্রিস্টান ইউরোপে ধর্মের সকল আদর্শকে পুনঃস্থাপিত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে, ধর্মের সংস্কারের জন্য দাবি ওঠে। সেই দাবি ষোড়শ শতাব্দীতে বজ্রনিনাদে ধ্বনিত হয়েছিল মার্টিন লুথার-এর কণ্ঠে জার্মানিতে, এবং যুগপৎ অন্যান্য দেশেও।

এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে সেদিন অবশ্য ইউরোপের অনেক রাজ্যের নৃপতিদেরও সমর্থন ছিল। সেই সময় ইউরোপের রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও ক্যাথলিক চার্চ-এর প্রভাব ছিল প্রবল; চার্চ -এর ঐহিক ঐশ্বর্যও কম ছিল না। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে চার্চ-এর প্রভাব খর্ব করে চার্চ-এর ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে সেই অর্থে ঐ সব *'সেকুলার'* নৃপতিদের ঐহিক প্রয়োজনে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার মেটানোর আগ্রহও যুক্ত হয়েছিল ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে। তাছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার যে উন্মোষ ঘটতে থাকে, তা ঐ সব দেশের নৃপতিদের উৎসাহিত করেছিল পোপের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে স্বদেশে নিজেদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে। ইংল্যান্ডে রাজা অষ্টম হেনরি যখন রোমের পোপের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেকেই ইংল্যান্ডের স্বতন্ত্র চার্চ-এর প্রধান রূপে ঘোষণা করেন, তখন ইংল্যান্ডের অধিকাংশ প্রজাই তাঁকে সমর্থন করেছিল জাতীয় স্বার্থে। বস্তুত এই সব নানা কারণেই সেদিন *'সেকুলার'* অর্থাৎ 'Non-ecclesistical' রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছিল।

অবশ্য ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। রেনেসাঁস-এর কাল থেকেই ইউরোপের মানুষের মনে *'ঐহিকে বিরক্তি'* আর তত প্রবল ছিল না; সেই মন ক্রমশ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতির ভাবনা ত্যাগ করে ইহলোকমুখী হতে শুরু করেছে- প্রথমে শিল্পের ভিতর দিয়ে, তারপর সাহিত্য, দর্শনে, সমাজ চিন্তায়, রাষ্ট্র চিন্তায়। ইতালিতে মেকিয়াভেল্লিই প্রথম রাজনীতিকে ধর্ম তথা নীতিশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য থেকে মুক্ত করার প্রয়াস পান। তাঁর The Prince গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, রাষ্ট্রের স্বার্থে শাসককে প্রায়শই মানবতা, দয়া, ধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি যে কেবল যাজক সম্প্রদায় বা চার্চ- এরই প্রভাব মুক্ত হবে, তাই নয়; তা হবে পুরোপুরি ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি আনুগত্য হতে মুক্ত। এই হলো ধর্ম-বর্জিত, ধর্মহীন রাষ্ট্রনীতি। অবশ্য মেকিয়াভেল্লি অন্যত্র বলেছেন, *'রোমের চার্চ* ও ধর্মযাজকরাই আমোদের শিখিয়েছেন ধর্মহীন ও অসাধু হতে; চার্চই তখন ইতালিকে বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত করে রেখেছিল তার ঐহিক স্বার্থে। মেকিয়াভেল্লি চেয়েছিলেন ইতালিতে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে এক শক্তিশালী সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মের তথা চার্চ ও যাজকদের অনুশাসন অগ্রাহ্য করার একই আগ্রহ ক্রমশঃ আরো প্রবল হয়ে ওঠে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের অনুক্রমে যখন ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধায় সমগ্র ইউরোপে প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যাপী এক গৃহযুদ্ধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ইংল্যান্ডের দার্শনিক টমাস হবসকে প্ররোচিত করেছিল এমন এক রাষ্ট্রের কল্পনা করতে, চার্চও ধর্মের বিধি-বিধান হবে যার শাসনের অনুগত। অতঃপর অষ্টদশ শতকের এনলাইটেনমেন্ট-এর যুগের দার্শনিক চিন্তাকরাও সেদিন ধর্ম ও চার্চ-এর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তাঁরা বলতেন, ধর্ম মানুষের মনকে পরলোকমুখী করে বলে তা ইহজগতের মানুষের কল্যাণ সাধনে বাধা হয়; ইহজগতে মানুষের সুখ ও কল্যাণ সাধিত হতে পারে মুক্তির দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলির বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যেই।

ধর্ম মানুষের মনকে অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন করে। তাতে তার সহজাত যুক্তিশীলতা অভিভুত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী লোকেরা স্ব স্ব ধর্মমতে অন্ধবিশ্বাসবশত অপর ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে; সেজন্য বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, সামাজিক শান্তি ও সুস্থিতি বিঘ্নিত হয়, জাগতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। সেই কারণে ইংল্যান্ডের দার্শনিক জন লক ফ্রান্সে ভলটেয়নর প্রমুখ চিন্তকেরা পরমতসহিষ্ণুতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রান্সে এই সকল মুক্তমতি চিন্তক দার্শনিকদের Philosophes বলা হতো। এঁদের মধ্যে ছিলেন দ্যলেমবার্ট, পিয়ের বেইল, কাঁদিলাক, কঁদরসে, দিদেরো, হেলভেশিয়াস, হলবাক, ভলটেয়ার মন্টেস্কু, রুশো প্রমুখ লেখকগণ, যাঁরা ফরাসি বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এঁদের রচনা সেদিন ফ্রান্সের চিন্তা-ভাবনার জগতে যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে, ফরাসি বিপ্লব তারই পরিণতি।

এঁরা মনে করতেন, মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলছে তাদের সুখ শান্তি নিরাপত্তা ও জাগতিক উন্নতির জন্য। সমাজকে ধারণ করে রাখে ধর্ম নয়, মানুষের রচিত বিধি-বিধান সদাচার নীতি। এই সকল বিধি-বিধান ও সদাচার নীতিও মানব প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির সম্যক পর্যালোচনা দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার জন্য কল্পিত ঈশ্বরে বা পরলোক বিশ্বাস করা অনাবশ্যক অযৌক্তিক; নিরুত্তাপ যুক্তির আলোকই মানুষ স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সকলের হিত সাধন করতে পারে, সদাচার নীতির যা উদ্দেশ্য। তার জন্য তাঁরা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, যাতে সকল মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, বিচার করতে পারে। অবশ্যই এই শিক্ষা হবে সেকুলার অর্থাৎ ধর্মবর্জিত। এইভাবে সেকুলারিজম শব্দটির অর্থ ক্রমশঃ থেকে সম্প্রসারিত হয় Non-religious; Non-secred বা Profane এই অর্থ পেল।[২৫] এই Secularism এর ধারণাই ঊনবিংশ শতক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে ক্রমশ এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর ও বুদ্ধিজীবীদের মনকেও অধিকার করেছে।

বাঙালি রাষ্ট্রনায়ক ও দার্শনিকদের চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতা

সেকুলারিজম এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আজকাল ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইহজাগতিকতাই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও মনে হয় ধর্মনিরপেক্ষতাই সেকুলারিজমের অধিকতর নিকটবর্তী শব্দ, তবুও এ নিয়েও সমস্যা আছে। একটি ধারণাকে একটিমাত্র শব্দে অনুবাদ করা কঠিন, কারণ ধারণার পেছনে থাকে ভাবনার ঐতিহ্য এবং সংশ্লিষ্ট নানান অনুষঙ্গ। ইহজাগতিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা এ দুয়ের কোনোটিই এ দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বতন্ত্র দার্শনিক প্রত্যয়ও ধারণা হিসেবে চর্চা হয়নি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে প্রচার চালিয়ে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি সাধারণ জনগণকে ভালোভাবে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। এদিকে ইহজাগতিকতাবোধ এবং এর নানান অনুষঙ্গ ছাড়া কোনো মানবসমাজ তো বিকশিত হয়নি, বাঙালি সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তাতেও দুটো বেশ বড় ফাঁড়া কাটানোর দায় এসে পড়ে-এক, ইহজাগতিকতার যেহেতু পাল্টা বিপরীত শব্দ আছে পরজগৎ (ইহকাল-পরকালের মতো), তাই মানুষ ধরে নিতে পারে যে এ ধারণা পোষণ করার অর্থ পরজগৎ এবং সেই সূত্রে ধর্মকে অস্বীকার করা। এই ভক্তিবাদী বৈরাগ্যবাদী ধর্মরসে সিক্ত প্রধানত ধর্মভীরু মানুষের সমাজে ধারণা হিসেবে ইহজাগতিকতাকে নিয়ে মানুষ যে বিব্রত অবস্থায় পড়বে এবং ভুল বোঝার সমূহ সম্ভাবনা যে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইংরেজি সেকুলার শব্দের বিপরীত কোনো পাল্টা শব্দ নেই। এর সহজ কারণ রাষ্ট্রসাধনার সাথে সাথে ধারাবাহিক নানা সংগ্রাম-সাধনার এক পর্যায়ে গণতন্ত্রের আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে এই প্রত্যয়টি তাদের মনে তৈরি হয়েছে।[২৬] ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ ধর্মহীন অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন রাষ্ট্রীয় রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি। নিজ ধর্মে সম্পূর্ণ আসক্ত থেকে অপর ধর্মকে সহ্য করা নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক সব ধর্মকে সমানভাবে উৎসাহিত করবার নীতিও ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। একথাও প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই রাষ্ট্রীয় নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব।

সেকুলারিজম শব্দটি মানুষের জীবন ও সমাজের প্রতি এমন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায় যা আভিধানিক অর্থেই ধর্মবিমুখ এবং জগৎমুখী। *'রিলিজিয়াস'* বা ধর্মীয় শব্দটির বিপরীতার্থক হিসেবেই *'সেকুলার'* শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান মনস্কতা এবং বিশ্বমানবতার উপরে অধিষ্ঠিত। এই ধর্মহীনতার অর্থেই প্রাচীন ভারতের লোকায়ত বা চার্বাকবাদীরা ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন। আর এই অর্থেই আঠারো শতকে ইউরোপের জ্ঞানবাদী আন্দোলনের মধ্যে, এবং পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি উঠে এসেছিল। তখন সেকুলারিজম ছিল ধর্মের বিপরীতার্থক। অর্থাৎ যা কিছু জাগতিক, যা কিছু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত, অতএব ধর্মের সঙ্গে অসম্পৃক্ত বস্তুজগৎ সংক্রান্ত, তাই সেকুলার।

এখনো পাশ্চাত্য দুনিয়ায়, এবং বর্তমান ও পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সেকুলারিজমের এই সংজ্ঞাই প্রচলিত আছে। এদিক থেকে বিচার করলে সেকুলারিজম শব্দের প্রকৃত অনুবাদ হওয়া উচিত ধর্মহীন বা ধর্মে উদাসীন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রকৃত অর্থ সর্বদা মনে না রাখলে অনর্থ হবার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে সেকুলারিজমের অর্থ বলা হয়েছে ধর্মের বিপরীত।[২৭] মানুষের অনুভব-উপলব্ধির জগতে এ সেকুলারিজমের উন্মেষ-বিকাশ-বিস্তার ঘটাতে ইউরোপীয় জ্ঞানী-মনীষীদের দীর্ঘকালের চিন্তা-চেতনার, প্রয়াস-প্ররোচনার ও প্রচার-প্রণোদনার প্রয়োজন হয়েছে। অবশেষে শাস্ত্র-সমাজ -রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে তাদের সেকুলারিজমের স্তানিক ও কালিক আবশ্যিকতা।

যদিও মূলে শাস্ত্রিক চর্যা-চর্চা, আচার- আচারণ, পালা- পার্বণমাত্রই কম-বেশি আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক এবং দেশ বিশেষে দৈশিক, রাষ্ট্র বিশেষে রাষ্ট্রিক, তবু বহু সম্প্রদায়, নানা জাতিসত্তা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রিক জাত ও গোষ্ঠী অধ্যুষিত আধুনিক দেশে ও রাষ্ট্রে অধিজনের বা উনজনের শাস্ত্রিক-পালা- পার্বন- অনুষ্ঠান- আচারণ ভিন্ন শাস্ত্রমানা অসহিষ্ণু লোকের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের আর্থিক-রাজনীতিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শহরে-বন্দরে সহিষ্ণুতায় সম্প্রীতিতে সহযোগিতায় সহাবস্থানের স্থায়ী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সদুদ্দেশ্যে সেকুলারিজমবাদীরা শাস্ত্রের আদি উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের, তত্ত্বের ও তথ্যের তাৎপর্য জেনে-বুঝেও একালে নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও বর্জনীয় বলে জানে ও মানে। তারা এ-ও জানে ভয়-বিস্ময়-ভরসাপুষ্ট জ্ঞান- বুদ্ধি-যুক্তিরিক্ত অশৈশব কল্পনা বিশ্বাস-সংস্কার লালিত অদৃশ্য অরি-মিত্রশক্তি আশ্রিত ভীরু মানুষ কখনো-জ্ঞান-বোধি-যুক্তি-প্রয়োগে নিরীশ্বর-নাস্তিক হবে না। তাই শাস্ত্রের অযৌক্তিকতা-অলীকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেই কেবল শাস্ত্রকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ও আচরণের বিষয় করে ঘরের ও অন্দরের সীমায় তার চর্যা ও চর্চা নিবন্ধ রাখতে চায়। এজন্যেই সেকুলারিজমের সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ ধর্মের তথা শাস্ত্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অস্বীকৃতিই সেকুলারিজম। সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম সম্বন্ধে থাকবে সর্ব প্রকারে উদাসীন, শাস্ত্রাচার সম্বন্ধে সমাজ থাকবে নীরব নিষ্ক্রিয়, রাষ্ট্র থাকবে অজ্ঞ-উদাসীন। ঈদগাহ কিংবা কুম্ভমেলার ঘাট সরকারি ব্যয়ে নির্মাণ করা যাবে না, যাবে না মন্দির-মসিজিদ গীর্জা-মঠ মেরামত করা, ঈদের কিংবা বিজয়ের বাণীও দেয়া যাবে না সরকার প্রধানের। এরই নাম ধর্মনিরপেক্ষতা।[২৮]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শব্দটি বাংলা প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং শব্দটির প্রকৃত অর্থ সর্বদা মনে না রাখলে অনর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে সেকুলারিজমের অর্থ বলা হয়েছে ধর্মের বিপরীত। কেম্ব্রিজ ইংরেজি অভিধানে বলা হয়েছে সেকুলারিজম এমন আদর্শ যাতে রাষ্ট্রের সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক

কর্মকান্ডে ধর্মকে সম্পৃক্ত করা অনুচিত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে যেসব বিভ্রান্তি আসতে পারে সেসব সম্পর্কেও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে,

> "পরধর্মের প্রতি উদার মনোভাবের প্রকারভেদ আছে। উদারহরণ স্বারূপ, অনেক ধার্মিক আছেন যারা নিজ ধর্মকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন। তাদের বক্তব্য, এমন ধর্ম কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। কিন্তু তারা অন্য ধর্মের মানুষকে সহ্য করে নিতে এমনকি তাদের ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি কিছুটা সদয় ব্যবহার করতেও প্রস্তুত আছেন। এই প্রবৃত্তির নাম ক্যাথলিসিজম বা পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার আদর্শ। আবার অনেকে মনে করতে পারেন যে, অন্য ধর্মের মধ্যেও কিছু কিছু সত্যদৃষ্টি আছে, এবং সেসব ধর্মের মানুষেরাও নিজ নিজ ধর্মাচারণের মধ্য দিয়া "অধ্যাত্মিক" উন্নতির পথে যেতে পারে। আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ হলেও পৃথিবীর আর সব ধর্ম একেবারে মিথ্যা, তা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির নাম কসমোপলিটানিজম বা বহুত্ববাদী ধর্মদৃষ্টি।
>
> ধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাবটি এই যে, সব ধর্মে বিভিন্ন নামে এবং রূপে একই সত্য নিহিত আছে। নিজ নিজ ধর্ম যথার্থ পালন করলে পৃথিবীর সব মানুষই '*আধ্যাত্মিক*' উন্নতির পথে এগুতে পারে। অর্থাৎ যত মত, তত পথ। এই ধর্মমতের নাম 'একলেকটিসিজম' বা সর্বধর্মসমভাব। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই মতের প্রবক্তা ছিলেন। এ ধরনের বিভিন্ন ধর্মদৃষ্টির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো সে আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় যে এর কোনওটিকেই সেকুলারিজম বা প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা ব্যক্তি মানুষ পৃথিবীর '*আধ্যাত্মিক*' উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষের জাগতিক বিকাশই তার আদর্শের সারবস্তু।[২৯]

মানব সমাজের যথাযথ বিকাশ ও মানবীয় কল্যাণ সাধনকামী রাষ্ট্র নির্মাণে ধর্মনিরপেক্ষতা যে শুধুমাত্র প্রাথমিক শর্ত নয়, অপরিহার্য এক চালিকাশক্তি এ সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এটি ইতিহাসেরই কথা। এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। তাহলো, সাবেক ভারতবর্ষীয় (বর্তমান ভারত রাষ্ট্র নয়) বা বাংলার ইতিহাস পরিপূর্ণভাবে দৈবনির্ভর বা ঈশ্বর নির্ভর বা ইশ্বরাশ্রয়ী হলে নেহেরু-মওলানা আজাদ কেমন করে স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করলেন এবং শেখ মুজিব কোন ঐতিহাসিক প্রেরণায় ইহলৌকিক আদর্শকে কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরটি বেশ উদ্দীপক হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় দার্শনিক কোঁত প্রভাবিত ওপরের উদ্ধৃতিটি মহা-মূল্যবান এক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ হলেও ওই বক্তব্যে ভারতবর্ষীয় সমাজের বর্ণশ্রমবাদী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং কেন্দ্রীয় মানসে ওই ধর্মবেত্তা পুরুত-যাজক চক্রের আধিপত্যে প্রচলিত দৈব নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গিটি কিন্তু সর্বজনীন ছিল না। সমাজের নিচুতলায় ধর্ম বা দৈব নির্ভরতা নয়, মানবতন্ত্রী ভাবসাধনাই অন্তঃশীল ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল। উঁচু তলার মানুষ ধর্মের মানবীয় উপাদানের গভীরতায় পৌছানোর কোন চেষ্টা না করে মোল্লা-পুরুতের অন্তঃসারশূন্য শাস্ত্রীয় কথামালাকে তোতা পাখির মতো অন্তরে ধারণ করে ধরতাই বুলি হিসাবে হরহামেশা উচ্চারণ করে গেছে। কিন্তু নিচু তলায় মানুষ তাদের যাপিত জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে জীবন- জগত এবং মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। এবং এই সূত্রেই গ্রামীণ বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে নানা জীবনমুখি ও ইহজাগতিক সাধনার ধারা এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন বিরোধী নানা লোকধর্মী। বৈষ্ণব, বাউল নাথযোগী সুফিদের গুহ্যতত্ত্ব ও মারেফতি ধর্ম-দর্শন ও ভাব সাধনায় (দেহতত্ত্ব ও কায়াসাধনাসহ) উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এই ইহলৌকিক ও মানবপন্থী ধারা। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় যে দৈব-নির্ভর, ধর্মপ্রবণ ও আধিপত্যবাদী ইতিহাস চর্চার কথা বলেছেন তার বিপরীতে মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের বাস্তব বুদ্ধিজাত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনীতির অপ্রতিকুলতার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় সমন্বয়বাদী ও শাস্ত্রীয় ধর্মনিরপেক্ষ যে, জীবনধারা ও বুদ্ধি বৃত্তিক ভাবসাধনার ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তার মধ্যেই নিহিত আছে বাঙালির স্বকীয় বিশ্ববীক্ষা Worldview বা জীবনদর্শন।

মুসলিম সুলতান ও নবাবেরা বাঙালির মানস প্রবণতাকে খুব যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সে-স্পর্শকাতর বিষয়ে কোনো বিরূপ ধারণা বা অসুয়া পোষণ না করে বাঙালির আচার অনুষ্ঠান উৎসবকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে দূরে থাকা গ্রমীণ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ধারার বিকাশে কোন বাঁধার সৃষ্টি হয়নি। তারা সব সময়েই তাদের নানা মত-পথ ও পন্থার বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে সমন্বয়ের

মাধ্যমে শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় অধিপত্যবাদী নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে উপলব্ধি করে তাই বলেছেন ঃ 'মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ জৈনমত এদেশে বা তার আশেপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন মধ্য বাংলার সঙ্গেই ছিল একঘরে অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে দেখা যায় সেই স্বাধীনতা।' বাংলার এই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় ধর্মনিরপেক্ষতাই অনিবার্যভাবে মানবমুক্তির অনিবার্য পথ ও পন্থা হয়ে ওঠে।বাংলার মানুষের এই মানসিক সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র গঠনের একটি প্রাথমিক উদ্যোগ চোখে পড়ে। একজন চিন্তাবিদ বলেছেনঃ

> অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর সুবায় সুবায় নতুন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্য করিলে এই সব রাষ্ট্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব চোখে পড়ে। ইউরোপে নতুন বানিজ্য পথ আবিস্কারের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রথম সূত্রপাত; আর্ন্তবাণিজ্য ও বার্হিবানিজ্যের কৃপায় এই শ্রেণীটি ইতিমধ্যেই বিশেষ অর্থবান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া নতুন নতুন শহর বন্দর গড়িয়া উঠিল। গ্রাম, গ্রামান্তর হইতে নিপুণ কারিগর শ্রেণী ও অনিপুণ মজুরের দল সুরাট, হুগলি সুতানটি ও মর্শিদবাদে ভিড় জমাইল। বাংলাদেশে পলাশি যুদ্ধের সমকালে এই শ্রেণীর রূপটি খুব স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। মুঘল সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসে যাহা কখনো পড়ে নাই- এই সময় তাহা দেখা যায়। দেখা যায় সামন্ততন্ত্রে কাঠামোর মধ্য হইতে একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণী। বিলক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। আর তাহার প্রথম ধাপ হিসাবে বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য '*হাতের লোক*' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাংকার জগৎ শেঠ, বণিকরাজ উর্মিচাঁদ, নিমকের একচেটিয়া কারবারী খোঁজা বাজিদ, ইংরেজ কুঠির সঙ্গে গোপন কারবারে প্রভূত বিত্তশালী ঢাকার ডেপুটি দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ এই নতুন শ্রেণীর প্রতিনিধি। উল্লেখযোগ্য যে ইহাদের একজন জৈন, একজন নানকপন্থী, একজন মুসলমান, অপর একজন বাঙালি হিন্দু অর্থাৎ ইহাদের ঐক্যর ভিত্তি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। ইহারা আবার বণিক পুঁজির প্রতিনিধি। আর এই পূঁজিই সর্বদেশে ধনতন্ত্রের অগ্রদূত। এই শ্রেণীর দ্বারা এদেশেও হয়তো বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা রচিত হইত।[৩০]

কিন্তু ইংরেজরা এদেশ দখল করে নেয়ার সৃজ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এদেশে সূচনালগ্নেই চাপা পড়ে যায় এবং ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকেরা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে শাসন করার লক্ষ্যে *Divide and Rule Policy* চালু করে। এভাবেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর ভারতবর্ষে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে দেয়। তারই বিষময় ফল, ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ভাগ করে '*ভারত*' ও '*পাকিস্তান*' নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিপুল নিরীহ মানুষের প্রাণহানি, অগণন মানুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশ ত্যাগ ও দুঃসহ বাস্তহারা জীবন গ্রহণ একে ইতিহাসের এক বিশাল মানবিক বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যায়?

ঘ. মানব কল্যাণে ধর্মনিরপেক্ষচিন্তার ভূমিকা

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টই বলা আছে যে, 'তোমার জন্য তোমার ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।' কুরআনের এই বাণীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পরস্পরের ধর্মবোধকে শ্রদ্ধা করা। এই বাণী থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলাম ধর্মেরও একটি মূল দর্শন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক ধর্মকে অপর ধর্মাবলম্বীদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে চাপিয়ে দেবার ঘটনা যুগে যুগে দেশে দেশে প্রচুর ঘটেছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে কত যে যুদ্ধ হয়েছে তার হিসাব করলে আতঙ্কে শিহরিত হতে হয়। ধর্ম যে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মানব সভ্যতার ইতিহাস তা প্রমাণ করে। কিন্তু পাশাপাশি ধর্ম যে মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণও কম করেনি, এর প্রমাণও মানব সভ্যতার ইতিহাসেই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। ধর্ম যতক্ষণ ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তার একটি কল্যাণময় রূপ দেখা যায়। কিন্তু যখনই তাকে ব্যক্তির গন্ডি পেরিয়ে সমষ্টির ওপর জোরপূর্বক চাপানো হয়, তখনই তার রূপ হয়ে ওঠে ভয়াবহ। মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি স্পষ্টতরভাবে ধরা পড়ে যে, যুগে যুগে হানাহানি শুধু এক ধর্মে বিশ্বাসীদের সঙ্গে অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যেই যে, সংঘটিত হয়েছে তা নয়, একই ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যেও হয়েছে এবং তার পরিণতি হাজার হাজার মানুষের জীবনাবসান ঘটেছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই ধীরে ধীরে ধর্মের অন্ধবিশ্বাসকে অতিক্রম করে যুক্তিবাদ নেমে এসেছে এবং মানবতার আলোকে ধর্মকে বিশ্লেষণের প্রায়স হয়েছে।

গণতন্ত্রের যেমন একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তেমনি আছে ধর্মনিরপেক্ষতার। রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে নিস্তার লাভের জন্য গণতন্ত্রের সৃষ্টি। তেমনি ইউরোপে পোপের ও ধর্মযাজকদের শত শত বছরের অত্যাচার, প্রাচ্য ব্রাহ্মণ্যবাদ, মোল্লাতন্ত্র ও বৌদ্ধদের বাড়াবাড়ি ইত্যাদি থেকে মুক্তির অন্বেষায় ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের একটি শর্ত। ধর্মকে কেন্দ্র করে ইউরোপে খ্রিস্টান- খ্রিস্টানে শতবর্ষের যুদ্ধ হয়েছে। খ্রিস্টানে-মুসলমানের ক্রুশেড হয়েছে প্রায় চারশত বছর। মুসলমান-মুসলমানেও মধ্যপ্রাচ্যে, মধ্য এশিয়ায় ও ভারতবর্ষে সংঘাত আজও অব্যাহত। ভারতবর্ষেও কম যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। আমাদের শ্রদ্ধেয় খলীফাদেরকেও হত্যা করেছিল মুসলমান। মুসলমান-মুসলমানে যুদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এখনো ঘটেই চলেছে। বাংলাদেশে ত্রিশ লাখ মানুষের হত্যা ও কয়েক লাখ মা-বোনের ইজ্জত ধ্বংসকারী আপর আর কেউ ছিল না - ছিল এই মুসলমান। হিন্দু-হিন্দুতে যুদ্ধের ইতিহাস আছে - আছে হিন্দু-বৌদ্ধের এবং বৌদ্ধ-বৌদ্ধে যুদ্ধের নির্মম ইতিহাস। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বীভৎসরূপ আমরা দেখিছি। সেই দাঙ্গার অবসান এখনো ঘটেনি।

১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ধর্মের নামে কম্যুনিস্টদের কাফের আখ্যা দিয়ে লাখ লাখ মুসলমানকে শহরে, গ্রামে -গঞ্জে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে সুদানে একই স্লোগানে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৪৮ সালে মওদুদীর সমর্থকদের হাতে পাঞ্জাবে তিন হাজারের অধিক কাদিয়ানী নিহত হয়। ইউরোপে ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্টে এবং গোঁড়া মতবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ মানুষের মর্যাদাকে বিষাক্ত করেছে। পোল্যান্ডের রোমান ক্যাথলিকগণ লুথারীয়ান জার্মানদের বিরুদ্ধে সক্রিয়। সার্বিয়ান এবং ক্রোটগণ একই ভাষা ও সংস্কৃতি সত্ত্বেও শুধু রোমান ক্যাথলিক ও গোড়া ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণাকেই দিনে দিনে উজ্জীবিত করেছে। এ সবই হয়েছে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ও ধর্মান্ধতার ফলে।

শ্লোভাকগণ জেকদের থেকে শুধু জেসোয়িট ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যে তাদের ভাষা ও সাহিত্যকে আপন বলে ভাবতে পারেনি। মুসলমান মুসলমান সত্ত্বেও নাইজেরিয়াতে হাউসা সম্প্রদায় ইরোবা সম্প্রদায়ের সাথে প্রায়ই বিবাদে লিপ্ত হয়। কেননা, হাউসা সম্প্রদায় আফ্রিকার শত শত নিজস্ব সংস্কারকেও ইসলামের মতই তাদের ধর্ম বলে মনে করে, যা ইরোবাদের পছন্দ নয়। ইন্দোনেশিয়ায় জাভাতে অভাঙ্গানী ও সাস্ত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ একই কারণে এক সম্প্রদায় নামমাত্র ইসলামে বিশ্বাসী, কিন্তু আচার-আচারণে সম্পূর্ণ জাভাপন্থী, অপরে তা নয়। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিরোধ পৃথিবীর সর্বত্র। পাকিস্তানে এই দুই সম্প্রদায় ছাড়াও আছে কাদিয়ানী। এ ছাড়া হানাফি, শাফি, মালিকী ও হাম্বলীদের বিরোধ। মুসলমানদের মধ্যে হামাদান বলে একটি সম্প্রদায় জন্মান্তরে বিশ্বাস

করে। এ ছাড়া আহলে উবরাই উয়াল কিয়াস, গায়েব মুকাল্লিদ আহলে হাদিস, ওয়াহাবি, জাইদীয় কাউসিনীয়, ইসনা আশারীয়, ইসমাঈলীয়, কাদেরীয়, বাতেনীয়, মোতাজিলীয় ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়ে মুসলমানগণ বিভক্ত। ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ দেয়, এইসব সম্প্রদায়ে রক্তারক্তি প্রচুর ঘটেছে। যেমন ঘটেছে খ্রিস্টান ধর্মের রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যালভিনিস্ট, গ্রীকঅর্থডকস, প্রেসবিটেরীয়ান, মেরমন কোয়েকার প্রভৃতির মধ্যে। কর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বশ্য ও শুদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি। বৌদ্ধ ধর্ম? যেখানে ভগবানের কোন অস্তিত্বের কথাই গৌতম বুদ্ধ স্বীকার করলেন না- সেখানে বুদ্ধকেই ভগবান সাজানো হল এবং সৃষ্টি হল দল উপদল। হীনযান ও মহাযান ছাড়াও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ত্রিশ -একত্রিশটি উপদল আছে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ আছে।

ইয়াহুদীরা বহু ঘাত -প্রতিঘাত সহ্য করে আজ একটি রাষ্ট্রে সমবেত হয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে এই দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ। কিন্তু তথাপি যে জুডাইজম বা ইয়াহুদী ধর্ম তারা অনুসরণ করে সেখানেও দল-উপদল আছে। সেফাডিক এবং আসখেনাজিম বিশ্বাসীরা আছে, আছে প্রাচ্যবাদী ইয়াহুদী। এদের মধ্যে বিরোধ মাঝে মাঝে সংঘর্ষে রূপ নেয়।

উল্লেখ্য, ধর্মের উদ্ভাবন যারা করেছে, ধর্মের বিকাশ সাধনে যাঁরা যত্নবান ছিলেন, তাঁদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মের মঙ্গলময় রূপ, মানবসভ্যতায় ধর্মের মহৎ অবদান ইত্যাদির একটি সুদীর্ঘ এবং সুমুজ্জুল ইতিহাস আছে। কিন্তু পাশাপাশি ধর্মের অপব্যবহার যে মানুষের কত বড় অকল্যাণ করেছে, তার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাসকে, অন্ধকারময় দিকের ইতিবৃত্তকে আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না। এতক্ষণ সেই সংঘর্ষের ও ধর্মীয় শ্রেণীবিদ্বেষের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিত্র উল্লেখ করেছি। এই বিদ্বেষ থেকে পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ধর্ম খ্রিস্টিয়ানিটি, ইসলাম, জুডাইজম, হিন্দু ও বৌদ্ধ কোনটিই মুক্ত নয়।

নিম্নে ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তবুদ্ধি চর্চা এবং বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী কতিপয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনীষীদের প্রতি বিভিন্ন ধর্মীয় শাসক, যাজক, পোপ কর্তৃক যে সকল অমানবিক আচরণ করেছেন তাঁর কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলোঃ

কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) পোল্যান্ডের অধিবাসী। তিনিই গ্রীক সূত্র ধরে প্রথম ঘোষণা করলেন, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এ কথা সত্য নয়- পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ধর্মযাজকগণ ক্ষেপে গেলেন। কোপারনিকাস ভৌতিক শক্তি আদান প্রদান করেছেন এই অপরাধে তাঁর মাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হল দীর্ঘদিন, ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটল। কোপারনিকাসের বেতন বন্ধ করে তাঁকে রাষ্ট্রের সমস্ত সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করা হলো। ঊনষাট বছরের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন তাঁর অভাবে, অনাহারে রোগে শোকে সমাপ্ত হল।

নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) যিনি মাধ্যকর্ষণ শক্তি, বিজ্ঞানের সুক্ষ্ম তত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক তথ্য আবিস্কার করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে পোপের নির্দেশে ধর্মীয় বিচার বা ইনকুইজিশন গঠিত হয়েছিল এবং বস্তুতপক্ষে প্রায় বন্দী অবস্থায়ই তাঁর জীবনাবসান হয়।

ইতালীর বিখ্যাত পদার্থবিদ গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) ঘোষণা করেন যে, 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে'। এ ছাড়া আপেক্ষিকতা ও ল অব ইনারসিয়া বা বস্তু জাড্যতার বিধানের আবিস্কারক গ্যালিলিও। যাজক সম্প্রদায় পোপের নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে ইনকুইজিশনের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে কখনো কারাগারে, কখনো গৃহবন্দী, কখনো নজরবন্দী করে রাখা হয়, কখনো বা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে বলতে হয় যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য নয়। এই বন্দী অবস্থায়ই বিশ বছরের উর্ধ্বে যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনযাপন করে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

ইউরোপের পুনর্জাগরণ যুগের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জিওনার্দো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) যে পোপের নির্দেশে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও হলবাকের গ্রন্থ উল্লাসের সাথে খোলা রাস্তায় পোড়ানো হয়।

ইবনে খুলদুন (১৩৩২-১৪০৬) ইতিহাস বিজ্ঞানের এবং সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের একজন প্রথম ও বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে মুসলিম সভ্যতার মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি দুই বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, বন্দী হন, দেশ থেকে নির্বাসিত হন এবং বিদেশেই মৃত্যুবরণ করেন। দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ এবং পদার্থবিজ্ঞানী ইবনে সিনা (৮৯০-১০৩৭) যিনি আজো বিশ্বের পণ্ডিতদের শ্রদ্ধেয়, তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, নির্বাসিত হন এবং দেশে দেশে ঘুরেই তার জীবনাবসান ঘটে। আরব সভ্যতার বিখ্যাত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮) এর অনেক গ্রন্থই পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং তাঁর জীবনে নির্যাতনেরও অন্ত ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বহু দুঃখ কষ্টে প্রাণরক্ষা করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, ইমাম আবু হানিফাকে আমরা কত শ্রদ্ধা করি, তাঁরও মৃত্যু ঘটে কারাগারের ভিতরে। মনসুর হাল্লাজ বা জায়েদ বিন জয়নাল ধর্মদ্রোহী বলে হত্যা করা হয়। মুতাজিলাদের গ্রন্থ পোড়ানো হয় এবং শূলে দিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। আহলে হাদিস আন্দোলনের নেতা মীর আবদুল্লাহ গজনবী মাতৃভূমি আফগানিস্তানে থাকতে পারেন নি- ভারতে আশ্রায় নিতে বাধ্য হন। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার বৃদ্ধ বয়সেও পাকিস্তান থেকে নির্বাসিত হন। ইকবাল ও নজরুল এক সময়ে *'কাফের'* বলে নিন্দিত ছিলেন।

আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি, করাচী ইসলামী একাডেমির ডিরেক্টর ফজলুর রহমান প্রহৃত হন এবং চাকরি ছেড়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন। মধ্যযুগে শুধু যে ধর্মান্ধতার কারণে ইউরোপে হাজার হাজার লোক মরেছে- জ্ঞানীগুণীদের ওপর নির্যাতন হয়েছে এমন নয়। এখনো এর রেশ ইউরোপ থেকে একেবারে মুছে যায় নি। মুসলিম বিশ্বে শুধু ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যুগ থেকেই এই হত্যা, নির্যাতন ও বর্বরতা শুরু হয়েছে তা নয়, মধ্যযুগে তার বৃদ্ধি ঘটেছে এবং বর্তমান যুগেও তার হ্রাস হয়েছে, এ কথা বলা যাবে না। ইতিহাস তা বলে না ধর্মের মতলবী ব্যবহারকারীদের দ্বারা ধর্মের নামে দেশে দেশে মানুষের ওপর নির্যাতন এখনো বিদ্যমান।

এই সুদীর্ঘ এবং করুণ অভিজ্ঞতা থেকেই গণতন্ত্রের আদর্শ ও গণতান্ত্রিক বিশ্বাস যতই মানুষের মনে দানা বেঁধেছে ধর্মকে ততই রাষ্ট্রীয় জীবন থকে দূরে রেখে ব্যক্তিগত জীবনে তার নির্বিঘ্ন অনুসৃতি এবং নিরাপদ বিকাশকে স্বীকার করা হয়েছে। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক ও লুথেরানদের মধ্যে যে সন্ধি হয় সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রধান শর্ত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। হিউজেন্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত হানাহানির পরে ফরাসী দেশে যে আইন করা হয়, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা আইনের অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দের এই বিখ্যাত ঘোষণার নামই এডিক্ট অব নান্টেজ। বেলজিয়ামে ১৬০১ সালে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যে সন্ধি হয় তার মূল কথাই হল ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৬৪৭ সালে ক্রমওয়েলের ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে পিউরিটানগণ গণবিপ্লবের স্বীকৃতি হিসেবে শাসনতন্ত্রে নিজেদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে। ১৬৭২ সালে ডিক্লারেশন অব ইনডালজেন্স এর মাধ্যমে দ্বিতীয় চার্লসের সময় ইংল্যান্ডে ধর্মনিরপেক্ষতা যথার্থ স্বীকৃতি লাভ করে। হল্যান্ডে ১৬১৪ খ্রস্টাব্দে হিউগ্লেটিয়াস ঘোষণা করেন যে, শুধু রাষ্ট্রীয় আদর্শেই নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ধর্মের বিকৃতি এবং অভিশাপ এই উপমহাদেশেও আমরা কম প্রত্যক্ষ করিনি। ধর্মের নামে ব্রিটিশ ভরতে হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে হত্যা করেছে, শোষণ করেছে। ফলে ধর্মীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারতের স্বাধীনতা আসে-সৃষ্টি হয় পাকিস্তান এবং ভারত। আদর্শগতভাবে স্বাধীনতা উত্তর ভারতে নেতৃবৃন্দ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন কিন্তু শাসনতন্ত্রে এর স্থান হয় ১৯৭৬ সালে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ভারতে পুরোপুরি অনুসৃত না হলেও সাংবিধানিক স্বীকৃতির যে একটি পৃথক শক্তি আছে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। একজন নাগরিকের পক্ষে এই সাংবিধানিক স্বীকৃতিই তার সবচেয়ে বড় শক্তি, নিরাপত্তার মহৎ উৎস। কিন্তু সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তান একটি সম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, যে ধর্মীয় নিরাপত্তাকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের মূল কথা বলে বাহ্যিকভাবেও দৃশ্যত ঘোষণা করা হয়, মুসলমান -মুসলমান হানাহানিতে সেই তত্ত্বের ভিত্তিমূল চুরমার হয়ে যায়। আবার প্রমাণিত হয়, ধর্ম সংস্কৃতির একটি অঙ্গ মাত্র, ধর্মই সংস্কৃতির সব কথা নয়। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এ যুগে অচল। একটি রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণে ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ভূমিকা ব্যাপক। এসব কথা

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ভাবা হয়নি বলেই পরবর্তীকালে হিন্দুতে মুসলামানে নয় -মুসলমানই ত্রিশ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে- দুই লক্ষ মুসলিম নারীর ইজ্জত নষ্ট করেছে। অর্থনৈতিক সমতা ও সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধাবোধকে অস্বীকার করবার এবং ধর্মকে স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে প্রাধান্য দেবার পরিণাম এ রকমই হয়ে থাকে।

ধর্মনিরপেক্ষতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধু যে একাধিক ধর্ম যেসব গণতান্ত্রিক দেশে আছে সেখানেই ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তা নয়- এক ধর্মবিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতার মর্যাদা স্বীকৃত। গণতান্ত্রিক ইতালীতে রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যা শতকরা ৯৯.৫ জন। ১৯৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই ধর্মই রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদায় ছিল। কিন্তু তারপর থেকে দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ, যদিও খ্রিস্টায়্যান ডেমোক্র্যাটি দল সমাজবাদী দলের সমর্থনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। অনুরূপভাবে আয়ারল্যান্ড একটি গণতান্ত্রিক দেশ -শতকরা ৯৪ জন অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক এবং অবশিষ্ট ৬ জনের কোন ধর্মীয় একক অস্বিত্ব নেই। কিন্তু ১৯৭২ সালে গণভোটের মাধ্যমে চার্চের ক্ষমতা বাতিল করে দেশটিকে ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ণ মর্যাদায় নিয়ে আসা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ধর্মকে নয় ধর্মের বিকৃতিকে ভয় করি। ধর্মের বাড়াবাড়ি থেকে বিকৃতির জন্ম হয়। এ কারণেই অনেক মনীষী ধর্মরূপ সর্পকে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বলেছেন। তাঁদের এই ' যুক্তি জোরালো এবং তীব্র। ব্যক্তিগত জীবনে থাকুক, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মকে প্রশয় দিলে আমাদের সাংঘাতিক অকল্যাণ হবে। যুগের পর যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেও যদি আমাদের এই শিক্ষা না হয়ে থাকে তবে তার মতো হঠকারিতা আর কিছু হতে পারে না।

ধর্মান্ধাতাকে ভয় করি কেননা বাংলাদেশের আবির্ভাবে বাধা দিয়েছেন অনেক ধর্মান্ধ ধর্ম, দার্শনিক। তাঁরা বাংলাদেশকে বাঙালি জাতীয়তাবদকে কতটুকু শ্রদ্ধা করতে পারবেন, সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ধর্মের বিকৃতি যদি সর্প হয়, তাহলে এঁরা সেই সর্পের বিষফণা। যুগে যুগে এ অভিজ্ঞতা থেকেই ধর্মের অভিশাপ সম্পর্কে মানুষ সজাগ হয়েছে, পরমতসহিষ্ণুতা গড়ে তুলেছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা তাই মানব সভ্যতার একটি সোনার ফসল।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জন্য যে সংবিধান বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত হয়, সেখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চারটি মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম বলে স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ না করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কোন ধর্মকে বড় বা ছোট করার জন্য নয়, বরং সকল ধর্ম যেন সমান শ্রদ্ধার সাথে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে আচরিত হতে পারে সে জন্যই এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চোখে সকল ধর্মই শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোন বিশেষ ধর্মের বাড়াবাড়ি বন্ধ করে পরমসহিষ্ণুতার আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

মানব কল্যাণ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অপরিসীম। মানব জীবনে শৈশবে ও কৈশোরে যে সমস্ত শিক্ষা মনের ভেতরে গাঁথা হয়ে যায় তার প্রভাব পরিণত বয়সেও অক্ষুন্ন থাকে। এ কারণে জীবনের ও জগতের মহৎ গুণাবলির শিক্ষা শিশু ও কিশোর কালেই হওয়া উচিত। আমাদের দেশে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে এবং মূল্যবোধে ধস নামার ফলে সমাজে যে সব বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসের বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে শিশু-কিশোরদের মহৎ মানবিক গুণাবলির ও আদর্শের আলোকে শিক্ষা প্রদান না করা। শৈশবে যদি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যায়, যদি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা যায়, তাহলে যৌবনে পদার্পণ করে তারা আর ধর্মান্ধতার শিকারে পরিণত হবে না। ধর্মের নামে মানুষের রগ কাটা, গলা কাটা ইত্যাদি নির্মম ও অমানবিক বর্বরতা থেকে তাহলে তারা দূরে থাকবে। শৈশবজীবনে এক ধার্মিক শিক্ষা সুফলের চেয়ে বয়ে আনে কুফল, যদি কেবলি বলা হয় যে এই একটি ধর্মই সত্য, অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা, তাহলে অপর ধর্মগুলোর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। সে জন্য আমাদের মক্তব, মাদ্রাসা বা অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য ধর্মের প্রতি

অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা যেন না জন্মায়, সেভাবেই পাঠক্রম প্রণীত হওয়া উচিত এবং শিক্ষকদের সতর্কতা অবলম্বন করা একান্তভাবে বাঞ্চনীয়। এক-ধার্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করবার কথা আমরা বলছি না তা সম্ভবও নয়। কিন্তু এইসব শিক্ষালয়ে এমন ব্যবস্থা অবশ্যই প্রচলিত করতে হবে যেন পবিত্র কুরআনের মহৎ বাণী 'তোমার জন্য তোমার ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম', এই শিক্ষাটিকে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করবার উপায় অবলম্বন করা হয়। শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষা দিতে হবে, যেন ধর্মের নামে মানুষকে ছোট না করা হয়, যেন ধর্মের কারণে অন্য ধর্মের লোক লাঞ্চিত না হয়। এই শিক্ষা আজ সর্বত্র, বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যে শিক্ষায় মানব কল্যাণের আদর্শের প্রতিফলন ঘটে এবং ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলোতে পরধর্ম সহিষ্ণুতার একটা শক্তিশালী প্রত্যয় গড়ে উঠে।

৬. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সংবিধানঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারত

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি আধুনিক আদর্শ হিসেবে বর্তমান কালে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। একটি মতাদর্শ হিসেবে আধুনিক ও প্রগতিশীল বলেই এক শ্রেণীর নিকট এর সুনাম। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এ আধুনিক সংস্কার প্রায় আড়াই শত বছর পূর্বে ইউরোপে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পনের শতাব্দীতে এর জন্ম হয় এবং আড়াই শত বছর সংগ্রামের পর আঠার শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা বিজয়ী মতাদর্শ হিসেবে প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পর্যায়ক্রমে ক্রমবিকাশ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারত।

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কোন ধর্মকে সরকারি ধর্ম বলে ঘোষণা করা হয় না। বরং বলা হয় ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে থাকতে হবে নিরপেক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানে সকল ধর্মের স্বাধীনতা দেয়া আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই স্বাধীনতা কোন চূড়ান্ত অর্থে স্বাধীনতা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একাধিক মামলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেন্দ্র করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের ছয় ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় চাকরীর যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কারও কাছ থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রশ্নের উত্তর চাওয়া চলবে না। ১৯৬১ সালে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা আসে। মামলাকারী অভিযোগ করেন যে, আমেরিকার মেরিল্যান্ড রাষ্ট্রে সরকারি চাকরিতে যোগ দেবার সময় বিধাতার নামে শপথ নিতে হয়। এর ফলে যাঁরা কোন ধর্ম মতে বিশ্বাস করে না এবং মনে করেন, মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য কোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই তাঁদের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই প্রথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থী। আদালত মামলাকারীর পক্ষে রায় দেন। ফলে এ ধরনের শপথ নেওয়া প্রথার বিষয়ে আবসান ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সরকারি স্কুলে ক্লাশ আরম্ভ হবার পূর্বে প্রার্থনা করা হত। ১৯৬২ সালে একজন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন যে, এ ধরণের প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ মার্কিন সংবিধানের পরিপন্থী। পরবর্তীতে তিনি মামলায় জয়লাভ করেন। ফলে সরকারি স্কুলগুলোতে প্রার্থনা করা ও বাইবেল পাঠ উঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমেরিকার আদালতের রায় অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ দাঁড়িয়েছে ব্যাপক, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কেবল ধর্ম বিশ্বাসীদের স্বাধীনতা নয়, ধর্ম অবিশ্বাসীদেরও স্বাধীনতা। যদি না, এই স্বাধীনতা জননিরাপত্তার ও সাধারণ নৈতিক বিধির পরিপন্থী হয়।[৩১]

২. ফ্রান্স

ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে গীর্জা'র সমস্ত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া হয় এবং যাজকদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় রাষ্ট্র থেকে। এর ফলে ফ্রান্সের ক্যাথলিক চার্চ হয়ে পড়ে ফরাসী রাষ্ট্রের অধিন, পোপের ক্ষমতা প্রায় লোপ পায়। কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের যোগ ঘুচে যায় না। ক্যাথলিকবাদ ফ্রান্সের সরকারি ধর্ম হয়েই থাকে। ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। ফ্রান্সের র‍্যাডিক্যালরা এ সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময়ে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মরিস রুভিয়ে। ফরাসি র‍্যাডিক্যালরা ছিলেন ভয়ঙ্করভাবে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করবার পেছনে তাঁদের যুক্তি ছিলঃ রাষ্ট্রের টাকা ধর্মের পেছনে ব্যয় না করে জনহিতকর কাজে ব্যয় করা উচিত। রাষ্ট্র কর্তৃক কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে সমর্থন করার অর্থ অন্যদের রাষ্ট্রীয় সমর্থন থেকে বঞ্চিত করা। তাঁদের আপন মত প্রচারের সমান সুযোগ না দেওয়া অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা। ফরাসী দেশের রাষ্ট্রীয় দমনের মূলনীতি হচ্ছে তিনটি ঃসমতা, সখ্যতা ও স্বাধীনতা। এই নীতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হলে রাষ্ট্র কোন একটা বিশেষ ধর্মমতকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারে না, কোন একটি বিশেষ ধর্মমতকে সরকারি ধর্মমত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। ফ্রান্স এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু ক্যাথলিকবাদ ফরাসী জীবনে এখনও গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। তা তার সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে নানাভাবে। অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি পারিবারিক ব্যাপারে রাষ্ট্রিক আইনই এখন কার্যকর, ধর্মীয় আইন নয়।

৩. ভারত

ভারতের ইতিহাস আমাদের সবার কাছেই বিশেষভাবে পরিচিত। রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সুবাদে ভারতের মানুষ এবং ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গর্ব প্রকাশ করে থাকে। এ গর্ব এবং অহংকার সম্পূর্ন যুক্তিহীন নয়। কারণ ভারতের চারিদিকে অনেক রাষ্ট্রই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্তে ধর্মরাষ্টেই গড়ে উঠেছে। সেসব দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা সাংবিধানিক এবং প্রকাশ্য রূপেই একটি বিশেষ ধর্মের উপর অধিষ্ঠিত। সে ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ আর ধর্মগুরুদের ভাষ্য ও নির্দেশমালা অনুযায়ীই রাষ্ট্রের সংবিধান, আইন ও শাসনব্যবস্থা তথা বিদেশনীতি নির্মিত ও পরিচালিত হবে। এ আদর্শই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি স্বরূপ। এ ধরনের ধর্মরাষ্ট্রকে মৌলবাদী আখ্যা দেওয়া অসংগত নয়। ভারতের এই ভৌগোলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার পক্ষেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৩২] স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা শেষ হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর। এই সংবিধানে জনসাধারণকে অনেকগুলি মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনাতা একটি এবং বলা হয়েছে, রাষ্ট্র হিসেবে ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকারের সাথে সাথে বলা হয়েছে যে, এই স্বাধীনতা জননিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিক চেতনার পরিপন্থী হতে পারে না। আমেরিকার সাথে ভারতের সংবিধানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভারতীয় পার্লামেন্টের উপর কোন প্রাধান্য নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইন সভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করতে পারে না। তাই যে কোন বিষয় ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের আইনগত মূল্যকে খুব বেশি বলা যায় না। ভারতীয় সাংবিধানের ম্যাধমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও হিন্দু-মুসলিম বিভাজন ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সমস্যা কিছুটা থেকেই যায়। আর সে কারণেই রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের সংবিধানে অনেক বৎসর পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কোনও উল্লেখ ছিল না। যদিও সরকারি নীতিতে এ আদর্শ ঘোষণা করা হত এবং সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে ধর্মের কারণে রাষ্ট্রীয় নীতিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকার সময়ে ১৯৭৬ সালে সর্ব প্রথম ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মুখবন্ধে ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়।[৩৩]

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত কি পরিমাণ ধর্মনিরপেক্ষতা হতে পেরেছে, সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। ভারতের রাষ্ট্রিক আইন ধর্মীয় কারণে এখনও সব নাগরিকের জন্য একরকম হতে পারছে না। উদহরণ, ভারতে উত্তরাধিকার আইন প্রনয়নে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসৃত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানের জন্য এক আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া বিবাহ ও পরিবার প্রথা সম্পর্কেও এক আইন প্রণয়ন করা যায়নি। ভারতে হিন্দুরা এখন আর বহুবিবাহ করতে পারেন না। কিন্তু মুসলমানরা পারেন।

ভারতবর্ষে বাঙালি ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান তার 'মুক্তবুদ্ধি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল 'বইয়ে বলেনঃ বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন এই ঐতিহাসিক বিকাশ সমাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধেয়। পাশ্চাত্যের সেকুলারিজম ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং মধ্যযুগের ইউরোপের তীব্র ধর্মীয় হানাহানি ও ধর্মযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে ফলে রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব-রিফর্মেশন-আলোকায়নের প্রজনন জাতি রাষ্ট্রের ধর্মই হয়ে ওঠে- আমরা যাকে বলি, ধর্মনিরপেক্ষতা বা পাশ্চাত্য অভিধায় '*সেকুলারিজম*'। এই সেকুলারিজমের সৃষ্টিতে দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তক মিল, কোঁত, রুশো, ভলটেয়ারের অবদান অনেক বড়। তাঁদের প্রভাবে শিক্ষিত নগরবাসী বাঙালিদের মধ্যে আলোকায়নের কিছু স্পর্শ লাগলেও গোটা দেশ জুড়ে সমন্বিত জাতীয় সাংস্কৃতিক সত্তা নির্মাণে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক, নাথযোগী, বাউল-সুফি কবিয়াল-বয়াতিদের ভূমিকাই প্রধান। পাশ্চাত্য সেকুলারিজম তাই বস্তুতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী আর আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা হৃদয় সংবেদী। বাঙালির আত্মিক বিকাশের সঙ্গে এর ওতপ্রোত সংযোগ। বলা চলে, বাঙালি জাতিসত্তাই গড়ে ওঠছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আশ্রায় করে।

ফলে, যে দেশজ চিন্তা-চেতনা ও দর্শনে বাঙালিত্ব বা দেশগতসত্তা তার ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতায়; অন্যকথায় ধর্মনিরপেক্ষ না হলে সত্যিকার অর্থে বাঙালি হওয়া সম্ভব নয়।[৩৪]

কারণ ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এখানে বহু ধর্মের মানুষের বাস। বিশেষত জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ তার রাষ্ট্রীয় নীতিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে কোনও বৈষম্য নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত বারে বারে ঘটেছে। এ ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক কলুষ থেকে আজও সম্পুর্ণ মুক্ত হতে পারিনি। ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় আদর্শ সংবিধানে গৃহীত হবার পরেও নয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মধ্যযুগীয় ভারতে তুর্কি-আফগান এবং মুঘল শাসনের সময়ে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রায় ছিল না বললেই চলে।

১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা অক্ষুণ্ন ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় যে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তার মধ্য থেকেই কয়েকজন প্রধান চরিত্রের মুখে এবং লেখনীতে সর্ব প্রথম হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের দুটি আলাদা জাতি রূপে চিহ্নিত করা হয়। তারপর রাজনৈতিক সংস্কারের নামে কার্যত ব্রিটিশ সরকারের কয়েকটি আইনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনকে রাজনৈতিক স্তরে প্রসারিত করা হয়। একই সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয়তার অনুপ্রবেশ মুসলিম জনগণকে বিরূপ করে তোলে। আবার ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লীগের রাজনীতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এভাবেই এদেশে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। যার পরিণতি দেশভাগ এবং পাকিস্তানের জন্ম।

ইংরেজি সেকিউলারিজম শব্দটির ভারতীয় প্রতিশব্দ হিসেবেই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি এদেশের সংবিধানে এবং রাষ্ট্রনীতিতে ব্যহৃত হয়ে আসছে। চৌদ্দ শতক থেকে ষোলো শতকে ইউরোপের নবজাগরণ এবং আঠারো শতকে জ্ঞানবাদী আন্দোলনের মধ্যে থেকে সেকিউলারিজম শব্দটি উঠে এসেছিল। তখন সেকিউলারিজম ছিল ধর্মের বিপরীতার্থক। অর্থাৎ যা কিছু জাগতিক, যা কিছু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত, অতএব ধর্মের সঙ্গে অসম্পৃক্ত বস্তুজগৎ সংক্রান্ত, তাই সেকিউলার। এখনও পাশ্চাত্য দুনিয়ায় এবং বর্তমান ও পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সেকিউলারিজমের এই সংজ্ঞাই প্রচলিত আছে। এদিক থেকে বিচার করলে সেকিউলারিজম শব্দের প্রকৃত অনুবাদ হওয়া উচিত ধর্মহীন বা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি এদেশে বহুল প্রচলিত বলে ইচ্ছে করলে এটিকে ভারতীয় ভাষায় রেখে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রকৃত অর্থ সর্বদা মনে না রাখলে অনর্থ হবার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে সেকিউলারিজমের অর্থ বলা হয়েছে ধর্মের বিপরীত।

একথা মনে করলেও ভুল হবে যে, ধর্মহীনতা বা ধর্মে উদাসীনতা অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বিদেশ থেকে আমদানি করা এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থী এদেশের সুপ্রাচীন লোকায়ত দর্শন, আদি সংখ্যা, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এহেন ধর্মহীনতা এবং জগৎ ও জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটেছিল। তাছাড়া ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয়, মৈত্রয়ানী প্রভৃতি কয়েকটি উপনিষদে, এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের কয়েটি অংশ বস্তুবাদী এবং ইহজাগতিক ধর্মহীন চিন্তাধারাই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ভারতের নাট্যশাস্ত্র এবং চরক ও সুশ্রুতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মহাগ্রন্থগুলিতেও ধর্মচিন্তার পরিবর্তে মানুষের জাগতিক জীবনের বৌদ্ধিক ও নান্দনিক বিকাশের আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত। ধর্মহীনতা বা ধর্মে উদাসীনতার আদর্শ এ দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে যে সেকুলারিজম শব্দটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ রূপে বর্তমানে খোদিত আছে, তার প্রকৃত অর্থ সরকারি ভাষ্যে বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা, সেটিই মূল প্রশ্ন ! এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ ইতিবাচক উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

এদিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু ভারতের সংবিধানে তথা সরকারি নীতি ও কার্যক্রমে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারমালার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৫ ধারা অনুযায়ী ধর্মের কারণে রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সংবিধান এখানেই থেমে থাকেনি। ২৫ (১) ধারায় ধর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে এবং কার্যত ব্যক্তি মানুষের এবং ধর্মগোষ্ঠীর ধর্মাচরণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের ধর্ম ঘোষণা, আচরণ এবং প্রচার করার সমান অধিকার আছে। ২৬ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি নামধারী ধর্মগোষ্ঠীরই অধিকার আছে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করবার, এবং নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করবার, নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবার এবং এ উদ্দেশ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, অধিগ্রহণ এবং পরিচালনা করবার। বলাবাহুল্য, মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচরণকে উৎসাহিত করবার উদেশ্যই এসব সাংবিধানিক ধারা রচনা এবং বলবৎ করা হয়েছে। আর এসব ধারার সাহায্যেই হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী দল ও সংগঠনগুলি ধর্মন্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। এভাবে ভারতীয় সংবিধান এবং সরকারি নীতি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে বেশ কিছুটা বিচ্যুত হয়েছে। সংবিধান এবং আইন ব্যবস্থা ধর্মাসুরদের বাধা দিতে পারনি। কার্যতঃ তাদের অসাধু উদ্দেশ্য সাধাণের সহায়ক হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মাচার এবং ধর্মীয় বিভাজনকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে রচিত সংবিধানের ২৫ (১) এবং ২৬ ধারা দুটি না থাকলেও শুধুমাত্র ১৪ এবং ১৫ ধারার সাহায্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের রূপায়ন সম্ভব হত। কারণ ১৪ ধারার আইনের চোখে সব নাগরিকের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে, আর ১৫ ধারায় ধর্মের কারণে কোনও নাগরিকের প্রতি বৈষম্যনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে সংবিধানের রচয়িতারা স্পষ্টই সম্প্রদায়গত এবং গোষ্ঠীগত ধর্মাচরণকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন, আর সে কারণেই সেকুলারিজম শব্দটি কিংবা তার কোনও প্রতিশব্দকে সংবিধানে স্থান দেননি। অনেক বৎসর পরে শুধুমাত্র সংবিধানের মুখবন্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শব্দটি যোগ করা হলেও ২৫(১) এবং ২৫ ধারায় কোনও সংশোধন করা হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মের ব্যাপক অনুপ্রবেশ এবং দেশভাগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবসব ধারার হয়তো বা কিছুটা প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে শুধুমাত্র সংবিধানের মুখবন্ধে ভারতকে সেকিউলার এবং সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেও পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যর্থ হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী রচিত ভারতীয় আইন ব্যবস্থায়ও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সম্পূর্ন প্রতিফলিত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বিবাহ সম্পত্তির উত্তারাধিকার নারীর সামাজিক অধিকার প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভন্ন ধর্মীয় মানুষের জন্য ধর্মভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রচলিত আছে। এর ফলে ভারতের আইন এবং বিচার ব্যবস্থায় সর্বজনীন দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে অনেকটাই সংকুচিত রয়ে গেছে। আর এভাবে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকেও ভারত অনেকটা বিচ্যুত হয়েছে। আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে আইন ব্যবস্থা কিছুটা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ, সংবিধানের ১৫(৪) এবং ১৬ (৪) ধারায় পিছিয়ে পড়া শ্রেণিদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে যে সংরক্ষণের অধিকার আছে, সরকারি নীতিতে এবং আইনে তা শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যই প্রয়োগ করা হয়। পিছিয়ে পড়া মুসলিম বা খ্রিস্টানদের জন্য নয়। তেমনিভাবে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ মুসিলদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেরকম অনুদানের কোনও বিধি নেই। আবার অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের জন্য আয়কর আইনে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা অন্য ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রে নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এ জাতীয় আইনি বৈষম্য সংবিধানের ১৫ ধারার পরিপন্থী।

প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংবিধানে অবশ্যই এই আদর্শ পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধারা-উপধারা সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে শুধুমাত্র সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ খোদিত থাকলেই বাস্তবে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার রূপায়িত নাও হতে পারে। কারণ রাষ্ট্র কোনও নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা সরকার পরিচালনা করলেও তাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনদর্শন এবং রাজনৈতিক আচরণ সরকারি নীতি ও কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অতএব শাসকগোষ্ঠী যদি কার্যক্ষেত্রে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস বা শঠতার আশ্রয় নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী আচরণ করেন, তবে সরকার এবং রাষ্ট্রের লোকব্যবহারে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়।

যেসব মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তি আসল ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মনামে সরাসরি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে, আর তথাকথিত রাম জন্মভূমি অথবা রামসেতুর পৌরাণিক কল্পনাকে ভিত্তি করে রাজনীতিতে ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, তারা যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যে সব রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিত্ব তাত্ত্বিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা হলেও ব্যক্তিগত বা দলীয় রাজনীতিতে ধর্মীয়তাকে আশ্রয় করেন, তারাও পরোক্ষ ভাবে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রূপায়ণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকেন। একমাত্র জওহরলাল নেহেরু ছাড়া ভারতের আর সব প্রধানমন্ত্রীই শুধু শাস্ত্রসমম্মত ধর্মাচরণ করেছেন, তাই নয়। তাদের সেই ধর্মচরণকে সব রকম সাংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে সক্রিয়ভাবে প্রচার করেছেন। তারা আগে থেকে টেলিভিশন ক্যামেরা এবং প্রচারের সুবন্দোবস্ত করে যত্রতত্র মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়েছেন, অগণিত গুরু-বাবা প্রভৃতির পায়ে ষষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করেছেন, নিজ মস্তকে তাদের পথ ধারণ করেছেন। এদেশর প্রায় সব রাষ্ট্রপতিও একই রকম প্রকাশ্য এবং প্রচারমুখী ধর্মাচারণ করে এসেছেন।

রাজনৈতিক এবং সরকারি ব্যক্তিত্বদের ধর্মাচারণ অনিবার্যভাবেই সরকারি নীতিতে ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং তারা বাবা-গুরু প্রভৃতিদের উচ্চ রাজনৈতিক স্তরে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর জমানায় তারই প্রশ্রয়পুষ্ট ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য সকলেরই একই চিন্তা নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে তার ধর্মগুরু চন্দ্রস্বামীর রাজনৈতিক উত্থান, সরকারি নীতিতে হস্তক্ষেপ, এবং অসাধু কার্যকলাপও সাম্প্রতিক ইতিহাস।

সে দেশের মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা, বিভিন্ন স্তরের ন্যায়ালয়ের বিচারক এবং সংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত অনেক মহাজন কর্তাব্যক্তি যে প্রতি পদক্ষেপে নিয়মিত অসংখ্যা বাবা-গুরু এবং জ্যোতিষীর পরামর্শ মেনে চলেন, সে বাস্তব সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। পরিস্থিতিতে এটা মোটেই আশ্চার্যের বিষয় নয় যে নরসিংহ রাওয়ের মতো একজন গোড়া হিন্দু প্রধানমন্ত্রী বাবরি মসজিদকে রক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং হিন্দু মৌলবাদীরা মসজিদ ভেঙে ফেলার পর তিনি তা পুনর্নির্মাণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক রামজন্মভূমির মতো বাবরি মসজিদ নামটিও অর্থহীন, কারণ বাবরের নির্দেশে অযোধ্যায় কোনও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এমন কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। আর বাবর কর্তৃক কোনও মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মানের তো কথাই নেই।

অবশ্য রাজনীতিবিদেরা যে সব সময় নিজস্ব ধর্মান্ধতার কারণে প্রচারধর্মী ধর্মাচরণ করে থাকেন, তা নয়। অনেক সময় ব্যক্তিমানুষের অনিরাপত্তা বোধ থেকে জন্মানো জনগণের ধর্মবিশ্বাসে সুড়সুড়ি দিয়ে অসাধু রাজনীতিকও বোঝাবার চেষ্টা করেন। আর এভাবে তারা জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে নির্বাচনী ফায়দা লোটার চেষ্টা করেন। বোধ হয় সে কারণেই ইন্দিরা গান্ধী তার রাজনৈতিক জীবনে নানাবিধ কাজ করা সত্ত্বেও, আর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিরন্তর ঘোষণা করলেও, পথেঘাটে মন্দিরে সর্বদা দেবার্চনা করতেন। আর সম্ভবত সে কারণেই রাজীব গান্ধী আযোধ্যায় বাবরি মসজিদের কাছে রামমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, আর সে উপলক্ষ্যে

'জয়ংশ্রী রাম' ধ্বনি দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের এ ধরনের প্রচারধর্মী এবং অভীষ্টলোভী ধর্মাচারণের অসংখ্য ঘটনা এদেশে প্রতিদিন ঘটছে।

কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সরকারের কর্ণধারেরা সত্যিকারের ব্যক্তিগত ধর্মান্ধতা থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছেন, নাকি নিজেরা ধর্মহীন হয়েও ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে জেনে শুনে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন, সে প্রশ্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে অবান্তর। উভয় ধরনের ধর্মান্ধ রাজনীতিই ধর্মানিরপেক্ষতার আদর্শকে প্রতিহত করে, এবং সংবিধানে ঘোষিত ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিকৃত ও কলুষিত করে তোলে। সরকারি নীতি ও কার্যক্রমও এই বিকৃতির অনিবার্য প্রভাব পড়ে। যেহেতু ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে, আর স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের সরকারি নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার চলছে, অতএব, ভারত যে, একেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ নয় একথা বলা যায় না। কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে এ সত্যও বেরিয়ে আসে যে ভারত সংবিধানে সরকারি নীতিতে অথবা সমাজজীবনে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নানাবিধ কর্মপন্থার চর্চা করছে এটুকুও কম নয়।

তথ্যনির্দেশঃ

১. মুহম্মদ শাকের আশ-শরীফ, অনুবাদঃ সানাউল্লাহ নজির আহমদ, সম্পাদনাঃ ড. আবু বকর মুহম্মদ যাকারিয়া, *'ধর্মনিরপেক্ষতা ও তার কুফল'*, পৃষ্ঠা-৫।

২. 'দুনিয়াবিমুখিতা' বা সংসারবিরাগী খ্রিস্টধর্মে একটি ইবাদতগত বিষয়। খৃস্টানগণ এ বিদআতটি আবিস্কার করেছে। সুতরাং যখন তারা বলে, সেকুলার অর্থ, সংসারবিরাগী নয় তখন তারা এর দ্বারা অর্থ নেয় যে, সে ইবাদতকারী নয়। মুসলিমরা মনে করে যে, সংসারবিরাগী হওয়া বিদআত। কিন্তু খৃস্টানরা এটাকে বিদআত মনে করে না। তারা এটাকে তাদের সত্যিকারের দ্বীন মনে করে। সুতরাং যখন কেউ বলবে যে, অমুক সংসার বিরাগী নয় তখন সে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয় যে, লোকটি ইবাদতের ধার ধারে না। বিদআত করে না এ অর্থ উদ্দেশ্য নেয় না।

৩. নাস্তিকতার উপর আভিধানিক বিশ্লেষণ ড. মুহম্মদ যায়ন-আল-হাদি রচিত সেকুলারিজম এর উৎপত্তি গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. Secularism and Secularityt Contemporary International Perspectives' Edited by Barry A. Kosmin and Ariela Keysar. Hartford, CTt Institute for the Study of Secularism in Society and Culture, 2007

৫. Yavuz, Hakan M, and John L. Esposio (2003) `Turkish Islam and the Secular Statet The Gulen Movement' Syracuse University. pg. xv-xvii.

৬. The New Encyclopedia Britannica. 15th Edn. 2002. Vol-X. P. 594. সেখানে আরো বলা হয়েছে The movement toward Secularism has been in progress during the entire course of modern history and has often been viewed as being anti Christian and anti religious.

৭. Cambridge Advanced Learner's Dictionary Second Edition, Cambridge University press, Secularism P. 1146

৮. A. S. Hornby. Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University press. 2002) P. 1155

৯. A. S. Hornby. Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University press. 2002) P. 1156

১০. অন্নদাশঙ্কর রায়ের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ *সেকুলার স্টেট*, পৃষ্ঠা-১৩৪

১১. সূরা নূর, ২০০৬ঃ১০৭।

১২. প্রাগুক্ত

১৩. ইসহাক, ২২১ঃ সিদ্দীকি ২০০৪ঃ২০

১৪. সিদ্দীকি, ২০০৪ঃ২২

১৫. প্রাগুক্ত, ২০০৪ঃ৩৫

১৬. প্রাগুক্ত, ২০০৪ঃ৩৮

১৭. কাদের, আহমেদ আব্দুল, *মহানবী (সঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ ঃ আজকের প্রেক্ষিত*, সীরাতুন্নবী (স.) স্মারক ১৩২০-১৪২০ হিজরী জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ১৮৮-১৯২

১৮. কাদের, পূবোক্ত পৃষ্ঠা ১৯২

১৯. আল কুরআন, ৫ঃ ৩

২০. কাদের, পূবোক্ত পৃ. ১৯২

২১. আল-কুরআন, ৯ঃ১২২

২২. অনুপসসাদি সম্পাদিত, *বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ*, কথা প্রকাশ, একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি - ২০১২, পৃ. ৫৮

২৩. আহমদ শরীফ, *মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, সন্দেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, জুলাই, ২০০৪ পৃ. ১৪২

২৪. প্রাগুক্ত, অনুপসাদি সম্পাদিত, *বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ*, পৃ. ৫৮
২৫. প্রাগুক্ত, অনুপসাদি সম্পাদিত, *বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ*, পৃ. ৭৪
২৬. অনুপসাদি সম্পদিত, বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতারবাদ, পৃ. ৫৭
২৭. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *ধর্ম ও প্রগতি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা., লি., কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর - ২০০৮, পৃ. ১৪৩
২৮. আহমদ শরীফ, *মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, সন্দেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, জুলাই, ২০০৪, পৃ. ১৪৩।
২৯. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ধর্ম ও প্রগতি, পূর্বোক্ত
৩০. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, কার্জন হল, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর-১৯৪৮, সভাপতির ভাষণ
৩১. ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-নিরোপেক্ষ রাষ্ট্র,
DHARMANIRAPEKKHATH A symposium on Secularism. Ali Anwar, Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. November t 1973, Page No. 64.
৩২. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্ম ও প্রগতি*, ২য় সংস্কারণ, পৃ. ১৪০
৩৩. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্ম ও প্রগতি*, ২য় সংস্কারণ, পৃ. ১৪১
৩৪. শামসুজ্জামান খান, *মুক্তবুদ্ধি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল*, (ঢাকা, মনন প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০), পৃ. ২৬

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালির চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার ক্রমবিকাশের ধারা

পৃ. ৫৫-৮৪

ক. ব্রিটিশ শাসিত বাঙলার রেনেসাঁস ও হিন্দু সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা
রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ

খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সন্ধানে মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দ
মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, কাজী ইমদাদুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস. ওয়াজেদ আলি, কাজী মোতাহার হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ

.

ক. ব্রিটিশ শাসিত বাঙলার রেনেসাঁস ও হিন্দু সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা

আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম প্রতিফলিত হয় বাঙলাতেই। এই প্রভাবের ফলে বাঙলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয় ইতিহাসে তা বাঙলার রেনেসাঁস নামেই পরিচিত। পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতনতার ব্যাপারে প্রায় একশ বছর ধরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাঙলা অনেক এগিয়ে ছিল। তাই ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে বাঙলার ভূমিকাকে তুলনা করা যায় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালির ভূমিকার সঙ্গে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাঙালির যে একটা বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, তা মূলত সামাজিক, ধর্মীয় সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক কাজ কর্মে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক ও সৃজনশীল প্রগতিকামী ভূমিকা অবলম্বন করার জন্যই। আজকের দিনে যখন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাথা তুলে দাড়াচ্ছে অনৈক্যের বিপদ, তখন আমাদের অতীত কীর্তিকে স্মরণ করা, বিভিন্ন সংগ্রাম ও সাফল্যের পর্যালোচনা করাটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে ওঠে। এইসব কীর্তি, সংগ্রাম ও সাফল্য আমাদের এক গৌরবময় ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছেন কিছু প্রতিষ্ঠান ও কীর্তিমান কতিপয় ব্যক্তি।

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঐক্য ও অনৈক্যের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দুধর্মের বিকাশের চূড়ান্ত পর্বে ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় যখন ইসলাম ধর্ম সম্প্রচারিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছিল গড়ে উঠেছিল নতুন 'মুসলমান সমাজ' তখনও এদেশে (বাঙলায়) বিদ্যমান ছিল বৌদ্ধ, জৈন ও উপজাতিসমূহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী। এই বহু ধর্মের অখণ্ড বাঙালি সমাজে সম্প্রদায়গত সহাবস্থান নীতি ছিল এক কথায় 'শান্তিপূর্ণ'। যার যার ধর্ম নিয়ে সে সে স্বতন্ত্র ধারায় জীবন যাপন করত। কিন্তু ইংরেজ আগমনের পর শিক্ষা বিস্তারের ফলে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক আর্থিক ও ধর্মীয় চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এটা ঘটে মূলত বাঙলার জাগরণের ফলে। আর এই জাগরণের পথিকৃত রাজা রামমোহন রায় ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যে যুক্তিবাদিতা চিন্তাচর্চার সূত্রপাত করেন তা থেকে ইহলৌকিকতার সৃষ্টি এবং ইহলৌকিক চিন্তাকে যারা গুরুত্ব দেন তারা 'ধর্মনিরপেক্ষ' হতে বাধ্য। একারণেই বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশের আলোচনায় প্রথমেই রামমোহন রায়-এর অবদান আলোচনা করতে হয়। তারই সূত্র ধরে যারা অগ্রসর হয়েছেন- যুক্তিবাদী ইহলৌকিক তথা ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারায় তাঁরা হলেন

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৭৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১), ইয়ং বেঙ্গল (১৮৩৩-৫৭), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-১৮৮৬), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রমুখ।

রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর লক্ষ্য ছিল দুটিঃ ক. ইহুদী, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মকেও সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী ধর্মে পরিণত করা এবং খ. খ্রিস্টান মিশনারীদের আগ্রাসন থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা। তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের বিরোধী ছিলেননা, তবে যে ধরনের ব্যাখার আশ্রয় নিয়ে হিন্দুদেরকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেয়া হতো তিনি তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। আরও উল্লেখ্য যে, রামমোহন রায় কোরআন, হাদিস, আর উপনিষদের শিক্ষায় বিশেষভাবে আলোকিত ছিলেন এবং তৎকালীন জেলা কালেক্টর ডিগবীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যের কারণে খ্রীষ্ট ধর্ম ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ফলে রামমোহনের চিন্তা- চেতনায় উদারতা ও যুক্তিবাদিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১]

যুক্তির বাইরে নির্বিচার ভক্তি বিশ্বাসের প্রতি রামমোহনের কোন আস্থা ছিল না। তিনি ধর্মের বিরোধী ছিলেন না বরং ধর্মই ছিল তাঁর দর্শনের মূল প্রেরণা। তবে তাঁর মতে ধর্ম কোন মন্ত্রের সাধনা কিংবা নিছক পরলোক চর্চা নয়। তাঁর ধর্ম সমস্ত কুসংস্কার রহিত এবং ধর্মের মূল ভিত্তি রচিত মুক্তবুদ্ধি ও দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের উপর। রামমোহন পৌত্তলিকতা বর্জন করতে চেয়েছেন এবং একেশ্বরবাদ যে হিন্দু শাস্ত্রসম্মত তা-ই-প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রচলিত শাস্ত্রবিধি যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয় তাহলে সেগুলোকে অমান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থেই রামমোহন ছিলেন যুক্তিবাদী, সত্যসন্ধানী ও মানবপ্রেমিক। রবীন্দ্রনাথের মতে, বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছেন রামমোহন রায়। তিনি আরও মনে করেন যে, আমরা সমস্ত বাঙালি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং তার নির্মিত ভবনে বাস করছি।

প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে রামমোহনের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী ধর্মনিষ্ঠদের প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক আক্রমণাত্মক। রামমোহনের নতুন মতবাদ সমূলে উচ্ছেদ করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও উপাসনা পদ্ধতিকে বজায় রাখার লক্ষ্যে অনেক খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলম ধরেন। রামমোহন এদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র্য প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। রামমোহন একদিকে যেমন প্রাচীনপন্থী ও গোঁড়া ধর্মনিষ্ঠদের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঠিক তেমনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন খ্রিস্টান মিশনারীদের সাথে আর একটি দ্বন্দ্বে।

যে প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্ব তা হলো, ঐশি সত্তার প্রকৃতি সংক্রান্ত। বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী হিন্দুদের মতোই ত্রি-তত্ত্ববাদী খ্রিস্টানদের কাছেও রামমোহনের আপোষহীন একেশ্বরবাদ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। ১৮২০ সালে রামমোহনের *The Precept of Jesust The Guid to Peace and Happiness* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুরে অবস্থিত ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরা তীব্র প্রতিবাদ করে রামমোহন সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেন। মিশনারীদের সমালোচনার জবাবে রামমোহন *Appeals to Christian Public* শিরোনামে বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। *The Concept of Trinity* বা ত্রিতত্ত্বের ধারণার বিরুদ্ধে রামমোহনের বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে ১৮২১ সালে মিশনারীদের অন্যতম উলিয়াম এ্যাডাম ত্রিতত্ত্ব বিরোধী *Unitarian Church* এর সদস্য হন।[২]

১৮১৫ সালে রামমোহন আত্মীয়সভা নামে একটি আলোচনা সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২১ সনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইউনিটারিয়ান কমিটি। এই কমিটির উপাসনায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী সকলেই যোগ দিতেন।[৩] এই কমিটি সমগ্র ভারতে একেশ্বরবাদ বিকাশে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এর পরে ১৮২৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। এ সমাজ প্রথমে ব্রাহ্মসভা নামে পরিচিত ছিলো। এ ব্রাহ্মসভা সকল ধর্মাবলম্বী একেশ্বরবাদীদের মিলনকেন্দ্র এবং অসাম্প্রদায়িক উপাসনার মঞ্চ হয়ে উঠেছিল।[৪] ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধী সংগঠন হিসাবে ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্ম-সভা। এই ধর্ম সভার সাথে জড়িত ছিলেন গোড়া হিন্দু ব্রাহ্মণগণ এবং এর নেতৃত্ব দেন রাধাকান্ত দেব।

রামমোহন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের যাবতীয় শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছিলেন বলেই এসব ধর্মের মধ্যে একটি ঐক্যমতের সন্ধান পান। তিনি উপলব্ধি করেন, সকল ধর্মের মূল আদর্শ মানবপ্রীতি, সত্যের সন্ধান এবং স্রস্টার আরাধনা। কিন্তু ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও ভিন্নভিন্ন আবহাওয়ার কারণে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক ও পদ্ধতি বিভিন্ন। তিনি মনে করেন, ধর্মের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রায় সব ধর্মেই পরবর্তী কালে নানা সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।[৫]

রামমোহনের দর্শন-চিন্তা, ধর্ম-চিন্তা ও সমাজ-চিন্তার মূলে ছিল মানবকল্যাণ। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিশ্বমানবিকতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন। কখনোই তিনি ধর্মকে কোন প্রকার অলৌকিক বিশ্বাসের আলোকে দেখেননি। বরং তিনি ধর্মকে মূল্যায়ন করেছেন বাস্তবতার নিরিখে। তাঁর ধর্ম দর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কারাদির মূলোৎপাটন করা এবং সকল প্রচলিত ধর্মের মধ্যে একটি সত্যিকারের সমন্বয় সাধন করে মানুষকে পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। অর্থাৎ বস্তনিষ্ঠভাবে প্রতিটি ধর্মের যৌক্তিক

বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ধর্মের কল্যাণকর দিক নিয়ে একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য এবং সবার কল্যাণ আনয়ন করতে পারে এরকম একটি সমন্বয়বাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্ম-চিন্তার প্রধান লক্ষ্য।

রামমোহনের সমাজ-সংস্কার-চিন্তার লক্ষ্য ছিল মূলত পাঁচটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই পাঁচটি কুপ্রথা হলোঃ ১. হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা, ২. অস্পৃশ্যতা, ৩. বহুবিবাহ, ৪. বাল্য বিবাহ এবং ৫. সতীদাহ প্রথা। এই পাঁচটি কুপ্রথার মধ্যে সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠে। সতীদাহ প্রথা অনুসারে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত আত্মহূতি দিতে হতো। বহুদিন ধরে হিন্দু সমাজে এরকম একটি অমানবিক লোকাচার চালু ছিল। রামমোহনের সামনে প্রশ্নঃ কীভাবে এই অমানবিক অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই তিনি দেখতে চাইলেন, সতীদাহ বা সহমরণের কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা ভিত্তি আছে কি-না। কিন্তু কোনো শাস্ত্র সতীদাহের পক্ষে তথ্য প্রমাণ না পেয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এটা লোকাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এইবার তিনি এই অমানবিক প্রথার বিলোপ সাধনের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হলেন এবং এর বিরুদ্ধে গড়ে তুললেন বিরাট সামাজিক ও আইনী আন্দোলন। রক্ষণশীলরাও থেমে থাকলো না। সতীদাহ প্রথা রক্ষার জন্য তারাও সামাজিক আন্দোলন শুরু করলো এবং কলমও ধরলো। কিন্তু রামমোহনের অকাট্য যুক্তি এবং শাস্ত্রের দলিল সম্বলিত লেখনীর সামনে তাদের চেষ্টা ব্যাহত হলো এবং ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিন এর এক আদেশ বলে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলো।[৬]

শুধু সতীদাহ প্রথাই নয় তৎকালীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত অন্যান্য কুপ্রথার মূল উচ্ছেদের লক্ষ্যে রামমোহন কলম ধরেন। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিনি জাতিভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, কন্যা বিক্রয় ও কৌলিণ্য প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। জাতিভেদ প্রথাকে তিনি হিন্দু অনৈক্যের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। নারীর উত্তরাধিকার আইন নিয়ে তিনি সোচ্চার ছিলেন। আর সে কারণেই তিনি সম্পত্তিতে হিন্দু নারীদের অধিকার নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন মৃত্যু বরণ করলে ব্রাহ্ম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থ-সাহায্যে এ সমাজ কোনভাবে টিকে ছিল। প্রায় এক দশক পরে দ্বারকানাথের পুত্র এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ১১ জন বন্ধুসহ ১৮৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। এখানে উল্লেখ্য, তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৩৯ সালে তত্ত্বরঞ্জনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪০ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় তত্ত্বাবোধিনী সভা। এ বছরই তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষার জন্য তত্ত্বাবোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৩ সালে অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন তত্ত্বাবোধনী পত্রিকা। দেবেন্দ্রনাথের সাথে অক্ষয় কুমার দত্ত ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং রাজা রামমোহনের আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিত্তশালী দ্বারকনাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। প্রগতিশীল ঠাকুর পরিবারের সন্তান হয়েও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রগাঢ় ধর্মানুভূতির অধিকারী ছিলেন। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিপুল ধন-সম্পদ ও বংশমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ তাঁর ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তিনি যে আত্মচরিত রচনা করেন তা বাংলা ধর্ম সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মহামূল্য গ্রন্থে তাঁর মানবজীবনের বিবর্তনের এক স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভাকে ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত করেন এবং একে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, হিন্দু ধর্ম, বিশেষত তাঁর সময়ে অনুসৃত হিন্দু সমাজের ধর্মপথ (দেবতার পূজা), যথার্থ নয়।[৭] সুতরাং তিনি হিন্দু

পথ পরিহার করলেন এবং এর পরিবর্তে চলার পথ হিসেবে অনুসরণ করেন রামমোহন নির্দেশিত পরমব্রহ্মের সাধনা। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশজন বন্ধুকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা-গ্রহণ করেন ব্রাহ্ম সমাজে।[৮]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন খ্রিস্টীয় পণ্ডিতের মতে, উপনিষদ বা বেদান্তে জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা কোন দয়াল পিতা পরমেশ্বরের কথা নেই। আবার জীবনের নৈতিক ব্যাপারেও এই শাস্ত্র নিশ্চুপ। উপনিষদে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে প্রেমের সম্পর্ক, তার কোন গুরুত্ব, এমন কি স্বীকৃতি নেই। বস্তুত, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেম উপনিষদের অন্তর্গত নয়। হিন্দু ধর্ম, বিশেষত উপনিষদ, সম্পর্কে এ জাতীয় সমালোচনা দারুণ অস্বস্তি সৃষ্টি করে তরুণ দেবেন্দ্রনাথের মনে। অতঃপর তিনি স্বস্তি পেলেন। গভীর নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ সহকারে বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, বেদ-উপনিষদে শুধু একেশ্বরবাদ নয়, বহু ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ সহ-অবস্থান করছে। এসব ব্যক্তিগত বিবেচনা এবং অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) পরামর্শে তাঁর মতান্তর ঘটে এবং উপনিষদ বা বেদান্ত ব্রাহ্মদের ভিত্তি এ মতও তিনি পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎস ও আকর বলে গ্রহণ করেন। এ পর্যায়েই তিনি বলেনঃ 'সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি, আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।'[৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, অক্ষয়কুমার প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ক্রমশ তিনি গতানুগতিক ধর্মের প্রতি আস্থাহীন এবং অজ্ঞেয়বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর এ মতের প্রতিফলন ঘটে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থে। এর ফলে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁর আত্মচরিতে দুঃখ করে বলেনঃ 'আমি কোথায় আর তিনি (অক্ষয় কুমার) কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কী সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কী সম্বন্ধ, আকাশ-পাতাল প্রভেদ।'[১০]

ডেভিড হেয়ার

নতুন শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের সহযোগী হিসেবে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি একজন অ-ভারতীয় পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি এক অবিনশ্বর কীর্তি রেখে গেছেন এবং তার নাম ডেভিড হেয়ার। ১৮০০ সালে একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসেবে এ-দেশে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু পরবর্তীকালে এ-দেশে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। বাংলার বুকে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ধাচে শিক্ষা চালু করার দাবিও উঠেছিল। সরকার কেবলমাত্র একটি সংস্কৃত কলেজ কিংবা একটি মুসলিম মাদ্রাসা চালাত, যেখানে শুধুমাত্র প্রাচীন বিষয়ই পড়ানো হত। এমনকি ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষাখাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেটাকেও সরকারের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পরামর্শদাতারা ব্যয় করতেন দেশীয় ধ্রুপদী শিক্ষার কাজেই।

নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কলকাতার ভদ্রশ্রেণীর লোকেদের নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিলেন ডেভিড হেয়ার। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৮১৬ সালে তিনি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টকে রাজি করান এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার ব্যাপারে। এই আলোচনার ফল হিসেবেই ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় সুবিখ্যাত হিন্দু কলেজ, যা আজও টিকে আছে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে। বেশ কিছু বছর ধরে এই পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মে সোৎসাহে অংশ নিয়েছেন ডেভিড হেয়ার। প্রতিদিন কলেজ পরিদর্শনে গেছেন, পালন করেছেন পরামর্শদাতার ভূমিকা। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকাগুলি রচনা ও প্রকাশ করার জন্য ১৮১৭ সালের তিনি গঠন করেন স্কুল বুক সোসাইটি এবং নতুন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ও মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করার জন্য ১৮১৮ সালে গঠন করেন স্কুল সোসাইটি। আশান্বিত তরুণরা

কিভাবে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকত, আর বৃত্তি পাওয়ার আশায় কিভাবে ছুটত তাঁর পালকির পিছু পিছু সে ব্যাপারে অনেক গল্পই শোনা যায়।[১১]

ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পর ডেভিড হেয়ার তাঁর পুরো সময়টাই ব্যয় করতে থাকেন নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সফল করার জন্য। কলকাতা শহরে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিদিন পরিদর্শনে যেতেন তিনি। ছাত্রদের সঙ্গে খেলা করতেন, তাদের খাওয়াতেন, অসুখ হলে পরিচর্যা করতেন। কলকাতার পুরো একটা প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালি যুবকরা এই মহান বিদেশী বন্ধুটিকে ভালবাসত, ভক্তি করত। ১৮৪২ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে যখন ডেভিড হেয়ার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তখন শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কলকাতার ঐ শিক্ষিত যুবকরা।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

ডিরোজিওকে বিস্ময় বালকই বলা চলে। ড্রামন্ড নামক জনৈক স্কটিশ ভদ্রলোক কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে যে প্রাইভেট বিদ্যালয়টি চালাতেন, সেই বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করেন ডিরোজিও। কবি, পণ্ডিত এবং বেপরোয়া মুক্তচিন্তক হিসেবে ড্রামন্ডের কিছুটা পরিচিতি ছিল। সম্ভবত তাঁর কাছ থেকেই ফারসি বিপ্লব প্রসূত অপ্রতিরোধ্য স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন ডিরোজিও। চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের এবং যাবতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক দুর্বার আবেগ আচ্ছন্ন করে ফেলে তাঁকে।

কিশোর বয়সেই দার্শনিক কান্টের চিন্তাকে চমৎকারভাবে সমালোচনা করতে পারতেন ডিরোজিও। তাঁর কবি প্রতিভাও বিকশিত হয় অল্প বয়সেই। 'ফকির অফ ঝুঙ্গিরা' কবিতাটির মধ্যে দেশপ্রেমের এক উদ্দীপ্ত প্রকাশ দেখা যায়, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যা ছিল একান্তই দুর্লভ। ১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই উঁচু শ্রেণীর বেশ কিছু ছাত্রকে চুম্বকের মতো নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন তিনি। এই ছাত্ররা তাঁকে ভক্তি করতে শুরু করে এবং আবিষ্ট হয় মুক্ত চিন্তার নেশায়।

অবাধে বিতর্ক করা এবং যে-কোন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য এই ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন ডিরোজিও। তাঁর বাড়িতে অবাধ অধিকার ছিল সমস্ত ছাত্রের। মুক্তির প্রতীক হিসেবে তারা পরম উল্লাসে গ্রহণ করত ইংরেজদের প্রিয় নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন ডিরোজিও। সংগঠনের মাসিক মুখপত্র ছিল এথেনিয়াম। এই পত্রিকায় তাঁর ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি আর তাঁর বন্ধুরা হিন্দু ধর্মকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন।[১২]

কলেজের সেরা ছাত্ররা সমবেত হয়েছিল ডিরোজিওর চারপাশে। এরা যাবতীয় প্রাচীন প্রথাকে উপহাস করত, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অস্বীকার করত, দাবি করত নারীশিক্ষার এবং নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করার জন্য আশ্রয় নিত মদ্যপান ও গোমাংশ ভোজনের। সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ রামকমল সেনের অনুরোধে যুবকদের মাথা-খাওয়া বিপদজনক মানুষটিকে ১৮৩১ সালের ২৫ এপ্রিল বরখাস্ত করেন। সেই বছরই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান ডিরোজিও, কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের মনের আকাশে অমলিন হয়ে থাকে তাঁর স্মৃতি।

ইয়ং বেঙ্গল

ডিরোজিওর ছাত্ররা যৌথভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। ১৮৩১ সালেই তাঁরা ইংরেজি ও বাংলায় দুটি মুখপাত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন- এনকোয়্যারার আর জ্ঞানান্বেষণ। কয়েকজন ডিরোজিও পন্থীর খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের সংবাদে চমকে উঠেছিল সারা কলকাতা। এ'দের মধ্যে দুজন' মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩২ সালেই নিজেদের ধর্মান্তরণের কথা ঘোষণা করেন। ডিরোজিওপন্থীদের কাজকর্মে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তৎকালীন সমাজ। কিন্তু ডিরোজিওপন্থীরা একটা সুদৃঢ় বুনিয়াদ ও ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন বিশিষ্ট কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। প্রকৃত পক্ষে তারা ছিলেন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন একটি গোষ্ঠী। ডিরোজিওপন্থীরা ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় সমবেত কিছু বুদ্ধিদীপ্ত যুবকের একটি দল। সাধারণ

মানুষের মধ্যে এ'রা একটা উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ইতিবাচক উপাদান খুব একটা ছিল না, কোন সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল মতাদর্শ গড়ে তুলতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁরা। পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অভিঘাতেই আন্দোলিত হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু জনসাধারণ আর তাদের অধিকার সম্বন্ধে যে ধারণার জন্ম দিয়েছিল ঐ বিপ্লব, তা তারা ঠিকমত আত্মস্থ করতে পারেনি। এই বুদ্ধিদীপ্ত যুবকেরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকেছেন তাদের শিক্ষকের স্মৃতির প্রতি, ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের অটুট রেখেছেন নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে স্বপক্ষে টেনে আনার উপযুক্ত কোন বিকাশমান চিন্তাধারার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা প্রমাণ করতে পারেননি নিজেদের। সেই সময়ে কিছুটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলেও পরবর্তীকালে তাঁরা হারিয়ে গেছেন 'পিতা ও সন্তানহীণ একটি প্রজন্ম'র মতো।

তবে বেশ কয়েক বছর ডিরোজিওপন্থীরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুটি মুখপাত্র প্রকাশ করতেন তাঁরা- এনকোয়্যারার এবং জ্ঞানান্বেষণ। ১৮৩৪-৩৫ সালে এদেরই একজন রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামমোহনের মৃত্যু, কোম্পনির সনদপত্রের সংশোধন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন জনসভায় চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে তাঁরা টিকিয়েছিলেন প্রায় ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত। সেই সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে মত-বিনিময় করার জন্য গড়ে তুলেছিলেন আর একটি সংস্থাঃ ইপিসটোলারি অ্যাসোসিয়েশন (লিপি-লিখন সভা)।

তবে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের চেতনায় প্রকৃত আলোড়ন তুলেছিল কয়েকটি বিশেষ বিষয়। যেমন, সুদূর মরিশাসে ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থা, জুরিদের দ্বারা বিচার অনুষ্ঠিত করার অধিকারের সম্প্রসারণ, ইংরিজিকে আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত কুলিদের জোর করে খাটানো ইত্যাদি। এর ফলে ডিরোজিওপন্থীরা আকৃষ্ট হতে শুরু করেন আরও সক্রিয় রাজনীতির দিকে। অবশ্য ১৮৩৩ সালের নতুন চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের জন্য সরকারি পদের দরজা খুলে যাওয়ার পর তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সরকারি চাকরিতে যোগ দেন।

বাংলার বুকে ডিরোজিওপন্থীরা যে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন, তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য। নিজেদের বাইরে কোন আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে পারেননি, এমনকি তাঁদের নিজস্ব গোষ্ঠীটাও কোন তাৎপর্যপুর্ণ আদল নিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। গোষ্ঠীর সদস্যরা এক সময় অবশ্যম্ভাবীরুপেই জড়িয়ে পড়েছিলেন জাগতিক কাজকর্মে ও ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তায়। মনে রাখা দরকার ইয়ং বেঙ্গলের অধিকাংশ সদস্যই এসেছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, স্বাভাবিকভাবেই জীবিকা অর্জনের একটা দায় তাঁদের ছিলই। একশ বছর আগে বাংলার মাটিতে পাশ্চাত্য ধাঁচের র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল, আর তাই ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যেকার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা কখনোই কোন সুদৃঢ় বুনিয়াদ খুজে পায়নি।

ডিরোজিওপন্থীদের যে একমাত্র প্রলক্ষণটি তৎকালীন সমাজের অনেকে অনুকরণ করার চেষ্টা করত, তা হলো চালু সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করা। কিন্তু এ ব্যাপারেও তেমন কোন বলিষ্ঠ বিদ্রোহ কিংবা সাহসী প্রতিবাদ দেখা যায়নি, বরং প্রথাগুলোকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক দুর্নীতি এবং সেক্ষেত্রে প্রকৃত ডিরোজিওপন্থীরা তাদের যে সততা ও সাহসের জন্য আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন, তার বিন্দুবিসর্গও ছিল না তাঁদের নকলকারীদের মধ্যে।[১৩]

অক্ষয় কুমার দত্ত

প্রথাগত চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লেখনীর মাধ্যমে যে কয়জন বাঙালি মুক্ত-চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁদের অন্যতম প্রধান। তাঁর চিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তচিন্তা ও মানবপ্রেম। মন ও মনন এবং চিন্তা ও কর্মে তিনি আজীবন মানবকল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি শান্তিময় অনুশীলনকে নিরুৎসাহিত করেছেন। মানুষের স্থায়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর ধর্ম-সমীক্ষার মূল লক্ষ্য। তার ধর্ম সমীক্ষা ছিল পাশ্চাত্যে প্রকৃতিবাদ প্রভাবিত মুক্তবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবমুখী চিন্তার ফসল।

১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পরই অক্ষয় কুমার দত্তকে 'তত্ত্বাবোধিনী' পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচার। এ ছাড়াও পাঠকদেরকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক করার মহান উদ্দেশ্যে সামনে রেখে প্রকাশিত হতো বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ। প্রায় এক যুগ ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্পর্কে অক্ষয় কুমার দত্তের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। ধর্মকে তিনি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেননি। বরং ধর্মের প্রতিটি বিষয়কে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে যেটা গ্রহণযোগ্য তাকে গ্রহণ করেছেন এবং যেটা বর্জনীয় বলে মনে হয়েছ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে গ্রহণ করলেও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ণ ব্যতিক্রমধর্মী। তাঁর মতে ধর্মের অর্থ হলো প্রাকৃতিক নীতিমালার অনুসরণ। তিনি তাঁর লেখায়, কথায় ও কাজে ব্রাহ্মধর্মকে যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্র থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের মূল শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু অক্ষয় কুমার ছিলেন শাস্ত্র মন্থনের ঘোর বিরোধী।

অক্ষয় কুমার দত্ত মনে করেন যে, বিশ্বজগৎ পরিচালনার জন্য ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত কোন স্বত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। বিশ্বজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত। কাজেই ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রাকৃতিক নীতিমালার উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা উচিত। তিনি আরো বলেন, ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন তবে তার জন্য উপসনা নয়, উপসনা করা উচিত মানব কল্যাণের জন্য। তার মতে প্রকৃতির নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্ম সম্পাদন করা হলো ধর্ম, আর তা না করাই হলো অধর্ম। আর এই চেতনা থেকেই তিনি প্রার্থনার আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করেন। একটি চমৎকার গানিতিক সমীকরণ দ্বারা তিনি দেখাতে চান যে, প্রার্থনার কোন মূল্য নেই। তার সমীকরণটি নিম্নরূপঃ

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

অতএব, প্রার্থনা = শূণ্য

এই সমীকরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর বা পরম স্বত্ত্বায় বিশ্বাসী কোন ধর্মই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অতএব, ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি প্রগতির পরিপূরক হিসেবে মনে করতেন। তার একটি বিখ্যাত উক্তিতে তাঁর মত স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়ঃ

> অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও ল্যাপলাস যাহা কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কনাদ এবং বেকন ও কোঁমত যে কোন প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাও আমাদের শাস্ত্র। ..... মুসা ও মুহম্মদ (সাঃ) এবং যীশুও চৈতন্য ও পরমার্থ বিষয়ে যাহা কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।[১৪]
>
> তিনি আরও বলেন ধর্ম বিষয়ে ইতোপূর্বে যাহা কিছু নির্ণীত হয়েছে এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নির্ণীত হবে সব কিছুই ব্রাহ্ম ধর্মের অন্তর্গত। বহু শতাব্দি পরেও যদি কোন অভিনব ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় তাহাও হবে ব্রাহ্ম ধর্ম। তার এ বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার যাঁদের আজীবন সাধনা তাঁদের অন্যতম প্রধান ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জন্মগতভাবে তিনি যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন, কিন্তু হিন্দুত্বের দিকে নয়, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নয়, বরং উদার অপার মনুষ্যত্বের অভিন্নমুখেই তিনি নিবেদন করেছিলেন তাঁর দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র জীবনকে।[১৫] তিনি কুসংস্কার দেশাচারের দাসত্ব, সামাজিক নিপীড়ন এবং পুরোহিত শ্রেণীর অত্যাচার ও অনাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার সংগ্রামে নিজেকে আজীবন সম্পৃক্ত রেখেছেন। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিলেন নারী জাতির মুক্তি। বিদ্যাসাগরের মানসে কল্যাণধর্মী ধর্ম একটা বিশাল স্থান জুড়ে রয়েছে। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষ্য ' মোক্ষ' বা ' নির্বাণ' লাভ; জীবন দর্শনের এই উদ্দেশ্য কখনোই

বিদ্যাসাগরকে আকর্ষণ করেনি। তিনি বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর উদার মানবতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিধর্মীতা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী।

বিদ্যাসাগরের মতে ঈশ্বরতত্ব বা ধর্মতত্ত্ব মানুষের জাগতিক কল্যাণে বিশেষ করে ব্যক্তি সত্তার উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবতঃ এই বিবেচনায়ই সমাজ পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় তিনি ধর্মকে পরিহার করেন। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের এই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই অভিনব। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চাইলে বিভিন্ন ধর্ম কিভাবে মানবকল্যাণ তথা ব্যক্তিসত্তার উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা বিশ্লেষণ করে মানুষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। বিদ্যাসাগর সে দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ছিলেন। আর সে কারণেই বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্ম ও সাধানার মূল উৎস ও প্রেরণা ছিল মানুষ। তাঁর জীবন দর্শনের কেন্দ্র ছিল মানুষ। তিনি যে মানুষকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন সে মানুষের কোন জাত নেই, কোন ধর্ম নেই। বলা হয়, রামমোহন যে সমাজ সংস্কারের সূচনা করেছেন বিদ্যাসাগর এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে যে মহৎ কাজ করেন বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ চালু করার মাধ্যমে রামমোহনের অসমাপ্ত কাজে সমাপ্ত করেন। বিদ্যাসাগর নিজেই বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনকে জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বলে অভিহিত করেন। বিধবা-বিবাহের প্রবর্তনের পক্ষে বিদ্যাসাগর বলেনঃ

> দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাহাদের কন্যা-ভগিনী, পুত্রবধু প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কতশত বিধবা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যাভিচার দোষে দুষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে এবং পতিকুল, পিতৃকুল মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা চালু হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যাভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিবারণ হইতে পারে। [১৬]

তিনি আরও উল্লেখ করেনঃ 'বিধবা বিবাহের প্রথা চালু না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্ধত আছেন। অনেকে ততদুর যাইতে সাহস করিতে পারেন না কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।[১৭]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় বিধবা বিবাহ প্রবর্তিত হয়। তিনি নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে অনেক বিধবার পুনঃবিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর ছেলে নারায়নচন্দ্র সেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে এক বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় এবং বিধবা মেয়েটিকে বিয়ে করায় তিনি সীমাহীন খুশী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের ভাব প্রকাশ করে তাঁর ছোট ভাই শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেনঃ "বিধবা বিয়ে প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎ কর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঊনিশ শতকের বাংলায় যে কয়জন চিন্তাবিদ তাঁদের মুক্তচিন্তার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক চিন্তা-চেতনাকে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও বিচারশীল দর্শনের সাথে যুক্ত করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ধর্মতত্ত্বে মানুষের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। তাঁর মতে মানুষকে উপলক্ষ্য করেই সকল ধর্মকর্ম। তিনি মনে করেন, যার চিত্তশুদ্ধি নেই তার কোন ধর্ম নেই। তিনি আরও বলেন, যার চিত্তশুদ্ধি আছে তার কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে কখনো নির্বিচারে বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, হিন্দুধর্ম মানি কিন্তু হিন্দুধর্মের বোকামিগুলো মানিনা। তিনি হিন্দু ধর্মের একান্ত অনুসারী হয়েও এ ধর্মকে কেন্দ্র করে যে সব দেশাচার, লোকাচার ও বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল সেগুলোকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথের মতে, বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ লোকাচার ও দেশাচারের

বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করতে সাহস পেতোনা। হিন্দু ধর্মের স্থবিরতাকে উপলব্ধি করেই সমকালের প্রয়োজনে এর নবমূল্যায়নের কথা তিনি বলেছেন। হিন্দু শাস্ত্রের কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা এ প্রশ্নের উত্তরের দায়িত্ব দিয়েছেন যুক্তির উপর। তিনি বলেন, যা ধর্ম তা সত্য আর যা অসত্য তা অধর্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে তথাপি অসত্য এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য। হিন্দুধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় প্রচলিত বিশ্বাসের মূল ধরে নাড়া দেওয়ার কারণে নিজ ধর্মের প্রাচীনপন্থীদের কাছে তিনি পরিচিত হলেন ধর্মদ্রোহী হিসাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী ও বিচারশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অবতারবাদ সম্পর্কিত তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাখ্যায়। মানবদেহে ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ কোন অবতারে তিনি বিশ্বাস করেননি। সেই ব্যক্তিকে তিনি অবতার বলে স্বীকার করেন যিনি মানুষ হিসাবে পূর্ণতালাভ করেছেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও অনুশীলনে এবং যার জীবন নিবেদিত পরহিত ও ব্যাপক মানবকল্যাণে। তিনি মানুষের কল্যাণকেই পরমার্থ মনে করেছেন। সে কারণেই তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব মানবতাবাদে উন্নীত হয়েছে এবং তিনি বলতে পেরেছেন, "মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরের ভক্তি নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। গোড়া হিন্দুরা বলেছেনঃ হিন্দু সমাজের পরস্পরাগত পবিত্র বিশ্বাস ও ধারণাগুলোকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন বিশেষ করে, হিন্দু মেয়েদের তিনি রীতিমত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বানিয়েছেন। অন্যদিকে মুসলমানদের ধারণা তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িক লেখক। তিনি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি বড় অভিযোগঃ "বঙ্কিম স্বভাবগতভাবেই সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ও মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন।" এ ধারণা আসলে সঠিক নয়। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, তিনি হিন্দুর পক্ষে লিখেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে এ-ও অনস্বীকার্য যে তিনি, মুসলমানদের প্রশংসা করেও লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবপ্রেমে হিন্দুর যেমন মুসলমানেরও তেমনি স্থান আছে। কারণ, তাঁর মতে হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানরাও একই পরমেশ্বরের সৃষ্টি। বস্তুতঃ একজন সংবেদনশীল সাহিত্যিক ও প্রজ্ঞাবান দার্শনিক হিসাবে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যখনই যেখানে মানবিক বোধ ও সদাচরণের সীমা-লঙ্ঘণ দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদমুখী হয়েছেন। রাজসিংহের আলমগীর চরিত্র এবং আনন্দমঠ-এর সন্তানদের মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব ও মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলোঃ সীতারামের যৌনমোহ, ভবানন্দের ব্রতচ্যুতি ও গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতাকে বঙ্কিমচন্দ্র এতটুকও ক্ষমার চোখে দেখেননি। অন্যদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে মীর কাসিম যে দেশপ্রেম ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা যে রাজসিংহের বীরত্বের চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তা-ও শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর কাছে পাঠান আক্রমণকারী কতলু খাঁ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও জঘণ্য হলেও তার মেয়ে আয়েশা এমন এক অসাধারণ নারীত্ব যার মহৎ গুণাবলীর তুলনায় তিলোত্তমাও একেবারেই নিষ্প্রভ। বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন করে দর্শনের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম বলেনঃ

> এ ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায় যেগুলো কিনা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্র আসলে মুসলিম বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, ছিলেন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানবচরিত্রের এক কুশলী বিশ্লেষক। যদি প্রকৃতই সাম্প্রদায়িক হতেন, তা হলে মুসলমান নারী পুরুষদের তিনি এমনভাবে মহিমান্বিত করতেন না। তদুপরি, মুসলমান চাষী-মজুরদের জন্য তাঁর যে একটা অকৃত্রিম মনের টান ও প্রাণের পরশ ছিল তা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বিধৃত।[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

ধর্মকে মানব কল্যাণের ধারক ও বাহক হিসাবে যাঁরা দেখেছেন, ধর্মপথে যাঁরা মানুষকে দেবত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আজীবন সাধনা করেছেন তাঁদেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহামানব শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে তিনি বলেন, ছাঁদের উপর উঠতে

হলে মই, বাঁশ, সিড়ি ইত্যাদি নানা উপায় যেমন উঠা যায়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়। তিনি আরও বলেন, যাদের মধ্যে সংকীর্ণভাব তারাই শুধু অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে এবং নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়। তাঁরা যারা ঈশ্বরানুরাগী, কেবল সাধন ভজন করতে থাকে তাঁদের ভিতর কোন দলাদলি থাকে না, থাকতে পারে না। যারা বলে যে, শুধু তাদের ধর্মই ঠিক আর অন্যের ধারণা ভ্রান্ত এবং ঈশ্বরের কৃপা পাবে না তাদের আচরণে দুঃখিত হয়ে তিনি বলেন, এসব লোক জানেনা ঈশ্বর সকলের। বাবা-মা আন্তরিক হলে সকলকেই তিনি দয়া করেন, সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আর এ কারণেই তিনি বলতেন, "যত মত তত পথ"।

পরমতসহিষ্ণুতার প্রশ্নে তিনি বলেন, তুমি তোমার মতের উপর নির্ভর করো এবং অপরকে তাঁর মতের, উপর নির্ভর করতে দাও। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে ভেদ-দর্শনই অজ্ঞান এবং অভেদ-দর্শনই যথার্থ জ্ঞান। আর তিনি নিজে যথার্থ জ্ঞানী ছিলেন বলেই কোন ভেদাভেদ মানতেন না এবং বলতেন, যেমন গ্যাসের আলো এক স্থান হতে এসে শহরে নানাভাবে জ্বলছে, তেমনি নানা দেশে বিভিন্ন জাতের ধার্মিক লোক সেই একই ভগবান হতে আসছে। একবার তিনি কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন, মানুষ অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে বৃথা গোলমাল করে কিন্তু যখন তার ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় তখন আর পরস্পরের বিরোধ থাকেনা।

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্ম-চিন্তা ছিল উদার এবং সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত। সমস্ত অন্তর দিয়ে তিনি ঘৃণা করতেন সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে। তিনি ছিলেন বর্ণ-বৈষম্যের ঘোর বিরোধী। ব্রাহ্মণক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শুদ্রের বিভাজনের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেন বিদ্রোহ। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্বেও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের চেয়ে তিনি নিজেকে বড় বলে মনে করেননি। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসাধারণ ভালবাসা। তাঁর এই ভালবাসা, মমত্ববোধ, সমত্ববোধ ও একত্ববোধ শুধু যে কথার কথাই ছিলনা, তিনি তাঁর কাজে কর্মে তা প্রমাণ করে গেছেন। কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ চণ্ডাল সেজে ঝাড়ুদারের কাজ করেছেন এবং গভীর রাতে নিজের হাতে একজন মেথরের মতো মন্দিরের নোঙরা স্থান পরিস্কার করতে দ্বিধাবোধ করেননি। শুধু তা-ই নয়, রামকৃষ্ণ যে মন্দিরে থাকতেন সে মন্দিরে প্রতিদিন ভিখারীদের খাবার দেয়া হতো। এদের মধ্যে থাকতো গৃহহীন, নিঃস্ব এবং তৎকালীন সমাজের ঘৃণিত লোক। সবার খাবার শেষ হয়ে গেলে তিনি উচ্ছিষ্ট একত্র করতেন, সেগুলো খেয়ে খাবারের স্থানটি পরিস্কার করতেন।[১৯] সমাজের প্রচলিত অস্পৃশ্যতা নামক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় বিদ্রোহ আর কী হতে পারে? সমাজে নিম্নবিত্ত, উপেক্ষিত, অবহেলিত ও ঘৃণিত মানুষের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম করার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

সুফীসাধক গোবিন্দ রায়ের সান্নিধ্যে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হলেন। মুক্ত মনের অধিকারী 'ধর্মের গুঢ় রহস্য সন্ধানী' এই মহান সাধক ধর্মান্তরিত গোবিন্দ রায়ের কাছে ইসলাম ধর্মের দীক্ষা নিলেন। শুধু দীক্ষাই নয়, এ ধর্মে গভীরভাবে প্রবেশ করার জন্য শুরু করলেন গভীর অনুশীলন। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের মূল রহস্যকে আপন চৈতন্যের দর্শনে উদ্ভাসিত করতে। ধর্ম-সাধনার আর এক পর্যায় বাইবেলের পাঠ শুনে এবং মাতৃক্রোড়ে যিশুর ছবি দেখে শ্রী রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হলেন। তিনি যিশুর ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেলেন। পৃথিবীর মানুষের জন্য যিশুর যে ত্যাগ তা শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করলো। এক ও অভিন্ন পরমেশ্বরের দূত হিসাবে যিশু হলেন তাঁর প্রণম্য। গৌতমবুদ্ধকে তাঁর অসাধণ যোগজ সমাধিবলে তিনি ঈশ্বরের অবতার হিসাবে জেনেছিলেন। জৈন ধর্মের প্রবর্তক তীর্থঙ্কর এবং শিখ ধর্মের দশ গুরু সম্পর্কে তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে অন্যান্য দেব-দেবী পটের সঙ্গে মহাবীরের একটি পাথরের মুর্তি ও যিশুর প্রতিচ্ছবি ছিলো।[২০] অন্য ধর্মকে বুঝবার জন্য সেই ধর্ম গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে অনুশীলনের এবং অন্য ধর্মকে এভাবে গভীরভাবে একান্ত আপন করে নেয়ার উদাহরণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। এখানেই শেষ নয়, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাব সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করে নায়িকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের

সাধনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকে আপন করে পাওয়ার জন্য এ ধরণের সাধনা হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন। নারী জাতিকে সম্মান দেখিয়েছেন নিজের স্ত্রীকে ষষ্টাঙ্গ প্রণামের মাধ্যমে। পৃথিবীর কোন পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে এভাবে সম্মান দেখায়নি। মোট কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন প্রগতিশীল, স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। তিনি নারী-পুরুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। তিনি শুধু ধর্ম-সংস্কারক এবং আদর্শ মানুষই নন, তিনি মানব জাতির গৌরব।

স্বামী বিবেকান্দ

ঊনিশ শতকে যে সব বাঙালি ধর্মের পথ থেকে সাধারণ মানুষকে কল্যাণের পথে ও মঙ্গলের পথে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন এবং যাঁদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল যুক্তি-নির্ভর ও গতানুগতিকতা বিবর্জিত, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম প্রধান। ঊনিশ শতকের শুরুতে ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনবার্তা নিয়ে এসেছিলেন রামমোহন রায়। এ আন্দোলন এগিয়ে চলে গোটা শতাব্দী ধরে। কিন্তু এই দীর্ঘ চেষ্টার পরেও যখন সমস্যার সমাধান হলো না, লোকাচার যখন সংস্কার আন্দোলনের সব চেষ্টাকেই ব্যাহত করলো তখন এই শতকের শেষ লগ্নে এক নতুন সংস্কারবার্তা এবং এক নতুন জীবনাদর্শ নিয়ে এগিয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সংগ্রামের প্রতিমূর্তি। ১৮৯৩ সনের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সভায় সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার বিষময় ফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেনঃ

সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা এবং তাদের ভয়ানক ফল স্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সারা জগতে এরা মারাত্মক উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে, বহুবার এ পৃথিবীকে রক্তে রঞ্জিত করেছে, সভ্যতা ধবংস করেছে এবং বিভিন্ন জাতিকে প্রায়শঃই হতাশায় নিমগ্ন করেছে। এ সকল পিশাচ যদি না থাকতো তাহলে মানব সমাজ আজ যে অবস্থায় রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত হতে পারতো। কুপমান্ডুক্য-সংস্কার যে মানব সমাজ তথা সভ্যতাকে পাশ্চাৎগামী করেছে। সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন তাঁর পঞ্চম দিনের ভাষণেঃ

> "আমি একজন হিন্দু। আমি আমার ছোট্ট কুয়োয় বসে আছি এবং তাকেই সমস্ত জগৎ বলে মনে করছি। খ্রীষ্ট ধর্মের লোকেরা তাদের নিজেদের ছোট্ট কুয়োয় বসে আছেন এবং তাকেই জগতের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছেন। মুসলমানও নিজের ছোট কুয়োয় বসে আছেন এবং তাকেই জগৎ বলে ভাবছেন।
>
> স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত তীব্রতার সাথে তাঁর সমালোচনা করেছেন ধর্মীয় গোড়ামিকে। তিনি বলেছেনঃ "মানব জাতির মধ্যে গোড়ারা সবচাইতে বেশী অকপট। কিন্তু তারা জগতের অন্যান্য পাগলের মতো সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত। যে কোন মারাত্মক ব্যধির মতো এই গোঁড়ামিও ভয়ঙ্কর ব্যধি। মানুষের স্বভাবে যত প্রকার কু-প্রবৃত্তি আছে, এই গোঁড়ামি তাদের সবগুলোকেই প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে ক্রোধ প্রজ্বলিত হয় এবং মানুষ বাঘের মতোই হিংস্র হয়ে উঠে। তিনি মনে করেন, মানুষের জন্যই ধর্ম এবং মমতাবিহীন ধর্ম অনাচারেরই নামান্তর। সকল ধর্মের মাঝেই তিনি সত্যের আলো খুঁজে পেয়েছেন। আর সে কারণেই তিনি সকল ধর্ম এবং সে সব ধর্মপ্রবর্তকদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ধর্মপ্রবক্তাদের সম্পর্কে তিনি বলতেন, এই মহাপুরুষেরা সবাই ছিলেন ঈশ্বরের দূত। আমি নতজানু হয়ে তাঁদের পায়ের ধুলো নিই। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, ব্রাহ্মণদের বিস্ময়কর মেধার সাথে এই মহান গুরুর হৃদয় উন্নত আত্মা এবং বিস্ময়কর মানবিকয়ানশক্তির সংযোগ সাধন করা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা বলেন, "ইসলামের সহায়তা ছাড়া বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, তা যতোই চমৎকার ও বিস্ময়কর হোক না কেন, বিশাল মানবসমাজের কাছে পুরোপরি নিরর্থক। ..... আমাদের নিজ মাতৃভূমির জন্য হিন্দুত্ব ও ইসলাম এই দুই মহান ব্যবস্থার সংযোগ অর্থাৎ বৈদান্তিক মস্তিস্ক ও ইসলামিক শরীরই হচ্ছে একমাত্র আশা।"

যে সময় স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম তখন বর্ণাশ্রম ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য, অতি প্রাচীণ ও দৃঢ় ছিল বর্ণে বর্ণে ব্যবধান। ধর্মের নামে এই বর্ণাশ্রমকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। বিবেকানন্দ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। অত্যন্ত প্রবল ছিল সে বিদ্রোহ। তিনি দাবি করলেন, সকল ভারতবাসী আমরা ভাই, কেউ বড় আর কেউ ছোট নয়, কেউ

ম্লেচ্ছ নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। তিনি ডোমকে আপন করে জড়িয়ে ধরলেন, মেথরকে টেনে নিলেন বুকে। সত্যিকার অর্থে দরিদ্রকে দেখলেন নারায়ণ হিসাবে। ধর্মের দেশে এ ধরনের ধর্মদ্রোহ ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা।

সংস্কার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্যান্য সংস্কারকদের চেয়ে ভিন্নতর। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কোনরূপ উপক্ষো না করেই তিনি সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন মনে করেন ধর্ম-সংস্কারের এবং বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন মানুষের মনে ধর্মীয় প্রেরণার উন্মেষের উপর। তিনি মনে করতেন, এদেশের জাতীয় জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় ভিত্তির উপর। তাঁর মতে, সামাজিক বা রাজনৈতিক যে কোন সংস্কারের জন্য এগোতে হবে ধর্মের পথে। শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষা ও প্রেরণায় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যথার্থ সংস্কারের জন্য জ্ঞান যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন মানুষের প্রতি প্রেম, মানুষের প্রতি দরদ। কারণ মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। মানুষের মতো বাঁচতে হলে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে। আর এই শ্রদ্ধাকে সার্থক করে তুলতে হবে প্রেম ও সেবায়। নিছক আত্মচিন্তা ও আত্মসাধনা নয়, অপরের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে ধন্য হতে হবে প্রত্যেককে।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐহিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ধারার অনুসারী। তাঁর বিশেষত্ব এখানে যে, তিনি দর্শনে এসেছেন বিজ্ঞানের পথে। বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনি নিষ্ঠাবান অনুসারী। ডারউইন ও স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদীদের মতের সঙ্গে তিনি সম্যক পরিচিত এবং তাঁদের মতোই তিনি প্রকৃতিবাদের প্রতি অনুগত। 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত' কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তায় তাঁর আস্থা নেই, ধর্মের গতানুগতিক ব্যাখ্যাও তিনি মানতে নারাজ। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে মির‍্যাকল বা অলৌকিক ঘটনা নামে আসলে কিছু আছে বলেও তিনি বিশ্বাস করেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের অনুসারী।

বিজ্ঞানভিক্ষু ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রকৃতিবাদী মনোবৃত্তিকে অতিমাত্রায় নমনীয় করে শেষ পর্যন্ত 'সোৎসাহে চর্চা করেন বেদের'।[২১] ত্রিবেদী তাঁর প্রথম জীবনের কঠোর মানোবৃত্তিকে বেশ কিছুটা নমনীয় করে শেষটায় ব্রতী হয়েছেন শাস্ত্রব্যাখ্যায়, ঝুঁকে পড়েছেন বেদের দিকে এবং বলেছেনঃ 'বিজ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি দর্শনের সেখানে সূত্রপাত।' তবে 'বিজ্ঞানের বেলায় যেমন বেদ-এর বেলায়ও তেমন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণব্রতের ভাষা রচনা করলেন তিনি।' যজ্ঞকথা গ্রন্থে তিনি অসাধারণ নিষ্ঠা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন বৈদিক যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনাও বিশ্লেষণে। তবে এ সবকিছুর পরও তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যায় বৈরাগ্য কিংবা পারলৌকিকতার কোনো প্রশয় দেননি। তিনি পূর্বাপর কর্মবাদে বিশ্বাসী এবং জীবন থেকে বৈরাগ্যকে বহিস্কারের পক্ষপাতী। তাই তিনি বলেন অলৌকিক উপায়ে নয়, কর্মসাধনার মাধ্যমেই উন্নতি করতে হবে নিজেদের ভাগ্যের। খোদ ভগবদগীতায় এ কর্মবাদ অনুশীলনের পরামর্শ রয়েছে। আচার্য ত্রিবেদীর ভাষায় '... কর্মকান্ডে যে বিরোধ দেখা যায় সেই বিরোধের মূলে সামঞ্জস্য আবিষ্কার ভগবদগীতায় ঘটিয়াছে।এই উভয়বিধ বিরুদ্ধধর্মের মূলগত ঐক্যসংস্থাপনে ও সমন্বয়সাধনে গীতার মহাত্ম 'জীবনের বৈচিত্র বিরোধের মধ্যেই চেষ্টা করতে হয় যোগ্যতম হওয়ার- এই শিক্ষা তিনি পেয়েছেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে এবং তাঁর মতে এ শিক্ষার পূর্বাভাস রয়েছে বেদ-গীতায়।[২২]

প্রথমে সংশয় ও নাস্তিকতার অবলম্বন এবং পরে ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনের এই যে প্রবণতা, তা কেবল আচার্য ত্রিবেদীর মধ্যেই নয়, অন্যান্য আরো অনেক মনীষীর মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন যে, যৌবনে তিনি নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন। এ জীবন নিয়ে কী করব? এ আত্মজিজ্ঞাসা অনেকদিন আন্দোলিত করেছিল তাঁর মন ও সত্তাকে। কিন্তু আজীবন যুক্তির অনুসারী হয়েও শেষ জীবনে তাঁকে অবলম্বন করতে দেখা যায় ভক্তিধর্ম। শুধু তা-ই নয়, অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতার অনুসারী অক্ষয়কুমার দত্তও শেষ জীবনে শির নত করতেন দেব মন্দিরে। একজন ঘোর সংশয়বাদী হয়েও খোদ বিদ্যাসাগর পালন করতেন স্মৃতিনিয়ন্ত্রিত আচার-আচরণ, চিঠি লেখা শুরু করার আগে নিয়মিত স্মরণ করতেন দুর্গানাম।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে সার্বক্ষণিক সক্রিয় না থেকেও যিনি প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও গানের মাধ্যমে ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন তিনি হলেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চিন্তা সারাক্ষণ এক জায়গায় থাকেনি, চলতে চলতে বার বার বাক নিয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবনা তাঁর চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। তবে এই ভাবগুলোর মাঝে ভিন্নতা থাকলেও তবে তেমন কোন বিরোধ নেই। রবীন্দ্রনাথকে রামমোহন বা দয়ানন্দ বা শ্রদ্ধানন্দের মতো "ধর্ম-সংস্কারক" বলা যাবে না। তবে তাঁকে "মানব-ধর্মের সাধক ও প্রচারক" বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

'ভারতপথিক রামমোহন রায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ 'যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, স্মৃতিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোন প্রশ্নের নতুন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিলো না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতরি দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশের আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীন বুদ্ধিকে অবিশ্বাস্য করেছে।' স্বাধীন ও মুক্তচিন্তাকে রবীন্দ্রনাথ কি পরিমাণে গুরুত্ব দিয়েছেন তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি স্বাধীন চিন্তাকে বলেছেন 'মানব জীবনের পরম সম্পদ'। সজাগ-স্বাধীন-মুক্তবুদ্ধির মানুষ না হলে তিনি রামমোহনের আবির্ভাবকে এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে একটা যুগান্তর বলে গণ্য করতে পারতেন না। রামমোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি তুলনামূলক বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

> রামমোহনের মতো রবীন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী, রবীন্দ্রনাথের রেনেসাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। দুজনেরই জিজ্ঞাসা প্রবল, মানবমুখিতাও প্রবল। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিজের মনের মতো করে নিয়েছেন, গীতা থেকে নিয়েছেন, কালিদাসের শৈশব জীবনদর্শন থেকে নিয়েছেন, বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি থেকে নিয়েছেন, তাতে মিশেছে সুফীবাদের ধারা, মধ্যযুগের সন্তদের সাধনার ধারা, সহজিয়াদের, বাউলদের, ফকির দরবেশদের সাধনার ধারা চলতে চলতে কখন যে উপনীষদের ব্রহ্ম সহজিয়া রস-সাধনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, মানবধর্মে মিশেছে, তার হদিস করা কঠিন। রামমোহনকে বুঝলে রবীন্দ্রনাথের এই অবিরত সন্ধান, নিরন্তর আহরণ এবং নিজের সঙ্গে অন্তহীন বোঝাপড়ার তাৎপর্য আমাদের কাছে অনেক স্পষ্ট হবে। যে বলিষ্ঠ হাঁ-ধর্মী মন আমরা রামমোহনকে দেখতে পাই, যার জন্য রামমোহনকে রেনেসাঁসের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ বলে গণ্য করতে পারি, রবীন্দ্রনাথেও আমরা সে হাঁ-ধর্মী সর্বভুক মনের সাক্ষাৎ পাব। একটি জিনিস রামমোহনে দেখতে পাব না, রবীন্দ্রাথে পাব, তা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথ সমস্ত আহরিত সম্পদকে পরিপাক করে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রায়িত করে নিয়েছেন। সৃজনের এই আগুন রামমোহনে ছিল না।[২৪]

ইংরেজ শাসনের শুরুতে পুর্তগীজ মিশনারীরা অনেক হিন্দু ও মুসলমানকে জোর করে খ্রিস্টান বানিয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে মিশনারীরা অনেক অশালীন ও কুরুচীপূর্ণ উক্তি করেছে। এর প্রতেকটি বিষয় রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। তার পরেও 'স্যালভেশন আর্মি' নামের খ্রিস্টান প্রচারকদের একজন পাদ্রী কিছু ধর্মান্ধ ও উগ্র হিন্দুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এই অন্ধ উগ্রতার প্রতিবাদে তিনি লেখেন তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা "ধর্মপ্রচার"। তিনি বলতেন, ধর্মীয় উগ্রতা ধর্ম নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই অতিশয়তা সহজেই উগ্র হয়ে ব্যধির চেহারা নেয়। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছেন কীভাবে অন্ধ-আচার-অনুষ্ঠান ধর্মকে অর্থহীন অনুশাসনে এবং ধর্মীয় নিয়মকে কারাগারে রূপান্তরিত করে। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন কীভাবে মন্ত্র-তন্ত্র আর আচার-অনুষ্ঠানের সম্মোহন হিন্দু ধর্মকে একটি অচলায়তনে পরিণত করেছে।

১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আদি-ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এর আগে সামাজিক প্রশ্নে তিনি মোটেই রক্ষণশীল ছিলেন না। যখন থেকে তিনি আদি-ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকেই সামাজিক বিদ্রোহের ভাবনা তাঁর মনে আসে। কিন্তু ১৯১১ সালে যখন তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার

সম্পাদক হন সে সময় তিনি একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম। বলা যায়, ষোলো আনা খাঁটি ব্রাহ্মসমাজী। অবশ্য এর পরেও তিনি নিজেকে ষোলো আনা হিন্দু বলেই মনে করতেন। তিনি দাবি করতেন, তিনি হিন্দু সমাজে জন্মেছেন এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও দাবি করতেন যে, তিনি যে সম্প্রদায়কে গ্রহণ করেছেন তা বিশ্বজনীন, তথ্যাপি তা হিন্দুরই ধর্ম। এভাবে এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩২ সালে "পরিশেষে" কাব্যগ্রন্থের "ধর্মমোহ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নাস্তিকের প্রতি তাঁর সদর্থক মনোভাব পোষণ করেনঃ

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সে-ও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্রে মানেনা, মানে মানুষের ভালো।"

তাঁর এ বক্তব্যে আরও একটা জিনিস ফুটে উঠে। তাহলো, তিনি শাস্ত্র মানার উপর গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব-আরোপ করেছেন মানুষের কল্যাণের উপর। তিনি মোক্ষ-সন্ধানী নন, তিনি মানব-কল্যাণ-সন্ধানী। রবীন্দ্রনাথ ধর্মপীড়াগ্রস্থ নন বলেই হিন্দু হয়েও মানবকল্যাণে অবদান রাখার জন্য যীশুখ্রীস্টকে মহামানবের আসনে বসিয়েছেন এবং গৌতম বুদ্ধকে বলেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ।

কেউ কেই মনে করেন, বাংলার রেনেসাঁর পরিপূর্তি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথে। সম্ভবতঃ এ কারণেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের সকল লেখকই তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন এবং এদের প্রত্যেকের লেখায় রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের এক সম্বর্ধনা সভায় এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাণ পুরুষ আবুল হোসেন রচিত অভিনন্দন পত্রে বলা হয়ঃ

তোমার প্রাণ মুক্ত, বিশ্বময়। সেখানে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, আছে মানুষ উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেনঃ 'আপনাদের কাছে আমার যে পরিচয় তার কারণ আমি মানুষের সংকীর্ণতার বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি।' রবীন্দ্রনাথ মুসলিম সাহিত্য সমাজ অর্থাৎ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সদস্যদের কাছে যে কতবড় আদর্শ ছিলেন তা বুঝার জন্য আবুল ফজলের নিম্নবর্ণিত দুটি মন্তব্যই যথেষ্টঃ

ক. রবীন্দ্রনাথ শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের সাধক। নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে ভাবে গদগদ হয়ে কান্নাকাটি বা মাতামাতি করলে যে ধর্ম সাধনা তথা মনুষ্যেত্বের চর্চা কিছুতেই সম্ভব নয় তা তিনি ভাল করেই জানতেন। আর নিজের কাণ্ডজ্ঞানকে গুরু বা পীরের হাতে তুলে দেওয়ারও তিনি ছিলেন বিরোধী। ... ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাণ্ডজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই উক্তিতেঃ "যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র, যা শাস্ত্র তা-ই বিশ্বাস্য নয়।" গুরুবাদে যারা বিশ্বাস করে তারা বিশ্বাস/অবিশ্বাস নির্বিচারে সবগুলো বাক্যকেই মনে করে বেদবাক্য। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে চরম দুর্গতি কল্পনা করা যায় না।[২৫]

খ. আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মুক্ত-বুদ্ধির মানুষ আজো জন্মায় নি। তাই আমরা যারা নিজেদের বুদ্ধিকে কিছুটা মুক্ত রাখতে চাই, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সহজেই প্রিয় হয়ে পড়েন।[২৬]

গত আড়াইশত বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় ধর্মকে বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিতে টেনে আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। এতে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাভবান হয়েছে সত্যি। তবে সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ হয়নি। বরং ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে মানুষে মানুষে বিভেদ আর হানাহানি সৃষ্টি করা হয়েছে। রাষ্ট্র রাজনীতি আর ধর্মের মিশ্রণে মানুষ হয়েছে প্রতারিত আর বিভ্রান্ত, দেশ হয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ, সভ্যতা হয়েছে বিপর্যস্ত। যুগে যুগে মনিষী আর চিন্তাবিদগণ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা আর

সম্প্রীতির সপক্ষে কথা বলেছেন। কিন্তু ধর্মের নামে অধর্ম অনুশীলনের ধারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের উপর নিপীড়ন আর সাম্প্রতিক ধর্মীয় জঙ্গীবাদের সর্বনাশা ছোবলে মানব সভ্যতা বিপন্ন, সংকটাপন্ন। এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় মানুষের মানুষ পরিচয়কে সব কিছুর ঊর্দ্ধে তুলে ধরা। উপলব্ধি করা মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। আর এ অনুধাবন করে কবি নজরুলের উক্তিঃ

মূর্খরা সব শোন
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ মানুষ আনেনি কোন।[২৭]

উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে ধর্ম ও সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন এনেছিল। ঊনিশ শতকের বাংলাদেশে হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের তিনটি স্তর বা পর্যায়ে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং এই তিনটি স্তর হলোঃ

ক. ব্রাহ্ম আন্দোলন,
খ. মুক্ত বুদ্ধি চর্চার আন্দোলন এবং
গ. হিন্দু ধর্মের উদারতাকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস বিরোধী এবং একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজ থেকে সব রকম গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করা এবং অন্ধ-শাস্ত্র নির্ভর না হয়ে যুক্তি ও স্বাধীন-বিচার-নির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এর পরের স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদ, উদার-মনোভাব ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রাণ বলে যাঁরা খ্যাত তাঁরা হলেন, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন। মুক্তচিন্তার আন্দোলনে যাঁরা সবিশেষ ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। হিন্দু ধর্মের বৈশ্বিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ের বক্তব্য ও আদর্শকে সমর্থন ও প্রশংসা করে এবং নিজস্ব বক্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির মুক্তচিন্তা ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন।

খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সন্ধানে মুসলিম সাহিত্যকবৃন্দ

বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ ঘটে মূলত ঊনিশ শতকে। ঊনিশ শতকে বাংলায় যা ঘটে তা ছিল অভূতপূর্ব একটি অধ্যায়। এ সময়ে হিন্দু মুসলমানের অবস্থান সম্পর্কে বাংলা ভাষার লেখকেরা পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন স্বতন্ত্র ও বহু বক্তব্য এবং বিশেষণও স্থান পেয়েছে। তবে কারও কারও মতে বাঙালির চিন্তাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে এবং নবযুগের সূচনা হয়, কালের স্বাভাবিক নিয়মে।

দীর্ঘ সাতশত বছর ধরে প্রচলিত সামন্ত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে ইংরেজ শাসকদের আগমনে। আধা-সামন্ত আধা-ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে ও শ্রেণি ধর্মের বিচারে তাই ঊনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পাদকে কেউ কেই চিহ্নিত করেছেন 'মধ্য শ্রেণির সাহিত্য' বলে। একে আবার সমগ্র বাঙালির সাহিত্য অনেকেই বলতে চাননি।

বাংলার জাগরণের বৈশিষ্ট্য ও পরিণাম শেষ বিচারে যা-ই দাঁড়াক, এই জাগরণ ঘটিয়েছিল যে মধ্যে শ্রেণির বাঙলা সাহিত্য তাতে মুসলমানের একক কোন অবদান নেই। জাগরণকালীন সাহিত্যে শিল্পে সমাজ সংস্কারে হিন্দুদের বেশি অবদান ছিল। মুসলমানের উত্থান ঘটে বিশের শতকে, দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে। কাজী আবদুল ওদুদের মতে ১৯২৬ সালে 'ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সময় থেকে। প্রকৃত পক্ষে নবনূর (১৯০৩) থেকে এই জাগরণের আরম্ভ হয়। বুদ্ধির মুক্তিবাদীদের পূর্বসূরী বেগম রোকেয়া ছিলেন এই জাগরনের প্রধান কাণ্ডারি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কিংবা নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের পর এ মন্তব্য করা চলে যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ন্যায় এই নবজাগরণের প্রভাব ঘটেছিল সুদূরপ্রসারী। ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ-সকল ক্ষেত্রে যে রূপান্তর তাঁর মূলে এক বড় শক্তিরূপে কাজ করেছে বাঙালি হিন্দু কর্তৃক সাধিত এই নবজাগরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যখন বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ঘটে চলেছে; তখন বাঙালি মুসলমান সমাজের নেতা মনীষী নবাব আবদুল লতিফ মুসলমান বাঙালিদের মাতৃভাষা হিসাবে উর্দুকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২) যখন সারা ভারতের স্বাধীনতার বেদবাক্য হয়ে উঠেছিল, তখন মুসলমান সাহিত্যিক মীর মোশারফ হোসেন বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫) লিখে চলেছেন একান্ত মগ্নতায়।

ঊনিশ শতকের শেষ দশক দুটিতে মুসলমানেরা হারানো মুসলিম ঐতিহ্য মন্থন করে চলেছিলেন। কেউ কেউ মুসলমানদের সমাজকে সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। একদল হিন্দুর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন, ভাবছিলেন হিন্দুরা মুসলমানের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। এভাবে তারা স্বদেশী আন্দোলনমুখর বিশ শতকের পাদপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু ছাড়া ঊনিশ শতকে প্রকাশিত মুসলিম রচিত বিখ্যাত সাহিত্য কর্ম আর দুটো পাওয়া যায়নি। তৎকালীন নবজাগরণের কালে মুসলমানেরা আত্মনিমগ্ন থাকায় সাহিত্য তথা চিন্তাচেতনার জগতে প্রায় একশ বছরের মত পিঁছিয়ে পড়েছিল। পরিতাপের বিষয় যে, আধুনিক সাহিত্যে শিল্পের সৃষ্টিক্ষেত্রেও তাঁদের পশ্চাৎপদতা রয়েই গিয়েছিল।

উল্লেখ্য ঔপনেবিশক আমলের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ও ভারতের উর্দু-ভাষী মুসলমানদের জীবনে প্রকৃষ্ট ধারায় বিচ্যুতি ঘটাতে পারেনি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে রাজাশ্রয়হীন বাংলার মুসলমান দল অচিরেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। মুসলমান সমাজে মনীষার অভাবের কারণেই, তাদের সমাজ পশ্চাতে পড়ে রইলো। ক্রমে নব-ঐশ্বর্য-লব্ধ হিন্দুর তুলনায় মুসলমান হয়ে চলল দিন দিন অধিকতর শ্রীহীন।

মুসলমান সমাজের এ বিপর্যয়ের মধ্যে শত বিড়ম্বনা পোহাবার পরও যে-কজন মহৎ প্রাণ সাহিত্যিক তাদের চেতনার ধারাকে মূহ্যমান হতে দেননি, অন্তরে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় আলোকিত করে রেখেছেন তাদের আত্মাকে তাঁরা জগৎ ও জীবনের বিচিত্র হর্ষ-বেদনা ও প্রেমের মাধুর্য উপভোগের সুযোগ করে নিয়েছিলেন অকৃত্রিমভাবে।

বাঙালি মুসলমানদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ে রচিত সাহিত্য-ভান্ডারের বিষয়বস্তু ছিল অলৌকিক রূপকথার কাহিনী, ইসলাম ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্য। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবন ও মুসলিম ধর্মবীর ও কর্মী মনীষী চিন্তাবিদদের জীবন ও সাধন-লীলার বর্ণনা। তবে এদের বক্তব্য, ভাষা প্রয়োগ-কৌশল, সাহিত্যরূপ ও শিল্পগুণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এবং যে সকল লেখক ও মনীষী ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারায় লেখনী ধারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মহীউদ্দীন (১৯০৬-১৯৭৫), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন অন্যতম। নিম্নে উপরোক্ত মনীষীগণ বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশে যে অবদান রেখেছিলেন তার বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মীর মশাররফ হোসেন

মীর মশাররফ হোসেন উপন্যাস, নাটক, জীবনী, আত্মজীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে ৩৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। মহররমের বিষাদময় ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদ। বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর জড়তা দূর করে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমেই।

তার পূর্বে বাংলা গদ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মুসলমান সাহিত্যসেবী দেখা যায়নি। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্য আলোক স্নাত হিন্দু সাহিত্যিকরা উন্নত রস ও রুচিসম্মত বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। বাঙালি মুসলমান তখনও বাস্তবকে স্বীকার করতে পারেনি। তখনও তারা দোভাষী পুঁথি সাহিত্য সৃজনেই ব্যস্ত। এমন সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়েই পরিণত প্রতিভাসম্পন্ন মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের আসরে নামলেন। তার সমসাময়িক লেখক একমাত্র বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর প্রভাব ও মিল দেখা যায়।

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে কাঙ্গাল হরিনাথের প্রভাব যেমন সক্রিয় হয়েছিল, পরিণত জীবনে তার স্ত্রীর স্নেহময় প্রভাব তার সাহিত্য সৃষ্টির পথ তেমনি সুগম করে দিয়েছিল। তার বহির্জীবনের নিঃসঙ্গতা অন্তজীবনের এ সহধর্মীনীর সহচর্য সুধায় ভরে উঠেছিল। তার স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা তাকে গৃহাশ্রয়ী করেছিল এবং স্ত্রী কুলসুম বিবিও তার সাহিত্যিক জীবনে নানা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন।

কায়কোবাদ

কায়কোবাদের "অশ্রুমালা" কাব্যের অনেকগুলো কবিতায় আমরা মুসলমানদের প্রাচীন সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে কবিকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখি। মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থা কবিকে বেদনার্ত করেছে। তাই তিনি অতীতের সমৃদ্ধমান যুগকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক- বিষয়ে চিন্তা ভাবনায় শিরাজীর বিপরীত মেরুতে ছিলো কায়কোবাদের অবস্থান। তিনি স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মোটেই পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঘোর বিরোধী। তাই মুসলমানদের গৌরবময় অতীত ও সমকালীন দুরবস্থার কথা তাঁর রচনায় স্বতঃস্ফুর্ত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হলেও হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রয়াসও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। 'অমিয়ধারা কাব্য'র (১৩২৯), ''হিন্দু-মুসলমান'' কবিতায় তিনি বলেনঃ

এ'স ভাই হিন্দু, এ'স মুসলমান
আমরা দু'ভাই ভারত-সন্তান,
এ'স-আজি সবে হয়ে এক প্রাণ
সেবি গে মায়ের চরণ দু'টি।[২৮]

উভয় সম্প্রদায়কে পারস্পরিক বিরোধ পরিহার করে মিলনের মাধ্যমে ভবিষ্যত কল্যাণের পথ প্রশস্ত করার জন্যে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। এতোদিনকার বিরোধের ফলে উভয়ের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়ে গেছে, এখন সে ক্ষতি পূরণ করে নেওয়া উচিত বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। সমাজ জীবনে সকল বিষয়ে অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়কে তাঁদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেনঃ

মোরা দুইটি ভাই-হিন্দু মুসলমান,
ভারত-মাতার যুগল সন্তান,
না জে'নে না শুনে সে গুঢ় সন্ধান,
এতোদিন মোরা ক'রেছি রণ।
আজি তা চিনেছি, সকলি বুঝেছি,
এ'স ভাই এ'স হৃদয় পেতেছি, [২৯]

কায়কোবাদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর 'প্রেম-পারিজাত' কাব্যেও পরিস্ফুট হয়েছে। মোহিদু ও বীণাপাণি পরস্পরকে ভালবাসে। বীণাপাণির অসংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোহিদু বীনাকে বলেঃ

> জাতিভেদ প্রথা মানিত না সে কখনো, হিন্দু মুসলমানে দেখিত সে এক চক্ষে, ভাবিত সে মনে হিন্দু মুসলমান কিংবা ইহুদি খ্রিস্টান সবি বিধাতার সৃষ্টি বিধাতার রাজ্যে সবি এক, মন তার এমনি উদার।[৩০]

মোহিদুর সঙ্গে বীণাপাণির বিয়ে হয়। বীণাপাণি মুসলমান হয়ে যোবেদা নাম গ্রহণ করে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছেন কায়কোবাদ মোহিদু ও বীণাপাণির প্রণয় এবং পরে পরিণয় তারই প্রমাণ দেয়। মোহিদু ও ইন্দুর মধ্যেও এক সময় প্রণয় ছিলো। ইন্দুর ঠাকুরমা এটা মেনে নিতে পারেনি, বলে ঃ

আমরা যে হিন্দু মাগো, সে ত মুসলমান,
শেষে কি ইন্দুর জন্য জাতি ধর্ম্ম যাবে?[৩১]

ইন্দুর ঠাকুরমার জাতি-ধর্ম সংরক্ষিত থাকে মোহিদু ও ইন্দুর মধ্যে বিয়ে হয়নি। ইন্দুর বিয়ে হয় রাখালের সঙ্গে। মোহিদু ইন্দুকে ছোট বোন হিসেবে মেনে নেয়। এখানেও কায়কোবাদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্যণীয় যে, 'প্রেম-পারিজাত' কাব্যে মুসলমান যুবকের প্রতি হিন্দু যুবতীরা আকৃষ্ট হলেও কোন মুসলামান যুবতীর হিন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার নজির নেই। এক্ষেত্রে কায়কোবাদকে ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সমগোত্রীয় মনে হতে পারে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শিরাজী যেখানে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, কায়কোবাদ সেখানে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলমাণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

কাজী ইমদাদুল হক

সমাজের অধিকাংশ মূর্খ জনগণকে মৌলবী মোল্লারা ধর্মের নামে যে প্রতারণা করে, তিনি তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। সমাজকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতার উপর কাজী ইমদাদুল হক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এতে ধর্মচিন্তায় তাঁর উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কাজী ইমদাদুল হকও হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার করে একে অপরকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে উভয় সম্প্রদায় দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর '*আবদুল্লাহ*' উপন্যাসের বিভিন্ন চিত্রে এ বিশ্বাসের প্রমাণ মিলে।

মুসলমানের প্রতি অনেক হিন্দু বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন। নিজেদেরকে তাঁরা 'ভদ্রলোক' বলে দাবি করতেন এবং মুসলমানকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এর একটি স্পষ্ট চিত্র '*আবদুল্লাহ*' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। বারিহাটী জেলা স্কুলে আবদুল্লাহ মাষ্টারী করেন। সাব- রেজিষ্টার আবদুল কাদের ওখানে জয়েন্ট-অফিসে বদলি হয়ে এসেছেন। তাঁর বাসা দরকার। নাদের আলী তার জন্যে শশীবাবুর একটি বাড়ি কুড়ি টাকা ভাড়ায় ঠিক করেছে। এর মধ্যে শশীবাবু একদিন এসে বলেন- বাড়ীটা মুসলমানকে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ,

আমাদের বারের প্রেসিডেন্ট অতুলবাবু ঐ পাড়াতেই থাকেন কিনা --- তা তিনি এবং আরও পাঁচ জনে বলছেন, ও পাড়ায় ভদ্রলোকের বাস, ওখানে মুসলমানকে বাড়ী দিলে সব লোকেরই অসুবিধা হবে, তা-ই ভাবছি- আবার এদিকে ---।

> 'ভদ্রলোকের' পাড়ায় 'মুসলমান' কে থাকিতে না দেওয়ার ইঙ্গিতে আবদুল কাদের বড়ই রুষ্ট হইয়া কহিল, 'তা ও পাড়া যে ভদ্রলোকের পাড়া তা, তো আপনার জানা ছিল, তাতে আমার মত "অভদ্র" অর্থাৎ মুসলমানকে কেন কথা দিয়েছিলেন মশায়?[৩২]

আবদুল্লাহ যখন বরিহাটী স্কুল থেকে রসুলপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার হিসেবে প্রমোশন ও বদলীর আদেশ পান, তখন সতীশ, অবনী প্রমুখ ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাতে আসে। তখন তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

> আশীর্বাদ করি, তোমরা মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হও যে মানুষ হলে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা কত্তে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে মুসলমান হিন্দুকে আপন জন বলে মনে কত্তে পারে। এই কথাটুকু তোমরা মনে রাখবে ভাই, অনেকবার তোমাদের বলেছি, আবার বলি, হিন্দু মুসলমানে ভেদজ্ঞান মনে স্থান দিও না। আমাদের দেশের যত অকল্যাণ, যত দুঃখ কষ্ট, এই ভেদজ্ঞানের দরুণই সব।[৩৩]
>
> আবদুল্লাহর মুখ দিয়ে এখানে কাজী ইমদাদুল হকের কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ধর্মমতে কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের অধিকারী হলেও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) মনে করতেন, ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ধর্ম কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান হতে পারে, তাহলে একে অপরের অমঙ্গল চিন্তা করতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে-এ ধারণা ছিল তাঁর। ১৯২৮ সালে অক্টোবরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন, দ্বিতীয় অধিবেশনে অভিভাষণে তিনি বলেনঃ

> হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখে আমার অনেক বন্ধু বলেন যে, ধর্মটর্ম ভারত বর্ষ থেকে দূর না করলে, ভারতে শান্তি হবে না স্বরাজও হবেনা। কিন্তু আমি বলি ধর্ম নেই বলেই ত এত বিবাদ হচ্ছে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে, ধার্মিক নিজে শান্তি পাবে, আর পাবে তার হাতে সমস্ত দুনিয়া শন্তি। যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম্ম নয়, পরম অধর্ম্ম। ইসলাম শব্দের দু'টি মানে, আত্মনিবেদন, আর একটি শান্তি স্থাপন।[৩৪]

ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্বও তাৎপর্য নিয়ে বিতর্ক সে যুগেও ছিল। যুব সম্প্রদায়ের একাংশ একে এক প্রকার বন্ধন ও ভন্ডামি বলে মনে করতো। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনের মাঝে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। তবে যে আনুষ্ঠানিকতায় কেবল বাহ্যিকতা আছে, আন্তরিকতা নেই, সে আনুষ্ঠানিকতার কোন মূল্য নেই। উক্ত যুবক সম্মেলনে একথাটিই শহীদুল্লাহ যুব সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এভাবেঃ

> যুবক চায় সকল বাঁধন থেকে ছুটে যেতে। তা'দের মনে করা স্বাভাবিক, ধর্ম একটা বাঁধন। ইসলাম আজ যে রূপ নিয়েছে, তাও একটা বাঁধন বই কি। অর্থ বোঝা নাই, কেবল শব্দের আবৃত্তি, অনুষ্ঠান আছে, নাই তার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য, বাহ্যিকতা আছে, নাই আন্তরিকতা। এসব ভন্ডামি, এর চেয়ে সাফ নাস্তিক হওয়া ভাল। ..... কিন্তু আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, ধর্ম বন্ধন নয়, ইসলাম বন্ধন নয়। ইসলাম পরম মুক্তি। .... আজ ১৪০০ বৎসরের অভিজ্ঞতা দিয়ে কুরআন মজীদ বুঝতে হ'বে, হাদীস শরীফ বুঝতে হ'বে। ফিকহ্ নতুন করে গড়তে হবে। ইসলাম চিরদিনের জন্য চির নতুন।[৩৫]

আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ধর্মের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর অগাধ। তিনি ১৩৩৫ সালে একটি প্রবন্ধে বলেনঃ

> আল্লাহ তা'আলার করুণা অনন্ত, তাঁহার দানও অনন্ত। .. ধর্ম দয়াময় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান। সেই ধর্মের উদ্দেশ্যে মানব তাহার আমিত্বকে আল্লাহর প্রীতির জন্য বিসর্জন দিয়া সমস্ত জগতে প্রেম ও শান্তির স্বর্গ বসাইবে। [৩৬]

> আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকলে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল মানুষ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী ও গাছপালার প্রতিও ভালোবাসা থাকতে হবে, কেননা, সৃষ্টিকে ভালোবাসা স্রষ্টাকে ভালাবাসার সমতুল্য। ইসলামে বিশ্বাসের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে একই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, কোন মুসলমানের আল্লাহর সেবা অর্থহীন, যদি না সে বিশ্বের সেবায় ব্রতী হয়।[৩৭]

মীর ফজেল আলীর 'কোরান-কণিকা' গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৩১ সালে 'কুরআন শরীফের মহিমা' ব্যাখা করে একটি আলোচনা লেখেন। এতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

> জগতে যদি সর্বাপেক্ষা আশ্চার্য্যজনক কোনও বস্তু থাকে তাহা মহামহিম কুরআন। .... বিশ্বাসী ভক্তের নিকট কুরআন আল্লাহর শ্বাশত বাণী। ইহাতে মানবের ইহ-পরলোকের সমস্ত মঙ্গল নিহিত আছে।[৩৮]
>
> কুরআনকে জানার জন্য, বোঝার জন্য বহু মনীষী আজীবন সাধনা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে। তবে শহীদুল্লাহর মতে- কুরআন শরীফের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে মূল পুস্তক অধ্যায়ন করিতে হইবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। তাহার জন্য চাই বিশ্বাসী, ভক্তিপূর্ণ ঐকান্তিক মন।[৩৯]

সমসাময়িক সমাজের আদর্শচ্যুতি ও কুসংস্কার দেখে তিনি মর্মাহত। তাই তাঁর সতর্কবাণী- এই অধর্ম যুগে কুরআন অনুসরণ ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই।[৪০]

আল্লাহ, রসুল, কোরানের প্রতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অগাধ বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু ইসলাম ধর্ম বলতে তিনি কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা কিংবা শাস্ত্রীয় সংস্কারকে বুঝেননি। ধর্মের বাহ্যরূপকে অতিক্রম করে তার অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তিনি। মুক্ত বুদ্ধি দিয়ে ইসলামকে বিচার করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁর রচনায় তাঁর উদারনৈতিক ধর্মচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হিন্দু-মুসলমানের মিলন ব্যতিরেকে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ আশা করা যায় না, এ কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কিন্তু মুসলমান সমাজ নানাকারণে পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে। অথচ মুসলমানদের মধ্যে মেধার অভাব নেই, সমান সুযোগ ও সুবিধা পেলে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় হিন্দুর সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে- এ বিশ্বাস মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছিল। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, রাজনৈতিক উন্নতি চাইলেও মুসলমান সমাজকে শিক্ষিত করে নেওয়া প্রয়োজন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদির পেছনে ধর্মীয় গোঁড়ামি কাজ করছে। প্রকৃত ধর্ম কল্যাণকর, যা ক্ষতিকর তা ধর্ম নয়, অধর্ম। ধর্মের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্রিয়া অনুষ্ঠান ভিত্তি করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অসন্তোষ, সে সম্পর্কে শহীদুল্লাহর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

> এই যে ঝগড়া-বিবাদ, একে আমি ধর্ম্মের জন্য ঝগড়া বলিনা। এমন কোন কথা হিন্দুর বেদে পুরাণে নেই যে এক মিনিটের জন্য মসজিদের সামনে বাজনা থামালে, তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম পন্ড হয়ে যাবে। এমন কথা মুসলমানের কুরআন হাদীসে নেই যে বিধর্ম্মী মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে, মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। প্রত্যেকে বলেছে তাদের স্বত্ব তারা বজায় রাখবে..... সকলের চেয়ে বড় স্বত্ব ত স্বাধীনতা, সে যে আমাদের জন্মগত স্বত্ব। অন্য স্বত্ব সব তারই ছায়া। হিন্দু মুসলমানে খুনাখুনি এই ছায়া নিয়ে। ওদিকে স্বরাজের ঘোড়া পালিয়ে যায়।[৪১]

ভারতবাসীর মূল লক্ষ্য স্বাধীনতা। উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ব্যতিরেকে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর নয়। শহীদুল্লাহ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, হিন্দু-মুসলমান ছোট খাটো ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে পরস্পর খড়্গহস্ত হয়ে আছে, ফলে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য থেকে তারা ক্রমে দুরে সরে যাচ্ছে। পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্যে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুসলিম যুবকদের উদ্দেশ্যে একই অভিভাষণে তিনি বলেনঃ

> ... আমি মনে করি, আমরা একসঙ্গেই এক সময়েই মুসলিম ও ভারতবাসী। আমরা জন্মান মাত্রই হয়েছি মুসলিম ও ভারতবাসী। ইসলাম স্বদেশপ্রেমের বিরোধী নয়।[৪২]

একে অপরের সংস্কৃতি উপলব্ধি করতে পারলেই হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সহজতর হবে বলে শহীদুল্লাহর ধারণা। পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এদের মধ্যকার বিরোধ অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে। পরধর্মের

প্রতি সহিষ্ণু হয়ে নিজ-ধর্ম প্রচারের মধ্যে কোন দোষ আছে বলে শহীদুল্লাহ মনে করেন না। তিনি ১৩৩০ সালে একটি প্রবন্ধে বলেনঃ

> ... আমি বিশ্বাস করি কালচারের মধ্য দিয়াই আমাদের মিলন হইবে। যে পর্যন্ত মুসলমান হিন্দু কালচার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে এবং হিন্দু মুসলমান কালচার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে, সে পর্যন্ত কখনই আন্তরিক মিল হইবে না। এই মিলনপন্থী হইয়াও আমি স্বীকার করি প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার আছে।[৪৩]

বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান যে পরস্পর নির্ভরশীল এবং এরা যে একে অপরকে বাদ দিয়ে চলতে পারবে না, 'ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে "আমাদের ভাষা সমস্যা" প্রবন্ধে একথাটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

> হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া বাঙালি জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে। কিন্তু দূর ভবিষ্যতেই হউক না কেন, তাহা ত করিতেই হইবে। বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমান ব্যতীত চলিতে পারিবে না। বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দু ব্যতীত চলিতে পারিবে না।[৪৪]

এ সকল বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রশ্নে শহীদুল্লাহ গোঁড়ামি মুক্ত, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন।

এস. ওয়াজেদ আলি

ইসলামের প্রতি তাঁর যত অনুরাগই থাকুক, এ কথা সত্য যে, তাঁর চিন্তাধারায় কখনো কোনো গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পায়নি। মানুষের ধর্মই সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে-এরূপ একটি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পোষণ করতেন। 'জীবনের শিল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্য' প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর একটি বক্তব্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

> আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ, আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি বাঙালি বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ, একটা গোলাপের গাছ যেমন সাধারণ উদ্ভিদের ধর্ম অবহেলা করে গোলাপের গাছরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, তেমনি একজন মানুষও সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম অবহেলা করে আদর্শ মুসলমান, আদর্শ ভারতবাসী, কিংবা আদর্শ বাঙালি হতে পারে না।[৪৫]

যারা ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্দি করার চেষ্টা করেনা, বরং তার আনুষ্ঠানিকতা ও বাহ্যরূপকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়, সেসব মুসলমান সম্পর্কে প্রবন্ধটির অন্যত্র তিনি বলেনঃ

> ... মুসলমান বললে এখন আমাদের চোখের সামনে স্থবির এক মানবের ছবি ফুটে উঠে, যার চিন্তার প্রধান বিষয় হচ্ছে দাঁড়ি আর গোঁফের আকার-প্রকার, পোষাকের বিশেষত্ব, আর ধর্মের খুঁটিনাটি ক্রিয়াকর্মের জটিল বিধি-নিষেধের সুদীর্ঘ তালিকা। সে এই সব অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ জিনিসকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, সে ধর্মের বাইরে আচার-অনুষ্ঠানের কথাই ভাবে, তার অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে চেয়ে দেখে না।[৪৬]

কালের ধারার যুগের দাবিতে ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজন, একথা ওয়াজেদ আলি বিশ্বাস করতেন। নতুন যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে ধর্মকে নতুন রূপে গড়ে তুলতে হবে, নচেৎ ধর্ম কতিপয় অন্ধবিশ্বাস ও অযৌক্তিক সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে থাকবে- এমনি একটি চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে একই প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ

> ধর্মকে প্রত্যেক যুগে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, নব নব সমস্যার, নব নব সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। নব যুগের আশার সঙ্গে, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে তাকে সুসংযোজিত করে দিতে হবে। তা যদি করতে না পারা যায়, তা হলে ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন বিধি-নিষেধের তালিকায় পর্য্যবসিত হবে।[৪৭]

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যারিষ্টার এস ওয়াজেদ আলি ধর্মচিন্তায় যে সংস্কার-মুক্ত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।এস, ওয়াজেদ আলি বাঙলার মঙ্গল ও বাঙালির কল্যাণের সাধনা করেছেন। তার মতে, হিন্দু, মুসলমানের সম্প্রতি ব্যতিরেকে বাঙলার মঙ্গলে আশা করা যায় না। তিনি জীবনের শিল্প (১৯৪১) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বাঙালি মুসলমান শীর্ষক প্রবন্ধে বলেনঃ

> বাঙলার মঙ্গল হচ্ছে আমাদের আদর্শ। এ আদর্শ যেদিন প্রকৃতই আমাদের অন্তর অধিকার করবে, সেদিন হিন্দু মুসলমানের বিরোধেরও শেষ হবে। কেননা, হিন্দু এবং মুসলমান, উভয়ের মঙ্গল ছাড়া, বাঙলার মঙ্গল হতে পারে না, আর হিন্দু এবং মুসলমানের সম্প্রীতি ছাড়া বাংলার গৌরব কখনও মাথা তুলতে পারে না।[৪৮]

হিন্দু মুসলমান বিরোধ নিরসনের উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি 'ভবিষ্যতের বাঙালি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে বলেনঃ

> হিন্দু মুসলমান যখন পরস্পরকে চিনতে শিখবে, পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখবে, পরস্পরের ধর্ম ও সভ্যতাকে সম্মান এবং আদর করতে শিখবে, পরস্পরের সঙ্গে খাওয়া-বসা, খেলাধুলা, মেলা-মেশা, আনন্দ-উৎসব করতে শিখবে, মনের মিল তখন আপনা থেকেই আসবে, বিরোধ আপনা থেকেই চলে যাবে।[৪৯]

এটা নিঃসংশয় যে, এস, ওয়াজেদ আলি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অবসান চেয়েছেন, তাদের মিলন কামনা করেছেন। তিনি বাঙালি জাতীয়বাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমুন্নীত করতে হলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতি অপরিহার্য।

কাজী মোতাহার হোসেন

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোক্ত ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। তাই, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিলো নিবিড়। ধর্মকে এর তুচ্ছ সংস্কার থেকে মুক্ত করে যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলা তাঁর লক্ষ্য ছিলো। তাঁর মতে, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিশ্বাসের ব্যাপার, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে টানাটানি করার আবশ্যকতা নেই। এ প্রসঙ্গে 'সঞ্চারণ' গ্রন্থের 'লেখক হওয়ার পথে' প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ

> ধর্ম মানুষের হৃদয়ের পরতে পরতে এমন ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে, যে তাকে মুছে ফেলবার মত ক্ষমতা কারো নাই। তবে ধর্ম যদি জীবন্ত হয়, তাহলে প্রত্যেকের অন্তকরণে তার বিকাশ ও পরিণতি হওয়াও স্বাভাবিক, কেউ তা' রোধ করতে পারবে না। আর আপনারা যে ধর্মকে সমাজের কোঠায় টেনে এনে ধর্মের পরিধি বাড়াতে চাচ্ছেন, এটা বড় জবরদস্তি হচ্ছে।[৫০]

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোরান-হাদিসের বিধি-বিধান প্রয়োগ করে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে, একই গ্রন্থের 'শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য' প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ

> পুরাতন মাদ্রাসা পদ্ধতির শিক্ষা অপেক্ষা বর্তমান ইংরেজি পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ অধিক হয়। এ জন্য কালের ভাবধারার গতি উপলব্ধি করিয়া যাহাতে কোরান হাদিসের অমূল্য সম্পদ বর্তমানের প্রত্যেক সমস্যায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে চিন্তা করা শিক্ষিত প্রচারক ও মৌলভী সাহেবদের উচিত।[৫১]

কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৭৬) গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

> বস্তুত সমাজে সংস্কৃতি, শিল্প ও ধর্ম নিয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাঙালি মুসলামন সমাজে যে নতুন চিন্তার উদগম হয়-নবজাগরণের সেই চিন্তার ধ্বনি আমাদের সকলের চিন্তায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[৫২]

নিঃসন্দেহে বলা যায়, কাজী মোতাহার হোসেন ধর্ম সম্পর্কে উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মুসলিম লেখক ছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম মানবতাকে ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছেন। 'যুগবাণী' গ্রন্থের 'নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি সাম্প্রদায়িক মিলন কামনা করে বলেনঃ

> আজ মহাবিশ্বে মহা জাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহা মানবতার মহাযুগের মহা উদ্বোধন।
> এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সবস্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয় ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি! আজ আমরা আর কলহ করিব না।[৫৩]

তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ভেদাভেদের মধ্যে কোন গৌরব নেই, 'মানুষ ধর্ম'-ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে তিনি বিশ্বাস করেন। ছুঁৎমার্গ প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, নিজের ধর্মকে যে ভালোবাসে ও সত্য বলে জানে যে বিশ্বের সকলকে, সকল ধর্মকে ভালোবাসতে শিখেছে। নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকলেই অন্যের ধর্মকে বিশ্বাস করার ও অন্যকে প্রাণ দিয়ে আলিঙ্গন করার শক্তি অর্জন করা যায়। যারা অন্য ধর্মকে, অন্য মানুষকে ঘৃণা করে, নীচ ভাবে, তারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাদের নিজেরও কোন ধর্ম নেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

> হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহা গগণ তলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া মানব.. তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম"।
> মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও শুদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ.. তুমি সত্য।[৫৪]

এখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন সাধনের পক্ষে কবির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দুকে আহ্বান করে তিনি বলেছেন যে, অখণ্ড ভারত গড়তে হলে, হিন্দু-মুসলমানের সত্যিকারের মিলন চাইলে, হিন্দুকে মুক্ত মানবতাবোধে উদ্দীপিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। একই প্রবন্ধে এ সম্পর্কে তিনি হিন্দুকে বলেনঃ

> এসো, যদি পার, তোমার স্বধর্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা রাখিয়া আকাশের মত উদার অসীম প্রাণ লইয়া এসো। এসো তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দুপায় দলিয়া মানুষের মত উচ্চশিরে তোমার মুক্ত বিথার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এসো, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষ লইয়া। সে মহা-আহ্বানে দেখিবে আমরা হিন্দু-মুসলমান ভুলিয়া যাইব। ... আমরাই ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিব।[৫৫]

ভাঙার গান কাব্যের 'জাগরণী' কবিতায় তিনি মানবতার জয়গান করেছেন, জেগে ওঠার আহ্বান করেছেন 'সত্যমানব'-কেঃ

> দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।
> পুরুষ সিংহ জাগোরে।
> সত্য মানব জাগোরে।
> বাধা-বন্ধন-ভয় হারা হও।
> সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও।[৫৬]

এতে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। 'সাম্যবাদী' কাব্যের 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি বলেছেন যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রিস্টান সকলেই সমান এবং মানব-হৃদয়ই সকল সত্যের উৎসভূমি, সকল ধর্মের মিলন-ক্ষেত্র। তাঁর ভাষায়-

> গাহি সাম্যের গান...
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
> যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান। ...
> মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
> এইখানে বসে ঈসা, মুসা পেল সত্যের পরিচয়।[৫৭]

'ঈশ্বর' কবিতায় তিনি বলেন যে, মানুষের বুকের মধ্যেই ঈশ্বর লুকিয়ে আছে। 'মানুষ' কবিতায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, মন্দির-মসজিদে মানুষের দাবি অগ্রাহ্য হচ্ছে, মোল্লা-পুরোহিত দুয়ারে চাবি লাগিয়েছে। ধর্মের নামে এই প্রতারণার প্রতি তীব্র ঘৃনার সঙ্গে নজরুল অনেক অসংখ্য ব্যঙ্গোক্তি করেছেন।[৫৮]

'বাঁধনহারা' উপন্যাসে রেবাকে লেখা সাহসিকার চিঠিতে নজরুলের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। রেবাকে চিঠিতে সাহসিকা বলেঃ

> ... সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পর- যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনো রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম। আমি, তো কোন ধর্মের বাইরের (সাময়িক সত্যরূপ) খোলসটাকে ধরে নেই। গোঁড়া ধার্মিকদের ভুল তো ঐখানেই। ধর্মের আদত সত্যটা না ধরে এঁরা ধরে আছেন যত সব নৈমিত্তিক বিধি-বিধান।[৫৯]

'প্রলয় শিখা' কাব্যের 'বিংশ শতাব্দী' কবিতায় নজরুলের আহ্বানঃ

> হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
> নব-চেতনায় জাগো জাগো, ওঠ বীর।
> নব ধ্যান নব ধারণায় জাগো,
> নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো।[৬০]

ধর্মের শো কাটিয়ে ওঠে কবি মানবতার গান গাইছেন। তিনি বলেনঃ

> কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আদিম-নেশা,
> ধ্বংস করেছি ধর্ম-যাজকী- পেশা।
> ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ,
> ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত-
> এক মানবের একই রক্ত মেশা।[৬১]

উল্লিখিত বক্তব্যসমূহে নজরুলের ধর্মনিরপেক্ষ জীবন চেতনার স্বাক্ষর রয়েছে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আন্তরিক মিলন-কামনা ছিল কাজী নজরুল ইসলামের আজীবন স্বপ্ন। হিন্দুদের ছুঁৎমার্গ-রূপ কঠিন আচার, মুসলমানদের ক্ষেত্র বিশেষ গোড়াঁমী, মন্দির-মসজিদ জাতীয় বির্তক, ইংরেজ সরকারের ভেদনীতি ইত্যাদিকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে প্রীতির সম্পর্কে স্থাপন করতে উভয় সম্প্রদায়কে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

যুগবাণী গ্রন্থের ছুঁৎমার্গ প্রবন্ধে তিনি বলেছেনঃ

> আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই।
> ... ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনেই বিশেষ সকলের কাছে সমান সত্য।
> মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি।[৬২]

ছুলেই মানুষের জাত যেতে পারে, একথা মানতে নজরুল রাজী নন। এ সম্পর্কে বিষের বাশী কাব্যের জাতের নামে বাজ্জাতি শীর্ষক গানে বলেনঃ

> জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া
> ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
> হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবলি এতেই জাতির জান,
> তাই ত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশ'-খান।[৬৩]

নজরুল ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমার কথা বলেছেন, ব্রাহ্মদের সংস্কার- মুক্ত শালীনতা ও সংযমের প্রশংসা করেছেন। ব্রাহ্ম ধর্মানুসারীদের সঙ্গে তুলনায় হিন্দুদের সংকীর্ণতা, ছুঁৎমার্গ ও ধর্ম-বিদ্বেষের তিনি নিন্দা করেছন। বাধন হারা

উপন্যাসে তার প্রমাণ মেলে। রাবেয়ার এক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ব্রাহ্ম-মহিলা এবং শিক্ষয়িত্রীর মেয়ে 'সাহসিকা'। মাহবুবাকে লেখা এক চিঠিতে রাবেয়া এঁদের সম্পর্কে বলেনঃ

> আমার পূজনীয়া শিক্ষায়িত্রী ঐ ব্রাহ্ম মহিলার কথা মনে পড়লে এখনো একটা বুক ভার পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এত মহিমান্বিত মৃত-শ্রীমন্ডিতা যে থধর্মের নারী, ... সে ধর্মকে সে সমাজকে আমি সালাম করি। ... এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বা ছুঁৎমার্গের ব্যামো নেই, কোন সংকীর্ণতা, ধর্ম বিদ্বেষ, বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আমরা বড় বড় হিন্দু পরিবারে সঙ্গে মিশেছি। ..... কিন্তু এমন দিল্-জান খোলাসা করে প্রাণ খুলে সেখানে মিশতে পারিনি। .. এ আমি জোর করে বলতে পারি, এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দু সমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তা হলেই হিন্দু-মুসলমানের এক-দিন মিল হয়ে যাবে।[৬৪]

এখানে রাবেয়া নিজের চিঠিতে নজরুলের বক্তব্যই উপস্থিত করেছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে ভুলে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান বাহ্যিক আচার ও তুচ্ছ ও বস্তুকে অহেতুক গুরুত্ব দিয়ে পরস্পরের সংঘাতে লিপ্ত হয় বলে নজরুলের ধারণা। রুদ্রমঙ্গল গ্রন্থের মন্দির ও মসজিদ প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ

> ভুতে পাওয়ার মত ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদের মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যে দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়, তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ-স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি। মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই।[৬৫]

হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে এক স্থানে নজরুল বলেনঃ

> হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামরি বিধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি হিন্দু-মুসলমানের মারামারি নয়।[৬৬]

হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যই ভারতে ইংরেজ শাসনকে টিকিয়ে রেখেছে বলে নজরুলের ধারণা। তাঁর মতে, এই দুই সম্প্রদায় যেদিন নিজেদের বিভেদ ভুলে গিয়ে প্রীতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হবে, সেদিন ইংরেজকে এদেশ ত্যাগ করতে হবে।

কুহেলিকা উপন্যাসে শিক্ষক প্রমত্ত নিজের জবানীতে লেখকের বক্তব্যই তুলে ধরেছেনঃ

> ইংরেজের ভারত-শাসনের বড় যন্ত্র কি, জানিস? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। ... যেদিন ভারত এক জাতি হবে সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুটলি বাঁধতে হবে। 'হিন্দু' মুসলমান' এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিইত ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা-কবজ।[৬৭]

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা প্রবন্ধেও নজরুলের এই বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়ঃ

> ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি-শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে- তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে অশ্রদ্ধা করে।[৬৮]
>
> হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্যে নজরুলের সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিলো। সংস্কারমুক্ত চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে তিনি এ ক্ষেত্রে উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন- কুহেলিকা উপন্যাসের জয়তী এরূপ একটি চরিত্র। জয়তী ছিলো সংস্কার বর্জিত চেতনার ধারক, ছোঁয়াছুঁয়ির অসংকীর্ণতা তাকে অধিকার করতে পারে নি।

হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের নৃশংসতায় বহু লোক নিহিত হওয়ার ঘটনা ভারতবাসীকে পরোক্ষ উপকার করছে বলে নজরুল মনে করেন। কয়েক শ লোকের প্রাণ-বিসর্জন কোটি কোটি ভারতবাসীর দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, তারা বুঝতে পেরেছে ইংরেজ এদেশের কল্যাণ চায় না, ইংরেজ তাদের আপনজন নয়। এই ইংরেজকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। ডায়ার তাদের ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে, ডায়ারের হত্যাকাণ্ড তাদেরকে জাগিয়েছে। যুগবাণী গ্রন্থের 'ডায়ারের' স্মৃতি স্তম্ভ প্রবন্ধে নজরুল বলেনঃ

আমাদিগকে জাগিয়েছে ডায়ার- অন্ধত্ব ঘুচিয়েছে ডায়ার। .. ডায়ারের আঘাতে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কেঁদেছে। "এস ভাই হিন্দু। এস ভাই মুসলমান। তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ-ক্লেষ, অনেক ব্যাথা-বেদনা ঝড় বহিয়া গিয়াছে আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই। খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই।[৬৯]

রুদ্রমঙ্গল গ্রন্থের আমার পথ প্রবন্ধে ধূমকেতু পত্রিকার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নজরুলের বক্তব্য হলোঃ

ধূমকেতু কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা কর'তে পারেনা।[৭০]

গান্ধীজীর চরকাতত্ত্বকে ভারতবাসীর স্বরাজ-অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হতো। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় চরকা-নীতিকে গ্রহণ করছিলো। নজরুল তাই চরকাকে এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের সেতুবন্ধন রূপে বিবেচনা করেছেন। বিষের বাঁশী কাব্যের চরকার গান কবিতায় তিনি বলেনঃ

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,
তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে
রচ্‌লি চক্রে তোর
তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
আবার তোর মহিমায় বুঝল দু'ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়।[৭১]

হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নজরুল অনুপ্রাণিত করেছেন ফণি-মনসা (১৩৩৪) কাব্যের যা শত্রু পরে পরে কবিতায়ঃ

আল্লাহ ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন।
ধর্ম-কলহ রাখ দু'দিন।....
শত্রুর গোরে গলাগলি কর আবার হিন্দু-মুসলমান।
বাজাও শঙ্খ দাও আজান।[৭২]

হিন্দু-মুসলমান যে শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, সেই শক্তির মিলিত স্রোত উভয়ের সাধারণ শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে এক সময় ব্যবহৃত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' নামক ব্যঙ্গ কবিতায়ঃ

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, গুড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।
করুক কলহ-জেগেছে তো তবু-বিজয়- কেতন উড়া।
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।[৭৩]

হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রশ্নে নজরুল গোঁড়ামীমুক্ত, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন। নজরুল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে স্বদেশ মুক্ত করতে হলে উভয় সম্প্রদায়ের মৈত্রী অপরিহার্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

তথ্য নির্দেশঃ

১. প্রীতি কুমার মিত্র, *'হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন'* সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২) পৃষ্ঠা ২৬১। এখানে আরো উল্লেখ্য রামমোহনের কাছে শেখ সাদীর একটি কবিতা অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তার দ্বারা তিনি দারুণভাবে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। কবিতাটি হলোঃ

তরিকত বজুজ খেদমতে খলক নিসত
বতস্‌বিহ ওয়া সাজ্‌সাদাও দল্‌কনিস্‌ত!
এর অর্থ হলো, সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়।
তসবিহ জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম নাই।

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ৪র্থ খণ্ড, ২০০০), পৃ ১১৬।

৩. 'রামমোহন তাহার লিখিত দলিলেও এইরূপ নির্দেশ দিয়ে যান যে, কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিবেন তাহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে এই মন্দিরের দ্বার উম্মুক্ত থাকিবে! তবে এখানে কোন সাম্প্রদায়িক নামে ভগবানের উপাসনা হইতে পারিবে না, কোন প্রকার চিত্র বা প্রতিমূর্তি ব্যবহৃত হইবেনা, প্রাণিহিংসা হইবেনা, পানভোজন হইবেনা এবং কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয় এবং প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ হয়, সেই আদর্শ অনুযায়ী বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে। এই 'আদর্শের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান এই মন্দিরে হইতে পারিবেনা।'

৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২০

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

৭. মনি বাগচি, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, কলিকাতা ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৬১-৬২

৮. সর্বপ্রথম দীক্ষা নিলেন শ্রীধর ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য এবং তৃতীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতঃপর দীক্ষিত হলেন বিভিন্ন মনীষীরা। দীক্ষানুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

৯. আবদুল হক (সম্পাদিত) *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলার জাগরণ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০) পৃষ্ঠা ৪৫

১০. ড. আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাঙালির দর্শন প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১১২

১১. সুশোভন সরকার (সম্পাদিত) *বাংলার রেনেসাঁস*। প্রকাশ রেনুকা সাহা, কার্তিক ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ২৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

১৩. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩

১৪. উদ্বৃত, মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শনঃ মানুষ ও সমাজ*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০) পৃষ্ঠা ২৯৭

১৫. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শনঃ প্রাচীন কাল থেকে সমকাল* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪) পৃষ্ঠা ১২২

১৬. শ্রী গোপাল হালদার সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ৩২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১

১৮. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০

১৯. নীরু কুমার চাকমা, *'রামকৃষ্ণের জীবন দর্শনে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব'* শরীফ হারুন সম্পাদিত, *বাংলাদেশে দর্শনঃ ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ২৭৫*

২০.সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *'শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্ম সাধনা' বাংলাদেশে দর্শনঃ প্রকৃতি ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান, তৃতীয় খণ্ড (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ২৩৪*

২১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *'দর্শন কেন এগোয়না'* বাংলাদেশ সমিতির বার বছর (স্মারক সংকলন) ঢাকা-১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৬৪

২২.ড. আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাঙালির দর্শন প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩৯

২৩.প্রাগুক্ত

২৪.সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎঃ ধর্মচিন্তা, বরীন্দ্ররচনা সংকলন, পঞ্চম খণ্ড*, (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, ১৯৮৯) ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২৯

২৫.আবুল ফজল, *লেখকের রোজনামচা'* (ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৩০

২৬.আবুল ফজল, *'রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম'* সমকাল রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ-৯ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৬৩১-৬৩২

২৭.আবুল হুসেন, *আমাদের রাজনীতি* 'আবদুল কাদের (সম্পাদিত) *আবুল হুসেনের রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮২

২৮.কায়কোবাদ, *অমিয় ধারা কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬-১৭৭

২৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১

৩০. কায়কোবাদ, *প্রেম পারিজাত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬

৩২. কাজী ইমদাদুল হক, *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১

৩৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *অভিভাষণ* মুহম্মদ শফিয়্যুল্লাহ (সম্পাদিত) *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (ঢাকা, ১৯৬৭) পৃষ্ঠা ১৭

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

৩৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম ও বিশ্বসেবা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩

৩৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *কুরআন শরীফের মহিমা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫

৪০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৬

৪১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *অভিভাষণ* মুহম্মদ শফিয়্যুল্লাহ (সম্পাদিত) *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (ঢাকা, ১৯৬৭) পৃষ্ঠা ১৮-১৯

৪২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯

৪৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *দেশের কথা 'ছোলতান' ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩০* উদ্ধৃত, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৩

৪৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *ভাষা ও সাহিত্য* (দ্বি-স, ঢাকা, ১৯৪৮), পৃষ্ঠা ৮

৪৫. সৈয়দ আকরাম হোসেন (সম্পাদিত), *'এস. ওয়াজেদ আলী রচনাবলী-১'* (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৮

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

৪৮. সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), *'এস. ওয়াজেদ আলী রচনাবলী-১'* (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৩৬

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৪

৫০. আবদুল হক (সম্পাদিত) *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী* প্রথম খণ্ড (ঢাকা-১৯৮৪), পৃষ্ঠা ১৫

৫১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮
৫২. কাজী মোতাহার হোসেন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৬
৫৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১১-৬১৪
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩২-৬৩৩
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩৩
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৭
৫৭. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয়* খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫-৬
৫৮. মূর্খরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ,- গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।
৫৯.আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী প্রথম* খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯৩
৬০.আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয়* খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮৩
৬১.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮৪
৬২.আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী প্রথম* খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩০-৩৬১
৬৩.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০
৬৪.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৩-৫৬৪
৬৫.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০৪-৭০৫
৬৬.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০৬-৭০৭
৬৭. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী* ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৫৫৩
৬৮.আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী* ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭০
৬৯. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২১
৭০.প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯০
৭১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮
৭২.আবদুল কাদির (সম্পাদিত) *নজরুল রচনাবলী* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯০

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশের এক মহেন্দ্রক্ষণঃ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, ১৯২৬-১৯৩৮

পৃ. ৮৫-২০০

ক. ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা

খ. মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা
কাজী আনোয়ারুল কাদির, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ

গ. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও আজাদ
মোহাম্মদী গোষ্ঠী ও রেনেসাঁস সোসাইটির প্রতিক্রিয়া

ঘ. বাঙলার নবজাগরণের কাণ্ডারী 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-কারীদের প্রতিরোধ সৃষ্টি প্রয়াসী সংরক্ষণবাদীদের ক্রিয়াকলাপসমূহ

ঙ. স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ গঠনে ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ (১৯৪৭-১৯৭১)
পাকিস্তান-পূর্ব বাংলা সম্পর্ক, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মতবাদ, পাকিস্তানে নতুন করে সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িক ভাষা আন্দোলন ও ধর্মনিরক্ষেতার বিকাশ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, পত্র-পত্রিকার চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা

চ. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে রেনেসাঁসের চেতনায় সমৃদ্ধ সাহিত্য- সংস্কৃতির উদ্বোধন (১৯৪৭-৭১)

ছ. পাকিস্তান আমলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের সাহিত্য ও সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভূমিকা
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ

ক. ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবেশমুহূর্ত থেকে আধুনিকতায় আমরা যে প্রবিষ্ট হয়েছি, তার মূলে কাজ করেছে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। জিজ্ঞাসা ছিল এর উৎসে, গদ্য ছিল এর বাহন। *সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই* এই ছিল তার মূলমন্ত্র; সমস্ত কিছু যুক্তি-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা ছিল এর লক্ষ্য, ফল হয়েছিল এক সামগ্রিক, সাকল্যিক জাগরণ। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এইভাবে বাঙালি সেদিন সমুত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণ সম্পূর্ণ হতে পারেনি এজন্যে যে বাঙালির অর্ধাংশ ছিল এর বাইরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বাঙালি-মুসলমান জেগে উঠতে থাকল, সংখ্যায়ও ততদিন অর্ধাংশ অতিক্রম করেছে। যে-তর্কবিতর্ক অর্থাৎ জিজ্ঞাসা-প্রতিজিজ্ঞাসা বাঙালি হিন্দু সমাজে শুরু হয়েছিল ঊনিশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই, মুসলমান সমাজে সেটাই আরম্ভ হল ঊনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাঙালি-মুসলমান সমাজের সামাজিক-সাহিত্যিক আত্মোন্মচন এবং প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের প্রথম স্তর বছর পঞ্চাশ জুড়েঃ ১৮৭০-১৯২০ কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবকালের আগে পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তরেই এর চূড়ান্ত বিকাশ-বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কাজী নজরুল ইসলামই (১৮৯৯-১৯৭৬) এর প্রধান নায়ক। প্রথম পর্বে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯৩২) অবিস্মরণীয় একটি নাম।

জাগরণ সম্পূর্ণ হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে-পশ্চিম বাংলার কলকাতা-কেন্দ্রিকতায় এবং পূর্ব বাংলার ঢাকা-কেন্দ্রিকতায় *সওগাত* ছিল কলকাতার প্রধান বাহন, *শিখা* ছিল ঢাকার মুখ্য মাধ্যম। বিশের দশক গড়ে উঠেছিল প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) উত্তর প্রতিবেশে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভ্যুত্থানে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের সমানাধিকারের দাবির আবহাওয়ায়। অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলন; ভারতবর্ষে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা; তুরস্কে কামাল আতার্তুকের নেতৃত্বের প্রভাব; স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যক্রমের প্রভাব-এইসব বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সাংস্কৃতির স্থিতাবস্থা ভেঙে দিয়েছিল।

১৯২১ সালে পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তার মফস্বলী কালিমা ঘুচে গেল। কলকাতা-ঢাকার মধ্যে একটি সেতুবন্ধ প্রণীত হল। কলকাতা থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র প্রকাশিত হল (১৯২৩) দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় *কল্লোল*; ঢাকা থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র (১৯২৭) বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্পাদনায় *প্রগতি*।

তখন কলকাতাই কেন্দ্র। প্রধান প্রবাহ চলছিল সেখানেই। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে ঢাকা ক্রমজাগ্রত হয়ে উঠল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হল তার মুখপত্র বার্ষিক *শিখা*। তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনা যে ১৯২৭ সালেই ঢাকা থেকে *প্রগতি* ও *শিখা* প্রকাশিত হয়েছিল। *প্রগতি*-তে ছিল রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের উৎসার; *শিখা*'য় নব-জাগ্রত বাঙালি মুসলমানের ভাবনা-বেদনার বহুধা বিকাশ। দুইয়ের মধ্যে যোগ ছিল না কোনো; কিন্তু দুয়ের মধ্যেই ছিল তারুণ্যের চাঞ্চল্য ও অগ্নি। দুই-ই বাংলার সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর কার্যক্রমের পরিসর ১৯২৬'-১৯৩৬ এই এগারো বছর জুড়ে। আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮)' কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০); কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১); আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪), আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-৫৬), মোহাম্মদ কাসেম (১৯০৫-৫৭), আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ ছিলেন এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রথম প্রতিষ্ঠা লগ্নে সভাপতিত্ব করেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)। কবি নজরুল ইসলাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রথম দুটি বার্ষিক সম্মিলনে যোগ দিয়েছিলেন-গান গেয়েছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। বার্ষিক সম্মিলনগুলিতে ভাষণ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, স্যার এ.এফ. রহমান, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান, হাকিম হাবিবুর রহমান প্রমুখ। তাছাড়া বছরোত্তর অনেক অনুষ্ঠান হতো। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর মুখপত্র বার্ষিক *শিখা* একটানা পাঁচ বছর বেরিয়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে

যায়। এই পাঁচ বছরের *শিখা* অতিমূল্যবান। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ-'এর বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলি *শিখা* ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে *সওগাত*, *জয়তী* প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকায়।

শিখা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় চৈত্র (১৩৩৩) 'প্রকাশকের নিবেদনে, বলা হয়েছিলঃ 'শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন-সাধন।' *শিখা* পত্রিকার রচনারম্ভে সবসময় লেখা থাকত। "*জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব*" ১৯৩২ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষনে আবুল হুসেন বলেছিলেন, 'এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'চিন্তা-চর্চা। মানুষের জীবন নিয়ত গতিশীল ও পরিবর্তনপ্রিয়। চিন্তা সেই গতির অগ্রদূত। বাংলার মুসলমান সমাজে জীবনস্রোত রুদ্ধ। সেই জীবন সক্রিয় ও গতিশীল করতে হলে চিন্তাচর্চার প্রয়োজন। এই চিন্তাই সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করবে। সাহিত্য সৃষ্টি হলেই সমাজের কর্মধারা চারদিকে উৎসারিত হবে। এ সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, 'নজরুলের অভ্যুদয়ের পরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ, মুখপত্রের নাম ছিল *শিখা*, আর তাঁদের মন্ত্র ছিল *বুদ্ধির মুক্তি*।

তখন ঢাকা ও মুসলিম ইত্যাদি বিশেষণও শুধু স্থান-কাল পাত্রের নির্দেশক মাত্র ছিল-এসব বিশেষণের আড়ালে কোনোদিন কোন সংকীর্ণতাই এর কর্মসূচিতে বা এর কর্মীদের মনে প্রশ্রয় পায়নি। আবদুল কাদিরের অভিমত ঃ 'মুসলিম-সাহিত্য-সমাজের' বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এসে প্রায় ততখানি কাজই করেছে, যতখানি কাজ করেছিল ১৮২৮ সালে কলকাতায় হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *Academic Association* তৎকালীন কলকাতার *ইয়ং বেঙ্গল* দল এবং শতবর্ষ পরে ঢাকার *শিখা*-গোষ্ঠী প্রায় একই রকম ভূমিকা পালন করে। ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র ছিল *PARTHENON ENQUIRER* ও *জ্ঞানান্বেষণ* এবং 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মুখপত্র ছিল *শিখা*, *জাগরণ ও জয়তী* এ সকল পত্রিকার লক্ষ্য ছিল স্ব স্ব সমাজের গতানুগতিক চিন্তাধারার প্রতি আঘাত দিয়ে জনগণের মনের জাগরণ ও প্রগতিশীল করা। ইয়ং বেঙ্গল দলের চিন্তা-চেতনায় প্রাধান্য পেয়েছিল পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ; আর 'মুসিলম -সাহিত্য-সমাজের' অধিকাংশ সদস্যের আদর্শ ছিল নব-মানবতা বা উদার মানবিকতা এবং কোনো কোনো সদস্যের মনে ছায়া ফেলেছিল সমাজতান্ত্রিক মানবতা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখেছেন ঃ

> ধ্বংসকামী, বিদ্রোহপরায়ণ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী নজরুল ইসলাম বাংলার বুকে আবির্ভূত হন। তাঁর আগমনে বাংলাভাষী মুসলিমদের চিন্তা একটি প্রবল ধাক্কা খেল। এই ধাক্কায় তার অগ্রগতি অনেকখানি সাহস পেয়ে গেল। ফলে চিন্তার তৃতীয় একটা স্তর স্পষ্ট দেখা দিল। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার পরবর্তী স্তরে এসেছিল যুক্তিবাদের প্রতি একটা স্বীকৃতিমূলক মনোভাব। এই যুক্তিবাদী দলের এক শাখা রইল ঢাকায়; অন্য শাখাটি রইল কলিকাতায়। ঢাকার মুসলিম সমাজ হলো প্রথমোক্ত শাখার আস্তানা। তাঁদের লক্ষ্য হলো *বুদ্ধির মুক্তি*। তাঁদের প্রধানদের মধ্যে আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হুসেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব বিভিন্ন মন্তব্য থেকে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'; তথা *শিখা* গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিত ও অন্বিষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্ববিরোধও ছিল কিছু। উদ্যোক্তাদের চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্যও ছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে এঁরা নিঃশব্দই ছিলেন। প্রধানদের কেউই প্রচণ্ড শক্তিশালী সৃজনীশক্তির অধিকারী ছিলেন না বলে বড় কোনো সামাজিক প্রভাব ফেলতে পারেননি। এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এঁদের চিন্তা ও দৃষ্টির ব্যাপকতা বিস্ময়কর। সংকীর্ণতামুক্ত প্রাগ্রসর *চিন্তাচর্চা* তাঁদের এমন-জায়গায় পৌছে দিয়েছিল, যে আজ আমরা অবাক হয়ে দেখিঃ বাঙালি -মুসলমান তাঁদেরই প্রদর্শিত-অবলম্বিত পথ ধরে এগিয়েছে। এখানেই তাদের সাফল্য। তাঁদের কেন্দ্রভূমি ছিল সাহিত্যঃ কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি ছিল সমাজের সর্বত্র।

খ. মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা

ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও *বুদ্ধির মুক্তি* আন্দোলন, নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য-চর্চা করে সুধী সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক ধরে। আর বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নজরুলের সচেতন পদচারণা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়া থেকেই। এদের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম ছিল গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ কখনো কখনো নাটক। তবে এদের কেউই সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারায় যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারেননি। তাদের এই সীমাবদ্ধতার কারণ বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতার মধ্যেই নিহিত ছিল। এদিক থেকে নজরুলই প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান সাহিত্য-শিল্পী যিনি সামগ্রিকভাবে বাংলা কাব্যের ধারায় প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত করতে সক্ষম হন।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর সাথে যুক্ত কোন কোন লেখক এর পূর্বেই সাহিত্য- চর্চায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন ও আবুল ফজলের কিছু সংখ্যক রচনা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই প্রকাশ লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাহিত্য-সমাজ -এর প্রায় সকল লেখকই গল্প, উপন্যাস ও কবিতা দিয়ে তাদের সাহিত্য-জীবন শুরু করলেও প্রবন্ধ রচনায় তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধই তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের প্রধান বাহন হয়েছে। প্রবন্ধ সম্পর্কে বিমলচন্দ্র সিংহ -এর নিম্নোক্ত অভিমত থেকেই এর কারণটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেঃ

> জাতি যখন গভীরভাবে নাড়া খায়, নতুন দিগন্তের অরুনাভা চোখের সামনে একটু একটু করে ফুটে উঠতে থাকে, তখন তার চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়, মনে নানা প্রশ্ন জাগতে থাকে, নানাদিকে তার অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়। এই জিজ্ঞাসা হতেই প্রবন্ধের উদ্ভব। মানুষের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হলে মহৎ কবিতাও রচিত হয়, নাটক গড়ে ওঠে, এসব কথা সত্য। কিন্তু ক্রান্তির আভাসে যেসব নানা প্রশ্ন মনকে আলোড়িত করে তাকে নব নব দিক আবিস্কারে নতুন জীবনের প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করে, সে সব প্রশ্নের আলোচনা রূপ পায় প্রবন্ধের মাধ্যমে।[১]

বাংলাদেশের মুসলমান লেখকগণ উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের শিল্প-রূপের চর্চা করলেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ ও মোজাম্মেল হকের মত প্রতিভাবান সাহিত্যিক পরিপূর্ণ শৈল্পিক চেতনার অভাবে তাঁদের রচনাকে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প-গুণান্বিত করে তুলতে পারেননি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক ও ডাক্তার লুৎফর রহমানের সাহিত্য-রুচি যথেষ্ট উন্নত হলেও তাঁরা কেউই সমাজের কাছ থেকে আনুকূল্য লাভ করেননি। এর কারণ, বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ এ-সময়ে শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে এমন একটি স্তরে অবস্থান করছিল যে, তাদের পক্ষে শিল্প-সাহিত্যের মত সূক্ষ্ম জিনিস উপভোগ করা সম্ভব ছিল না। একারণেই নজরুলের মুক্ত-চিন্তা ও উদার মানবতাবোধ তাদের কাছে যথাযথ মূল্য বহন করেনি। তবু নজরুলই পথিকৃৎ সাহিত্যশিল্পী যিনি বাঙালি মুসলমান সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। এছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের কতগুলো ঘটনা (যেমন, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, তুরস্কের খেলাফত বর্জন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি) তাঁদেরকে আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত করেছিল। সুতরাং এ-পটভূমিতে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'এর লেখকগণের মনে যে অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয় তারই সার্থক রূপায়ন ঘটেছে তাঁদের রচিত প্রবন্ধে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাঙালির চিন্তাধারায় ধর্মনিরাপেক্ষতা ও নবজাগরণে, *বুদ্ধির মুক্তি* আন্দোলনে কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), তাদের সাহিত্যে কর্মে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা ফুটে উঠেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

কাজী আনোয়ারুল কাদির

কাজী আনোয়ারুল কাদির ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে তোলার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবন দুটি ধারায় প্রবাহিত- একদিকে স্কুলের শিক্ষক ও পরিদর্শকরূপে আদর্শ ছাত্র গড়ে তোলা, অন্যদিকে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর উদ্যোক্তারূপে লেখনী ও ভাষণের মাধ্যমে সমাজের গলদ দূর করা। শিক্ষক হিসেবে তাঁর ধ্যান-ধারণা উচ্চ ছিল। তাঁর প্রমান মেলে শেখ হবিবুর রহমান ও শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুল হাকিম কাজী আনোয়ারুল কাদির সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে আমার জীবনে আনোয়ারুল কাদির সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছে। ... এই সময় বাংলাদেশের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মুসলমান হিন্দুদের চেয়ে বহু পিছনে ছিল। আনোয়ারুল কাদির দুই চারিজন বাছা বাছা মুসলমান ছাত্রকে শিক্ষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, হিন্দুদের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার স্বপ্ন সবসময় দেখিতেন। পাঠ্যবই সকল মাস্টারই পড়াইয়া থাকেন; কিন্তু কাদির সাহেব যে সকল উচ্চাদর্শের কথা শুনাইতেন তেমন কথা আমরা অপরের কাছে শুনিতে পাইতাম না।[২].....

উল্লেখ্য, কাজী আনোয়ারুল কাদির ছিলেন আবুল হুসেনের শিক্ষক। যশোর জিলা স্কুলে শিক্ষকতাকালে আবুল হুসেন ছিলেন সে-স্কুলের ছাত্র। আবুল হুসেনের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সুগভীর।[৩] কাজী আনোয়ারুল কাদিরের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ *আমাদের দুঃখ* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলন।[৪] গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলো *শিখা*, *নওরোজ*, *দীপিকা*, *নব্যবাংলা*, *জয়তী* ও *বুলবুল* পত্রিকায় ১৩০০ থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কাজী আবদুল ওদুদ *মুখবন্ধ* লিখে দেন। এ-*মুখবন্ধে*-এ তিনি বলেনঃ

> বইখানি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভূমিকা অশোভন হতো না। কিন্তু আমার তাতে অক্ষমতা প্রধানতঃ এই কারণে যে, আমরা সহকর্মী-একালের মুসলমান বাঙালিদের ভিতরে যে ক্ষুদ্র দলটি অনুভব করছেন যে দেশের লোকদের কাছে বলবার মতো দুই একটি কথা তাঁদের অন্তরে জমেছে আমাদের সাধারণ পরিচয় সেই দল-ভুক্ত বলে। তাই শুধু প্রার্থনা এই *দুঃখ* দেশের গুণিসমাজের কাছে তার প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করুক। .....

প্রথম প্রবন্ধের নামেই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। এ-প্রবন্ধে লেখক হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদের কারণ উল্লেখ করে তা দূর করাবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এ-দুটি সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে বলেই পরস্পর পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণে সদাব্যস্ত । অথচ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও পরস্পরের মিলন সম্ভব। আর এ-মিলনের প্রধান সূত্র... *বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য*। এই ঐক্য প্রাকৃতিক জগতের জন্য যেমন সত্য, তেমনি মানুষের জন্যও।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য, দেশের কল্যাণের জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নেতার উদার দৃষ্টিভঙ্গি কামনা। তৃতীয় প্রবন্ধ *সামাজিক গলদ* ধর্ম সম্পর্কে লেখকের স্বচ্ছ চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে। কিন্তু ইসলামের এই সাম্যনীতির অপব্যবহারের ফলে বাংলার মুসলমান সমাজে নানারকম গলদ প্রবেশ করেছে। লেখক এ-প্রবন্ধে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ্যের মধ্য দিয়ে সেগুলো উদঘাটন করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেনঃ

> আমাদের সমাজের গলদসমূহের কথা যখন মনে হয়, যখন কনসেসনের কথা ভাবি, যখন শাদী নেকাহ পোলাও কোর্মা আর শারাফতের কথা শুনি, খবরের কাগজে নারীর উপর অত্যাচারের কথা চোখে পড়ে, মসজিদের সামনে বাজানো নিয়ে খুন খারাবতের দৃশ্য মনে পড়ে, তখন মনে মনে লজ্জিত হই। এসব কথা মনে হলে বলি, ইসলাম যে শান্তির জন্য লালায়িত বলে' দাবি করে সে-দাবি আল্লাহর দরবারে গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না তবে মানবসমাজের দরবারে যে তা সন্দেহ করা হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই (পৃ. ৪২-৪৩)।

সামাজিক গলদ নিঃসন্দেহে এ-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। কাজী আবদুল ওদুদ গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

> বাংলার মুসলমান সমাজে যে একটি নব মনোভাবের সূচনা হয়েছে, সেদিনকার সেই সভায় ['মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে] এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আর যে সব প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে এই কথাটি ব্যক্ত হয়েছিল, সে সবের মধ্যে শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে চমকিত করেছিল এই লেখাটি। কিন্তু এর লেখক

> এটি লিখেছিলেন ও পড়েছিলেন শান্তভাবে। ... শিক্ষা সাধারণ চাল-চলন, ধর্ম দেশের বৃহত্তর জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান কথা যেটি এতে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে, কিন্তু সব চাইতে বড় কথা যেটি এতে বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে জীবন-যাত্রায় যুক্তির বুদ্ধির অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার কথা। মনুষ্যত্বের বোধ লেখকের কত পরিপূর্ণ, তারও পরিচয় এতে আছে।[৫]

অর্ধশতাব্দী পূর্বে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তিনি যে-অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণঃ

> হিন্দু মুসলমান সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা সমাধানের যে সব চেষ্টা হচ্ছে তা বিশেষ সফলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। সব চেষ্টাই এমনভাবে বিফল হবার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হয়েছে- এই সংঘর্ষের জন্য বাংলা সাহিত্যও অনেকখানি দায়ী। এর অনেক স্থলে সত্যের অপলাপ ও প্রেমের অভাব দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে অহিন্দু বলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক কতকগুলি লেখকের দ্বারা মুসলমানের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা হয়ত সত্য নয়, অথবা যদি সত্য হয় তবে তার পার্শ্বে হিন্দুর যে চিত্র দাঁড় করান হয়েছে সেটি হয়ত সত্য নয়। সোজা কথায়, আমাদের সাহিত্যে যেখানে হিন্দু মুসলমান উভয়কে আঁকা হয়েছে সেখানে হিন্দুকে শুধু হিন্দু বলেই বড় করার চেষ্টা হয়েছে। বাঙালি জাতির কল্যাণকে উদ্দেশ্য করে আমাদের সাহিত্য গড়ে উঠেনি (পৃ. ৭৫-৭৭)।

মুক্তবুদ্ধির অন্যতম প্রবক্তা কাজী আনোয়ারুল কাদিরের মানসগঠনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশ ও ভাষার প্রতি অবজ্ঞার ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ দীর্ঘকাল ধরে সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেছে ঃ

> বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম বর্ধিত হয় নাই, এ কারণেই তাহারা সমগ্র বাঙালি জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন। তাহারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু এখানে মুশকিল এই যে, নিজেদের স্বার্থ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের উপর নির্ভর করে। সমগ্র দেশের শিক্ষা-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র- সমস্যা ইত্যাদিকে বাদ দিয়া শুধু মুসলমানের অন্ন বা বস্ত্র বা অন্য কোন সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের অভাবে বাঙালি মুসলমান এ সমস্ত সমস্যার ভার নিতে নারাজ।[৬]

তাই এ-প্রবন্ধে তিনি দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন-"বাংলাই বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা, সুতরাং বাংলার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টাই সঙ্গত ও সহজ"। প্রবন্ধই কাজী আনোয়ারুল কাদিরের সাহিত্য-চর্চার প্রধান মাধ্যম। তবে গল্প-উপন্যাসেও যে তাঁর প্রবণতা ছিল, তার প্রমাণ মেলে *আমাদের দুঃখ* গ্রন্থের *পল্লী-চিত্র* এবং কাজী ইমমদাদদুল হকের *আবদুল্লাহ* উপন্যাসের শেষ এগারটি পরিচ্ছেদ রচনায়। *আবদুল্লাহ'র* শেষাংশের প্রকৃত লেখক সম্পর্কে কেউ কেউ বিতর্কের অবতারণা করলেও কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবদুল কাদিরের পরিবেশিত তথ্য থেকে মনে হয় কাজী আনোয়ারুল কাদিরই *আবদুল্লাহ্'র* উক্ত অংশ রচনা করেছেন।[৭] পরে এ-অংশটুকু কবি শাহাদৎ হোসেন কর্তৃক 'পরিশোধিত' হয়ে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার *দি মুসলমান প্রেস* থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৮]

কাজী আনোয়ারুল কাদির ছিলেন একন উচ্চশিক্ষিত বাঙালি। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সাহিত্য ও দর্শন তাঁর প্রাণ ও মনকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল বলেই তিনি কর্মজীবনে যেমন হতে পেরেছিলেন আদর্শ শিক্ষাবিদ, তেমনি সাহিত্য জীবনে হতে পেরেছিলেন একজন সার্থক প্রবন্ধকার। যে বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, সে বিষয়গুলো তার সমগ্র চেতনায় সর্বদা জাগ্রত থাকতো বলেই তাঁর রচনা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

কাজী আবদুল ওদুদ

'মুসলিম-সাহিত্য-সমাজের প্রধান লেখক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। তাঁর রচনা পরিমাণে যেমন বিপুল, প্রকৃতিতে তেমনি বিচিত্রধর্মী। ওদুদের মাতামহ পাঁচুমোল্লা ছিলেন বিষয়-সম্পত্তি সম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ কারণেই তাঁর মাতুলবর্গ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওদুদও এদের কাছ থেকেই বিদ্যাশিক্ষার অনুপ্রেরণা ও সহায়তা লাভ করেন। তার কনিষ্ঠ মাতুল নাজির উদ্দিন মোল্লা দারোগার চাকরি করলেও অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ওদুদ এই মাতুলের আশ্রয়ে থেকেই লেখাপড়া শেখেন। চাকরির সুবাদে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বদলি হওয়ায় ওদুদকে জগন্নাথ পুর, ঢাকা, নরসিংদী, পাবনা, মুড়াপাড়া (নারায়ণগঞ্জ) প্রভৃতি স্থানে স্কুল-জীবন কাটাতে হয়েছিল। এর ফলে কৈশোরেই তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে দশ টাকার একটি বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখানে কমরেড মুজাফফর আহমদের সঙ্গে তার হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। কমরেড মুজফফর আহমেদ বলেছেন ঃ

> কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯১৩ সালে। সে-বছর তিনি মফঃস্বলের কোনও স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে এসে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। থাকতেন গভর্নমেন্টের বেকার হোস্টেলে। এটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের হোস্টেল। আমি সেই হোস্টেলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তাই তো তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি চৌকস ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।[৯]

প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপ কুমার রায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। এ কলেজ থেকেই তিনি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিএ পাশ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্কুল ও কলেজে তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা ছিল সংস্কৃত। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে (পলিটিক্যাল ইকোনমি) এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময়ে তিনি *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি*'র অফিসে *মোসলেম ভারত*- এর সম্পাদক আফজাল-উল হকের সঙ্গে বাস করতেন। এখানেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

ওদুদের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যিক খ্যাতির কারণেই তিনি দীনেশ চন্দ্র সেনের, সুপারিশে এই পদে মনোনীত হয়েছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও আকর্ষণীয় বাক-ভঙ্গির জন্য তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি এ কলেজে শিক্ষকতা করার পর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সরকারের টেক্সটবুক কমিটির সেক্রেটারি হন। এই কর্ম উপলক্ষ্যে তিনি ঢাকা, কলকাতা, রাজশাহী ঘুরে শেষে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতায় অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে তিনি সেখানে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ওদুদ তাঁর পিতার মতই স্পষ্ট ভাষী ও দৃঢ়চরিত্রসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বহু পরিচয়। জীবনের শেষ চার-পাঁচ বছর ধরে তিনি দূরারোগ্য পারকিনসন্স' রোগে ভোগেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। প্রাবন্ধিক হিসেবেই কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয়। তবে তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক-এমনকি কয়েকটি কবিতাও রচনা করেছিলেন। আবদুল ওদুদ সমগ্র জীবনব্যাপী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। এ পরিচয়ের স্বাক্ষর আছে যেমন তরুণ বয়সের রচনা নবী-প্রশান্তি কবিতায় ও এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত মানবমুকুট গ্রন্থের সমালোচনায়, তেমনি আছে পরিণত বয়সের রচনা হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও ইসলাম (১৯৬৬) গ্রন্থে।[১০] নবী-প্রশস্তি কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর মহিমান্বিত রূপ ঃ

দুর্দিনে ওমর খৈয়ামের আদর্শে রচিত। ওমরের মত ওদুদও এ-কবিতায় সখা, সাকী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন-

ভাবছ সখা পয়মাল মোর
বিচিত্র সাধ-ভাবনা যত,
কাল-সারথি রথ হেঁকে যায়,
রইনু পিছে ভাগ্যহত;
যাক্ না সে-রথ, কি ক্ষোভ তাহে,
ভাবনা যত যাক্ না ডুবে;
সাকী আমার শ্যাম ধরনী
তাহার হাতে ক্ষোভ কি করে?

ওদুদ জার্মান কবি গ্যেটের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থ রচনাকালে তাঁর বহু কবিতার অনুবাদ করেছেন গদ্য কবিতার ছন্দে। জার্মান ভাষা জানতেন না বলে বঙ্গানুবাদের জন্য তাঁকে প্রধানত পল কেরাস ও বাত্তরিং এর ইংরেজি অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবু অনুবাদে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট। ওদুদের কবিতার সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল কবিতা রচনা তারই ইঙ্গিত বহন করে। দু-একটি কবিতা অবশ্য আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল ফজলও রচনা করেছেন। আর মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও আবদুল কাদির নিয়মিত কাব্যচর্চা করেছেন। কবিতার ইতিহাসে স্বীকৃতি রয়েছে তাঁদের। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর এই লেখকদের কিছু কবিতা নিয়েই শামসুল হুদার সম্পাদনায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ওদুদ এ-গ্রন্থের পরিচতি লিখেছিলেন। ওদুদের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ'মীর পরিবার।[১১] *'মীরপরিবার'* সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চের এক চিঠিতে লেখেন-

> দিনে দুই হইল আপনার পত্র এবং "মীর-পরিবার' পাইয়াছি। আজ কালকার দিনে গল্প পড়িয়া আনন্দ পাওয়া এবং সুখ্যাতি করিতে পারা দুইই যেন কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়ছে। বই উপহারে পাইয়া গ্রন্থকারকে দুটো ভাল কথা বলিতে, সর্বান্তঃকরণে উৎসাহ দিতে পারি না বলিয়া আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনি সেই সুযোগ আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সত্যই আমি ভারি খুশি হইয়াছি। এই আপনার প্রথম চেষ্টা হইলে ভবিষ্যতে যে আপনার কাছে অনেক বেশি আশা করা যায় তাহা বলাই বাহুল্য।
>
> আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া আসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুই জাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়।[১২]

মীর- পরিবার- এর পরেই ওদুদের যে গ্রন্থটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল সেটি *নদীবক্ষে* উপন্যাস।[১৩] এ- উপন্যাস পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখের এক চিঠিতে শান্তিনিকেতন থেকে ওদুদকে লেখেনঃ

> আপনার লিখিত নদীবক্ষে উপন্যাস খানিতে মুসলামান চাষীগৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি- এই কারণে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন।[১৪ কলিকাতা]

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নজরুল যুদ্বক্ষেত্র থেকে কলিকাতায় ফিরে এলে ওদুদ তাঁকে নদীবক্ষে পড়তে দেন। উপন্যাসটি পড়ার পর "দিলখোলা আবেগচঞ্চল নজরুল প্রশংসায় ভেঙ্গে পড়েন; উপন্যাসখানি ভাল লেগেছিল"।[১৫] উপরিউক্তি মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, ওদুদ তাঁর প্রথম উপন্যাসেই সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধ ও সমালোচনায় অধিকতর অনুরাগী হওয়ায় সাহিত্যের এ-শাখায় তাঁর প্রয়াস নিয়োজিত হয় নি। ফলে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস আজাদ অসমাপ্তই থেকে গেছে।[১৬] কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণ-উভয় দিক থেকেই

নদীবক্ষে একটি উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস। বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক পরিবারের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী এত জীবন্ত করে আর কোন ঔপন্যাসিক ইতোপূর্বে তুলে ধরেন নি। মুসলমান কৃষকের জীবন সম্পর্কে ওদুদের জ্ঞান যে কত গভীর ছিল তা এ-উপন্যাস পাঠেই বুঝা যায়।

ওদুদ গ্যেটের মানবচেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর *কবিগুরু গ্যেটে* গ্রন্থে বলেছেনঃ

তাঁর [গ্যেটের] খুব বড় উক্তিঃ মনে রেখো বাঁচবার কথা, অর্থাৎ মানব -প্রকৃতির সার্থকতার দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন অতিবাহিত করবার কথা। তিনি মানুষের জন্য যে-সার্থকতা কাম্য জ্ঞান করেছেন তা বৈরাগ্য সাধনে নয়, কোনো সংকীর্ণ আদর্শের অনুসরণেও নয়, তা লাভ হতে পারে মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনে-এরই নাম সৌন্দর্য সাধনা। এমন উৎকর্ষ-সমন্বিত ব্যক্তি প্রচার করে না, হুকুম করে না-তার সান্নিধ্য থেকেই সঞ্চারিত হয় অশেষ আশা ও আনন্দ। উপন্যাসের সাহায্যে জীবনাদর্শ প্রচারের এই প্রয়াস একালে সার্থকতা লাভ করে'চলছে। ক্রোচের মতে এর একালের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রোমা রোলাঁর *জন ক্রিসটোফার*।[১৭] কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রতি ওদুদের অনুরাগ প্রকাশিত হলেও তিনি মূলত মননশীল ও মুক্তিধর্মী ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তাধারার প্রগতিশীল প্রতিভার স্বক্ষেত্র। কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম প্রকাশিত রচনা- একটি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ, শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বৌ উপন্যাসকে কেন্দ্র করে লিখিত। এ-প্রবন্ধ থেকে বুঝা যায় যে, অল্প বয়সেই ওদুদের সাহিত্যেবোধ কত তীক্ষ্ম ছিল। ওদুদের দ্বিতীয় প্রবন্ধ *মুসলমান সাহিত্যিক* প্রকাশিত হয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে, 'প্রবাসী'তে।[১৮] বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ কথাবার্তায় ও প্রাত্যহিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও দীর্ঘদিন তারা এ-ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা কেন অনুভব করেন নি, তার কারণ উল্লেখ করে তিনি এ প্রবন্ধে বলেছেনঃ

> প্রথমে বাঙালি মুসলমান বাংলা সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই অনেকটা তাহাদের জাতীয় গৌরবের জন্য, কেননা তখন তাঁহারাই দেশের ভাগ্যবিধাতাদের স্বজাতি, মুসলমান-মহিমাবর্জ্জিত বাংলা সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করা তাঁহারা উপযাচকের নীচতা প্রকাশের কাজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন; তারপর কালচক্রে যখন তাঁহারা বাংলাদেশের প্রকৃত বাসিন্দা হইয়া পড়িয়া বাংলা ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিলেন এবং ইংরেজ অধিকারের কিছুকাল পরে দেশে বাংলা সাহিত্যের চর্চা পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইল, তখনও অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহারা বাংলাভাষার অনুশীলনে মানোযোগ দেন নাই। তাহার কারণ সে সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেই ব্যস্ত ছিলেন (পৃ. ২২০)।

ওদুদ, মুসলমান রচিত পুথি-সাহিত্যের কথা তাঁর এ-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন; তবে শিল্পের নিরিখে বিচার করে এগুলোকে বিশুদ্ধ সাহিত্য বলে স্বীকার করতে চাননি। তবু, বিলম্বে হলেও বাংলার মুসলমান সমাজ সচেতন হয়েছে। এবং এই সচেতনতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তাদের রাজনীতি ও সাহিত্যের আলোচনায় এবং ধর্ম সম্পর্কীয় বিতর্কে। আবদুল ওদুদ বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মসুলমান সাহিত্যিকগণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেনঃ

> প্রথম শ্রেণী, যাহারা সর্বদেশের মুসলামন-ধর্মাবলম্বী জাতির অতীত গৌরবের কথা শুনাইয়া আমাদিগকে ধর্মের মাহাত্ম উপলব্ধি করিতে বলিতেছেন; আর দ্বিতীয় শ্রেণী, যাঁহার কাব্য উপন্যাস লিখিয়া মুসলমানের বাংলা সাহিত্য আলোচনার সুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন (পৃ. ২২১)।

প্রথমোক্ত সাহিত্যিকদের কেউ কেউ সাহিত্য-চর্চার নামে বঙ্কিম প্রমুখ হিন্দু সাহিত্যিকের রচনার পালটা জবাব দিতে ব্যস্ত দেখে তিনি তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

> কবি বা ঔপন্যাসিক যদি তাঁহার সৃষ্টিতে এমন কিছু রস না দিতে পারেন যাহা মানুষের আত্মাকে তৃপ্ত করে, তবে শুধু গালাগালির জন্যই কেহ তাঁহার কাব্যকে আদর করিবে না। সংসারে নানা ঘটনা মানুষকে পৃথক করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু এই সব ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষে মানুষে যে আত্মার মিলন, কবির বীণায় সেই রাগিণীই আবহমানকাল ধ্বনিত হইতেছে। এমন কি, কবি যেখানে বিচ্ছেদের দুঃখ ফুটাইয়া তোলেন তাহা প্রকৃতই বিচ্ছেদের দুঃখ নয়, তাহা সেই আপাত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়া আত্মার একটা বড় মিলনের জয়গান। আমরা মুসলমান সাহিত্যিকের

> কাছে সেই ধরনের পূর্ণসৃষ্টি চাই - শুধু নিন্দাবাদ চাই না। মুসলমানের সভ্যতা মুসলমানকে একটা বিশ্বব্যাপী মিলনের আদর্শ কার্যে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছে। সুতরাং মুসলমান সাহিত্যিক যে এরূপ বিরাট হৃদয়ের পরিচয় দিয়া মুসলমানের সাহিত্যচর্চাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন, তাহা আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি (পৃ. ২২৩-২২৪)।

'মুসলমান সাহিত্যিক' নিঃসন্দেহে কাজী আবদুল ওদুদের একটি বিশিষ্ট রচনা। সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশের প্রাক্কালে মুসলিম সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে প্রকারান্তরে তিনি নিজেরই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন। প্রবন্ধটি পাঠ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) তাঁর *সাহিত্য* পত্রিকার *মাসিক সাহিত্য সমালোচনা* য় লিখেছিলেন ঃ

> শ্রী কাজী আবদুল ওদুদ 'মুসলমান সাহিত্যিক' প্রবন্ধে যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা নবীন মোসলমান সাহিত্যের জন্যই উদ্দিষ্ট বটে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের পক্ষেও কাজী সাহেবের অনেক পরামর্শ সুপথ্য। মুসলমান সাহিত্যিকগণ এখন বাঙ্কিমের ও তাঁহার পরবর্তী হিন্দু লেখকগণের পাওনা কড়ায়- গণ্ডায় পরিশোধ করিতেছেন, 'ঢিলটির বদলে পাটকেল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও হিন্দুপত্র বা হিন্দু লেখক তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। কাজী সাহেব ধর্ম নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের ও জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফলের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার অনেক পরামর্শই, হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর পক্ষেই হিতকারী, মনোহরী হইলেও তাহা উভয় সম্প্রদায়েরই চিন্তনীয়।[১৯]

ওদুদের এই সুলিখিত প্রবন্ধটি যে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীর একটি আলোচনায় ঃ

> সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে মোসলেম ভারতে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কাজী আবদুল ওদুদের 'সাহিত্যিকের সাধনার মহাগুণ এই যে, উক্ত প্রবন্ধে বিষয়টিকে নানা দিক থেকে দেখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিচার করাও হয়েছে। এহেন সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙলা মাসিক পত্রে নিত্য চোখে পড়ে না।[২০]

বাঙালি মুসলমান সমাজ যখন ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা ও দেশের নেতৃবৃন্দের মূঢ়তায় পথহারা, ঠিক সেই মুহূর্তে মুস্তফা কামাল তুরস্কের নবজাগরনের সূচনা করেছেন। সুতরাং স্বাবাভিকভাবেই নজরুল, ওদুদ প্রমুখ প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিক কামালের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে এ-সমাজে নবজাগরন আনয়নের স্বপ্ন দেখলেন।[২১] মুস্তফা কামাল সম্পর্কে আলোচনায় ওদুদের সেই আশাবাদেরই প্রকাশ ঘটেছে।

> মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গতানুগতিকতাকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে, নব সৃষ্টির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখিয়ে, মুসলমান সমাজের বুকে কামাল যে সত্যকার আঘাত দিয়েছেন, আশা করা যায়, এই আঘাতেই আমাদের শতাব্দীর মোহ- নিদ্রার অবসান হবে। ধর্মে, কর্মে, জাতীয়তায়, সাহিত্যে, সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের ভিতরে স্থান পেয়েছে যে জড়তা, দৃষ্টিহীনতা, মনে আশা জাগছে, যেমন করেই হোক, এইবার তার অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। কামালের প্রদত্ত এই আঘাতের বেদনাতেই হয়তো আমরা উপলব্ধি করতে পারবো-সত্যকার ধর্ম জীবন কি, জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রের সত্যকার সম্বন্ধ কি। হয়তো আরো উপলব্ধি করতে পারবো, জীবন সমস্যার চরম সমাধান কোন কালেই হয়ে যায় নাই, নতুন করে সে সমস্ত বিষয়ে সচেতন হওয়া আর তার মীমাংসা করতে চেষ্টা করা- এই-ই জীবন (পৃ. ১২)।

বাংলার রেনেসাঁস ও ইউরোপের রেনেসাঁস দ্বারা অনুপ্রাণিত ওদুদ ছিলেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ-এর প্রধান ভাবযোগী পুরুষ। তার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজকে মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলা। তাই তিনি বাংলার ধর্মভীরু ও বিচার বিমুখ মুসলমানের দৃষ্টি ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের দিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সম্মোহিত মুসলমান প্রবন্ধে তার এ-প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়ঃ

মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছু মাত্র বিরোধ নাই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহিদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, - বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহকে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান, অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা, প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ইসলামের তৌহিদের সাধনা জগতে কল্যান ও মুক্তির সহায়তা করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমান আছে।

তৌহিদে-বিশ্বাসী দার্শনিক ইবনে রুশদের (Averroes) লেখা থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের চিত্তে শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় সন্দেহ জন্মেছিল, প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে বুদ্ধির এই মুক্তির স্থান ইউরোপীয় রেনেসাঁসে অনেকখানি; মধ্যযুগের ঘোর তামসিকতার ভিতরে নানক কবীর প্রভৃতি ভক্ত সত্যকার আধ্যাত্মিকতার দীপ ভারতে পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তাদের সামনেও শিখারুপে জ্বলেছিল ইসলামের তৌহিদ ও সাম্যবাদ, আর বাঙালি মুসলমানের জন্য সব চাইতে বড় সুসংবাদ এই যে, ভারতের নবজাগরণের যিনি আদি নেতা সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের উপর ইসলাম আশ্চর্যভাবে কার্যকরী হয়েছিল (পৃ. ৮১-৮২)।

ওদুদের চিন্তা ও চেতনায় রামমোহনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি রামমোহনকে ভারতের নবজাগরণের মহা উদ্‌গাতা রূপেই শুধু দেখেননি, তাঁর চিন্তাধারায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সূত্রও আবিস্কার করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঙালি সমাজ রামমোহনের সাধনাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। সম্ভবত একারণেই তিনি রামমোহনের চিন্তাধারাকে বাঙালি সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেন রামমোহনকে হিন্দু মুসলমান -উভয় সম্প্রদায়ের নেতা বলে মনে করেন, সে সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বলেছেনঃ

> রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কালের পটে মানবতার যে নব চিত্রাঙ্কন প্রয়াস এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে তার আংশিক পরিচয়ই আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে, পূর্ণ পরিচয়ের উদঘাটনের ভার ন্যস্ত রয়েছে ভবিষ্যতের উপরে। প্রধানত দুটি কথা ভেবে একথা বলছি। প্রথমত, রামমোহনের যে মুক্তি-মন্ত্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অভিমানী বাঙালির কণ্ঠে আজ তা আর উদাত্ত সুরে বিঘোষিত হচ্ছে না, দ্বিতীয়ত রামমোহনের আত্মীয়-গোষ্ঠীর এক বড় শাখা, অর্থাৎ মুসলমান-সম্প্রদায়, তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজো সচেতন হয়ে ওঠেনি। রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু মুসলমান এই দুই প্রবল ভাবধারার সঙ্গমস্থল ছিল। হিন্দু সেই মহাতীর্থে স্নান করে কিছু শক্তি ও শ্রী অর্জন করেছে। এ তীর্থ যে মুসলমানেরও শক্তি ও শ্রী লাভের জন্য অমোঘ, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, মুসলমানকেও একথা স্বীকার করতে হবে।
>
> ..... আধুনিক কালের সঙ্গে মুসলমানের যখন সম্যক পরিচয় হবে, এবং সেই পরিচয়ের প্রভাবে এক নতুন দৃষ্টিতে সে তার প্রাচীন শাস্ত্র ও সভ্যতার প্রতি চাইতে বাধ্য হবে, তখন বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে দেখবে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের এই মহাপুরুষ ইসলাম ও মুসলমানের অনেক কিছু উপাদানরূপে ব্যবহার করে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে কি এক গৌরবময় নবসৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করেছেন, এবং সেই দিক দিয়ে আধুনিক মুসলমানদের তিনি কিরূপ একজন অগ্রবর্তী নেতা। ভিন্ন সমাজের লোক হয়েও রামমোহন যে এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন তার আংশিক কারণ, আত্মপ্রকৃতির ধর্মে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন; আর ইসলামের ইতিহাসে যা-কিছু মূল্যবান যা -কিছু স্মরণীয়, যেমন কুরআন, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জীবনী ও বাণী, মোতাজেলা দর্শন, সুফী সাহিত্য, মুসলমানী সভ্যতা -এ সমস্তের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল, এমন গভীর যে তার সাহায্যে কোনো কিছুকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নেওয়া যায় (পৃ. ৩-৪)।

বাঙালি সমাজ রামমোহনকে তাদের মানস জগতের নেতারূপে গ্রহণ করে নি। কেন করেনি, তার কারণ নির্দেশ করে ওদুদ বাঙলার জাগরণ প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> মনে হয়, বাঙালির রামমোহনকে গ্রহণ করার সবচাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে সে সাধারণত ঘর-মুখো আর রামমোহন ঘর-মুখো ছিলেন না। এই বাহির -মুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্তমান বাঙালি জীবনে বড় সাধনা হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ -পথের সম্বল আহরণ তার পক্ষে সহজ হবে। আর এই বাহির -মুখো হওয়ার উপায়ও তার অতি নিকটে। দৈব ঘটনায় বহু জাত বহু সম্প্রদায় দেশের বুকে এক জায়গায় মিলেছে, সেই মিলনকে অন্তরের দিক দিয়ে সার্থক ক'রে তোলাই হচ্ছে বাহির -মুখো হওয়ার বড় উপায় (পৃষ্ঠা ৬৫)।.....

রামমোহনের জীবন-সাধনা সম্পর্কে অধিকাংশ লেখকের ব্যক্তব্য এই যে, প্রথম জীবনে তিনি বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদে পরিণত হয়েছিল। এই ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদই তিনি মানুষের জন্য কাম্য মনে করতেন। অথচ ওদুদ রামমোহন সম্বন্ধে এই মতবাদকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে পারেননি। রামমোহন নিজেকে শাস্ত্রনুগামী হিন্দু বলে প্রচার করেছেন এবং বেদান্তকে আশ্রয় করে

হিন্দুর জন্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান আহরনের চেষ্টা করেছেন ওদুদ এই তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন ঃ

> তাঁর দেশবাসীর জন্য ইয়োরোপীয় জ্ঞানলাভের পথ সুগম করবার অনুরোধ জানিয়ে লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের দুরূহতার কথা বলেছেন, আর বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতির শিক্ষাকে বেশ উপহাস করেছেন। একথা স্বীকার করতে হবে যে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চার চাইতে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান- দর্শন চর্চাকে তিনি বেশী মর্যাদা দিয়েছেন (পৃষ্ঠা ২১-২২)।

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম মনীষীদের সাধনা থেকে রামমোহন তাঁর ধর্ম- চিন্তাকে কিভাবে সুগঠিত করেছিলেন সে-প্রসঙ্গের আলোচনায় ওদুদ এ -প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> কুরআন থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটি রামমোহনের লাভ হয়েছিল সেটি মনে হয় বিশ্বভ্রামন্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তিনি যে- ইসলাম থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে- ইসলাম মোতাজেলাদের ও শ্রেষ্ঠ সুফীদের ইস্‌লাম (পৃ. ৫-৮)।

এ-গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ । এ প্রবন্ধে ওদুদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কীয় চিন্তাধারর একটি সামগ্রিক রূপ ধরা পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে'জাতীয়তা'র সচেতন অনুপ্রবেশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে এবং এর সূচনা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) রচনায় লক্ষ্য করা যায়। ভূদেবের পরেই এ ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)। ওদুদ জাতীয়তার প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের সবলতা ও দুর্বলতার উল্লেখ করে এ প্রবন্ধে বলেছেনঃ

> ভুদেবের পরে বঙ্কিমচন্দ্র কালানুসারে; কিন্তু বাংলার সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার অগ্রবর্তী বঙ্কিমচন্দ্রই- বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রসন্ন আলোক ভুদেবের চিন্তাধারার উপরে পড়েছিল বলেই তার ঐতিহাসিক মর্যাদা এতে বেশি। নব- বাঙালিত্বের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এ- সম্বন্ধে দ্বিমত নেই- স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর কালের একজন কর্মী বলে নিজেকে পরিচিত করতে অগৌরব বোধ করেন নি। বঙ্কিম প্রতিভাবান. তাই স্বভাবতঃই তিনি অনেকখানি সত্যাশ্রয়ী। কিন্তু তবু কেন সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্বের অভিমান তাঁর ভিতরে এত প্রবল তা বহু রকমে ভেবেও আমি নিজে তেমন সুমীমাংসায় পৌছুতে পারি নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সৃষ্টি ধর্মীয় উজ্জ্বল মরীচিকা-ধর্মী এ কথাটি আপাততঃ অনেকের কানে রুঢ় শোনাতে পারে কিন্তু সেদিন হয়ত দূরে নয় যেদিন তার শ্রেষ্ঠ ভক্তরাও বলবেন-জাতীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে অস্বীকার না করলে ও পরিবেষ্টনের সঙ্গে দ্বন্দ্বই হবে বাঙালির ভাগ্য। বাঙালি বলতে আমরা জাতি ধর্ম নিবিশেষে বাংলাদেশের সব লোকই বুঝছি (পৃ. ৫৩-৫৪)।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ধর্মের দিক থেকে বাঙালির জাতীয় জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তবে ওদুদ মনে করেনঃ

> বিজ্ঞান-প্রভাবান্বিত ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কেশবচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত বেশি। তাই তার প্রভাবে বাংলার জাতীয় জীবন ধর্মময় তত হতে পারে নাই যত হয়েছে ধর্মোন্মত্ত, অন্য কথায়, কর্মহীন ও গতিহীন।

এ ধারারই অন্য দু'জন নেতা রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) ও বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। এরা বাংলার জাতীয় জীবনে কেশবচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। তবে ওদুদ রামকৃষ্ণকে নিয়ে আলচনায় অগ্রসর হন নি। কারণ তার মতে, 'তাঁর [রামকৃষ্ণ] মর্যাদা তার দেবত্বের জন্য, নরত্বের জন্য তেমন নয়। আর বিবেকানন্দের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যঃ

> বিবেকানন্দ সুপণ্ডিত ও সুলেখক; কিন্তু তার প্রধান কীর্তি দেশের বুকে সেবাশ্রমের বিস্তার। এর পেছনে যে আত্মসম্মানবোধ ও স্বদেশবাৎসল্য রয়েছে সেটি আমাদের পরম আনন্দ ও শ্রদ্ধা্র সামগ্রী। তবু এ-কথা আমাদের ভাবতেই হবে যে সন্নাস ও ভিক্ষার সাহায্য দেশের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করা ছেড়া কাপড় তালি দেওয়ার চাইতে বড় কাজ নয় (পৃ. ৫৭)।

এরা সকলেই জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাদের প্রদর্শিত পথ যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল না। তাই তা সমগ্র বাঙালি সমাজের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। ওদুদ মনে করেন, কেবল রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের

চিন্তাধারার মধ্যেই ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের চিন্তাধারা বাঙালি যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। রামমোহনের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে 'নবপর্যায়' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের বাংলার জাগরণ প্রবন্ধে তিনি বিস্তারিতভাবে আলেচনা করেছেন। কজী আবদুল ওদুদের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাচেতনার প্রকাশ ঘটেছে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সংক্রান্ত আলোচনায়, তিনি বলেন রামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সমন্বয় চেষ্টা বা বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, রবীন্দ্রনাথের ' বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' প্রভৃতি বিষয় বাঙালির ভাবজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কোন কোন মানীষীর চিন্তাধারায় যে-হিন্দুজাগরণের সূত্র ছিল প্রচ্ছন্ন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতে এসে তা-ই প্রকট রূপ ধারণ করে। এভাবেই হিন্দু-জাগরণ দেশবাসীর সম্মুখে তিনটি অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয়-'পতিত হিন্দু-সমাজের সহজ ও সবল মনুষ্যত্বের স্তরে উত্থান' 'হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্নিহিত অন্যান্য সাধারণ শক্তির জাগরণ' ও 'ভারতের সর্বব্যাপী এক বিশেষ প্রভাবের জাগরণ।'

ওদুদ প্রথম মতবাদকে 'অশ্রদ্ধেয়' নয়, দ্বিতীয় মতবাদকে 'একান্ত অপ্রিয়' এবং তৃতীয় মতবাদকে 'শ্রদ্ধার বস্তু' বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় মতবাদ সম্পর্কে তিনি এ বক্তৃতায় বলেছেনঃ

> এই মতের চিন্তাশীলেরা বলতে চান ভারতে আর্য অনার্য দ্রাবিড় শকহুন প্রভৃতি বিচিত্র জাতির মিলনে মুসলমানের আগমনের পূর্বে একটি বিশেষ মনোভাবের জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই মিশ্র জাতির সাধারণ নাম হিন্দু। মসলমানেরা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে খুবই চেষ্টা করেছিল। তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নি; কিন্তু তাদেরও অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, নানা আচারে, হিন্দু-প্রভাব অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রভাব পড়েছিল। সে-প্রভাব দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। সেই ভারতীয়ত্ব কিছু দিন নিস্প্রভ হয়েছিল, আবার তার শক্তি বোঝা যাচ্ছে। হিন্দু জাগরণের অর্থ এই ভারতীয়ত্বের জাগরণ। এদেশের সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত এটি, কেননা, এই-ই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকলের সার্থকতা লাভের পথ। কোনো সমাজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেওয়া এর স্বভাব নয়, তবে দেশের সব রকমের স্বাতন্ত্র যেন হয় এই মূল ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সুসঙ্গত (পৃ. ৩৫-৩৬)।

কিন্তু জাগরণ-লগ্নে দ্বিতীয় মতবাদকে আঁকড়ে ধরে হিন্দু সমাজ চেয়েছে হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ এবং মুসলমান সমাজ চেয়েছে মুসলিম ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ফলে দেশের জাগরণ দাঁড়িয়েছে হিন্দু জাগরণ ও মুসলিম জাগরণে। সুতরাং শাসক গোষ্ঠীর বিভেদ নীতি হিন্দু মুসলমানের বিরোধের অন্যতম কারণ হলেও এই দুই সম্প্রদায়ের বহুকালের বিকৃতবুদ্ধিও এর জন্য কম দায়ী নয়। তবে ওদুদ এই বিরোধের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায়ঃ

> রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়বাদের দুইটি ধারা। একদিকে, তাঁকেও [রামকৃষ্ণের মত] বলা যায় "যত মত তত পথ" বাদী বিভিন্ন শ্রেণীগত ও দেশগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি শ্রদ্ধাপূর্ণ; আর একদিকে তিনি বিশেষভাবে সৃষ্টি ধর্মী-মানুষকে দেশে কালে বিভক্ত না দেখে এক অখণ্ড বিকাশমান সমাজের সভ্যরূপে দেখেছেন, সমাজ জীবনের উৎকর্ষলাভ যার জন্য চরম ও পরম। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে তাঁর এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই যে বিকাশধর্মী মানুষ সমাজজীবনে অক্লান্তভাবে সৃষ্টিশীল হয়ে চলা যার জন্য সার্থকতার পথ, এর অভ্যুদয় দেশে না হলে হিন্দু -মুসলমান বিরোধ বলতে আমাদের যে দুঃখ বোঝায় তা দূর হবে না এই -ই আমাদের প্রধান নিবেদন (পৃ. ৫০)।

হিন্দু -মুসলমানের বিরোধ গ্রন্থে ওদুদের স্বাধীনচিন্তা, মুক্তিনিষ্ঠা ও সুক্ষ্ম বিচারশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নয় সমকালের অন্যান্য মণীষীকেও মুগ্ধ করেছিল। গ্রন্থটি সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> এই বই পড়ে লোকেরা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ হটাতে পারবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ওদুদের চিন্তা প্রণালীকে তারিফ করতেই হবে। ওদুদ সকল প্রকার শাস্ত্রনিষ্ঠার যম। তাঁর প্রাণের কথা হচ্ছে সৃষ্টিকার্য, সৃষ্টিধর্ম। বইটা বাঙালি সমাজ-দর্শনের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বইয়ের ভেতর আর্থিক ও রাষ্ট্রিক তথ্যের বিশ্লেষণ নাই। এই জন্য পাঠকদের পেট ভরবে না। প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে সামস্যার মীমাংসায় সাহায্য পাওয়া কঠিন। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ ভবিষ্যৎপন্থী মুড়োর সরস ভাবধারা যারপর নাই মূল্যবান।[২২]

রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ওদুদের সাহিত্যিক জীবনের একটি প্রিয় বিষয়। তিনি লেখক জীবনের প্রথম থেকেই এ-সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে তার প্রকাশও ঘটিয়েছেন। বাংলার জাগরণ গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মননের গভীর প্রতিফলন। সমগ্র বাংলার জগরণ প্রক্রিয়া তিনি পর্যবেক্ষণ করে কামনা করেছেন সকল ধর্ম মতে মানুষের মুক্তি তিনি লিখেছেনঃ

> আধুনিককালে দেশের প্রাণ প্রবাহ স্থানীয় এই জাগরণ এক সুবৃহৎ ব্যাপার বিচিত্রধারা সম্মিলিত হয়েছে এতে। তাই বহুজনের বহু ধরনের অনুসন্ধান ও বিচারের ফলেই এর সম্বন্ধে প্রমাণিক কিছু দাঁড় করানো সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু এই গুরু বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আজ পর্যন্ত তেমন সচেতনতার পরিচয় দেননি। দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতা তাঁদের নতুন তাগিদ দেবে আশা করা যায়।

প্রথম বক্তৃতায় তিনি বাংলার নবজাগরণের সূচনাপর্বে রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল-এর অবদান, ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের মতবাদ এবং বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা। তৃতীয় বক্তৃতায় সিপাহী বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব, মধুসূদন- দীনবন্ধু-বঙ্কিমের ভূমিকা, ব্রাহ্ম সমাজের ত্রিধাবিভক্তি -আদি ব্রাহ্ম সমাজ, 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' ও 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ বক্তৃতার বিষয় - ইংরেজ আমলের সূচনা থেকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত মুসলমান সমাজের চিন্তা ভাবনা, তাদের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থা এবং হিন্দু সামাজের ব্যাপক জাগরণে মুসলমান সমাজে তার প্রতিক্রিয়া। পঞ্চম বক্তৃতায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর রূপ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে তিনি স্বদেশী আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ, বাঙালি মুসলমান সমাজে উদার মানবিকতার প্রশ্নে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'এর ভূমিকা এবং সর্বভারতীয় জাগরণ প্রয়াসে মাহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বের কথা বলেছেন। নবজন্মের বা রেনেসাঁসের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেরই মন্তব্য করেছেন ঃ

> সাধারণত তিনটি ধারায় ভাগ করে দেখা যেতে পারে এই [ইউরোপের] নবজন্মাকে -প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নতুন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা আনন্দ, ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুনবোধ। এই নবজন্মের বা ব্যাপক জাগরণের প্রভাব হয়েছিল সুদুরপ্রসারী প্রধানত এর সাহায্যে ইউরোপ, অথবা পাশ্চাত্য জগৎ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় খোলস চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে (পৃ. ১)।

বাংলাদেশের ঊনিশ শতকের জাগরণকে তিনি এই 'রেনেসাঁসে'র সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন ঃ

> ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরণ ঘটে তাও এমনি একটি রেনেসাঁসঃ তার প্রভাবও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী সমস্ত ভারতবর্ষ তার দিকে তাকিয়েছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে, ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সবক্ষেত্রেই নবীন ভারতে যে রূপান্তর ঘটল তার মূলে এক বড়ো শক্তিরূপে কাজ করেছে এই রেনেসাঁস (পৃ. ১-২)।

ওদুদ বাংলার নবজাগরণের সূচনা ধরেছেন রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাসের কাল থেকে বিশেষ করে তার বেদান্ত গ্রন্থ ও তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের কাল অর্থাৎ ১৮১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এ ক্ষেত্রে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তারিখে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মসমাজে'র নতুন গৃহ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই Trust Deed of the Brahmo Samaj রচিত হয়। রামমোহন চেয়েছিলেন বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সভ্যভব্য মানুষদের এক ধর্ম মিলন কেন্দ্র হবে। এক স্রষ্টা ও পাতার ছত্র-ছায়াতলে, পরস্পরের প্রতি প্রেম সম্পন্ন হবে ও পরস্পরের হিত-সাধনে তৎপর হবে সকলে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়িনি। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি যা করতে পারলেন তা হলো-

> 'একটি কক্ষে প্রাচীন রীতির বেদপাঠের ব্যবস্থা যাতে ব্রাহ্মণের জাতির প্রবেশাধিকার নেই, আর তার সঙ্গে অপর একটি কক্ষে প্রধানত হিন্দু শাস্ত্র থেকে কিছু পাঠ ও ব্যাখ্যা আর কিছু ধর্ম সঙ্গীত, সেই কক্ষে অবশ্য সভ্যভব্য সব শ্রেণীর লোকের প্রবেশাধিকার রয়েছে (পৃ. ৩৮-৩৯)।'

পাশ্চাত্যের যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী দর্শনের প্রভাবে ডিরোজিও ও তাঁর অনুসারী ইয়ং বেঙ্গল' প্রবলভাবে সংশয়ী হয়ে উঠেছিলেন। ফলত তাঁরা মানবজীবনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে অবলোকলন করতে সমর্থ হন। বাংলার নবজাগরণে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব যাঁরা হাতে নিয়োছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিষ্ঠা ছিল ভগবৎ ভক্তিতে। অক্ষয়কুমারের প্রবণতা যুক্তিবাদের দিকে। বিদ্যাসাগরও যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে তাঁর অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য, যুক্তিবাদী চেতনা ও পৌরুষের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। কিছু পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে মনে করলেও ওদুদের মতে, ' সে দিনের বাংলাদেশ, অন্ততঃ বাংলার প্রাণ কেন্দ্র কলকাতায় সিপাহী বিদ্রোহের কোন প্রভাব অনুভূত হয়নি। "তিনি মনে করেন' ১৮৫৮-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের নীল বিদ্রোহ বাঙালিকে যথেষ্ট জোরে নাড়া দিয়েছিল। এই বিদ্রোহের বাণীই সাহিত্যরূপ লাভ করেছে দীনবন্ধু মিত্রের রচনায়। একই সময়ে সাহিত্যের অঙ্গনে রেনেসাঁসের প্রথম শিল্পী মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব ঘটে। বাংলা সাহিত্যের এই দু'জন মহৎ শিল্পী সম্পর্কে ওদুদ এ গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> বাংলার সাহিত্যে নীল বিদ্রোহ কিন্তু একটি অমৃত ফল ফলাল সেটি দীনবন্ধু মিত্রের নীল-দর্পণ নাটক। এতে নীলকরদের ঔদ্ধত্য, তাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতির স্থুলতা আর পাশবিক অত্যাচার যেমন রূপ পেলে তেমনি রূপ পেল নীলকরদের আশ্রিত গোমস্তা-আদির দাস-মনোভাব, আর অজ্ঞমুর্খ কিন্তু দেহে ও হৃদয়ের বলিষ্ঠ চাষী তোরাপের অকুতোভয় প্রতিরোধ। নাটকে দীনবন্ধুর নীল দর্পণ যেমন অর্থপূর্ণ হল, মধুসূদনের নতুন কাব্য -সৃষ্টি হল তাঁর চাইতেও অর্থপূর্ণ কেননা এতে সূচিত হল নতুন বাংলা সাহিত্যের বিরাট সম্ভাবনা। আর শুধু সূচিতই হল না, অচিরে এমন সার্থক নতুন কাব্য সৃষ্টি তাঁর প্রতিভায়ই সম্ভবপর হল যার মধুচক্রে আজও গৌড়জন সুধাপান করে চলেছে (পৃ. ৭৬-৭৭)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বাঙালি মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ পূর্ণাঙ্গ ছিল না। এর মূলে আছে এই সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের নিস্কর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি এবং ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের রাজভাষার পরিবর্তন, এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের তিনটি স্তর। অনেকে মনে করেন এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণেই মুসলমান সমাজ ইংরেজী শেখার সুযোগ পায় নি। ফলত আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গেও তাদের যোগ নিবিড় হয় নি। কিন্তু মুসলমানদের ইংরেজি না শেখার কারণ হিসেবে ওদুদ শুধু অর্থনৈতিক অবস্থাকে দায়ী না করে মনস্তাত্তিক কারণের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন ঃ

> নানা ঘটনায় মুসলমান ও ইংরেজের মধ্যে যে দীর্ঘ কালব্যপী মনোমালিন্য, এমন কি শত্রুতা, মুসলমানদের সচেতন অংশে দেখা দেয় সেইটিই হচ্ছে তাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণার মূল কারণ (পৃ. ১১৯)।

স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তবে কি মুসলমান সমাজে আদৌ জাগরণ দেখা দেয় নি? এ-প্রশ্নের উত্তরে ওদুদ বলেছেন ঃ

> একালে মুসলমান-জগতে সত্যিকার নবজাগরণ আংশিকভাবে দেখা দেয় তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বাধীনে। বাংলাদেশেও তেমন একটা ব্যাপারের সূচনা হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার 'শিখা' সম্প্রদায়ের মধ্যে (পৃ. ১২৬)।

শিখা সম্প্রদায়ই 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'। বাংলার নবজাগরণে 'মুসলিম সাহিত্য -সামাজ, এর ভূমিকার কথা অন্যতম কল্পধারা কাজী আবদুল ওদুদের ভাষায় ঃ

> 'মুসলিম সাহিত্য -সমাজ' সেই দিনে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাবই বিস্তার করেছিল তবে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কি না তা জানা যাবে ভবিষ্যতে। বাংলার জাগরণের একটি অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিসর কিন্তু বেগবন্ত ধারা যে সেই দল বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অল্প কিছু কালের জন্য প্রবাহিত করতে পেরেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই (পৃ. ১৯৬)।

বাংলার জাগরণ প্রকাশের অব্যাহতি পরেই হুমায়ুন কবির গ্রন্থটিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেনঃ

কাজী সাহেবের বুদ্ধি স্বচ্ছ দৃষ্টি উদার এবং চিত্ত নির্ভীক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই নির্ভীকতা আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন, তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন না করেও কাজী সাহেব যেভাবে তাঁদের সমালোচনা করেছেন, সে ধরনের নির্ভীক ও যুক্তিবাদী সমালোচনার আজ দেশে বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে মতভেদ ও অশ্রদ্ধার মধ্যে আমরা বিশেষ পার্থক্য করি না। যাঁরা শ্রদ্ধা করি, বহুক্ষেত্রে বিনা বিচারে সকল বিষয়ে তাঁর মতামত মেনে নিই। অন্যপক্ষে কোন ক্ষেত্রে কারু কোন মতকে অস্বীকার করলে সে মতভেদকে সাধারণত অশ্রদ্ধা মনে করা হয়। তাই কাজী সাহেব যেভাবে বহু সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাঁদের মতামতের সমালোচনা করেছেন, তা প্রশংসনীয়।

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর *'বাংলার জাগরণ'* গ্রন্থে সুস্পষ্টভাব ব্যক্ত করেছেন যে, 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' *বুদ্ধির মুক্তি* মন্ত্রের দীক্ষা লাভ করেছিলেন যাঁদের কাছ থেকে তাঁদের অন্যতম হযরত মুহম্মদ (সাঃ)।[২৩] প্রকৃতপক্ষে, ওদুদের জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছে হজরত মুহম্মদ (সাঃ) জীবন ও বাণী। তিনি এই মহাপুরুষের মধ্যে জীবন্ত আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই লেখকজীবনের প্রথম থেকেই তাঁর রচনায় সে-সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহল প্রকাশ পেয়েছে।[২৪] অবশেষে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও ইসলাম নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই কৌতুহল ও জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটেছে। এয়াকুব আলী চৌধুরীর *মানব -মুকুট* (১৩২৯) -এর আলোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ লিখেছিলেনঃ

....এটি হজরত মুহম্মদের পুরোপুরি জীবনী নয়-জীবনী-পাঠ, অর্থাৎ তার ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার আলোচনা। ....কিন্ত বাস্তবিক এ একটি পাঠ অর্থাৎ একজন জীবন্ত আধুনিক যুগের পুরুষ পাঠ করতে চেষ্টা করেছেন হজরত মুহম্মদের মহাজীবন। ....মানুষ হিসাবে জীবন্ত বলা যায় যে (ব্যক্তি বা জাতি) পর্যাপ্ত পরিমাণে সজাগ; অর্থাৎ এই চির পরিবর্তনশীল জগৎকে সে নিজের মন দিয়ে বুঝবার ক্ষমতা রাখে, আর বুঝে তার সঙ্গ ব্যবহার করতে পারে। ....আমাদের মানব-মুকুটের গ্রান্থকার একজন জীবন্ত ব্যক্তি বলেই যুগধর্মের প্রভাব তার ভিতরে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে।[২৫]

মানব-মুকুট -এর গ্রন্থকার সম্পর্কে ওদুদ যে মন্তব্য করেছেন তা তার নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কারণ 'হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম' গ্রন্থেও 'একজন জীবন্ত আধুনিক যুগের পুরুষ পাঠ করতে চেষ্টা করেছেন হজরত মুহম্মদের মহাজীবন'। এ-গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে হজরত মোহম্মদের জীনের ঘটনা ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যুগ ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুতীব্র বাসনা। একজন মহামানবের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও কৌতূহল থাকা দরকার তা ওদুদের মধ্যে ছিল। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা ও কৌতুহল অন্ধ অনুবর্তিতায় পরিচালিত না হয়ে বিচারবুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করায় এ-গ্রন্থ একজন জীবন্ত মানুষের জীবনী হতে পেরেছে। এ-গ্রন্থে তিনি ইসলামের ইতিহাসের বহু ঘটনার ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যঃ

অশেষ শক্তিমান আর অশেষ প্রেমিক হজরত মোহাম্মদের একটি জীবনচরিত লিখবার সংকল্প করি বহু দিন পূর্বে - ১৯২৮ সালে। সেই দিনেই সেটি আরম্ভও করেছিলাম। কিন্তু তাতে বাধা পড়ে। কাজ অবশ্য চলতে থাকে তবে সেই চরিত্র-চিত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে হাত দিতে পারি ১৯৬৪ সালের শেষ। ১৯৬৪ সালের সূচনাতেও বলা যেতে পারে, কেননা, সমগ্র কোরআনের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করি সেই সময়ে ..।

.. আমার সত্যিকার বিষয় ঃ একালে আমরা, অর্থাৎ প্রধানত মূসলমান সমাজের লোকেরা, কিভাবে হযরতের দিকে তাকাব- তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝবো, একালের মানুষের সামনে যে সব চিন্তা ভাবনা ও গুরু সমস্যা এসে পড়েছে সে সব সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের জন্য কি নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত বহন করে -এই সব সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা। এই ধরনের চিন্তা একালের মুসলমানদের মধ্যে স্বভাবতঃই দেখা দিয়াছে। তবে সে সব এখনো তাদের জন্য হয় পুরাতনের দুর্বল ওকালতি, না হয় পাশ কাটাবার চেষ্টা। বলাবাহুল্য চিন্তার এমন কুণ্ঠিত রূপ অসার্থক রূপ। চিন্তা সার্থক রূপ নেয় যখন তা প্রকাশ পায় নতুন চেতনা ও নতুন প্রত্যয়ের রূপে। .... চিন্তার সেই অনেকটা অকুণ্ঠিত পরিচয় এই বইটিতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে আশা করি ..... (মুখবন্ধ)।

'হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও ইসলাম, চার খণ্ডে বিভক্ত ঃ *পরিবেশ ও প্রযত্ন, সংঘর্ষ, বিজয় ও পরিণতি*। তৃতীয় খণ্ডের শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবৃত্তিরূপে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জীবনের কয়েকটি বিতর্কিত ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নবীদের জীবনের যে-সব আলৌকিক ঘটনার কথা কোরআনে আছে সে-সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

> প্রাচীন কালের নবীদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ কোরআনে আছে যদিও কোরআনেই বার বার ঘোষণা করা হয়েছে যে অলৌকিক-কিছু ঘটাবার জন্য বা প্রদর্শন করবার জন্য হযরত মোহম্মদের (সঃ) আগমন হয়নি।
>
> এই সব থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে ঃ সেকালের নবীদের সম্বন্ধে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল তার কিছু কিছু কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোরআনের বক্তব্য এই নয় যে, সেই পুরাতন জনপ্রিয় কাহিনীগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেইভাবেই সেকালে ঘটেছিল।
>
> অন্যকথায়, নবীদের সম্বন্ধে প্রাচীন জনপ্রিয় কাহিনীগুলো থেকে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রেরণা পাচ্ছেন - বিপদে ধৈর্য্যও আশা অবলম্বন করতে পারছেন, এই সব সম্বন্ধে বড় কথা, কাহিনীগুলোর সত্যকার সার্থকতা এই-খানেই। সুরা 'হুদে' স্পষ্টই বলা হয়েছেঃ "আর আমি রসুলদের কাহিনী যা সব তোমার কাছে বর্ণনা করছি সে-সবের সাহায্যে তোমার অন্তর দৃঢ় করার জন্য আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর উপদেশ, আর বিশ্বাসীদের জন্য স্মারক (১১ঃ১২০)।"

সূরা আল-ইমরানের একটি বিখ্যাত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কোরআনের কতকগুলো আয়াত নির্দেশাত্মক, আর কতগুলো রূপক; আর কোরআনে জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশাত্মক আয়াতগুলোর উপরে, রূপকগুলোর উপরে নয়। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রচলিত জীবনী-গ্রন্থে 'প্রত্যাদেশ' সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ ও বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। ওদুদ 'প্রত্যাদেশ' সম্পর্কে কোরআন, হযরত আয়শা, বুখারির হাদিস, ইবনে খলদুন, ইবনে ইসাহাক, 'মোস্তফা-চরিত' প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রচলিত সমস্ত মতবাদের বিচার -বিশ্লেষণের শেষে এ-সম্পর্কে "প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধি" শিরোনামায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করা হয়েছেঃ

> ... মানুষের প্রতিদিনের জীবনে যা শোভন ও কার্যকর তা যেমন কাম্য বিচার বুদ্ধির, তেমনি কাম্য প্রত্যাদেশেরও। আর প্রত্যাদেশের দ্বারা এও ঘোষিত হয়েছে যে আল্লাহ মানুষের দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা, এসব বার বার ক্ষমা করেন- অবশ্য যদি মানুষ আগ্রহ দেখায় কল্যাণের পথে চলতে। অন্য কথায়, বিচারবুদ্ধিই আমাদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রত্যাদেশের অর্থ ও মূল্য নিরূপণের ব্যাপারে (পৃ. ২৭৮)।

'পরিণতি' অংশে তিনি আলোচনা করেছেন কোরআন, হযরতের আচরণ, আর প্রত্যেক মুসলমানের বিচার-বুদ্ধি, এই তিনের অনুসরণ করার জন্য হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর অনুবর্তীদের জন্য যে নির্দেশ রেখে গেলেন, মুসলমানের ইতিহাসে তাঁর পরিণতি কি হলো, সে সম্পর্কে।

তিনি এ-জীবনীগ্রন্থে স্পষ্টতই বলেছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কাছে বিচার-বুদ্ধির মর্যাদা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত করে ফেলেছেন। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ এর লেখকগণ চেয়েছিলেন বিচার-বুদ্ধির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নির্দেশকে বাঙালি মুসলমানের জীবনে অর্থপূর্ণ করে তুলতে।[২৬]

একালে ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মানুষ্যত্ব সাধনাই মুখভাবে বুঝতে হবে- ধর্মের আচার- অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌণ-জীবন, কোনটি মুখ্য কোনটি গৌণ এই বিচার আমাদের মধ্যে যেন কখনো শিথিল না হয়, বিশেষ করে, একালের জটিল জীবনায়োজনের দিনে।

> .....যুক্তি বিচারের উপর জোর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোরআনের অনুবর্তিতার চাইতে যুক্তিবিচারের অনুবর্তিতাই প্রতিষ্ঠিত হবে -এর মীমাংসা এইঃ যুক্তি - বিচারের অনুবর্তিতা ও কোরআনের অনুবর্তিতা এই দুইটি পৃথক করে দেখা অসঙ্গত; কোরআনের অনুবর্তিতার সত্যিকার অর্থ যুক্তি-বিচারেরই অনুবর্তিতা, যেখানে যুক্তি-বিচারের নির্দেশ ক্ষুণ্ন হয় সেখানে কোরআনের নির্দেশও প্রকৃতই ক্ষুণ্ন হয়।[২৭]

প্রসঙ্গত ওদুদ -কৃত কোরআনের অনুবাদের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। কারণ হযরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবনী লিখতে গিয়েই তিনি বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর অনুদিত 'পবিত্র কোরআন'কে 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' এর পরিপূরক গ্রন্থ বলে গণ্য করা যায়। এ-সম্পর্কে তিনি 'পবিত্র কোরআন' এর ভূমিকা'য় বলেছেনঃ

> পবিত্র কোরআন বাংলায় অনুবাদ করবো -একথা পূর্বে কখনো ভাবি নি। এর জন্য প্রস্তুত হইনি। হয়রত মোহম্মদের (সঃ) (তাঁর উপরে আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক) একটি জীবনী লিখবো- সে কথা অবশ্য বহুদিন থেকে ভেবে এসেছি। কিন্তু সেই জীবনীতে যখন প্রকৃতই হাত দিতে পারলাম তখন দেখলাম, কোরআনের সঙ্গে যে সব পাঠকের পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষে হযরতের চরিত্র উপলব্ধি করা দুরূহ কতকটা অসম্ভব।

কোরআন অনুবাদেও তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। মুলের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি কোরআন অনুবাদ করেছেন চলিত বাংলায়। উল্লেখ্য যে, কোরআনের কোনো অনুবাদক চলিত বাংলার এই প্রকাশ সামর্থ্যকে এভাবে কাজে লাগাতে সমর্থ হন নি। ওদুদের শিল্পীমনই তাঁকে এই অভিনবত্বের অনুসারী করেছে।

বলা বাহুল্য কাজী আবদুল ওদুদ বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য প্রাবন্ধিক। কথাসাহিত্যেও তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি মননশীল লেখক বলেই তাঁর প্রতিভা-বিকাশের যোগ্য বাহন হতে পেরেছে প্রবন্ধ। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় শিল্পীমানস গঠিত হলেও তাঁর নিজস্ব বাণী ছিল। এই বাণী পাঠক সমাজে পৌছে দেবার গভীর তাগিদ তিনি আজীবন অনুভব করেছেন। সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ 'সাহিত্যিক কাকে বলবো? যিনি তাঁর মনের ভাব সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন। সুন্দর ভাষা কি? যাতে ভাবের প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ বা পর্যাপ্ত হয়েছে।[২৮] ওদুদ নিজেও তাঁর ভাবধারাকে সর্বদাই সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর প্রবন্ধে ভাবের গভীরতা ও ভাষায় ঐশ্বর্য -এ দুয়েরই সম্মিলন ঘটেছে। 'ব্যবহারিক শব্দকোষ নামক একটি 'আধুনিক বাংলা ভাষার অভিনব অভিধান' সংকলনের মধ্যেও তাঁর ভাষা-সচেতন মনের পরিচয় মেলে।[২৯]

তাছাড়া জাতীয় জীবনে কাজী ওদুদ যেমন সাম্প্রাদিয়কতা সমর্থন করেননি, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্যান-ইসলামবাদ সমর্থন করেননি। 'মুস্তফা কামাল সম্পর্কে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, প্যান-ইসলামী চিন্তা মুসলমানকে বহিমুখী করে তোলে এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি উদাসীন করে। মুসলমানদের স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখ দৈন্যের অবসানের চিন্তা করা উচিৎ। প্যান-ইসলামবাদ নয়, বাস্তব জাতীয়তাবাদই মুসলমানের কাম্য। কাজী ওদুদ বানার্ড 'শ-এর একটি উক্তি প্রায়ই উল্লেখ করতেন '*Let us live rationally and nationally*' বিচারবুদ্ধিপরায়ন এবং জাতীয়তাবাদী রূপে জীবন যাপন তিনি কামনা করেছেন। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আন্তর্জাতীয়তাবাদও তার কাম্য ছিল।

ওদুদ 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি 'বুদ্ধির মুক্তির' সমর্থন করতেন। তারই অনুসঙ্গ হিসেবে তিনি সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তার বিরোধিতা করছেন। সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা ধর্ম রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি একটি সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে ভাবতেন সেটি হলো মুসলিম সমাজ। সকল মুসলিম মনীষী ও সাহিত্যিকের মতোই তিনিও ছিলেন মুসলিমগত প্রাণ।

আবুল হুসেন

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'- এর আদর্শকে সমুন্নত রেখে সম্মুখে অগ্রসর হবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন আবুল হুসেন। তিনি এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক দায়িত্ব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই তা পালন করেছিলেন। তাই 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর জীবন ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পীর প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি সে-কাজেই তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে গেছেন। একারণেই সাহিত্যক প্রতিভার

যথার্থ স্বাক্ষর তাঁর পক্ষে রেখে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তবু তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে যে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে একজন যুক্তিবাদী ও মননশীল এবং ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তার সাক্ষাৎ পেতে অসুবিধা হয় না।

আবুল হুসেনের কর্মজীবন শুরু হয় কলকাতার হেয়ার স্কুলে সহকারী শিক্ষকরূপে। ১৯২১ খ্রিস্টব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি এখানে সমাজ -সংগঠন কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে মাসিক *তরুণ পত্র* - এর প্রকাশ ঘটে এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে *আল-মামুন* ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ঘটে তাঁরই সংগঠন তৎপরতায়। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কর্মে নিয়োজিত ছিলেন এবং অধ্যাপনাকালেই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বি-এল ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকতা ত্যাগ করে তিনি ঢাকায় আইন -ব্যবসা শুরু করেন এবং এম-এল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সর্ব প্রথম এম-এল ডিগ্রির অধিকারী হয়ে পরবর্তী বছরেই কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *'Tagore law Lecturer'* পদের জন্য *'The History of Development of Muslim Law of British India'* বিষয়ে পনেরটি বক্তৃতার সার-সংক্ষেপ দাখিল করেন। কিন্তু এ-সময়ে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে আর এ-বিষয়ে আগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। অবশেষে এ-ব্যাধির প্রকোপেই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫ অক্টোবরে সকাল সাড়ে সাতটায় কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পানিসারা গ্রামে পিতার সমাধির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আবুল হুসেনের প্রধান পরিচয় পাবন্ধিক হিসেবে। তবে কয়েটি ছোট-গল্প এবং 'মিলন-মঙ্গল' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটকও রচনা করেছিলেন। *রুদ্ধ ব্যথা, নেশার ফের, স্নেহের টান, মিনি, গোঁয়ার গাদু, প্রীতির কুঁড়ি,* প্রভৃতি গল্পে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের বিচিত্রমুখী সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। অবশ্য *মিনি*-তে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। পর্দা প্রথার নিষ্পেষণে মুসলমান নারীর জীবন কিভাবে ব্যর্থ হতে পারে *রুদ্ধ ব্যথা* গল্পের বড়ুর মধ্যদিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে। সমাজের অন্যায় অবিচার ও নিষ্ঠুরতায় বড়ুর মনে যে বেদনার ক্ষত সৃষ্ট হয়েছে সমাজের রক্তচক্ষুর জন্য তা কখনো প্রকাশের পথ খুঁজে পায়নিঃ

> তাহার [বড়ুর] অন্তরের ভিতরকার অশান্তি প্রকাশের অভাবে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতে চাহিত কিন্তু সমাজ ও লৌকিক আচারের চোখ রাঙানিতে সে থামিয়া থাকিত। তবু রুদ্ধ বেদনার জ্বলন্ত আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া তুষের আগুনের মতো নীরবে তাহার ভিতরটা খাইয়া ফেলিতে ছাড়িল না। কিন্তু অন্তরের অবস্থা অন্তরেই রহিয়া গেল।[৩০]

শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে মুসলমানগণ কিভাবে স্খলিত-চরিত্র হয়ে একসময় পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, *নেশার ফের* গল্পে তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পটির সূচনা হয়েছে নিম্নোক্তভাবেঃ

> জৈনদ্দীন শেখ কিসমত খাঁর গলির একখানি ছেঁড়া টিনের ঘরে বাস করে; তার বাপ-দাদারা নাকি বাদশাহের আমল থেকে কাসিদা-শিল্পের কাজের জন্য খুব নামজাদা লোক ব'লে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু জৈনদ্দীন এখন গাড়োয়ান। মহাজনের টাকায় গাড়ী-ঘোড়া চালিয়ে সে যে মাসহারা রোজগার করে, তাতে তার দিন গুজরান করা খুবই কঠিন। বাপ-দাদাদের অর্জিত সম্পত্তি যা ছিল, তা তার দাদার পরদাদার গোষ্ঠির মালিকেরা ভাগ বাটোয়ারা ক'রে নিয়ে ছিল। তার বাপের অংশে যা ছিল, তা সে স্ফুর্তি, খেলা, মদ, গাঁজা, ভাঙ-কোকেন প্রভৃতি যাবতীয় নেশায় উড়িয়ে দিয়ে অবশেষে চাবুক ধরতে বাধ্য হ'ল। এখন সে দিন আনে দিন খায়।[৩১]

আবুল হুসেনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *বাংলার বলশী* চারটি দীর্ঘ প্রবন্ধের সমষ্টিঃ তাঁর মধ্যে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল- *রুশ বিপ্লব* (১৩২৪) এর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রবন্ধগুলো রচনা করেছিলেন এবং গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন *বাংলার বলশী*, অর্থাৎ বাংলাদেশে বোলশেভিক্স।[৩২] বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায়ের জাগরণেই যে কৃষি-বিপ্লব সম্ভব আবুল হুসেন তা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন।[৩৩]

আবুল হুসেনের দ্বিতীয় গ্রন্থ *বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা*।[৩৪] 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে তিনি গ্রন্থের প্রথমাংশ পাঠ করেছিলেন। এ-অংশ *শিখা'র* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়াংশ পাঠ করেছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর তৃতীয় বর্ষের সাধারণ অধিবেশনে। বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগৃতির উপায় হিসেবে তিনি আধুনিক শিক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দান করেছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিমুখতার কারণেই বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ জীবন - সংগ্রামে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়েছে। এ-প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেনঃ

> আমাদের শিক্ষা নাই- আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহু দিন হতে বিরোধ ক'রে বসেছি এবং দর্শন, বিজ্ঞান ও আর্টকে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিয়েছি-এই ভয়ে, পাছে তাতে ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম আমাদের এতই নাজুক! ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞান-দীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ ক'রে নিল, আর আমরা সে আঘাতে জাগতে চাই-ই নাই বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইউরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি- কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুণ ভুলের কোন সংশোধনেরই চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্তমানে আমরা জোর করে আঁকরে ধরেছি।[৩৫]

এ-ভুলের সংশোধন করে তিনি স্কুল-কলেজে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি ও নতুন পাঠ্য তালিকা চালু করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। একারণেই পুস্তিকাটি সুধিসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল।

আবুল হুসেনের তৃতীয় গ্রন্থ '*মুসলিম কালচার*' ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।[৩৬] প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ মোহাম্মদ মার্মাডিউক পিক্‌থল (১৮৭৫-১৯৩৬) ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের 'ইসলাম বিষয়ক বক্তৃতা কমিটি'র আমন্ত্রণে *The Cultural Side of Islam* শিরোনামায় আটটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলো পরবর্তীকালে *`Islamic Culture'* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৩৭] আবুল হুসেন এই বক্তৃতামালার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে মাসিক '*সওগাত*' এর সাতটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। 'মুসলিম কালচার' এই অনূদিত রচনাবলির সংকলন। পিকথলের এ-বক্তৃতায় মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান ও পতনের কারণগুলো যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আবুল হুসেন এগুলো বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এ-সম্পর্কে '*মুসলিম কালচার*' এর 'গ্রন্থ সম্বন্ধে দুটি কথা'য় বলেছেনঃ

> এই গ্রন্থে স্বনামধন্য ইংরেজ মুসলমান মার্মাডিউক পিক্‌থলের মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত ও হাইদ্রাবাদের *Islamic Culture* নামক ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত। ..... এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইসলাম মানবসভ্যতার ইতিহাসে কি ফল ফলিয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আরবী- ফারসী অনভিজ্ঞ বাঙালি এই পুস্তক হতে মুসলিম সভ্যতার একটি স্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, অনুরূপ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ও কাজী আবদুল ওদুদ *The Spirit of Islam* বাংলা ভাষার অনুবাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে সৈয়দ আমীর আলীর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। আমীর আলী ও এ-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সানন্দচিত্তে অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[৩৮] আবুল হুসেন *ইসলাম সার* শিরোনামায় *The Spirit of Islam* গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করেছিলেন, কিন্তু প্রকাশকের অর্থের দাবি মেটাতে না পেরে ক্ষান্ত হন। এ-গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

> এই পুস্তক *The Spirit of Islam* ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্ত মনের কতখানি খোরাক জোগাইয়াছে, জোগাইতেছে ও জোগাইতে থাকিবে তাহার ইয়াত্তা করা দুস্কর। ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে খ্রিস্টান পাদ্রীরা ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্তক সম্বন্ধে নানা মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া ইসলামের প্রতি ভারতবাসীর বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় আমীর আলী ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও স্বরূপ এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) মহাজীবনের যুগধর্ম-সঙ্গত অর্থ তাঁহার *The Spirit of Islam*-এ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর ইসলামের প্রতি অমুসলিম জাতির শ্রদ্ধা ও প্রশংসা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা শত শত প্রাচীন সংস্কার-নিপীড়িত আধুনিক জ্ঞানবিবর্জিত আলেম করিতে পারেন নাই ও পারিতেন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।[৩৯]

আবুল হুসেনের উপরোক্ত *Islamic Culture* সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে মনে হয়। *মুসলিম কলচার* গ্রন্থটি শুরু হয়েছে নিম্মোক্ত উক্তি দিয়ে-

> মুসলিমের জন্য এক আইন ও অমুসলিমের জন্য অন্য আইন-ইসলামের এরূপ কোন বিধি নাই। আল্লাহর রাজ্যে কোন বিশেষ প্রিয়পাত্র নাই। পবিত্র আইন সকলের জন্যই এক এবং যে অমুসলিম এই আইন মেনে চলে, সে আইন-দ্রোহী দীক্ষিত মুসলিমের চেয়েও ভাগ্যবান। *"নিশ্চয়ই, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না- যতক্ষণ সে জাতি আপনার অবস্থা ও গতির পরিবর্তন না করে'- কোরান*। ধর্ম বিশ্বাস নয়, কর্মই কালচারে'র প্রকৃত মাপকাঠি। প্রত্যেক মানুষই তার কর্ম দ্বারা ইহকাল-পরকালের শুভাশুভ অর্জন করে।[৪০] ....

মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য ইসলাম ধর্মে ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করা হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কিভাবে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করতেন সে সম্পর্কে এ-গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

> হযরত কখনও উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি। নিজের জীবনে সে উপদেশ কার্যকরী করে তুলে নিজেকে এক অপরূপ আদর্শে পরিণত করেছিলেন। সমস্ত আরব দেশের সম্রাট হয়েও তিনি কখনও রাজসিংহাসনে বসেন নি বা সম্রাটোচিত হুকুম ঝাড়েননি। তিনি জনসাধারণেরই একজন ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব বড় জোর মজলিসের ইমামতিতেই শেষ হয়ে যেত। মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব যখন তিনি প্রচার করেন, তখন তিনি নিজেকে বাদ দেন নাই। তিনি নিজেই এক বিরাট আদর্শ ছিলেন।[৪১]

মুসলমান সমাজে জ্ঞান- বিজ্ঞান, ললিতকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ প্রচলিত থাকায় এ-গ্রন্থে কোরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং যুক্তিদ্বারা সেই উদ্ধৃতিসমূহ বিশ্লেষণ করে ইসলাম ধর্মে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ললিত-কলা ও সাহিত্যের স্থান নির্ণয় করার প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে। জ্ঞান সাধনার গুরুত্ব সম্পর্কে এ-গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

> মুসলিম কালচারের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রেরণা ও মূল কারণ হচ্ছে পবিত্র কোরান এবং তার অর্থ কায্যে পরিণত করবার প্রধান শিল্পী হচ্ছেন হযরত মুহম্মদ (সঃ)। কোরানে পুনঃ পুনঃ মানুষের সহজবুদ্ধিকে উদ্বোধিত করে মানুষকে প্রত্যক্ষ জাগতিক জীবনের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। ভৌতিক বা আলৌকিক ব্যাপারকে আমলই দেওয়া হয় নাই। তবু আধুনিক মুসলিম যে কোন ভৌতিক ও আলৌকিক গল্প দিয়ে কোরান ও হযরতকে ঢেকে রেখেছে, তা বুঝা কঠিন, তবে ভারতবর্ষে হয়ত পরিপার্শ্বিক পৌত্তলিক সংসর্গে পড়ে মুসলিমগণ এই ভৌতিক ব্যাপারকে বেশি ক'রে বিশ্বাস করছে। হযরত বলেছেন- "প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে জ্ঞানার্জ্জন করা ফরজ। যদিও চীন দেশে যেতে হয় তবু সেখানে গিয়ে জ্ঞানার্জন কর।" আরও বলেছেন-" খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে এক ঘন্টা ধ্যান ও অধ্যয়ন এক বৎসরের উপাসনার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।[৪২]

চিত্রকলা ও সঙ্গীত সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে

চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্যনৈপুণ্য প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় সৃষ্টিকে অবলম্বন করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে কোরান ও হাদীসের মধ্যে এমন কোন উক্তি নাই, যাতে প্রাণী-চিত্র নিষিদ্ধ হয়েছে বলে বুঝা যায়। শুধু হযরত একজন পারসী চিত্রকরকে তাঁর স্বীয় চেহারা আঁকতে নিষেধ করেছিলেন- এ ভয়ে পাছে পারসীরা সেই চিত্রের উপাসক হয়ে পড়ে। .... পৌত্তলিকতাকে দূরীভূত করবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীত ও অভিনয়কে নিম্নস্তরের কলা বলে ধরা হয়েছিল। তা'হলেও জনসাধারণ সঙ্গীত ত্যাগ করেন নাই। সঙ্গীত ভোজের অঙ্গ বলে প্রচলিত ছিল কখনও কলাশ্রেণী ভুক্ত ছিল না। "মুয়াযযিনগণই (নামাজে আহবানকারী) একমাত্র গায়ক ব'লে অভিহিত হ'তেন। এরা খুব সমাদৃত হতেন এবং মজলিসে আহুত হতেন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আলাপ করবার জন্য। তাদের পুরস্কার খুব মোটা রকমের ছিল।[৪৩]

অভিনয়-কলা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য ঃ

> অভিনয়-সম্পর্কে মুসলিমগণ অপ্রকৃত চেহারা অনুকরণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সেটাতে মুসলিম নরনারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হ'ত বলে তাঁরা মনে করতেন। গ্রীক ও আরমেনিয়ানদের হাতে এই অভিনয় ছিল। এরা ঘুরে ঘুরে নানা বিষয় নিয়ে অভিনয় করতে। সমাজের বুদ্ধিমান মাত্রই এতে যোগ দিয়ে চিত্তবিনোদন করতে পারত। ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াতে এই ছায়া-অভিনয়ের উল্লেখ আছে!.. যখন আমি এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিসরে ছিলাম তখন আমি

নিজে বহু ছায়া - অভিনয় দেখেছি। এই অভিনয় এখন নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। তবু তার মধ্যে বাস্তবিক বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ খুব আমোদজনক ও আনন্দকরও বটে।[৪৪]

স্থাপত্য -শিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে

স্থাপত্য-শিল্পে মুসলিমের কীর্তি অমর ও অনুপম ! কর্ডোভার মসজিদ হতে সমরখন্দের বাগিচা পর্যন্ত, আলহামরা হতে তাজমহল পর্যন্ত, দানিয়ুব নদের এপার পেসতের উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেই ছোট দরবেশের কবর হ'তে কাইরোজান ও কাইরোর গম্বুজ ও জেরুজালেমের পর্ব্বত -গম্বুজ পর্যন্ত যাকে জনৈক জার্মান পর্যটক বর্তমান জগতের বুকে সর্ব শ্রেষ্ঠ স্মৃতি স্তম্ভ বলেছেন - আমরা বিচিত্র স্থাপত্য-নৈপূণ্যের নিদর্শন দেখতে পাই। মুসলিম জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকারের স্থাপত্য-আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। সমস্তই ইসলামের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত।[৪৫]

মার্মাডিউক পিকথলের পঞ্চম বক্তৃতার বিষয় ছিল *Tolerance in Islam* (ইসলামে সহিষ্ণুতা) আবুল হুসেন এ-বক্তৃতার অনুবাদ করেছেন *ঔদার্য্য ও প্রেম* শিরোনামে। ইসলাম ধর্মের উদারতা প্রসঙ্গে *মুসলিম কালচার* এ বলা হয়েছে ঃ

মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের একটা স্বরূপ হচ্ছে ঔদার্য ও প্রেম। যে-জাতি যত উদার ও প্রেম-প্রবণ, সে-জাতি তত উন্নত ও মনুষ্যত্বের অধিকারী। ..... আজকাল মুসলমান অন্য ধর্মাবলম্বীকে 'কাফির' বলে অনুদারতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কোরানেও 'কাফির' শব্দের উল্লেখ থাকায় ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলমানকে অনুদার বলে নিন্দা করে থাকে। কিন্তু 'কাফির' শব্দের প্রকৃত অর্থ এই, সর্বধর্মের সত্যদ্রোহী ও খোদার করুনায় আস্থাহীন ব্যক্তি। কোন ধর্মই সে বিশ্বাস করে না। কোন ধর্মগ্রন্থেই তার আস্থা নাই। সে পয়গম্বরকে সত্যের দূত ব'লে স্বীকার করে না। প্রথম কাফির হচ্ছে 'ইবলিস' শয়তান' যে অহঙ্কারস্ফীত হয়ে মানুষকে সেজদা করতে স্বীকার করে নাই। .... 'পৌত্তলিক' ও 'কাফির' পৃথক। যে-ব্যক্তি মুসলিমকে সালাম করে, সে কখনও কাফির নয়। একথা হযরত নিজেই বলেছেন। 'কাফির' কোরানের মতে সর্ব জাতি, সর্ব সমাজ ও সর্বধর্মের শত্রু।[৪৬]

প্রসঙ্গত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষ উদারতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

ধর্মমতে অসহিষ্ণু হয়ে তিনি [হযরত মোহাম্মদ (সঃ)] কখনও অন্যের প্রতি কোন প্রকার জোর জবরদস্তী বা রূঢ় ব্যবহার করেন নি - যুদ্ধ করা ত দুরের কথা। খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসক অতিথীদের সহিত তার যে ব্যবহার, তার তুলনা অতি বিরল। ধর্মের জোশ বা বাড়াবাড়ির গন্ধও তাতে প্রকাশ পেতে না। মুসলিমগণও ভুলে যান যে, আমাদের হযরত কখনও কিতাবী জাতিকে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করার জন্য আহবান করেন নাই। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর পৌরোহিত্য-প্রথা ত্যাগ কর-কুসংস্কার হতে তোমাদের ধর্ম মুক্ত করে তার আদি পবিত্রতার পুরুদ্ধার কর'। তাঁর প্রশ্নটা ছিল এই, "তোমরা আল্লাহর রাজ্যের জন্য বাঁচতে চাও, যে রাজ্যে মানুষ মাত্র সকলকেই সমভাবে স্থান দেওয়া হয়-না তোমরা শুধু তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য জীবন ধারণ করতে চাও, যার মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন অধিকার থাকতে পারে না?" প্রথমটা শান্তি ও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আর দ্বিতীয়টি যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, অত্যাচার ও নির্যাতনের বহর বাড়ায়।[৪৭]

মুসলিম কালচার প্রকাশের অব্যবহিত পরে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল তারিখে আবুল হুসেন রংপুর ছাত্র-সম্মিলনীতে *মুসলিম সংস্কৃতি* বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এ বক্তৃতারই সংক্ষিপ্তরূপ *মুসলিম কালচারের ধারা* শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৮] রচনাটিকে *মুসলিম কালচার* গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে গণ্য করা যায়। এ বক্তৃতার তিনি *মুসলিম সংস্কৃতি'র* স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেনঃ

মুসলিম কালচার বুঝতে গেলে কালচার জিনিসটা কি তা বুঝতে হবে। মানুষের চিন্তা বা idea কোন একটা বিশিষ্ট দেশে, একটা বিশিষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে তৎকালীন মানুষকে যে সমস্ত কাজ করতে প্রণোদিত করে, সেই সমস্ত কাজের সমষ্টিই হচ্ছে 'কালচার'। আরব মরুভূমি-বক্ষে এক মহাপুরুষ মুহম্মদ (সঃ) চিন্তা বা idea বেদুঈন-আরবকে এবং তাদের মারফতে অন্যান্য দেশের লোককে যে-সমস্তকাজ করতে উৎসাহিত করেছিল, সেই সমস্ত কাজের সমষ্টিই হচ্ছে মুসলিম কালচার। মুসলিম কালচার বলতে কোন একটি বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানের একটি

> চিরন্তন কোন কিছু বুঝলে চলবে না। তাঁর সাধনা হতে যে চিন্তা জন্মেছিল তারই প্রভাবে খাঁটি আরব আবহাওয়ার ভিতর যে কালচারের সৃষ্টি হয়েছিল সেটিকে আরবী কালচার বললেই ভাল হয়। এইরূপে সেই চিন্তা পারস্যের আবহাওয়ায় যে কালচারের সৃষ্টি করলে সেটি পারসী কালচার, স্পেনের আবহাওয়ায় যেটা করল সেটা মূল-কালচার এবং ভারতের আবহাওয়ায় যেটা করল সেটাকে ভারতীয় মুসলিম কালচার বলতে হবে। আর এই সমস্ত দেশের কালচারকে সমষ্টি করলে 'মুসলিম কালচার' নাম সার্থক হবে।

মুসলিম কালচার বাঙালি মুসলমান সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল।[৪৯] আবুল হুসেন গ্রন্থটিকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে তোলার জন্য পিকথলের মূল বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করেছেন। আবুল হুসেনের অধিকাংশ প্রবন্ধ শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম বিষয়ক। এ জাতীয় প্রবন্ধ অবলম্বনে আবুল হুসেনের চিন্তাধারার পরিচয় পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে।[৫০] তিনি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও লিখেছেন। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধ সমূহ আবদুল কাদির 'আবুল হুসেনের রচনাবলি' প্রথম খণ্ড এ সংকলন করেছেন। এই প্রবন্ধাবলীর সহায়তায় আবুল হুসেনের সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে। আবুল হুসেন ছোটগল্প রচনার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প নিয়ে চিন্তাভাবনাও করেছেন। "ছোটগল্পের ধারাষ্ট্র প্রবন্ধটি তারই পরিচয় বহন করে। তিনি এ প্রবন্ধে সাহিত্যে ছোটগল্পের আবশ্যকতা, পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রাচূর্যের কারণ, বাংলা ছোটগল্পের বর্তমান অবস্থা ও তার পরিকল্পিত রূপ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ছোটগল্প কিভাবে বাঙালি সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে সম্পর্কে বলেছেনঃ

> বঙ্গসমাজ, কি হিন্দু কি মুসলমান, অত্যন্ত প্রাচীন আচারাবলম্বী। মৃত্যু স্বীকার তবু আচার পরিত্যাগ অসম্ভব। আচার তাহার অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে অন্ধের মত আঁকড়িয়া আছে ..... মনের সচলতা সমাজকে জাগরিত করিয়া তুলিবে সেটা শিক্ষা সাপেক্ষ। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের মধ্যে সমাজের অভ্যস্ত আচারের বিভীষিকাময় ফল দেখাইতে পারিলে যথেষ্ট ফল হইতে পারে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর লেখকগণ ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তায় হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা করতেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই উদার ও অসাসম্প্রদায়িক সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শৈলবালা ঘোষজায়া ছিলেন সেধরনের একজন বিরল লেখিকা, যিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস, *শেখ আন্দু*'তেই এর প্রমাণ মেলে।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব যে কিভাবে সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে দু'টি প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে কাছাকাছি এনে দেয়' 'শেখ আন্দু' উপন্যাসে তার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মুসলমান আন্দু এক হিন্দু (চৌধুরী) পরিবারের মোটরচালক হয়েও পৌরুষ ও চরিত্র মহিমায় পরিবারের সকলের ভালবাসা লাভ করেছিল। এমন কি তার প্রভু-কন্যা ললিতা চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে চিরজীবনের সাথী হিসেবে কামনা করেছে। এ-ঘটনার চিত্রণে ড. সুকুমার সেন লেখিকার 'বিশেষ রকম স্বাধীনতা ও সাহসিকতা'র পরিচয় পেয়েছেন।[৫১] আবুল হুসেন এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত সমালোচনায় বলেছেনঃ

> আন্দু সামান্য ভৃত্য হইলেও সে মানুষ ছিল; মানুষের আত্মায় সে ভরপুর ছিল- চৌধুরী সাহেবও মনূষ্যত্বের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন। কাজেই মনুষ্যত্বের মহামিলন ক্ষেত্রে আন্দু ও চৌধুরী সাহেব গলাগলি হইয়া দাঁড়াইয়া মানবতার প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গণ করিয়া জাতি ধর্মের সঙ্কীর্ণতাকে উপহাস করিতেছেন। আন্দু আর যবন ম্লেচ্ছ নয় - চৌধুরী সাহেবও সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দুর নিষ্ঠাগর্বে স্ফীত উদ্ধত নন। চৌধুরী সাহেবের উদার মাহাত্ম্যকিরণে তাঁহার সারা বাড়ীটা উদ্ভাসিত।

অসম্প্রদায়িক ও মুক্ত বুদ্ধি সুপ্ত সমুষ্যত্বকে জাগ্রত করে তোলাই ছিল আবুল হুসেনের সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তাই শেখ আন্দু ও চৌধুরী সাহেবের মনুষ্যত্বের চিত্রটি তাঁর মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বাজিতপুর সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণেও তাঁর এ-মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছেঃ

> আমাদের সাহিত্যের ভিতর সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য যেন কোন প্রকারে না থাকে, তবেই মিলনের পদটি পরিস্কার হবে। শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যেদিন এটা চাইবে সেদিন দেশের হাওয়া বদলে যাবে। সেইদিন থেকে যে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হবে তা প্রকৃত বঙ্গসাহিত্য হবে।

মূলত আবুল হুসেনের সকল রচনাই বক্তব্য প্রধান। এমন কি, ছোট গল্পেও তিনি বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন নি। একারণে গল্পগুলোও রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠেনি। তবে বক্তব্যই প্রবন্ধের প্রাণ শক্তি বলে সাহিত্যের এ শাখায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি মানুষের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ (আল্লাহর গুণাবলীতে বিভূষিত হও) - হযরত মোহাম্মদের এই অমর বাণী তিনি বার বার স্মারণ করেছেন।

মানুষের এই সম্ভাবনাময় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলার পথে নানারকম সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা এসে উপস্থিত হয়। আর এসব প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করার প্রধান অস্ত্র মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি। জ্ঞানই এই বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ ও শাণিত করতে সাহায্য করে। তাই জ্ঞানসাধনাই মানব জাতির মুক্তির প্রধান উপায় এবং *জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব*। সঙ্গত কারণেই আবুল হুসেন তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বিষয়রূপে শিক্ষা ও জ্ঞান সাধনাকে গ্রহণ করেছেন। তার আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিষয়। এসকল ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বহু আবর্জনা জমা হয়ে বাঙালি সমাজকে চলচ্ছক্তিহীন করে তুলেছিল বলেই তিনি এই পুতিগন্ধময় আবর্জনা দূর করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা এ-অনুভূতিরই বাস্তব ফসল।

কাজী মোতাহার হোসেন

মুক্ত বুদ্ধির সাধক ও উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন বলে কাজী মোতাহর হোসেন বিচিত্র রসের রসিক হতে পেরেছেন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, খেলাধুলা সবকিছুতেই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। উত্তরকালে তিনি সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিজ্ঞানী ও দাবাখেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর অন্যতম প্রধান সংগঠকের একজন ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদকে বলা হতো এ প্রতিষ্ঠানের মস্তক, আবুল হুসেনকে হস্ত এবং তাঁকে বলা হতো হৃদয়।

কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে *Design of Experiments* বিষয়ে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংখ্যাতত্ত্ব (পরিসংখ্যান) বিভাগের প্রফেসর হন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে *সুপার-নিউমারারী প্রফেসর-* এর পদ দেয়া হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি Institute of Statistical Research and Training এর পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রফেসর এমিরিটাস পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মনসূচক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা লাভ করেন। বাংলা প্রবন্ধে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় অবদানের জন্য ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর ঢাকায় তিনি পরলোক গমন করেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কাজী মোতাহার হোসেনের প্রবল অনুরাগ ছিল। পল্লী গ্রামের পুঁথি-পাঠের আসর থেকেই তিনি প্রথম সাহিত্যরসের সন্ধান পান। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

> এক ধরনের পুঁথি ছিল শহীদে কারবালা, মেসবাহুল ইসলাম, শাহনামা ইত্যাদি, অন্য ধরনের জৈগুন বিবি, সোনাভান, সূর্য উজাল বিবি ইত্যাদি। আর পুঁথির মতই জনপ্রিয় ছিল মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু। আমার পিতাও ছিলেন সুকণ্ঠ পাঠক। পুঁথির বহুলাংশ তাঁর মুখস্ত ছিল। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহম্মদ (সঃ) পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী সময় সময় পুঁথি পুস্তক না দেখেই তিনি আউড়িয়ে যেতেন। তাতেও অনেক উপদেশ থাকতো, সেগুলোও আমি মনে রাখবার জন্য একটু বিশেষ যত্ন নিতাম।[৫২]

দেশ বিভাগের কিছু আগে থেকেই বাঙালি মুসলমান সমাজে যে স্বাতন্ত্র্যচেতনার উন্মেষ ঘটে, দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রবল আকার ধারণ করে। পূর্ব বাংলার সাহিত্যকে *মুসলমানী সাহিত্য* করে তোলার জন্য কিছু সংখ্যক ধর্মান্ধ লেখক নানারকম কৌশল অবলম্বন করে সাহিত্যচর্চার সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কাজী মোতাহার হোসেন এই গুরুতর সমস্যাটিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি এ-সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে লিখেছেন ঃ

> ধর্মীয় ব্যাপারাদি মূল থেকে প্রচুর পরিমাণে অনুবাদ করা আবশ্যক। আবার সে সব বিষয়ে মৌলিক রচনাও বাদ দিলে চলবে না। ধর্ম-বিষয়ে জোর দেওয়ার একটি বিশেষ কারণ এই যে, সাধারণভাবে এশিয়াবাসীর এবং বিশেষ করে বাঙালির মানসিক গঠনে ভক্তিভাবের প্রাবল্য আছে। ধর্মের আশ্রয়েই ভক্তিভাব পরিপুষ্ট হয়। তাই ধর্ম এদেশীয় লোকের কর্ম প্রচেষ্টার একটা প্রবল উৎস। ধর্মের নামে সহজে উত্তেজনা আর উম্মাদনার সৃষ্টি হয় এবং তার পরিচয়ও আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। ..... মূল ধারণা স্পষ্ট থাকলে, অপ্রধান খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। এদিক দিয়ে সাহিত্যের দায়িত্ব রয়েছে। ধর্মভাবকে মধ্যযুগীয় বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। বরং বুদ্ধি দিয়ে একে মার্জিত করে নিতে হবে। আসলে বুদ্ধি ও 'সাধনা দিয়ে লাভ করতে না পারলে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের যে প্রাপ্তি, তার অপর মূল্য যাই হোক না কেন, ব্যবহারিক মূল্য প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। তাই সাহিত্যিকের একটি কর্তব্য হচ্ছে, ধর্মপ্রাণতা আর ধর্মান্ধতার মধ্যে পার্থক্য কি তা স্পষ্ট করে লোকের সামনে তুলে ধরা। অবশ্য এ অতি কঠিন কাজ। এর প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে ধর্মীয় তথ্য সংগ্রহ যেমন আবশ্যক, তেমনি তার মূল্য যাচাই করে বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়েও ঠিক ততটা বা তার চেয়েও অধিক প্রয়োজন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবন্ধে তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শিল্পীও সাহিত্যিকের চিন্তার স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, রাজনীতি ও ধর্ম, এ দুটি বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দকে মুক্ত মন নিয়ে সৃষ্টিকর্মে অগ্রসর হতে হবে। কিছু সংখ্যক লেখক তাঁদের রচনায় আরবী ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা মুসলিম কৃষ্টির পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেন বলেই তিনি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন ঃ

> যে শব্দ বাংলার লোকে ব্যবহার করেছে, তা বাংলা হোক, উর্দু-ফার্সী হোক, ইংরেজী হোক তা' বর্জন করবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। হয়ত আরবী-ফার্সী -উর্দু শব্দের চাকচিক্যে ভুলিয়ে বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে এক প্রকার অবোধ মোহের সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে সাহিত্যও হবে না, লোকের ধর্মও স্পর্শ করবে না। সুতরাং তা নিস্ফল।

বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলার সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধে তিনি উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দুটি শর্তের কথা বলেছেন- প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। দ্বিতীয় শর্তের ব্যাখ্যা করে প্রসঙ্গত বলেছেন ঃ

> পরিবেশ বলতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা চাই-ই এছাড়া আরও চাই একটি সমযোতার পাঠক গোষ্ঠী যারা সামাজিক, বাক্তিগত বা অন্যবিধ পূর্ব সংস্কারের উর্দ্ধে ওঠে বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য মিথ্যা বা ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা রাখে।

ভাষা যেহেতু সাহিত্যিকদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহক, তাই উপযুক্ত শব্দ, অলঙ্কার ও বাগবিধির সুষ্ঠু ব্যবহার ছাড়া মনের ভাবকে পাঠকের কাছে পৌছিয়ে দেয়া যায় না। তিনি শব্দের অপপ্রয়োগ, যুক্তিবিরুদ্ধতা, রূপকের অসঙ্গতি কৃত্তিমতা, প্রচলিত বাগবিধির খেলাপ, ব্যাকরণ প্রভৃতি ভাষাগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ ধরনের অপপ্রয়োগের ফলে বহু গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধের মূল্য প্রায় অর্ধেক হ্রাস পায়। তাই নবীন লেখকগণকে তিনি ভাষাসম্পর্কে সচেতন হতে উপদেশ দিয়েছেন। তবে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তরুণ লেখক সমাজ জনজীবনের কাছে এসেছে বলেই তিনি তাঁদের সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী।

এখানে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ও গ্রন্থে অসংকলিত বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সাধনার পথ, সাহিত্যের ভিটামিন ও সমালোচনার সাহিত্য শীর্ষক তিনটি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৫৩] বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সাধনার পথ প্রকৃতপক্ষে এ শিরোনামায় প্রকাশিত এস, ওয়াজেদ আলীর একটি প্রবন্ধের আলোচনা।[৫৪] এটি প্রবন্ধের আলোচনা হলেও কাজী মোতাহার হোসেন এ প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এস, ওয়াজেদ আলীর অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য

সাধনা সম্পর্কে যে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন দীর্ঘদিন পরেও তা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। এস. ওয়াজেদ আলী তার উল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

> আমাদের তরুণদের মনে আত্ম-প্রত্যয় জন্মায়ে দিতে হবে, ইসলামের ইতিহাস নিয়ে তাদের গৌরব করতে শেখাতে হবে, আর ইসলামের বিশ্বজয়ী শক্তির উপর তাদের বিশ্বাস জাগিয়ে দিতে হবে; তবেই তারা মানুষ হবে, তবেই তারা জীবন্ত মুসলিম হবে, তবেই তাদের কীর্তি কলাপে সমাজের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

এর উত্তরে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর উক্ত প্রবন্ধে বলেন ঃ

> বর্তমানের সঙ্গে যোগ না থাকলে, শুধু অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে রাখলেই যে আমাদের মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মাবে একথা অবিশ্বাস্য, কারণ অতীত ঠিক একইভাবে বর্তমান পর্যন্ত চলে আসতে পারে না। কথায় বলে এক নদীতে কখনও দুই বার স্নান করা যায় না। আমরা ঠিক অতীতে ফিরে যেতে পারিনে, আর অতীতের ঘটনাও সেইভাবে দ্বিতীয় বার ঘটতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হয়ে, অতীতের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায়, অতীতের আমরা কতটুকু গ্রহণ করতে পারি, অতীতের সঙ্গে আমরা নতুন কি কি মিশিয়ে ফেলেছি এবং এইরূপ নতুন মিশ্রণের কতটুকু সার্থকতা আছে এসমস্ত কথা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। এক কথায় অতীতের বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ অতীতকে বর্তমানের মাপকাঠি দিয়ে বুঝে নিতে হবে।

কাজী মোতাহার হোসেন সমালোচনা সম্পর্কে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না, নিজেও একজন ভালো সমালোচক ছিলেন। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ সমালোচনা থেকেই এ উক্তির প্রমাণ মিলবে। ভাষা-সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধবলীর মধ্যদিয়ে কাজী মোতাহার হোসেনের প্রগতিশীল চেতনার পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গে ভাষা-সমস্যার আলোচনার সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁর *রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পকিস্তানের ভাষা-সমস্যা* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ঢাকার *তমদ্দুন মজলিস* কর্তৃক ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত '*পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?* নামক পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছিল।[৫৫] এটি পরবর্তীকালে *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১ম খণ্ড) এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতার কারণেই বাঙালি মুসলমান সমাজ সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে নি। সুতরাং শিক্ষার বাহন হিসেবে অবিলম্বে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তিনি যে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা যেমন বাস্তববুদ্ধিপ্রসূত, তেমনি দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

প্রাবন্ধিক হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেন বাংলা সাহিত্যের একজন স্মরনীয় লেখক। সমাজসচেতনতা ও শিল্পসচেতনতা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর প্রবন্ধের বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তাঁর রচনায় চিন্তার স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতার সন্ধান সহজেই মেলে। তিনি নিজেই এ-সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> বস্তুতঃ সমাজে সংস্কৃতি, শিল্প ও ধর্ম নিয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে নতুন চিন্তার উদ্‌গম হয়- নবজাগরণের সেই চিন্তার ধ্বনি আমাদের সকলের চিন্তায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার অনেকগুলি প্রবন্ধে সেই মানসিকতার ছাপ রয়ে গেছে। বিশেষ করে যে-গুলো ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখা সেগুলোর মধ্যে।[৫৬]

কিন্তু লক্ষণীয় যে, বাঙালি মুসলমান সমাজে তিনি নবজাগরণের অন্যতম বাণী বাহকরূপে আবির্ভূত হলেও শিল্প সম্পর্কে তাঁর চেতনা সর্বদাই সজাগ ছিল। তাই একটি গোঁড়া, শাস্ত্রাচারে আবদ্ধ ও প্রগতিবিমুখ সমাজের মধ্যে অবস্থান করেও তিনি কখনো মানসিক ধৈর্য হারিয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েননি। জীবনে যে ভারসাম্য রক্ষা করে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রবন্ধাবলি তারই শ্রেষ্ঠফল।

এছাড়া তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোড়ামীর বিরোধীতা করলেও মুসলমান হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্যের কথা কখনো ভুলেননি। তিনি বলেন *আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই না*; আমরা মুসলিম সমাজের পুঞ্জিভূত সংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান চাই। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক হলেও তিনি বিশ্বাস করতে স্বধর্মে অবস্থান থেকেও উদ্ধার হওয়া যায় এবং সামাজিক কুপমণ্ডকতাকে বিসর্জন দেওয়া যায়। আর ইহাই ছিল তার নিজস্ব স্বতন্ত্রচিন্তা চেতনার মূল লক্ষ্য।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের স্বল্পসংখ্যক মননশীল লেখকদের একজন। শিল্প ও সৌন্দর্য তাঁর কাছে মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রধান নিয়ামক বলে প্রতিভাত হয়েছিল বলেই তিনি জীবনের সকল অবস্থায় সাহিত্য-চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তাই সাহিত্য তাঁর কাছে বিলাসের উপকরণ নয়, উন্নততর জীবনে উত্তরণের সোপান স্বরূপ।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কুমিল্লায় বসতি স্থাপন করায় তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সেখানে। তিনি কুমিল্লা থেকেই ঢাকায় এসে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করতেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতা এখানে অবস্থানকালেই রচিত হয়। তাই তাঁর কুমিল্লার জীবনকে *কবি জীবন* রূপে আখ্যায়িত করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের কুমিল্লায় অবস্থানকালে মোতাহের হোসেন চৌধুরীই সবরকম সহায়তা দান করে তাঁর কুমিল্লার প্রবাস জীবনকে আনন্দগন করে তুলেছিলেন। তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবন অতিবাহিত হয় এ শহরেই। বিএ পাস করার দীর্ঘকাল পরে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজে বাংলা সাহিত্যের লেকচারার নিযুক্ত হন। কলিকতায় অবস্থানকালে তিনি বেকার হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে যোগদান করেন। এখানে 'মুসলিম সাহিত্য -সমাজ' এর অন্যতম লেখক আবুল ফজলকে পান সহকর্মীরূপে। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধসমূহ চট্টগ্রামে অবস্থানকালেই রচিত হয়। এখানে অধ্যাপনাকালেই দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাণত্যাগ করেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অসংখ্য কবিতা ও প্রবন্ধের প্রকাশ ঘটলেও জীবনকালে তাঁর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন একজন আদর্শবাদী পুরুষ। মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। ক্ষুৎ-পিপসা নিবারণের মধ্যে তিনি মানবজীবনের কোন সার্থকতা খুঁজে পান নি। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

> রাজনীতি সমাজ রক্ষাকারী হলেও সমাজ সৃষ্টির ভার সাহিত্য ও শিল্পের হাতে, ক্লাইভ বেলের মতে Civilising influence এর কাণ্ডারী তারাই। ..... আমরা আছি সভ্যতা সৃষ্টির জন্য, ডালভাত বিতরণের জন্য নয়, এই বোধ আমাদের ভিতরে প্রবল থাকা চাই। দেশকে কল্পনা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সৌন্দর্যবোধ দিয়ে নতুন ক'রে গড়ে তুলবার গুরু দয়িত্ব আমাদের উপর। আমাদের উদাসীন থাকলে চলবে না। তাই, অনটনের মাত্রা যদি আরো একটুখানি বাড়েও, তবু আমাদের এদিকে মুক্ত হস্ত হতে হবে। ..... দুঃখ বেদনার কাঁটায় গোলাপ ফোটাব, এই তো আমাদে ব্রত।[৫৭]

আবুল ফজল তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

> মোতাহেরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ত্রিশ বছর আগে ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' এক বার্ষিক অধিবেশনে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মোতাহের কুমিল্লা থেকে সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। ..... 'সাহিত্য সমাজ' উঠে গেছে বহুকাল, কিন্তু এ যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। কালক্রমে এ যোগাযোগ আরো অনেকের সঙ্গেও গভীর বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। ... দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আমি সহকর্মী হিসেবে পাই। কাজেই একেবারে নিকট থেকে, অন্তরঙ্গভাবে তাঁকে দেখবার, জানবার ও বুঝবার সুযোগ আমার হয়েছে। হৃদয়ের ঔদার্যে, চরিত্র মাধূর্যে ও বন্ধুবাৎসল্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। জীবনবোধ ও

রুচিজ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর জীবন। রসগ্রহণে ও মূল্যবিচারে তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখেছি অসাধারণ।[৫৮]

মোতাহের হোসেন চৌধুরী সম্ভাবনাময় মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাই সর্ব শক্তিমানের কাছে তাঁর প্রার্থনাঃ

হে আল্লাহ,
বুদ্ধি দাও, শান্তি দাও, অনুভূতি দাও, কল্পনা দাও।
সৃষ্টি পদ্মের মর্ম কোষের মধুপানের ক্ষমতা দাও।
জীবনকে আনন্দিত করো, স্বার্থক করো, উজ্জল করো।
উদ্যোগী করো, প্রাণবান করো, নিষ্ঠাবান করো।
অন্তরে নিয়ত শিখার মতো জ্বলো-
বিবেকরূপে, বিচার-বুদ্ধি রূপে।
ইতর লোভের নাগপাশ থেকে মুক্তি দাও।
পদ্মের মতো পঙ্কিলতার উর্ধ্বে ওঠার শক্তি দাও।
আনন্দ গ্রহণের ক্ষমতা দাও, আনন্দ দানের ক্ষমতা দাও।
ফুলের মতো ফুটে ওঠার ক্ষমতা দাও।
প্রতি প্রাতে নব-জন্ম লাভের ক্ষমতা দাও।[৫৯]

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর শিল্পীসত্তা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। তাই তিনি স্বাপ্নিক ও কর্মী, রোমান্টিক ও বাস্তববাদী, কবি ও প্রাবন্ধিক। চিন্তা ও মননের জগতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রথম চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ, ক্লাইভ বেল ও বার্ট্রান্ড রাসেল। জীবনের শেষ দিকে তিনি রোমাঁ রোলাঁর ও ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রোলাঁর I Will Not Rest গ্রন্থটি সেসময়ে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল।

উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রকাব্যে বেদনার সুর প্রথম থেকে শেষাবিধ নানাভাবে অনুরণিত। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ-বেদনাকে দেখেছেন সৃষ্টির মূল উৎস রূপে।[৬০] রবীন্দ্রনাথের মতো মোতাহের হোসেন চৌধুরীও দুঃখকে সৃষ্টির মূলীভূত কারণরূপে গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়েই আনন্দ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সাধনা করেছেন। আর এই কল্যাণ ও মঙ্গলবোধের অনুভুতিই তাঁকে ক্রমশ স্বপ্নের রাজ্য থেকে বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায় নামিয়ে নিয়ে এসেছে। তিনি সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে গ্রহণ করেছেন কর্মীর ভূমিকা। সমাজকে কল্যাণ ও মঙ্গলের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলবার জন্য মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিকে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর এক পত্রে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে লিখেছিলেনঃ

আমরা জানি আর না জানি প্রায় সকলেই তাঁর [প্রমথ চৌধুরীর] শিষ্য ভাবের জগতে না হলেও ভাষার জগতে তো বটেই। আমি নিজেও তাঁকে গুরু বলেই জানি, যদিও তাঁর শিষ্য হওয়ার উপযোগীতা আমার নেই।[৬১]

ভাষার ক্ষেত্রে মোতাহের হোসেন চৌধুরী যে প্রমথ চৌধুরীকেই গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন এ পত্রে তাঁর পূর্ণ স্বীকৃতি আছে। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর গুরুর প্রিয় আঙ্গিক সনেটকে প্রাধ্যান্য দান করেছেন। পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত সনেট থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬২] মোতাহের হোসেন চৌধুরী কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ *বুদ্ধিরমুক্তি* কবিতাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এটি ফারসী *রুবাই* এর ছন্দে রচিত-

বুদ্ধিরে তব মনের দুয়ারে দ্বারী ক'রে রেখ ভাই,
জীবনের পথে চলো সাবধানে, ক্ষতি তাহে কিছু নাই।
তবু মাঝে মাঝে দ্বারীরে সরায়ে মুক্তি দিও হে তারে,

খেয়াল - খুশীতে বাড়ে যেন তব আনন্দ -পরমাই।

জীবৎকালে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। প্রথম গ্রন্থ 'সংস্কৃতি কথা' তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।[৬৩] এ-গ্রন্থ *শিখা*, *মাসিক মোহাম্মদী*, *সওগাত*, *বুলবুল*, *জাগরণ*, *সংকল্প*, *মাহেনও* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তিরিশটি রচনার সংকলন। রচনাগুলোতে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, সৌন্দর্যচেতনা, ধর্ম, রাষ্ট্র, জাতীয়তা, গ্রন্থপ্রীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

নাম প্রবন্ধ *সংস্কৃতি-কথার* মধ্যেই লেখকের সংস্কৃতিচিন্তার মূল সুরটি স্পষ্টভাবে বিধৃত। প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৬১ বঙ্গাব্দে।[৬৪] মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে, সংস্কৃতি বা কালচার শিক্ষিত ও মার্জিত লোকের ধর্ম। তাই সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র সমাজ নয়, ব্যক্তি। কারণ 'জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহু ভঙ্গিম প্রকাশ নিজের দিকে তাকিয়েই হয়, সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়।' তবু সংস্কৃতিবান মানুষ অসামাজিক নয়। সংস্কৃতিবান মানুষ ব্যক্তিতান্ত্রিক এই অর্থে যে, সমাজ বা আর্থনীতির কথা ভেবে সে নিজের অসৌন্দর্যকে ক্ষমা করে না। যেহেতু ধর্মের অর্থ জীবনের নিয়ন্ত্রণ এবং মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মাধ্যমেই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না, কিন্তু সাধারণ মানুষ উপায়গুলোকে অবলম্বন করতে পারে না বলেই তারা ধর্মের মধ্যদিয়ে কালচারের স্বাদ পেয়ে থাকে ঃ

> ধার্মিক আর কালচার্ড মানুষে ..... লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য এই যে, ধার্ম্মিকের চেয়ে কালচার্ড মানুষের বন্ধন অনেক বেশি। .... ধার্ম্মিকের কয়েকটি মোটা বন্ধন, সংস্কৃতিবান মানুষের বন্ধনের অন্ত নেই। অসংখ্যা সূক্ষ্ম চিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সে-ই তো ফ্রি-থিংকার আর ফ্রি থিংকিং কালচারের দান। যেখানে 'ফ্রি থিংকিং নেই সেখানে কালচার নেই।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা'কেই সংস্কৃতি চর্চার প্রধান লক্ষ্য মনে করতেন। তাই যারা জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত এবং অন্নবস্ত্রের চিন্তায় অস্থির তাদের পক্ষে তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি। তাঁর রচনার লক্ষ্য সেই সব পাঠক যারা জীবনধারণের উপযোগী রসদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েও মূল্যবোধ ও বিচার শক্তির অভাবে সুন্দর, বিচিত্র ও মহৎ জীবনের সন্ধান পায়নি। *মূল্যবোধ ও যুক্তি বিচার* প্রবন্ধে তিনি এ-এসম্পর্কে বলেছেন ঃ

> নিকটবর্তী স্থুল সুখের চেয়ে দুরবর্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমার বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা-এসবই মূল্যবোধের লক্ষণ, আর এ সকলের অভাবই মূল্যবোধের অভাব। ..... নিরঞ্জন শুভবুদ্ধিই যুক্তিবিচার, স্বার্থের দাগ লাগা বুদ্ধিকে যুক্তি বিচারের সম্মান দেওয়া যায় না।

মোতাহার হোসেন চৌধুরীর আরেকটি বিখ্যাত প্রবন্ধ রেনেসাঁসঃ গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গী। এ প্রবন্ধে তিনি *রেনেসাঁস* এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করে বাঙালি মুসলমান সমাজে এর স্ফুরণ কখন কিভাবে ঘটেছে তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কাছে *রেনেসাঁস* এর অর্থ জীবন প্রীতি তথা বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনাপ্রীতি। যেহেতু বাঙালি মুসলমান সমাজে বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির আকাঙ্খা নজরুল প্রথম অনুভব করেছিলেন, সুতরাং রেনেসাঁসের প্রেরণা নজরুলের রচনাবলির মাধ্যমেই বাঙালি মুসলমান পাঠকের মনে প্রথম সঞ্চারিত হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর প্রচেষ্টাকেই প্রথম সচেতন পদক্ষেপ বলে তিনি মনে করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্টঃ

> প্রাণের অন্ধ আবেগে নজরুল যা করতে চেয়েছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (ঢাকা) তারি জাগ্রত প্রচেষ্টা। বুদ্ধির মুক্তি ছিল এর লক্ষ্য। সচেতনভাবে দলবদ্ধ হয়ে সমাজের কর্মকর্তারা বুদ্ধির মুক্তির যে আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন, তা সত্যই অপূর্ব - শুধু মুসলমান সমাজের নয়, বাংলার সংস্কৃতি আন্দোলনে এর এক বড় স্থান। মানুষের জীবন ছিল এর সামনে, জীবনের বহু-ভঙ্গিম বিকাশকে সম্ভব করে তোলাই ছিল এর স্বপ্ন। রেনেসাঁসে বড় হয়ে উঠেছিল যে, জীবন পরকালমুখী ধর্ম সাধনা নয়, ইহকালমুখী জীবনসাধনা, মানে জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়াস, সাহিত্য-সমাজেরও লক্ষ্য ছিল তাই। জীবন সুন্দর হোক, ঐশ্বর্যময় হোক, তার বিকাশের অন্তরায় দূরীভূত

> হোক, এই ছিল তার অন্তর্নিহিত কামনা। জ্ঞান, প্রেম ও বুদ্ধির সন্নিপাতে জীবনের যে ঐশ্বর্যময় জয়যাত্রা তারি স্বপ্নে 'সমাজের'র নেতৃস্থানীয়দের চিত্ত আন্দোলিত হয়েছিল। সেজন্য কোন ইজমের তাবিজে বিশ্বাসী না হয়ে গভীর জীবনানুভূতির আশ্রয় গ্রহণই এঁরা কল্যাণপ্রদ মনে করেছিলেন। ... মুসলিম সমাজে যদি কখনো সত্যিকারের রেনোসাঁসের আবির্ভাব হয়, তাবে উপলব্ধি হবে যে তার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্র প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর চিন্তাধারার একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে। ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি, ব্যক্তি কোথায় সমাজের একজন ও কোথায় স্বতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ক্লাইভ বেল-এর Civilization গ্রন্থটি এ প্রবন্ধ রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি প্রবন্ধের এ-বক্তব্যকে আরো প্রাঞ্জল করে পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরার জন্যই পরবর্তীকালে ক্লাইভ বেল-এর উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনের সভ্যতা রচনা করেছিলেন। ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি এ প্রবন্ধে বলেছেনঃ

> রাষ্ট্র সমাজের দেহ, আত্ম নয়। আত্মা ব্যক্তি। ..... তাই সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তিই বড়, সমাজ বা রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্রের কাজ যেখানে ফুরোয় ব্যক্তির কাজ সেখানে শুরু হয়।

সভ্যতা রচনার পেছনে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মনেও অনুরূপ চেতনা জাগরূক ছিল। এ-গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি তা অকপটে ব্যক্ত করেছেনঃ

> সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব বই দেখতে পাওয়া যায়, সে সবে সভ্যতার ক্রমবিকাশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সভ্যতার বৈশিষ্ট কি, অথবা কোন গুণে সভ্যতা 'অসভ্যতা' থেকে পৃথক তা ভালো করে বলা হয়নি। ক্লাইভ বেল সাহেব তাঁর 'সিভিলিজ্যাশন' নামক ক্ষুদ্র কিন্তু মুল্যবান গ্রন্থে সে চেষ্টা করেছেন এবং আমার মনে হয় তাতে তিনি সফলকাম হয়েছেন। তাঁর মতে সভ্যতার লক্ষণ দুটি ব্যাপারে সর্বাধিক পরিস্ফুট ঃ মূল্যবোধ আর যুক্তি বিচারের প্রতিষ্ঠা। .. বেল সাহেব তাঁর বইখানি লেখেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। যুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালের কলঙ্ক-কুশ্রীতা তাঁকে এই পুস্তক রচনায় নিয়োজিত করে। .. আমার এই রচনার মূলেও আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আমাদের দেশের অতি কদর্য হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। এক কথায় একালের কলঙ্ক-কুশ্রীতা।

'মুসলিম সাহিত্য -সমাজ'এর প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি ছিলেন চব্বিশ বছরের যুবক ও কুমিল্লার মতো মফঃস্বল শহরের অধিবাসী। কিন্তু এই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের আদর্শ তাঁকে এতই অনুপ্রাণিত করেছিল যে তিনি এর বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য ঢাকায় ছুটে আসতেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর কাছে তিনি এভাবেই মুক্তবুদ্ধির দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্য-সমাজ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও তিনি এ চেতনাকে জাগ্রত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন মূলত রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ, রাসেল ও বেল এর রচনাবলি পাঠ করে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী সাহিত্যচর্চাকে জীবনের ব্রতরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় সাধনার স্বাক্ষর স্পষ্ট। তিনি এ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন ঃ

> লেখা আমার কাছে এক প্রকারের প্রার্থনা, আর প্রার্থনার উদ্দেশ্য আত্মার ঔজ্জ্বল্য সাধন, অর্থ উপার্জন নয়। মুক্তির স্বাদ লাভ করতে হলে কিছু কিছু Extra economical work বা অনার্থিক কাজ দরকার, লেখা আমার কাছে সেই অনার্থিক কাজ- কর্মব্যস্ত সংসারে মুক্তির আকাশ অনুভব করার বাতায়ন।[৬৫]

ভাষার ক্ষেত্রে মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু রচনাশৈলীটি তাঁর নিজের। প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষার কাঠামো গ্রহণ করেই তিনি তাঁর গদ্যে ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ মুদ্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেহেতু স্টাইল বা রাচনাশৈলী একজন লেখকের নিজেস্ব চিন্তাধারা ও প্রকাশকুশলতার ওপর নির্ভরশীল এবং এ জিনিষ বাইরে থেকে লেখকের ওপর আরোপ করা যায় না, সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, যার নিজস্ব বক্তব্য আছে এবং সে বক্তব্যকে সমাজের কাছে উপস্থাপিত করার তাগিদ আছে তাঁর একটা নিজস্ব রচনাভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রমথ চৌধুরী ও মোতাহের হোসেন চৌধুরী উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষ, মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের চিন্তার ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন। প্রমথ চৌধুরী বাঙালির মনকে করে তুলতে চেয়েছিলেন জড়তামুক্ত, ভাবালুতাবর্জিত ও অনুশীলন তৎপর। তাই তাঁর ভাষাও হয়েছে গঠন পারিপাট্যে অনবদ্য-ঋজু, সংহত ও

আতশয্যবর্জিত। অপরদিকে মোতাহের হোসেন চৌধুরী চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজের ঘুম ভাঙ্গাতে এবং শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে তাদেরকে সুন্দর জীবনের অনুসারী করে তুলতে। তাই বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও সুসংহত করে তোলার জন্য তিনি বুদ্ধিবৃত্তিও হৃদয় বৃত্তি উভয়ের উপর নির্ভর করেছেন। এর ফলে তাঁর গদ্য হয়েছে পরিচ্ছন্ন প্রসাদগুনমণ্ডিত ও লক্ষ্যভেদী।

আবুল ফজল

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর মুক্তবুদ্ধির আদর্শকে দীর্ঘদিন ধরে সগৌরবে বহন করেছেন আবুল ফজল। বাঙালি মুসলমান সমাজকে কুসংস্কার ও ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য একদা তিনি সাহিত্যের যে আলোকবর্তিকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হয়েও তার উজ্জ্বল শিখাটি আমৃত্যু অনির্বান ছিল। আবুল ফজল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কেঁওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে।[৬৬] তাঁর পিতা মওলানা ফজলুর রহমান চট্টগ্রামের জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি এ-পদে অত্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে দীর্ঘ বত্রিশ বছর কাজ করেন। সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাস, সত্যবাদিতা ও আত্মসম্মানবোধের জন্য তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

আবুল ফজলের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের মক্তবে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লেখাপড়ার জন্য তিনি চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম সরকারি হাই মাদ্রাসা (নিউস্কিম) থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই-এ এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মাহমুদ হাসান, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ও স্যার এ এফ রহমানের ছাত্র ছিলেন। এর পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে তিনি বি-টি ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভিন্ন স্কুলে প্রায় দশ বছর ধরে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশবিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাশ করে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ শেষে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। এ উপলক্ষ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র দেন কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহের হোসেন, জসীম উদ্দীন, শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, অজিতকুমার গুহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।[৬৭] সভাপতির ভাষণে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বলেন ঃ

> কর্মবীর, ধর্মবীর, রাষ্ট্রবীর প্রভৃতি যেমন জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি। এ'রা ব্যষ্টির সাধনায় সমিষ্টির প্রতিষ্ঠা করেন। আর সকলকে ... যেমন আমরা সংবর্ধিত করি, সম্মান দেখাই তাঁদের কাজের জন্য, সাহিত্যিকরাও তেমনি তাঁদের সাহিত্যকর্মের জন্য জাতির সংবর্ধনার হকদার। .. সাহিত্যিক আবুল ফজলের সংবর্ধনা সেই নামের ব্যক্তিটির সংবর্ধনা নয়, তাঁর সাহিত্যকর্মেরই সংবর্ধনা।[৬৮]

আবুল ফজলের শিল্পিমানস গঠনে তাঁর পিতার ব্যক্তিত্ব ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর আদর্শ সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে বাল্যকালেই তার মধ্যে একটি সংস্কারমুক্ত চেতনার উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীকালে এই সুপ্ত চেতনাই অনুকূল পরিবেশে পল্লবিত হয়ে তাঁকে সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে। পিতার সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রীতিও তাঁর লেখক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই জীবনাদর্শ একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্যজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তেমনি দ্বিধা দ্বন্দ্বের পথে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেনঃ

> যে উদার মানবতাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তবুদ্ধির আদর্শ তাঁর রচনাবলীকে সমৃদ্ধ করেছে তা প্রধানত এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠানেরই দান।
>
> এ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর এক পত্রে বলেছেনঃ

> শিখা নাম দিয়ে সাহিত্য সমাজের একটি বার্ষিক সংখ্যা বের হচ্ছে। ঢাকার খুব সুন্দর এক নতুন চিন্তাশীল দল গড়ে উঠতেছিল - এরা মুসলমান বাঙলার চিন্তার এক নূতন যুগ খুলে দিয়েছিল-'শিখাতে তার কিছু পরিচয় পাবে চিন্তার জড়তা থেকে মুক্ত না হলে বাঙালি মুসলমানের মুক্তি নাই- এইটাই আমাদের ধারণা। .... আজ মুসলমানের জাতীয় জীবনের সিংহদুয়ারে আঘাত পড়েছে। নবসৃষ্টির এসব বেদনায় আজ আমাদের ভিতর বাহির গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শুভ মুহূর্তেই আমাদের জন্ম হয়েছে। এতে আমি আমার নিজেকে ধন্য মনে করি। এই জাগরণকে যদি আমরা স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী ঠেলে দিতে না পারি তাহলে আমাদের জীবনের সার্থকতা কি হল।[৬৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর *বিচিত্রকথা, জীবন পথের যাত্রী* ও *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*, গ্রন্থ তিনটি তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর লেখকগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।[৭০] আবুল ফজল বিচিত্ররসের লেখক। সর্বত্র সমান সার্থকতার পরিচয় দিতে না পারলেও তিনি সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই বিচরণ করেছেন।

আবুল ফজল তার লেখক জীবনের সূচনা থেকেই যথেষ্ট সমাজ সচেতন ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রগতিবিমুখতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে গিয়ে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর অধিকাংশ লেখক প্রবন্ধকেই প্রধান মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে আবুল ফজল গল্প উপন্যাসকেই তার বক্তব্য প্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তার নিজের মন্তব্যঃ

> আমাদের সমাজের ও দেশের শ্রীহীন চেহারাটা একদিন আমার যৌবনকে কাঁদিয়ে দিয়েছিল। তাই হয়তো সেদিন কলম নিয়ে বসে পরেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, খোঁচায় খোঁচায় সমাজ মনকে জাগ্রত করে তুলবো, জীবনবোধকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবো। সে ক্ষেত্রে আমি কতটুকু পেরেছি আর কতটুকু পারিনি আজ আর তার হিসেব দিতে বসবো না। তবে এই দিক থেকেই সাহিত্যের অঙ্গনে আজ অনেক নতুন পথিকের পদসঞ্চারণ লক্ষ্য করছি সেখানেই আমার শান্ত্বনা। [৭১]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে জাগ্রতাকরা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকেই সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলি ভারতের মুসলমান সমাজকে ক্রমশ সম্প্রদায় সচেতন করে তোলে। ফলে আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারে ভিত্তিতে পাকিস্তান-আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের প্রবল জোয়ার বাঙালি মুসলমান সমাজকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই আবুল ফজলের সৃষ্টিশীল মন ভারতীয় ইতিহাসের এই অত্যুজ্জ্বল ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

আবুল ফজলের নিজস্ব জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে *বুদ্ধির মুক্তি* প্রবন্ধে। 'মুসলিম সাহিত্য- সমাজ' মুক্ত বুদ্ধির আদর্শকে সম্মুখে রেখে সকল প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে কিভাবে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল, সে কথা এ- সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের একজন হয়ে তিনি এ প্রবন্ধে বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করেছেন। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'- এর আদর্শ তাঁর সমগ্র সাহিত্য- জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেনঃ

> 'মুসলিম সাহিত্য- সমাজের' ঢেউ যাঁদের মনে নাড়া দিয়েছিল আর যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কারো মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, গোঁড়ামি ও কোনরকম সংকীর্ণতা কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। তখনো যেমন পারে নি, পরে সংক্রামক ব্যাধির মত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প যখন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তখনো তাঁরা ছিলেন এবং এখনো আছেন সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। স্বাধীন- চিন্তা ও মুক্ত- বুদ্ধির চর্চা তাঁরা এখনো অব্যাহত রেখেছেন।

ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রথম প্রকাশিত হয় *সমকাল* পত্রিকায়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মের প্রয়োগের ফলে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, লেখক যুক্তি প্রমাণের সাহায্য এ- প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

> আজকের দিনের কোন সভ্য রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্ন ও একক নয়- তাবৎ পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ও আদান প্রদানের সম্বন্ধ। যে মানুষ ও মানুষের জীবন নিয়ে রাষ্ট্রের কারবার সে মানুষ ও তার জীবন সহিষ্ণু, পরিবর্তনশীল ও জঙ্গম। অথচ ধর্ম হচ্ছে তার বিপরীত।

পাকিস্তানকে ধর্মভিক্তিক রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলতে চেয়ে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যঃ *ইসলামী রাষ্ট্র* কথাটা যাঁরা বলেন তাঁদের মনে ঐ রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন

ধারণা যে আছে তা নয়' তাঁরাও ঐ শব্দ দু'টার আড়ালে আর একরকম আকাশ কুসুমের চাষ করে থাকেন। এই 'আকাশ কুসুমের চাষ'- এরই পরিণতি জাতীয় চেতনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বন্দ্ব এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়। আবুল ফজল যে একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক, *ধর্ম ও রাষ্ট্র* তার উজ্জ্বল দৃষ্টন্ত। এ প্রবন্ধেরই পরিপূরক রচনা *মানবতন্ত্র*। এ প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ ধর্ম নয়, মানবতাই মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাও এক্ষেত্রে লেখকের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয় নিঃ

> সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা খুব ভালোভাবেই দেখা গেছে যে,ধর্ম বা সিকুলারিজম কোনটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারে নি। কাজেই ধর্ম নয়, সিকুলারিজমও নয়, একমাত্র মানবতার উপরই জোর দিতে হবে। ধর্মের কথা বললেই অনিবার্যভাবে অন্য ধর্মের কথা এসে পড়ে। সিকুলারিজমের সঙ্গেও বৈপরীত্যের কল্পনা অবিচ্ছিন্ন। যারা সিকুলার নয় তাদের শত্রু ভাবতে সিকুলারিজম বিশ্বাসীর মোটেও বাধে না।

লেখক যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন বলে ধর্মকেও যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে জীবনে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম সম্পর্কে মনে কোন জিজ্ঞাসা না জাগলে মানুষ জীবনবিমুখ হয়ে পড়বে এবং ধর্মও সামাজিক উপযোগীতা হারিয়ে আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হবেঃ

> আবুল ফজল বিশ্বাস করতেন ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ধর্ম আজ অনেকের জীবনে অন্য পাঁচটি বৈষয়িক বস্তুর সামিল পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। অথচ এরা বাস্তব ও পার্থিব যুক্তি বিচারের কষ্টি পাথরে ধর্মকে যাচাই করতে নারাজ। ধর্ম আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শব্দ ও নানা উক্তি বহু ব্যবহারে আজ এমন একটা নির্জীব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তা মনে আর কোন আবেদন বা উপলব্ধিরই চমক লাগায় না। ... ধর্মজীবনও যে সামাজিক জীবন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই তার যা কিছু মূল্য, এবোধ না থাকলে ধর্মজীবন বিমুখ হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমন এখন হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মানবতন্ত্র, ধর্ম ও রাষ্ট্র, সভ্যতার সংকট ও সংস্কৃতি পূর্বোক্ত এই চারটি প্রবন্ধের সঙ্গে আগামী দিনের সভ্যতা ঃ একটি কল্পনা শীর্ষক প্রবন্ধ যোগ করে ১৩৭৯ বাঙ্গাব্দে মানবতন্ত্র নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।[৭২] শেষোক্ত প্রবন্ধটি স্বাধীনতা-পূর্ব কালে রচিত হলেও লেখকের অপ্রিয় সত্যভাষণের কারণে বিপদাশংকায় কোন পত্রিকা সে সময় প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে রাজি হয় নি।

আগামী দিনের সভ্যতাঃ একটি কল্পনা 'য় লেখকের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয় স্পষ্ট। লেবাননের প্রখ্যাত লেখক খলিল জিব্রান এর একটি গল্প দিয়ে প্রবন্ধের শুরু। ঈশ্বর ও শয়তানের পারস্পরিক নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের অস্তিত্বের কথা এ গল্পে বলা হয়েছে। জিব্রান-এর এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখক সামাজিক জীবনে ঈশ্বর ও শয়তানের স্থান নির্দেশ করে বলেছেনঃ

> ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু ঈশ্বরভুক্ত পাদ্রীকে দেখতে পাই। তিনি এবং তাঁর অনুরূপ পেশার লেখকেরা ঈশ্বরের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি। ঈশ্বরের বিপরীতে শয়তানকে না দাঁড় করালে চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই ইশ্বররূপী কল্প মূর্তির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিপরীতে কল্প-মূর্তি শয়তানের আবির্ভাবও অপরিহার্য। ... ঈশ্বরের অস্তিত্বের মানতে হলে শয়তানের অস্তিত্বও মানতে হয়। এ প্রায় গণতন্ত্রের মতো ব্যাপার। গণতন্ত্রে ঈশ্বর যদি হন লীডার অব দি হাউস, শয়তান হচ্ছে লীডার অব দি অপজিসান। একে অন্যের পরিপূরক।

লেখক যেহেতু, *আগামী দিনের সভ্যতা*কে পুরোপুরি মানবতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাই ঈশ্বরহীন ও শয়তানহীন একটি সমাজের কল্পনা তাঁর চিন্তাধারায় এসেছে। এ কল্পনা দুঃসাহসিক বলে মনে হলেও লেখকের আশাবাদী মন তাঁরই প্রতীক্ষায় রতঃ

> আবুল ফজল আরো বলেন, বর্তমান সভ্যতা, তথাকথিক ' স্বাধীন বিশ্বে' যে সভ্যতা এখন চলতি তা মোটামুটি ধর্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ ঈশ্বর আর শয়তানের ধারণাকে কেন্দ্র করেই তা শাখায়িত ও পল্লবিত। সে খুঁটি যেদিন ভেঙ্গে যাবে আনুষাঙ্গিক অন্য সব কিছুও সেদিন লোপ না পেয়ে পারে না। তখনই হয়তো মানুষ হতে পারবে পুরোপুরি মুক্ত, তখনই শুধু মানুষের মন থেকে ঘুচোবে যত সব অদৃশ্য আর অশরীর বন্ধন, খসে পড়বে মুহূর্তে যুগ যুগান্তরের যতসব সংস্কারের শিকল। সর্ব বন্ধন মুক্ত সে মানুষের সভ্যতা নিশ্চয়ই ভিন্নতর হবে। ঈশ্বরহীন, শয়তানহীন সে

> সভ্যতার কল্পনাই ত রীতিমতো রোমাঞ্চকর!.....তেমন দিন যদি কখনো আসে, আমার পৃথিবীতে তখনই মাত্র মানুষের রাজত্ব তথা মানবতন্ত্র আর মানুষের সভ্যতা দেখা দেবে।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষে পাকিস্তান আমলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সরকারি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আবুল ফজল এর প্রতিবাদে নবী দিবস ও জাতীয় পতাকা শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ দৈনিক পত্রিকায় লেখেন।[৭৩] এ প্রবন্ধই নবী ও জাতীয় পতাকা নামে এ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। তিনি এ- প্রবন্ধে বলেছেন, যেহেতু হজরত মোহাম্মদকে সকল দেশের ও সকল মানুষের নবী হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে এবং একথা সুস্পষ্ট ভাষায় কোরআন ও হাদিসে উল্লিখিত আছে সুতরাং তাঁকে কোন বিশেষ দেশ ও জাতির নবী বলা যায় না। আর একারণেই জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে নবীদিবস উদ্‌যাপন করলে ধর্মের বৃহত্তর উদ্দেশ্য হয় খণ্ডিত ও ব্যর্থ।

বিশ্বমানব ধর্ম তথা অখণ্ড সত্যের প্রচারক নবীকে যে কোন দেশের জাতীয় পতাকার আড়ালে দাড়িয়ে দেখা কখনো সত্য দেখা হতে পারে না। যে নবী সব মানুষের নবী যার বাণী সর্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর নামে স্মরণে যে দিবস পালিত হয়, তাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সার্থকতা আমার বুদ্ধির অগোচর।

পাকিস্তান আমলে শাসক চক্রের কৌশলে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই ভুল ধারনা ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল যে, তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, এমনকি কিছুটা বিরুপও ছিলেন। এই ভ্রান্তি অপনোদনের উদ্দেশ্যে তিনি *রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ *দোলনা* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিই এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলেছেনঃ

> কোন বড় প্রতিভা সম্বন্ধেই ভুল ধারণা প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়। পেলে মনের ভিতর এমন একটা সংস্কার গড়ে ওঠে, যা সে প্রতিভাকে বোঝার প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা ভাষা-ভাষীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে না চাওয়া বা সে সম্বন্ধে অনীহা থাকার মতো ক্ষতি কল্পনা করা যায় না। কারণ আজো রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্য।

এরপরে সাল তারিখসহ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে তিনি ভিত্তিহীন অপ- প্রচারণার জবাব দিয়েছেন। দেশের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে লিখিত বলে প্রবন্ধটি তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি একাজ যে সচেতনভাবেই করেছেন নিম্মোক্ত উক্তি থেকেই তা বুঝা যায়ঃ

> মহাপ্রতিভা ও মহৎকবি সম্বন্ধে এসব কথাও খুঁটিনাটি তথ্য উদ্‌ঘাটন অনর্থক ও অবান্তর জেনেও তা করতে হলো স্রেফ দেশ ও সমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখেই। জীবনে এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া মানবিক - তাই বিরুদ্ধ মানস- পরিবেশের মানুষ ও তাঁর রচনায় যথাযথ মর্যদায় সমুন্নত ও সমৃদ্ধ। এ না হলে রবীন্দ্রনাথ কখনো রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে মানুষকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনা ও গোত্রপ্রীতির উর্ধ্বে স্থাপন করে সহজ মানব- ধর্মের আলোকে বিচার করা হয়েছে। *রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম* প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

> রবীন্দ্রনাথের যা ধর্মবোধ ও ধর্মের যা ধারণা তা তো কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত ভাবাবেগের দ্বারা লাভ হতে পারে না। তাই ধর্মোন্নত্ততাকে কবি কখনো ধর্ম সাধনা বলে মনে করেন নি। তাঁর ধর্ম তথা মনুষ্যত্ব সচেতন সাধনার দ্বারাই লভ্য। তাঁর লক্ষ্য শান্তি, কল্যান ও আনন্দ।

মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করে তাকে যুক্তিবাদী ও মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আবুল ফজল *রবীন্দ্রমানস* প্রবন্ধে বলেছেনঃ

> রবীন্দ্রনাথ আজীবন জাগ্রতচিত্ততার সাধনাই করে গেছেন। .....তিনি অন্ধভক্তি ও যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠানকে কখনো স্বীকার করেন নি। একারণেই তিনি বলতে পেরেছেনঃ যাহা বিশ্বাস্য তাহাই ধর্ম, যাহা ধর্ম তাহাই বিশ্বাস্য নহে। *Rationalism* বা যুক্তিবাদ রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আবুল ফজল রবীন্দ্র - উত্তর কালের একজন বিশিষ্ট গদ্য লেখক। স্বচ্ছতাও বলিষ্ঠতা তাঁর গদ্যের প্রধান গুণ। 'মুসলিম সাহিত্য -সমাজ' এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সমগ্র লেখক জীবনে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের দীপশিখা বহন করেছেন। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর খ্যাতির মূলে আছে এ-দুটি বৈশিষ্ট্যের অপরিমেয় শক্তি। সাহিত্যকে তিনি কখনো বিলাসের সামগ্রী বলে মনে করেন নি। অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজের কথা মনে রেখে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন আজীবন। তাঁর এই সমাজ সচেতনতা ও সাহিত্যের কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তাঁকে যেমন সাহসী করে তুলেছে, তেমনি তাঁর রচনায় সঞ্চারিত করেছে বলিষ্ঠতা ও প্রাঞ্জলতা। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর *হীরক জয়ন্তী* পালন উৎসবে যে-ভাষণ দেন তাতে সাহিত্যের এই কল্যাণকর দিকের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। সে-ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

> মানুষের জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। ভয়ে বা প্রলোভনে আমি কখনো আমার কথাকে সাহিত্যের তথা সত্যের পথ থেকে বিপথগামী হতে দিই নি। দেশও সমাজের কথা ভেবে যখনই আমার মন আলোড়িত হয়েছে তখন আমি তা নির্ভয়ে প্রকাশ করছি- আমার কণ্ঠস্বর কখনো চাপা থাকে নি। চেষ্টা করেছি লেখায় যথাসম্ভব যুক্তি ও বুদ্ধি নির্ভর হতে। যা তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে কোনদিন দ্বিধা করিনি।.....মানুষের মন কতরকম ভূতের যে আড্ডা তার ইয়ত্তা নেই- ব্যক্তি সমাজ, সম্প্রদায, দেশ, জাতি, শাস্ত্র ও দেশাচারের হাজারো রকমের ভূত তথা সংস্কারের বন্ধনে মানুষের মন বাঁধা। আমরা যে দেশে ও সমাজে জন্মেছি সেখানে সংস্কারের বন্ধন আরো দৃঢ় মূল। এ সংস্কার শুধু যে ব্যক্তিগত বিকাশের অন্তরায় তা নয়- দেশ ও সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতিতেও তা জাগদ্দল বাধাঁ হয়ে দঁড়ায়। এযুগের আরো অনেক লেখকের মতো আমিও এসব সংস্কারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি - আমার বিভিন্ন রচনায় তা নানাভাবে রূপ নিয়েছে।[৭৪]

এ বক্তব্য থেকেই আবুল ফজলের শিল্পীমনের মূল প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই মঙ্গলবোধের আলোকে তাঁর প্রতিটি রচনা সমুজ্জ্বল। তাই উদ্দেশ্যমূলক রচনার মূলে ক্রিয়াশীল থাকলে ও শিল্পীর স্বভাবজ প্রেরণায় সে-রচনা শিল্পগুণে মণ্ডিত। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তাঁর ভাষাও হয়েছে ক্রমশ গতিশীল ও সুসংহত। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা ও রাষ্ট্র জিজ্ঞাসায় তিনি যে বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন, ধর্ম-জিজ্ঞাসায়ও যে সে মন সমান অকুণ্ঠ ,তার প্রমাণ, মেলে কোরানের বাণী, হাদিসের বাণী, হযরত আলী প্রভৃতি গ্রন্থে।[৭৫] কোরানের বাণী'র 'মুখবন্ধ'-এ তিনি এ- প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

> বিশ্বমানবতার উপরই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বমানবতাবর্জিত ধর্ম কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামে বিশ্বমানবতা অর্থাৎ সর্ব-প্রকারের সংকীর্ণতাবর্জিত মানবধর্ম কতখানি স্থান লাভ করেছে তার ও পরিচয় পাওয়া যাবে কোরানে। কাজেই কোরানেই পাওয়া যাবে, ইসলাম মানুষের জন্য যে- জীবন- কাম্য মনে করে ও যে-জীবনের আদর্শ মানুষের সামনে ইসলাম স্থাপন করতে চায় তার পরিচয় ও নির্দেশ। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে মানবজীবনের আদর্শ নির্দেশক কিছু কিছু আয়াতের পরিচয় ও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে (পৃ. ৪)।

আবুল ফজলের সাহিত্য জীবন সুদীর্ঘ। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং তিনি সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির উপর অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এসব প্রবন্ধে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ধর্মের নামে অধার্মিকতা চলছে। ধর্মকে তথাকথিত ধার্মিকদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন এবং বলেনঃ যাদের আল্লাহ শুধু ঠোটে আর তছবিতে তাদের থেকে সাবধান। এ ভাবে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এখানেই।

আবদুল কাদির

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য আবদুল কাদির বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কালক্রমে 'কবি' বিশেষণটি তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠলেও সমালোচক, গবেষক, সম্পাদক ও ছান্দসিকরূপে তাঁর

পরিচয় পাঠক সমাজে স্বীকৃত। শিখা প্রকাশনায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য আবুল হুসেনের সঙ্গে তাঁর নামও সমভাবে স্মরণীয়। আবদুল কাদির কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত আড়াইসিধা গ্রামে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন ১৯০৬) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম আফসার উদ্দীন ও আরজউন-নিসা। তিনি মাত্র দু'বছর বয়সেই মাতৃহারা হন। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের চারতলা মধ্য ইংরেজি স্কুলে। অল্প বয়সে এ -স্কুলেরই প্রধান পণ্ডিতের কাছে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করে তিনি বাংলা সাহিত্যে গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনন্দ হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আইএস সি ক্লাসে ভর্তি হন। এ কলেজের বাংলা ও ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন যথাক্রমে কাজী আবদুল -ওদুদ ও কবি পরিমলকুমার ঘোষ। আবদুল কাদির উভয়েরই স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে আইএসসি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বি-এ পড়তে থাকেন। কিন্তু কাব্যচর্চা ও পত্র -পত্রিকা প্রকাশনায় অত্যধিক জড়িয়ে পড়ার ফলে তাঁর পক্ষে আর বি-এ পাশ করা সম্ভব হয় নি।

আবদুল কাদির তাঁর কর্মজীবনে শিক্ষক ও প্রকাশন-অফিসার হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন সত্য কিন্তু এ সময়ে তাঁর শিল্পীসত্তা সর্বদাই কামনা করেছে পত্র পত্রিকার সান্নিধ্য। এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন একজন নিপুণ সম্পাদক। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বরে তিনি কলিকাতা করর্পোরেশন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক নবশক্তি'র সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করতে থাকেন। এসময়ে নিতান্ত অন্তরের তাগিদে নিজের প্রচেষ্টায় ও ব্যয়ে বের করেন মাসিক জয়তী। জয়তী কিঞ্চিদাধিক দু'বছর জীবিত ছিল। দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তিনি এ পত্রিকার উচ্চমান রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আবদুল কাদিরের প্রথম গ্রন্থ দিল্‌রুবা প্রকাশিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। কাব্যগ্রন্থটি কবি শাহাদাৎ হোসেন কে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে কবিতা আছে উনিশটি।[৭৬] তৃতীয় সংস্করণে কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে-প্রথম সংস্করনের পাঁচটি কবিতা বাদ দিয়ে আঠারোটি নতুন কবিতা গৃহীত হয়েছে। কবিতাগুলোতে মৌলিক জীবনচেতনার স্পর্শ থাকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দিলরুবা সুধিমণ্ডলীর প্রশংসা দৃষ্টি আকার্ষন করেছে। কাব্যটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ কবিকে এক পত্রে লেখেনঃ

> তোমার *দিলরুবা* বইখানি পড়ে খুশি হলুম। ভাষা ছন্দে তোমার প্রভাব অপ্রতিহত। তোমার বলিষ্ঠ লেখনীর গতিবেগ কোথাও ক্লান্ত হয় না। বাংলার কবি সভায় তোমার আসনের অধিকার অসংশয়িত, বিষয় আনুসারে যে কবিতায় তুমি মাঝে মাঝে আরবী পারসি শব্দ ব্যবহার করেছ আমার কানে তা অসঙ্গত বোধ হয় নি।[৭৭]

দিলরুবা'র আধিকাংশ কবিতা আবদুল কাদিরের অল্প বয়সের রচনা হলেও এর মধ্যে তাঁর কবিমানসের রূপ ধরা পড়েছে। তাঁর কবিসত্তা দ্বিধাবিভক্ত ঃ একদিকে ঐতিহ্যসচেতন, অন্যদিকে শিল্পসচেতন। তাঁর ঐতিহ্যসচেতন মন বাঙালি মুসলমান সমাজের দুরবস্থায় বেদনাবোধ করে। তাই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি জাগরণের ডাক দেন।

মন বাঙালি মুসলমান সমাজের দুরাবস্থায় বেদনাবোধ করে। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি জাগরণের ডাক দেন। কিন্ত বাস্তব সচেতন কবি উপলব্ধি করতে পারেন যে, যুদ্ধোত্তরকালের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে একটি উপদ্রুত, অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শুধু ঐতিহ্য সচেতনতাই যথেষ্ট নয়, সমাজ সচেতনাতারও প্রয়োজন। এ কারণে তার কবিতায় সমাজতান্ত্রিক মতবাদেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

> ধুলি-কাঁদা-মাখা মানুষের শিশু দলে দলে আজ করিছে ভিড়।
> আপন প্রাপ্য অধিকার চায়-তার লাগি দিবে লাল রুধির।

আবদুল কাদিরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *উত্তর বসন্ত* প্রকাশিত হয়েছে *দিলরুবা* প্রকাশের কিঞ্চিদাধিক তিনদশক পরে। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি বিরলপ্রজ সন্দেহ নেই, তবুও তার চর্চা অব্যাহত ছিল। তাই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ এক্ষেত্রে তাঁর নিস্পৃহতাকে প্রকট করে তোলে।

কাব্যচর্চায় আবদুল কাদির তার সমগ্র সত্তাকে নিয়োজিত করতে পারেননি বলেই তার কাব্যসাধনা যথেষ্ট ফলপ্রসু হয়ে ওঠেনি। তাই মৌলিকতা ও বলিষ্ঠ কাব্যভাষার অধিকারী হয়েও তিনি ক্রান্তিলগ্নের একজন কবি

হিসেবে উত্তরকালের পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত হবেন। সম্ভবত কবি হিসেবে তার এই সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করেই তিনি এক স্বাক্ষাতকারে বলেছেনঃ

> সৌন্দর্য ও আনন্দ আমার অন্তরে সঞ্চার করেছিল কবিতা প্রণয়নের প্রেরণা ; কিন্তু স্বদেশের ও স্ব-সমাজের মূঢ় ও নির্যাতিত মানুষের জীবন ও মন কিরূপে মুক্ত ও বিকশিত হতে পারে এই ভাবনা ক্রমশ আমাকে করে অধিকতর ব্যাকুল, ফলে আমাদের রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতার ইতিহাস সন্ধানের দিকে আমার মনোনিবেশ বৃদ্ধি পায়, আমার বিবিধ প্রবন্ধে আছে তার বিচিত্র পরিচয়। আমার জীবনে কবিতার অনুশীলন অপেক্ষা সাহিত্যের গবেষণা ও সম্পাদনার পরিমাণ এই কারণেই হয়েছে তুলনায় অধিক।[৭৮]

কবি হিসেবে আবদুল কাদিরের সাফল্য সীমিত হলেও গবেষক ও ছান্দসিক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তা সম্পূর্ণ ভাবে ঐতিহ্যে সমর্পিত ছিল বলেই তিনি জাতীয় ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যয় করেছেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কাব্য-মালঞ্চ' এ চেতনারই প্রথম ফসল। গ্রন্থটিকে বাঙালি মুসলমানের কাব্যসাধনার প্রথম দলিলরূপে চিহ্নিত করা যায়। এতে শেখ ফয়জুল্লাহ থেকে সৈয়দ আলী আহসান পর্যন্ত ১১৭ জন মুসলমান কবির মোট ১৭৪ টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক রেজাউল করীম সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় বলেছেনঃ

> সংকলনের কবিতাগুলি বাঙ্গালাদেশের মুসলিম সংস্কৃতির অমর অবদান স্বরূপ। মধ্যযুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মুসলিম কবিগণ কাব্যলোচনা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষার উপর মুসলিম মানসিকতার যে একটা স্থায়ী ছাপ দিতে পারিয়াছেন, এই কবিতাগুলি তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা আশা করি, হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধকগণ মুসলিম কবিও সাহিত্যিকগণের এই অমর অবদানের কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। বরং এগুলিকে সমন্বয়ের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিবেন।[৭৯]

মূলত কোন সম্প্রদায়গত চেতনা থেকে কাব্যমালঞ্চ সম্পাদিত হয়নি। এ গ্রন্থ প্রকাশের পেছনে রয়েছে বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্যকে অখণ্ডরূপে তুলে ধরার বাসনা। এ কারণেই সম্পাদকদ্বয় মুসলমান কবিদের কাব্যধারার নমুনা সংগ্রহ করে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের অভাব দূর করেছেন। কিন্তু আবদুল কাদির নমুনা সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হননি। বায়ান্ন পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ ভূমিকায় বাঙালি মুসলমানের কাব্য সাধনার ইতিহাসও রচনা করেছেন। এ রচনায় তিনি যে তথ্যনিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে গবেষক ও সমালোচকরূপে বাংলা সাহিত্য তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। সংকলিত কবিতাবলিকে বস্তগত দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি যে দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন এখানে তা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হননি।

নজরুলের কবি জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা ও মরমীয়া গান ..... এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেনঃ

> আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর, আল্লাহ তো দূরে নয়;
> নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে, পরম সে প্রেমময়।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ-সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস-সহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফী সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন, সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হ'লেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্ম সংস্কারের নানারূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাতিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন -রঞ্জনের পরম উপযোগী-অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

আবদুল কাদির রচনাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে নজরুলের কবিমানসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের সচেষ্ট হয়েছেন। তাই নজরুল রচনাবলির খণ্ডগুলো ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলে কবির ভাবধারার রূপরেখাটি সহজেই ধরা পড়ে। তবে গবেষকদের কাছে এই রচনাবলির প্রধান আকর্ষণ সম্পাদক- প্রদত্ত গ্রন্থ- পরিচয়। রচনাবলির এ- অংশে সম্পাদকের তথ্যনিষ্ঠা ও গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় সুপরিস্ফুট।

তাছাড়া নজরুল ইসলামের সাহিত্য সম্পদ ও সুর সৃষ্টি সম্বন্দে যারা আলোচনায় আগ্রহী, তাদের মধ্যে জনাব আবদুল কাদির অন্যতম। প্রকাশকের এ মন্তব্যকে অত্যুক্তি বলা চলে না। কারণ আবদুল কাদির ছিলেন নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরই একজন। তিনি কবিকে দেখেছিলেন অত্যন্ত কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই তার রচনায় অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। আর এদিকথেকে প্রবন্ধগুলোর গুরুত্ব যথেষ্ট। কবি নজরুল-নজরুল সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা নয়, তবে খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধের মধ্যে দিয়েই আবদুল কাদির নজরুলের সমগ্র শিল্প সত্তার স্বরূপ উদঘাটিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী (১৯ মে ১৯৭২) উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত স্মৃতিসভায় আবদুল কাদির "কাজী আবদুল ওদুদ"শিরোনামায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ঐ বছরেই' বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।[৮০] *কাজী আবদুল ওদুদ* এ- প্রবন্ধেরই গ্রন্থরূপ। গ্রন্থকারে প্রকাশকালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভূমিকা' লিখে দেন। পরিশিষ্টে প্রবোধচন্দ্র সেন ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি করে চিঠি এবং শেষোক্তজনের 'কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গে' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

এ গ্রন্থে ও ওদুদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর সাহিত্যচর্চার বিবরণ ও রচনা প্রকাশের কথা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ প্রতিটি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্যই এ কাজে আবদুল কাদিরের যোগ্যতা সন্দেহাতীত। কারণ তিনি শুধু 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এরই একজন ছিলেন না, ওদুদের ও স্নেহভাজন ছিলেন। সম্ভবত একথা স্মরণ করেই আবুল ফজল গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

> এক অসাধারণ লেখকের জীবন ও চিন্তার সঙ্গে এযুগের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এ আদি ও প্রথম প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আবদুল ওদুদের বিচিত্র সাহিত্যকর্মের দীর্ঘতর আলোচনা অন্যরা নিশ্চয়ই করবেন কিন্তু আবদুল কাদিরের বইটি এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পথিকৃতের মর্যদা পাবে।
>
> আবদুল ওদুদের ছাত্র আর সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তার মধ্যে আবদুল ওদুদ সম্বন্ধে লেখার যোগ্যতম ব্যক্তি যে আবদুল কাদির তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।[৮১]

আবদুল কাদির তাঁর আলোচনায় যে *জনতা* ও নীচের তলার গণ-মানুষের কথা বলেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিবিদদের লক্ষ্যস্থল। শিল্পী সাহিত্যিকগণ জনগণের সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন বটে কিন্তু এ সমস্যার সমাধানে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন না। ওদুদ মনে প্রাণে ছিলেন সাহিত্যশিল্পী। তাই তাঁর রচনায় রাজনৈতিক সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয় নি। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে গ্যেটেপন্থী।[৮২] অপরদিকে আবদুল কাদির সেকালের সহযাত্রীদের কাছে বিপ্লবভাবাপন্নরূপে পরিচিত ছিলেন । এসময়ে তাঁর ঝোঁক ছিল বামপন্থী রাজনীতির দিকে।

উল্লেখ্য যে, 'মুসলিম সাহিত্য - সমাজ'-এর লেখকদের মধ্যে মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদের জীবনাদর্শকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ও এ পথেরই আরেকজন যোগ্য, পথিক। যিনি 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলেও এ সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে সমর্থন জানিয়েছেন।[৮৩]

আবদুল কাদির বুদ্ধির মুক্তি ধারণা ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা সমাজ মানসে বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন গল্প কবিতা, প্রবন্ধের মাধ্যমে। ব্যক্তির চেয়ে তিনি সমাজকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন এবং সে প্রভাবে সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন। শিখা গোষ্ঠিকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় শিখা গোষ্টির সদস্যদের বিভিন্ন রচনাবলির সংকলন বের করা হতো তাতে তার চিন্তা চেতনা যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে কয়টি সমাজ-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে মুসলিম মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রভাব ছিল এ সমাজের সদস্যদের উপর অপরিসীম। ঊনবিংশ শতাব্দীর কতিপয় বাঙালি মণিষীর প্রভাবও এদের উপর লক্ষ্য করা যায়। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল লেখক 'মুসলিম সাহিত্য

সমাজের' অবদানকে খাটো করে দেখার প্রয়াস নিয়ে থাকেন। তাদের মতে এই *বুদ্ধির মুক্তি* আন্দোলন সমাজের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এ আন্দোলন স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে সাহিত্য সমাজের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। আসলে কি তাই?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিটি সংস্কার আন্দোলন বুদ্ধিজীবিদের কেন্দ্র করেই শুরু হয় এবং তার ঢেউ বৃহত্তর জনগোষ্ঠির দার প্রান্তে পৌছতে সময় লেগে যায়। ইউরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবিদের কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল এবং তা জনসমাজে পৌছতে সময় লেগেছিল। তাই বলে কি ইউরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল? *বুদ্ধির মুক্তি* আন্দোলনও ব্যর্থ হয়নি।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব যে তৎকালীন বাঙালি সমাজে উদার মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। হতে পারে সেই আন্দোলন ছিল ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তা ছাড়া এ মুসলিম লেখকদের চিন্তা ও কর্মেও রেনেসাঁসের উত্তাপ অনুভব করা যায়। কলিকাতায় সওগাত গোষ্ঠী জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে রেনেসাঁসের স্পিরিট দ্বারাই অনুপ্রানিত ছিল। এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন তার মর্মে ছিল রেনেসাঁস সৃষ্টির সংকল্প। বাঙলার মুসলমান সমাজকে তারা সামিল করতে চেয়েছিলেন শতাব্দীকাল আগে কলকাতায় সূচিত হিন্দু বাঙালির জাগরণের ধারায়। হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনা দ্বারা তারা জাতি গঠনে প্রয়াসপর হয়েছিলেন। পাশাপাশি ১৯৪০ এর দশকে কলকাতায় একদল মুসলিম লেখক জাতীয়তাবাদী চেতনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনা নিয়ে গঠন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটি এবং কাজ করেছিলেন দ্বি-জাতি তত্ত্বের সমর্থনে। শেষ পর্যন্ত দ্বি-জাতি- তত্ত্ব সফল হলো, আর বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন কিছু সময়ের জন্য অগ্রগতির পথ পেল না। পরে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে বিকশিত হয় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চেতনা।

গ. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও আজাদ মোহাম্মদী গোষ্ঠি ও রেনেসাঁ সোসাইটির প্রতিক্রিয়া

মুসলিম বাংলার গণজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণীষী, সাংবাদিক দিকপাল, ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ, ইসলামি চিন্তাবিদ আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলা বাংলায় সুপণ্ডিত, সুসাহিত্যিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি পশ্চিম বাংলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত চব্বিশ পরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী আলিম ও মুজাহিদ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৮৪] মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জন্মসূত্রেই জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। কারণ, ১৮৩১ সালে বালাকোর্ট যুদ্ধে তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।[৮৫] তাঁর পিতা মওলানা আবদুল বারী সৈয়দ আহমদ শহীদের মুজাহিদ আন্দোলনে শরীক হন।[৮৬] তিনি গাজী[৮৭] হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এছাড়া তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা[৮৮] ছিল আকরম খাঁ'র পার্শ্ববর্তী গ্রামে।[৮৯] তাই, পারিবারিক সূত্রেই জিহাদী প্রেরণার উত্তারাধিকারী হওয়ায় এই জিহাদী চেতনা তাঁর মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী জীবনে বিজাতীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে তিনি কলম-সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত সফর করে অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের নেতৃত্বে দেন। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। যেমনটি ঘটেছিল তাঁর পূর্বসুরি নওয়াব আবদুল লতিফের[৯০] বেলায়। উভয়েই কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র ছিলেন[৯১] এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

মওলানা আকরম খাঁ'র কর্মজীবন শুরু হওয়ার সময় উপমহাদেশের ইংরেজ শাসন মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিপাহী বিপ্লবোত্তর প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটানা নির্যাতনে মুসলিম সমাজ অর্থ, বিত্ত, বিদ্যাবুদ্ধি প্রায় সবকিছু হারিয়ে ফেলে।[৯২] প্রায় সাত'শ বছরের মুসলিম ঐতিহ্যের কেন্দ্রভূমি দিলী ও আশপাশের শত শত মাইলের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত সিপাহী বিপ্লবোত্তর গণহত্যার কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা সংখ্যা লঘুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নামমাত্র কিছু মুসলমান অত্যন্ত মানবেতর জীবন ও জীবিকা নিয়ে বেঁচে ছিল। মওলানা আকরম খাঁ'র কর্মস্থল কলকাতাতেও মুসলিম জনসংখ্যা ছিল নগন্য। তারা ছিল স্বল্পশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত। সরকারি চাকরি, অফিস-আদালত সর্বত্রই হিন্দুদের একচ্ছত্ত আধিপত্য ছিল। আর্থিক দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজ দরিদ্র চাষী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। নিজেদের কিভাবে উন্নতি হবে-সেই দিকে ভালভাবে দৃষ্টি না দিয়ে তারা ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে মেতে থাকতো। নানা কুসংস্কার ও শিরক বিদআতপূর্ণ কার্যকলাপ মসুলমানদের বিপদগামী করে তুলেছিল।[৯৩]

উপমহাদেশের রাজনীতিতে তখন কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠালাভ করা সত্ত্বেও এ সংগঠন কোনো ভূমিকা গ্রহণ করার মত সাংগঠনিক শক্তি তখনও অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর খিলাফত ও অসহযোগের কোলাহলে সারা উপমহাদেশের আকাশ-বাতাস উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে সমগ্র বাংলা তখন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভায় ভাস্বর। বাংলার মুসলিম জনগণের সাহিত্য বলতে ছিল পুঁথিপুস্তক। এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই তখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। তথাকথিত বিত্তশালী মুসলমানরা মাতৃভাষা বাংলা চর্চা করাকে শরাফতির অন্তরায় বলে মনে করতো। আলিমগণ ফার্সি ও উর্দু চর্চার মাধ্যমেই জনগণকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। জাতির এ দৈন্য অবস্থা প্রথম থেকেই ভাবিয়ে তোলে আকরম খাঁ কে। তিনি বুঝাতে পারেন যে, মুসলমানদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে তাদের ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপ হলো নিজস্ব তাহযিব তমদ্দুনকে তুলে ধরার একমাত্র মাধ্যম সংবাদপত্র ও নির্ভিক সাংবাদিকতা।

তিনি অনুভব করলেন, সংবাদপত্র না থাকলে মুসলমান সমাজের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে না। কারণ, দরিদ্র মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরা, তাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা প্রসার এবং অন্ধ কুসংস্কারসমূহ দূর করার জন্য চাই হিন্দু সমাজের মত মুসলমানদেরও শক্তিশালী হাতিয়ার সংবাদপত্র।[৯৪]

কর্মজীবনের শুরুতেই আকরম খাঁ তৎকালীন মুসলমান সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাঁদপদতা দূর করার জন্য সাংবাদিকতাকেই উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। সমকালীন অনগ্রসর মুসলমান সমাজের চৈতন্যোদয় এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনি ১৯০১ সাল থেকে সুদীর্ঘ ৬৭ বছর সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

আকরম খাঁ'র সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয় আহলে হাদিস[৯৫] নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সাথে। অল্পদিন পরেই তিনি এই পত্রিকা ছেড়ে দেন। অতঃপর কাজী আবদুল খালেক প্রকাশিত মহাম্মদি আখবার পত্রিকায় যোগ দেন। এ পত্রিকায় একই পাতায় বাংলা ও উর্দু ভাষায় কলাম থাকতো। আকরম খাঁ এই পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও খবর বাংলা থেকে উর্দু এবং উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তিনি এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।[৯৬]

মওলানা আকরম খাঁ' দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাঙালি মুসলমানদের মুখপত্র সাপ্তাহিক মোহাম্মদী সম্পূর্ণ নিজ কর্তৃত্বাধীনে স্বাধীন মতামতের বাহন হিসেবে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনভাবে বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতায় আকরম খাঁ'র প্রবেশ তখন হতেই। বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার বাহন হিসেবে পত্রিকাটি সুধি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর লেখনিতে গোঁড়ামী-বিবর্জিত যুক্তিবাদী মানস, স্বাধীন চিন্তাধারা ও জাতীয় অনুভূতি বিকশিত হতে থাকে। মোহাম্মদীর প্রথম দিকের প্রকাশনাগুলোতে হানাফী মাযহাবের আলিমগণ আহলে হাদিস সম্পর্কে যেসব বিতর্কিত মাসয়ালা-মাসায়েল আলোচনা-সমালোচনা করতেন, বিশেষভাবে সেগুলোর উত্তর থাকতো। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেগুলোর উত্তর দিতেন। অবশ্য, সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ কলহ-কোন্দল, দীর্ঘস্থায়ীভাবে চলুক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই, পত্রিকাটি পূর্বোক্ত সংকীর্ণ মতামতের পরিবর্তে অখণ্ড মুসলিম সমাজের ঐক্য, সংহতি ও উন্নতি সাধনের মুখপত্রে পরিণত হয়।[৯৭]

সাপ্তাহিক মোহাম্মদী প্রকাশনায় ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিরাট বিপবী চেতনার উন্মেষ ঘটে। স্বল্পকালের মধ্যেই এই পত্রিকা বাংলা, আসাম, বার্মায় বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দুর্বার গতিতে এর খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হতাশাগ্রস্ত মুসলিম জনগণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হলো। এভাবে জাতি বুকে পেল আশা, মুখে পেল ভাষা। ইংরেজ শাসকদের বৈরী দৃষ্টি, অর্থ সংকট, বহুবিদ বাধা-বিপত্তির মধ্যদিয়ে আকরম খাঁ এ পত্রিকায় মুসলমানদের জাগরণমূলক প্রবন্ধ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রচনা এবং মুসলিম বিশ্বের খবর প্রকাশ করতে থাকেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলাভাষী মুসলিম জনগণ নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ তৎকালীন সময়ের ইংরেজ শাসকবর্গের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হানাফী[৯৮] নামক পত্রিকা সাপ্তাহিক *মোহাম্মদীর* সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর* যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী রচনার মোকাবেলায় *হানাফী* তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। মোহাম্মদী অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। বাংলার মফস্বল অঞ্চল এমন স্থান কমই ছিল, যেখানে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী অনুপ্রবেশ ঘটে নি। সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে বাংলা ও ইংরেজীতে আকরম খাঁ যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, উক্ত পত্রিকার লালিত্যময় ভাষা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯১৪, মতান্তরে ১৯১৫ সাল মোতাবেক ১৩২২-২২ সনের বৈশাখ মাসে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র হিসেবে *আল-এসলাম* নামক আরও একটি মাসিক পত্রিকা মওলানা আকরম খাঁ'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সহকারি হিসেবে ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ, মওলানা ফখরুদ্দিন আহমদ নিযামপুরী, ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেন। বিশিষ্ট লেখকদের লেখা এতে প্রকাশিত হতো।[৯৯]

আল-এসলাম প্রকাশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, ইসলামের মাহাত্ম প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা উপস্থাপিত সংশয়বাদীদের যুক্তি খণ্ডন , সমাজ সস্কার, অন্ধবিশ্বাসীদের মুলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা, মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষ্টি, শিক্ষা, সভ্যতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর প্রবন্ধ *আল-এসলাম* প্রকাশিত হতো। বাঙালি মুসলিম সমাজে *আল-এসলাম* বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মুসলিম জনমত গঠনে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জানা যায় যে, ১৯১৭ সালে *আল-এসলামের* প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০০।[১০০]

১৯২০ সালে ভারতব্যাপী মুসলমান ও হিন্দুদের যুক্ত আন্দোলন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন[১০১] শুরু হয়। আকরম খাঁ খিলাফত আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে এর মুখপত্র হিসেবে ২১ মে মতান্তরে ১৪ মে ও ২৪ মে, তাঁর সম্পাদনায় যামানা নামক একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বাণী উর্দুভাষীদের কাছে পৌছানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।[১০২] এ পত্রিকায় লিখতেন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মওলানা আবুল কালাম আযাদ, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মওলানা জাফর আলি খাঁ, মওলানা হাসমত মুহানী, মওলানা[১০৩] আযাদ সুবহানী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আবদুলাহিল বাকী প্রমুখ। যামানার মাধ্যমে তিনি উর্দুভাষী মুসলমানদের নিকট রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করার সুযোগ পান। এ সময় তিনি একাধারে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক যামানা ও দৈনিক সেবক এ তিনটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে রাজনৈতিক প্রচারণা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।

উর্দু দৈনিক যামানা প্রকাশের পরপরই মওলানা সেবক নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। প্রথমে সাপ্তাহিক প্রকাশ হলেও ১৯২১ সালের ১ ডিসেম্বর পত্রিকাটি তিনি দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। প্রকাশনার মাত্র ১০ দিন পরই ১০ ডিসেম্বর 'অগ্রসর! অগ্রসর!' শিরোনামে উত্তেজনামূলক সরকারবিরোধী একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করায় সরকার কর্তৃক পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, জামানত তলব করা হয় এবং মওলানাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কলকাতার তৎকালীন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইনহোর বিচারে তিনি এক বছরের জন্য দন্ডিত হন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে রাখা হয়।[১০৪] এ সময় সেবক পত্রিকাটি কিছুকাল বন্ধ থাকে।

সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের অজুহাতে সে সময় মহাত্মা গান্ধীসহ ভারতের উল্লেখযোগ্য বেশির ভাগ নেতাই গ্রেফতার হন। আকরম খাঁ অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে জেলখানায় বন্দী জীবন গ্রহণ করেন। সরকার তাঁকে শরীরী সংগ্রাম থেকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বন্দী করেছেন। কিন্তু সংগ্রামী বীর আকরম খাঁ জেলখানায় কলম সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তিনি কারাগারের বন্দী শিবিরে বসে পবিত্র কুরআনের আমপারার অনুবাদ করেন। এটি কারাগারের সওগাত (আমপারার অনুবাদ) নামে খাত। কারাগারে প্রেরিত হওয়ার পর তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পত্রিকায় যোগদান করার অনুরোধ করেন। তিনি ১৯২২ সালের জুন মাসে সেবকের সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে সেবকের উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। আবার সেবক প্রকাশনা শুরু হয়। এ সময় সেবক এ মোহাম্মদ মোদাব্বের ও অদ্বৈত মলবমন প্রমুখ কাজ করতেন। কিন্তু সঠিক পরিচালনার অভাবে কাগজের জনপ্রিয়তা কমে যায়। পত্রিকাটি টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হলে একদিন কারাগার থেকে লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে মওলানা পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।[১০৫]

১৯২২ সালে দৈনিক মোহাম্মদী প্রকাশিত হয়।[১০৬] পূর্বেই বলা হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের কারণে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আকরম খাঁও বন্দী হন। সরকারবিরোধী সম্পাদকীয় লেখার অজুহাতে সেবক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। সেবকের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে দৈনিকে রূপান্তরিত করে প্রকাশনা আরম্ভ হয়।[১০৭] তখন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মঈনউদ্দীন ও কাজী নজরুল ইসলামসহ আরও অনেকেই মোহাম্মদীতে কর্মরত ছিলেন।

বাংলা, উর্দুর পাশাপাশি একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য মওলানা সাহেব বহুদিন থেকে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। ১৯৪৩ সালে উপমহাদেশের রাজনীতি স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে রূপান্তরিত হলে তিনি ইংরেজি সাপ্তাহিক *কমরেড* পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির সর্বপ্রথম মালিক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আলী। তিনি খাজা নুরুদ্দীনের[১০৮] স্বত্ব বিক্রি করে দিলে আকরম খাঁ দ্বিতীয় ছেলে সদরুল আনাম খাঁ পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করেন। কমরেড পত্রিকার সম্পাদনা আকরম খাঁ কলকাতা আজাদ অফিস থেকে আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে মুজিবর রহমান খাঁর সম্পাদনায় বের হতো। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন[১০৯] কমরেড সম্পাদনায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। আকরম খাঁ মুসলিম ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কীয় অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ইংরেজী অনুবাদ করে লেখাগুলো কমরেড-এ ছাপাতেন। সে সময় কলকাতা থেকে স্টার অব ইন্ডিয়া, মর্নিং নিউজ ইত্যাদি ইংরেজী পত্রিকাও বেরুতো।[১১০] প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আকরম খাঁ ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ না পেলেও ব্যক্তিগত অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজীতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় কমরেড সম্পাদনকালে। ড. সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন, কমরেড এ ছাপাবার আগে প্রতিটি প্রবন্ধ মওলানাকে পড়ে শোনাতে হতো। এই সময় দেখেছি, শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর সুক্ষ সচেতনতা, ভুল বা অসার্থক প্রতিশব্দ ব্যবহারের ত্রুটি তিনি সহজেই ধরে ফেলতেন।[১১১]

মওলানা আকরম খাঁ মুসলমান সমাজের পত্র-পত্রিকার দৈন্যতা দেখে মুসলিম জাগরণের কণ্ঠস্বর হিসেবে ১৯২৭ সালের ৬ নভেম্বর মুসলিম বাংলার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা *মাসিক মোহাম্মদী* ২য় পর্যায় প্রকাশনা আরম্ভ করেন।[১১২] প্রথম পর্যায়ে *মাসিক মোহাম্মদী* ১৯০৩ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশিত হয়।[১১৩] অবশ্য এর পূর্বেই মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন আহমদের সুধাকর[১১৪] ও ইসলাম প্রচারক মুন্সী আবদুর রহীমের মুসলিম হিতৈষী, সৈয়দ এমদাদ আলীর *নবনুর,* মীর মশরাফ হোসেনের *হিতকরী* এ সমস্ত সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এগুলো বেশির ভাগই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা সমাজ সংস্কারমূলক এবং কিছুটা সাহিত্যের বিষয়াবলি নিয়ে প্রকাশ হয়েছিল। রাজনৈতিক ও জাতীয় জাগরণমূলক কোনো পত্র-পত্রিকা তখন পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছিল কি-না জানা যায় নি। [১১৫] *মাসিক* মোহাম্মদীই সম্ভবত প্রথম রাজনৈতিক ও জাতীয় জাগরণের বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

মুসলিম বাংলার প্রাচীনতম বাংলা দৈনিক আজাদ প্রকাশিত হয়েছিল উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম নবজাগরণের পটভূমিতে ঐতিহাসিক সময়-সন্ধিক্ষণে। *দৈনিক আজাদ* এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়নের একটি সাধারণ *দৈনিক সংবাদপত্র* হিসেবে বিচার করলেই চলবে না। এই পত্রিকার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। বস্তুতপক্ষে, *দৈনিক আজাদ* ছিল তৎকালীন উপমহাদেশের বিশেষ করে তদানিন্তন আসাম ও বাংলার মুসলমানদের মুখপত্র, *নবজাগরণ* ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী বাহক এবং হাতিয়ার। সাংবাদিকতার ইতিহাসে *দৈনিক আজাদ* অতুলনীয়। *দৈনিক আজাদ* প্রকাশের পটভূমি বর্ণনা দিতে গিয়ে পত্রিকার প্রথম বার্তা সম্পাদক সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের লিখেছেনঃ

> ১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য, একে ফজলুল হক মনে করেছিলেন যে, তাঁর প্রজা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু তা সম্ভবপর হয় নি। এ জন্য যে, মুসলিম লীগের হাতে *মোহাম্মদীর* মত একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল। নির্বাচনের পর যখন লীগ- প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হল, তখন একটি শক্তিশালী দৈনিকের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেন ফজলুল হক। তাঁরা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে মওলানা আকরম খাঁ ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে *দৈনিক আজাদ* বের করলেন। এই *আজাদ* পত্রিকাই মুসলিম জাতীয় ইতিহাসের দিকদর্শন। এবার মনে হল মুসলমান জাতি নতুন জীবন ফিরে পেল। মুসলিম লীগ মুসলমান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি নিয়ে এগিয়ে চললো, *আজাদ* জাতির সামনে তুলে ধরলো এক নতুন আদর্শ। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব ও *আজাদের* সমর্থন উপমহাদেশের এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের সূত্রপাত করলো। যার ফলশ্রুতি পাকিস্তান।[১১৬]

বাংলার মানুষের সুপ্ত মনের আকুতি প্রকাশ এবং ভাষা দেওয়ার জন্য, বিশ্বের দরবারে তাকে তুলে ধরবার প্রত্যয় নিয়ে জাতীয় সচেতনতার প্রতিভূ ও পরিপূরক হিসেবেই *আজাদের* আত্মপ্রকাশ। বাংলার মুসলিম সমাজ নিজ দেশেও পরবাসী। সংখ্যাধিক্য হয়েও সংখ্যালঘুদের অনেক পেছনে, সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হয়েও আত্মবিস্মৃত। এই সংকটাপন্ন অবস্থায়, *দৈনিক আজাদকে* জন্মলগ্ন থেকেই ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে-

এক শাসক শ্রেণী,
দুই, প্রতিবেশী সমাজ
তিন, নিজ সমাজ।

অর্থাৎ, দেশের শাসকদের কাছে মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্খার কথা তুলে ধরতে হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-মানে অগ্রসর ও প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশী সমাজের ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা, অন্য দিকে নিজে সমাজের আপামর জনসাধারণকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজেদের হক ও দাবি-দাওয়া সমন্ধে সচেতন, সজাগ, আত্মপ্রত্যয়ী ও সংগ্রামী করে তুলতে হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই তিন ভূমিকা *আজাদ* সার্থক ও সফলভাবে পালন করেছে। তাই *আজাদের* ঐতিহাসিক অবদান অনন্য। উপমহাদেশের মুসলমানরা এভাবে *আজাদের* কাছে ঋণী। সাহিত্যিক আকবর উদ্দীনের নিম্নের উদ্ধৃতি অনুধাবনের জন্য সহায়ক হবেঃ

> ১৯৩০-৩৫ সালের পরে যাঁরা জন্মেছেন তাঁর পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁরা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা অজ্ঞতার দরুন এই উপমহাদেশীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ট্রাজেডী ধর্মভিত্তিক বহুবিভক্ত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং সেই ট্রাজেডীর ফলশ্রুতি হয়েছিল-পাকিস্তান। আর পাকিস্তান হয়েছিল বলেই অর্থাৎ উপহাদেশে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল বলেই, স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে।[১১৭]

মওলানা আকরম খাঁ'র দৈনিক আজাদ ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর বের হয়। তবে, একমাত্র আজাদ ছাড়া কোনো পত্রিকাই বেশি দিন টিকেনি। আযাদ-ই দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাংলাদেশে মুসলিম ঐতিহ্য ও জাতীয়তা প্রচারের কাজে দৈনিক আজাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৈনিক আজাদ ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উৎপীড়িতদের মুক্তিকামী পত্রিকা। দৈনিক আজাদকে অভিনন্দন জানিয়ে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক বলেছিলেনঃ

> মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাইতে হইলে যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ঔষধের আবশ্যক, মৃতপ্রায় সমাজকে বাঁচাইতে হইলে তেমনি আবশ্যক শক্তিশালী সংবাদপত্রের। বাংলার নিপীড়িত জাতিগুলি যখন অত্যাচারের চাপে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া মুক্তি লাভের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিতেছিল। সেই সন্ধিক্ষণে আশার দীপ্ত মশাল হস্তে হইল *আজাদের* আবির্ভাব। *আজাদ* বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি মৌনমুক জনসাধারণ কণ্ঠের ভাষা পাইল, বুকে পাইল আশা। বন্দী আবার জিন্দানখানার আগল ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। মুক্তির নির্মল আলোকে.....।[১১৮]

সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে *দৈনিক আজাদ* ছিল সোচ্চার। জমিদার উচ্ছেদের পক্ষে সাধু সাবধান শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার জন্য *দৈনিক আজাদ* কে আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়। এ প্রসঙ্গে *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেনঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার (লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি) নয়াবাড়ী তখনও তৈরি হয় নাই। তাই জগন্নাথ হলেই সাময়িকভাবে আইন সভার অধিবেশন চলছিল। আইন সভায় সে সময়ে জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা তীব্র হয়ে ওঠেছিল। জমিদার শ্রেণীর লোকেরা যাতে এ সম্পর্কে তাদের স্বার্থবিরোধী আইন গৃহীত না হতে পারে, সেজন্য নানাপ্রকার প্রকাশ্য ও গোপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল। তাই সাধু সাবধান শীর্ষক আজাদ-এর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। লেখাটা নিয়ে আইন সভায় তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শুধু তাই নয়, আজাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। পরিষদ আজাদের রিপোর্টারের প্রবেশাধিকার নাকচ এবং সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে আজাদকে বঞ্চিত করা হয়। এরপর দীর্ঘদিন

আজাদ সম্পর্কে এই ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। তার ফলে আজাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তবে জনপ্রিয়তা এর ফলে বেড়েই গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।[১১৯]

১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর দৈনিক আজাদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর (পাকিস্তান ও ভারত) এক সপ্তাহ পত্রিকা বন্ধ থাকে। ১৯ অক্টোবর তারিখ পুনরায় ঢাকা থেকে *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়।[১২০] *দৈনিক আজাদ* আমাদের জাতীয় জীবনে আবেহায়ত এর কাজ করেছে।

আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে *দৈনিক আজাদ* এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই পত্রিকার ভূমিকা ও অবদানের সাথে জড়িত রয়েছে উপমহাদেশের এক শতাব্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিশেষ করে মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের ও বাংলার মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস। *দৈনিক আজাদ* একটি সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও জন্মলগ্ন থেকেই একটি অঙ্গীকার নিয়ে মুসলিম জনগণের নিকট আবির্ভূত হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায়, যাবতীয় অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বোপরি স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উজ্জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টায় *দৈনিক আজাদ* শাণিত লেখনীর মাধ্যমে অবদান রেখেছে। বাস্তবক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। *দৈনিক আজাদ* তার অঙ্গীকারকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে। *দৈনিক আজাদ* এর এই সফলতা যার জন্য তিনি মুসলিম বাংলার দিকপাল সাংবাদিকতার জনক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ-সংস্কারক, প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা নিছক একটি সংবাদপত্র ছিল না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র এবং স্বাধিকার আদায়েরও বিপ্লবী হাতিয়ার ছিলো।

এক সময় এমন ছিল, কলকাতার *আজাদ* অফিস আলিম, রাজনীতিক এবং সাহিত্যিকদের জন্য হয়ে ওঠেছিল সমকালীন বাংলার সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় কেন্দ্র। বাংলার এমন কোনো রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আলিম ছিলেন না, যিনি একবার *আজাদ* অফিসে হাজিরা দেননি। বলা যেতে পারে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বেসরকারি কার্যালয় ছিল তখন *আজাদ* অফিস। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির শুধু প্রাণকেন্দ্র নয়, অফিস বলতেও সবকিছুই *আজাদ* অফিস।

মওলনাকে অনেকেই কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনে করেন। আসলে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন কি-না, কয়েকটি ঘটনাতেই তা প্রতীয়মান হবে। ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে তিনি মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু[১২১] নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদুত হিসেবে কাজ করেছেন। বেঙ্গল প্যাক্ট গঠনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে সাহায্য করেন। তিনি মহাত্ম গান্ধীর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। পণ্ডিত শ্যামাচরণ মুখার্জী, প্রফেসর জিএল ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। মওলানা জেলে যাওয়ার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রাখার চিন্তা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য, দু'জন একত্রেই কারাগারে যাওয়ায় তা আর বাস্তবায়িত হয় নি।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরের একটি স্মরণীয় ঘটনা। মহারাজ ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মওলানা কয়েদীর বন্ধু ছিলেন।[১২২] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেটে গেছে অনেক বছর, তখনও মহারাজ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ চলে আসেন সেখানেই তার শেষ কৃত্য হয়। তিনি শেষ জীবনে জীবন স্মৃতি নামে একখানি বই লিখেছিলেন। বইটি ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় প্রবন্ধ আকারে বের হয়েছিল। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি আকরম খাঁ'র সম্পর্কে লিখেছেন;

> ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর আমি ঢাকা গিয়া মওলানা আকরম খাঁ'র সহিত দেখা করি। ১৯২১ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মওলানা সাহেবের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাহার পর আর মওলানা সাহেবের সহিত দেখা হয় নাই। তখন শহরের অবস্থা এমন যে, আমাকে রাস্তায় হত্যা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে কিছুই হইত না। তখন

আজাদ অফিস ও মওলানার বাড়ি এত বড় ছিল না। মওলানা সাহেব একতলা দালানে বাস করিতেন। গেটের দরজা খোলা ছিল। আমি মওলানা সাহেবকে কিছুক্ষণ ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা। মওলানা সাহেব বারান্দায় পাইচারী করিতেছিলেন। আমার পরনে ধুতি ছিল। একজন অপরিচিত হিন্দুকে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি রাগভরে বলিলেন, বাড়িতে মেয়েছেলে আছে ভিতরে ঢুকিয়াছেন? আমি বলিলাম, আপনার বাড়ির মধ্যে আমি ঢুকিতে পারি। বৃদ্ধের রাগ অনেক কমিয়া গেল। তিনি বলিলেন পরিচয়, আমি আলিপুর জেলের পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পাশে চেয়ারে বসাইলেন। আমি বলিলাম, মওলানা সাহেব দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এখন জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে তবে জাতির ভবিষ্যৎ কি? মওলানা সাহেব বলিলেন, পূর্বে রাজা বাদশাহরা ছিল চরিত্রহীন, স্বার্থপর, জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে সাধু-সন্নাসী ফকিরেরা। আমি সব সময় ভাবি সব ছাড়িয়া গাছতলায় বসি। আমি-ত আর সব ছাড়িতে পারিতেছি না। এ জন্য কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছি না, যাহা কিছু করিবেন আপনারাই করিবেন। তিনি ইহাও বলিলেন, ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা বাস করিতে পারিবে না, দুনিয়ার সম্মুখে এই কলঙ্ক হইতে দিব না। যখনই কোনো গণ্ডগোলের আভাস পাইবেন, আমাকে সংবাদ দিবেন। আমি গণ্ডগোল বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। প্রয়োজন হইলে আমি নিজে সেখানে যাইব। স্বাধীনতার পর জাতি গঠনে বা জাতীয় চরিত্র গঠনে কোনো চেষ্টা করিতে না পারিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হয় না। দুর্নীতির আশ্রয় লইলে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়। যাহার প্রচুর অর্থ আছে তিনিই বড়লোক। তিনি দেশের মধ্যে গণ্যমান্য নেতা। তিনি সুখী, যাহারা সৎলোক তাহারা গরীব, তাকাকে কেহ মান্য করে না। বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ সংস্কার। বর্তমান দূষিত আবহাওয়া পরিবর্তন করিয়া নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা। ইহার মূল হইবে দেশপ্রেম। দেশপ্রেম হইলেই প্রত্যেকেই মনে করিবে আমি জাতির সেবা করিতেছি। তখনই প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইবে। যখন তখন সরকারি কর্মচারীরা ঘুষ লইতে সাহসী হইবে না। লজ্জাবোধ করিবে। তখন ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিবে না, মনে করিবে আমার জাতি দূর্বল হইয়া পড়িবে। যাহারা সমাজ সংস্কার করিবেন, জাতি গড়িয়া তুলিবেন, তাহাদের প্রথমে আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে। নতুবা কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। অবশ্য, বর্তমান অবস্থায় কারা সংস্কার প্রয়োজন। তবে জেলে কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের পূর্বে জেল কর্মচারীদের ও দেশের নেতাদের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন।[১২৩]

উদারপন্থী মওলানা আকরম খাঁ ১৯৫০ সালের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য ও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাবলি আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন।

ঘ. বাঙলার নবজাগরণের কাণ্ডারী 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-কারীদের প্রতিরোধ সৃষ্টি প্রয়াসী সংরক্ষণবাদীদের ক্রিয়াকলাপসমূহ

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তার ধর্মীয় ভাবধারা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ধর্মচেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবধারার মিশ্রণ এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এ যুগে শিক্ষিত সমাজের অনেকের মধ্যে উদার নৈতিক চিন্তা-চেতনা জন্মলাভ করে। আবার, খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচারণায় এদেশবাসীর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগে এবং তা থেকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জাগে অনেকের মনে। মূলত এ দু'টি কারণে নতুন ধর্মান্দোলনের উন্মেষ ঘটে আর এর মধ্যেই অঙ্কুরিত হয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার বীজ।

ভারতের রাজনৈতিক ভাবধারার সূচনা লক্ষ্য করা যায় রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে। সাত বছর ধরে তিনি উপনিষদ, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োজিত থাকেন। পরে ১৮১৪ সালে কলকাতায় সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সংস্কৃত, আরবী, হিব্রু, গ্রীক, ফার্সী ও ইংরেজীসহ দশটি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসূত আধুনিক ধ্যান ধারণার চর্চার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। হিন্দু পৌত্তলিকতা, বর্ণভেদ, সতীদাহ, শিশু হত্যা, বহুবিবাহ ইত্যাদি ধর্মীয় কুসংস্কারের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ধর্মের এ সকল অভ্যন্তরীণ গোঁড়ামিকে আমূল সংস্কার করে একে যুক্তিনির্ভর আধুনিকতায় প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর সাধনা ছিল। এই লক্ষ্যেই ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৩০ সাল তিনি ইংল্যান্ড পাড়ি জমান এবং ১৮৩৩ সালে সেখানে তিনি মারা যান।[১২৪]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ অনুযায়ী খ্রিস্টান মিশনারীরা কোম্পানি এলাকায় বসতি স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন।[১২৫] ফলে, তাঁদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ বেড়ে যায়। এই সুযোগে তীব্র প্রচারণার মাধ্যমে তাঁরা এদেশীয়দের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠুর আক্রমণ শুরু করেন। এ সহানুভূতিহীন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তবে পাদ্রিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশেষ করে সনাতন হিন্দু সমাজের মুখপাত্ররাই।[১২৬] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এর প্রতিবাদকল্পে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে আপোষ করতেও কুণ্ঠিত হননি।[১২৭]

ব্রাহ্মসমাজ সমন্বয়পন্থী ভূমিকা গ্রহণ করে। মানবতাবোধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, ধর্মচিন্তায় যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি, উদার নৈতিক মনোভাবের চর্চা ইত্যাদিই ছিলো রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীদের চিন্তাধারার মূল ভিত্তি। মানুষের মর্যাদা ও অধিকারবোধের গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধিকেই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চেতনার উৎস বলা যেতে পারে। এ কারণে জনৈক ঐতিহাসিক রামমোহন রায়কে উনিশ শতকের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করেছেন।[১২৮]

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-৮৬) একটি ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা করেন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ ভক্তিমার্গের মধ্য দিয়ে ভগবানকে পেতে চেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬০-১৯০২) ও সিষ্টার নিবেদিতা তাঁর অনুসারী ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনীতির বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ এদেশবাসীর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিলো। বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মকে সকল ধর্মের মাতৃস্বরূপ বলে মত প্রকাশ করেন।[১২৯]

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হিন্দুদের মধ্যে এ সময় গর্ববোধ দেখা দেয়। এই ঐহিত্য চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা-মুখর হয়ে ওঠেন। নিজেদের চিন্তাধারার সমর্থনে জনমত-সৃষ্টির লক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিশির কুমার প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়া লীগ।

এরপর বৃহত্তম যে সংগঠনটি জন্মলাভ করে, তা হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। মাত্র সত্তর জন সদস্য নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এরা প্রধানত ছিলেন আইনবিদ, সাংবাদিক ও স্কুল-শিক্ষক। দ্বিতীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা প্রায় ৪৫০-এ

দাঁড়ায়। এ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পার্সী উদারপন্থী দাদা ভাই নওরোজী। এটি অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায়। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে বদর-আল-দীন তৈয়বজী (১৮৪৪-১৯০৬) সভাপতিত্ব করেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক গোড়ার দিকে অত্যন্ত অনুকূল ছিলো। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এ্যালান অকটেভিয়ান হিউম নামক একজন অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ সরকারি কর্মচারির মস্তিস্ক প্রসূত ছিলো। এমন কি, ভাইসরয় লর্ড ডাফরীনকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা বলেও অভিহিত করা যায়।[১৩০] তাছাড়া প্রথম দিকে স্যার ওয়েডারবার্ণ, স্যার ডেভিড ইয়ল ও পরে স্যার হেনরী কটন প্রমুখ ইংরেজ কর্তৃক এই কংগ্রেস সমর্থিত হয়েছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৯০০ সালের কংগ্রেস সভাপতিদের মধ্যে তিনজন সভাপতি ছিলেন ইংরেজ।[১৩১] প্রথম দিকে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে সু-সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তীকালে সরকারের মোহভঙ্গ হয় এবং দুপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক প্রশংসা-বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় ভাটা পড়ে।

কংগ্রেসের সূচনা থেকেই ভারতীয় মুসলমানরা এ সংগঠনের আহবানে তেমন সাড়া দেননি। প্রথম অধিবেশনের ৭০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান। দ্বিতীয় অধিবেশনে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩-এ দাঁড়ায় বটে, কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই কংগ্রেসে যোগদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করেননি। সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ নেতা কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মনে করতেন, ভারতের 'সাধারণ উন্নীতি' বলে কিছু হতে পারে না, কারণ ভারত 'একটি জাতি নয়'। তাঁর মতে, ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানরা স্থায়ীভাবে হিন্দুর কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়বেন। ইংরেজদের শাসনাধীন থাকার পরিবর্তে হিন্দু শাসনাধীনে যাওয়া তাঁর কাম্য ছিলো না। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মুসলমানদের এমন আচরণ করা উচিত যাতে ব্রিটিশ শাসন এদেশে স্থায়ীরূপ লাভ করে।[১৩২]

বস্তুতঃ এ কারণেই স্যার সৈয়দ আহমদ খান কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না। ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন অপসারণযোগ্য নয় বলে তাঁর ধারণা ছিল। তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের আবশ্যকতা স্বীকার করতেন। ১৮৮৬ সালে তিনি মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই কনফারেন্সের একটি সভায় ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

১৮৭১-এ পরবর্তীকালে মুসলমানরা ক্রমে রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠতে থাকেন। শিক্ষিত মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুসলমানকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তারূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।[১৩৩] অষ্টম দশকে ও নবম দশকের প্রথম দিকে ভাইস্‌রয়ের আইন পরিষদে, শিক্ষা বিভাগ ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনে মুসলমানদেরকে মনোনীত করা হতো।[১৩৪] এ সকল কারণে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থকে কংগ্রেসের সঙ্গে অভিন্ন ভাবতে পারেননি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে প্রথমদিকে, বিশেষ করে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত এই বিশ বছর ধরে- যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা উদার নৈতিক বা নরমপন্থী ছিলেন। জি. কে. গোখলে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁদের একটি সশ্রদ্ধ আনুগত্যের মনোভাব ছিলো। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এতে হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হলেন এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো চরমপন্থী নেতাদের আবির্ভাবে কংগ্রেসের প্রকৃতিকে পরিবর্তন সাধিত হলো।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ভারতের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বঙ্গভঙ্গের আলোচনায় একটু পিছিয়ে গিয়ে তার পটভূমি দেখা যেতে পারে। ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন যখন ভাইস্‌রয় হয়ে আসেন, তখন প্রায় ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে বাংলা ছিলো একটি বৃহদায়তন প্রদেশ; বিহার ও উড়িষ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আয়তনের বিশালতা ও যোগাযোগ সমস্যার কারণে প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনা দূরহ হয়ে ওঠে। সুষ্ঠু প্রশাসনের লক্ষ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আসামকে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব প্রকাশ করেন। বাংলার হিন্দু সমাজ এ প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ সেন ও মতিলাল ঘোষের নেতৃত্বে তাঁদের বিক্ষোভ ক্রমে তীব্রতর হয়।[১৩৫]

কলিকাতার আইনজীবি সম্প্রদায়, সংবাদপত্র সমূহের মালিক গোষ্ঠী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আশংকা করেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে তাঁদের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ-বিঘ্নিত হবে। তাঁরা সমগ্র ব্যাপারটিকে শিক্ষিত ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে পূর্ব বাংলায় মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্য বলে মনে করেন। প্রথমদিকে, মুসলমানরাও বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবটিকে ভালো চোখে দেখেননি। কলিকাতার কেন্দ্রীয় মোহামেডান এসোসিয়েশন ১৯০৪ সালে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই পদক্ষেপ সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[১৩৬] এ সময়ে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি; বরঞ্চ তিনি এর বিরোধিতা করেন এবং বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানান। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, বিভাগ-সমর্থনকারী মুসলিম নেতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ঢাকা আসেন। তিনি মুসলমানদের বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, ঢাকাকে রাজধানী করে মুসলিম প্রধান একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মুসলমানদের সবদিক দিয়ে উন্নতির সম্ভাবনা অতি উজ্জল।[১৩৭] ফলে, তাঁদের মনোভাব ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে।

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হয় এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। স্যার রাম্পফিল্ড ফুলার নতুন প্রদেশের লে. গভর্ণর নিযুক্ত হন। প্রথম দিনে দায়িত্বভার গ্রহণকালে মুসলমানরা তাঁকে স্বাগত জানান; হিন্দুরা অসন্তষ্ট চিত্তে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদানে বাধার সৃষ্টি করেন।[১৩৮] বঙ্গভঙ্গ বিষয় কংগ্রেসকে ভারতীয় রাজনীতিতে অগ্রগামীর ভূমিকায় নিয়ে আসে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অভিযানকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে ৭ আগস্ট, ১৯০৫ এ কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলন শুরু করেন। বিদেশী পণ্য বর্জন স্বদেশী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো।

শিক্ষিত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করেন এবং তাঁদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একে একটি সুযোগ হিসেবে ধরে নেন। এ কারণে, হিন্দুরা তাঁদের প্রতি ঈর্ষান্বিত বলে মুসলমানদের ধারণা হয়। ফলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্ম নেয় এবং পূর্ববঙ্গে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়।

হিন্দু সমাজ বঙ্গ বিভাগের উদ্বোধনী দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করেন। একে তাঁরা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির একটি সরকারি ষড়যন্ত্র নামে অভিহিত করেন। হিন্দু জনগণ, তাই বন্দে মাতরম রবে সোচ্চার হন এবং ব্রিটিশ সামগ্রী বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।[১৩৯] ১৯০৭ সালে স্বদেশী আন্দোলন বলিষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করে; ১৯০৮ সালে তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন রূপে দেখা দেয়। এ সময়ে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। স্কুলে উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্যে স্বতন্ত্র সেকশন খোলা হয়।[১৪০]

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড মিন্টো। তাঁর সমগ্র শাসনামলেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অব্যহত থাকে। মিন্টোর পরে ১৯১০ সালে ভাইস্‌রয় হয়ে আসেন দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। তাঁর আমলে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ভ্রমণরত রাজা পঞ্চম জর্জ দিলীর দরবারে ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেন। এতে হিন্দু সম্প্রদায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সরকারের প্রতি মুসলমানদের অসন্তোষ দেখা দেয়। এ সময়ে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর ও অন্যান্য প্রদেশে উচ্চশিক্ষার দ্রুত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ তার পূর্ব-কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে।[১৪১]

মুসলমানদের সময়কালীন রাজনীতি-সচেতনতার কথা আলোচনা করতে গেলে একটু পেছনে যাওয়া দরকার। স্যার সৈয়দ আহমদ, তাঁর মতে, হিন্দু-রাজনীতিবিদদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক মনোভাব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পর যুক্ত প্রদেশের লে. গভর্ণর স্যার এন্থনী ম্যাকডোনেল কতিপয় অফিস- সংক্রান্ত কাজে হিন্দু ভাষাকে দেবনাগরী লিপিতে লেখার আদেশ জারি করেন। এতে মুসলমানরা আহত হন এবং তাঁদের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেন। এ সময়ে আলীগড় মুসলমানদের রাজনীতি সচেতনতার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং নবাব মোহসিন-উলমুলকের উপর স্যার সৈয়দের দায়িত্ব বর্তায়। তাঁর প্রচেষ্টায় *'উর্দু-রক্ষা সমিতি'* গঠিত হয়। ১৯০০ সালের লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করেন। দু'বছর

পর ১৯০২ সালে লে. গভর্ণর জেমস ল্যাটাচ-এর আমলে উর্দু আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। এ বিজয় সম্ভবপর হয় নবাব মোহসিন-উল-মূলকের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার ফলেই। এর মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক শক্তিরূপ একটি ঘটনা বহুল মসুলিম সংগঠনের জন্মলাভের পথ সুগম হয়ে ওঠে।[১৪২]

১৯০৬ সালের দিকে এরূপ সংগঠনের জন্মলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সেক্রেটারী জন মর্লি পার্লামেন্টে বাজেট বক্তৃতায় ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা উল্লেখ করেন। মোহসিন-উল-মূলক সময় নষ্ট না করে ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে ১ অক্টোবর একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইস্‌রয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে মুসলমানদের স্বার্থ সংক্রান্ত কতিপয় দাবি তাঁর নিকট পেশ করেন। স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি ছিলো এদের অন্যতম। ভাইস্‌রয় প্রতিনিধি দলের দাবিসমূহ যথার্থ বলে স্বীকার করেন এবং এক্ষেত্রে সহানুভূতি ও সুবিবেচনার আশ্রয় নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

ঢাকার নবাব স্যার সলিমূলাহ অসুস্থতার কারণে সিমলা-ডেপুটেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। তবে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এ ঘটনার ফলে একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর প্রথমদিকে তিনি একটি নিখিল ভারত মুসলিম সংগঠনের পরিকল্পনা প্রচার করেন। ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের সভায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সলিমুল্লাহ কর্তৃক আনীত প্রস্তাব পাশ করলে *'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'* জন্মলাভ করেন। এর লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তিনটি। এগুলো হচ্ছে; ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি বৃদ্ধি করা, মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখা। ১৯০৮ সালে সৈয়দ আমির আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের লন্ডন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪৩]

১৯০৯ সালে ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন পাশ হয়। এতে মুসলমানরা পৃথক শাসনতান্ত্রিক সত্তা অর্জন করেন এবং তাদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন-পদ্ধতি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়। এই আইনের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন না হলেও আইন সভায় সমালোচনা অধিকার কিছুটা বৃদ্ধি পায়।[১৪৪] মুসলিম লীগ ও নরমপন্থী কংগ্রেসীদের সমর্থন থাকলেও চরমপন্থী কংগ্রেসীরা এই আইনকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। মর্লি মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে মিন্টো মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন বলে হিন্দুদের ধারণা হয়। প্রকৃতপৃক্ষে এসংস্কার মুসলমানদের খুব বেশি উপকারে আসেনি বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। বিভিন্ন পরিষদে তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যার হার জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম ছিলো।[১৪৫]

আমরা আগেই দেখেছি, এরপর ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। এতে হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর সকল মুসলমান ভাই ভাই এবং তুরস্কের খলিফা ভারতীয় মুসলমানদেরও ধর্মীয় নেতা, এরূপ একটি প্যান-ইসলামী ধারণায় এদেশের বহু মুসলমান উদ্বুদ্ধ ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আলীর *কমরেড* (১৯১১) ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের *আল-হিলাল* (১৯১২) পত্রিকার মাধ্যমে ভারতে এই প্যান-ইসলামী চেতনা প্রসার লাভ করে।

১৯১২ সালে মিত্র বল্কান শক্তি ব্রিটিশের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে তুরস্ক আক্রমণ করলে ভারতীয় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বল্কান যুদ্ধে মুসলিম সমাজ তুরস্কের স্বার্থ সমর্থন করেন এবং ইতালী কর্তৃক ত্রিপলী আক্রমণের প্রতিও তারা নিন্দা জ্ঞাপন করেন। এসব ষড়যন্ত্রের কারণে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমান সমাজে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এ সঙ্গে মুসলিম রাজনীতির পুনরুদ্ধয় ঘটে এবং ১৯১৩ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করে।[১৪৬] এ বছরেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লীগে যোগদান করেন। তাঁর উদযোগেই উপযুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগা খান ও জিন্নাহর মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য ঘটে। ফলে, আগা খান লীগের সভাপতি পদে ইস্তফা দেন এবং উদারপন্থীরা জিন্নাহর নেতৃত্ব ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।[১৪৭]

১৯১৩ সালে আবুল কাশেম ফজলুর হক বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরেই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন, নবাব সলিমুল্লাহ তখন সভাপতি ছিলেন। ফজলুল

হক এ সময় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সহ-সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৪ সালে সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর ফজলুল হককে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসেও যোগদান করেন এবং নেতৃত্বে আসীন হন। একই সঙ্গে উভয় দলে তিনি কাজ করেন। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি কৃষক-প্রজাদের সঙ্গবদ্ধ করার প্রয়াস পান।[১৪৮]

১৯১০-১৯১৪ সাল পর্যন্ত সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৫ সালেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধী ভারত প্রত্যাবর্তন করেন গোখলের নেতৃত্বে আস্থা নিয়ে। একই বছরে গোখলে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯১৪ সালের আগষ্টে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, ভারত সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে এই আনুগত্যের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।[১৪৯] এ বছরের নভেম্বরে ব্রিটেন তুরস্ক আক্রমণ করে। সরকার মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীকে অন্তরীণ করে রাখে। কিন্তু, তাতে মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে একটি সমঝোতার দিকে নিজেদের কর্মধারাকে এগিয়ে নেন।[১৫০]

১৯১৫ সালে বোম্বাই-এ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সঙ্গে বার্ষিক অধিবেশন করে। পরের বছরেও লক্ষ্মৌতে উভয় দলের বার্ষিক অধিবেশন একই রূপে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশন বিখ্যাত লক্ষ্মৌ চুক্তি পাশ করা হয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় রূপ ধারণ করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার এই ঐক্যের স্থপতি ও প্রধান দুত ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।[১৫১] জিন্নাহ লক্ষ্মৌ চুক্তির ফলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন-পদ্ধতি, যা মর্লি মিন্টো সংস্কারে নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয় এবং হিন্দুরা প্রতিরোধ করে, তা এখন লীগ ও কংগ্রেসের সম্মত ও যৌথ দাবিতে পরিনত হয়। এ পরিকল্পনায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। লক্ষ্মৌ চুক্তি হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক মৈত্রীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং উভয় সম্প্রদায়কে বিট্রিশ সরকারের নিকট সম্মিলিত দাবি পেশ করতে সমর্থ করে তোলে।[১৫২]

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে যায়। তুরস্কের প্রতি আচরণে ইংল্যান্ড ভারতীয় মুসলমানদেরকে প্রদত্ত যুদ্ধ-পূর্ব প্রতিশ্রুতি বঙ্গ করে। মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১৯১৮ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর পরে গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসেন। এ বছরেই মন্টেন্ড-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা প্রকাশিত হলে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে তা প্রত্যাখান করেন। কুখ্যাত রাউলাট রিপোর্ট ও উভয় সম্প্রদায়কে আহত করে। এ সকল কারণে ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজ-সরকারের প্রতি বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ক্রমে তা তীব্রতর আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমানের একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী (এ দুই ভাই) হাকিম আজমল খান, মৌলবী আবদুল বারী, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলেনই গান্ধী অসহযোগের প্রস্তাব প্রথম উচ্চারণ করেন।[১৫৩] কয়েক সপ্তাহ পরে মীরাটে অনুষ্ঠিত খেলাফত কনফারেন্সে তিনি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে অহিংস অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর এ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১৫৪]

এ বছরের সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। স্বীকার করা হয় যে, স্বরাজ ও খেলাফতের সমাধান লাভ করতে হলে অসহযোগই একমাত্র উপায়। খেলাফত ও অসহযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে আগস্ট মাসে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গান্ধী দেশের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ান। তাঁর এ ভ্রমণ ফলপ্রসু হয়। লোকমান্য তিলকসহ বিভিন্ন কংগ্রেস নেতা যেমন খেলাফত সমর্থন করেন, তেমনি আলী ভ্রাতৃদ্বয়সহ অনেক মুসলিম নেতা অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করে নেন।

ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অহিংস-অসহযোগ পরিকল্পনা ও খেলাফত কমিটি অনুমোদিত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অসহযোগ পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেন; তিনি গান্ধীর এই পদক্ষেপে কোন প্রজ্ঞা লক্ষ্য করেননি। বিরোধিতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়াতে তিনি চিরতরে কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন।

এ সময়ে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। *সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন* স্থলে *স্বরাজ* বসে। এ সকল পরিবর্তনের ফলে কংগ্রেস একটি গণ-সংগঠনের রূপ লাভ করে। স্কুল, আইন সভা, এমনকি, নির্বাচনও বয়কট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একই সঙ্গে চলতে থাকে; হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে। ১৯২০ এর ২২ জুন গান্ধী ভাইস্‌রয়কে লেখেন যে, তাঁর ব্যর্থতার জন্যে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। দু'দিন পর ৯০ জন বিখ্যাত সুন্নী মুসলমান একটি স্বাক্ষরযুক্ত যৌথ স্মারকলিপির মাধ্যমে সরকারকে জানিয়ে দেন যে, যারা খেলাফতকে পঙ্গু করে দিয়েছে, তাদের সাহায্য প্রত্যাখান করা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার নেই। এ সময়ে পাঁচশত জন মুসলিম আলেমের স্বাক্ষরযুক্ত একটি ফতওয়া প্রকাশিত হয়, এ মর্মে যে তাঁদের অনুগামীরা সরকারকে যেন কোন সহযোগিতা না দেন এবং *চূড়ান্ত* আত্মত্যাগের জন্যে যেন প্রস্তুত থাকেন।[১৫৫]

এদিকে ১৯২০ সালেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এ বছর ডিসেম্বরে তিনি কংগ্রেস থেকে বিদায় নেন। তিনি গান্ধীর চরকানীতি ও অসহযোগ সমর্থন করেননি এবং গান্ধীকে যোগ্য নেতা বলেও মেনে নিতে পারেননি।

গান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে আঁতাত হয় মূলত দু'টি বিষয়ে। এ দুটো হচ্ছে; পাঞ্জাবে বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও খেলাফতের দাবি। উভয়ের সংগঠন পরস্পরের কর্মসূচি সমর্থন ও তাতে অংশগ্রহণ করবে বলে তাঁরা স্থির করেন। মোহাম্মদ আলী বলেন, খেলাফত আন্দোলন প্রথমত ধর্মীয়, পরে রাজনৈতিক। গান্ধীও একথা মানতেন। মুসলমানরা স্বাধীন ভারত লাভের চেয়ে মুসলিম বিশ্বের উন্নতি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। ১৯২১ সালের জুন মাসে ইউনিফর্ম পরিহিত খেলাফত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। পরে এ বাহিনী কংগ্রেসের সমাজ সেবা সংগঠনে একীভূত হয়ে জাতীয় সেচ্ছাসেবক বাহিনীতে রূপান্তারিত হয়। এদের সক্রিয় আন্দোলন অসহযোগ চরমে পৌছে। কংগেসের স্বরাজ ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলাফত আন্দোলন এতবেশি সাড়া জাগায় ও জনগণকে এতবেশি অনুপ্রাণিত করে যে, সরকার এ ব্যাপারে রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।[১৫৬]

গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অধিকাংশ লোকের সমর্থন লাভ করে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থরক্ষায় তিনি একচ্ছত্র নেতা বিবেচিত হন। কংগ্রেস এমন একটি দলের মর্যাদা পায়, যার নেতৃত্ব উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। তবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ ব্যক্তি কর্তৃক গান্ধীর আন্দোলন নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক অসহযোগ আন্দোলন বলে সমালোচিত হয়। চরকাকে গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠি বলে ঘোষণা করেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট তাঁর এই মতাদর্শটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।[১৫৭]

১৯২১ সালের শেষের দিকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গান্ধীর নীতির বিরোধী সহিংসতা অবলম্বন করে। সেপ্টেম্বরে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও আবুল কালাম আজাদ পুনরায় গ্রেফতার হন। এ বছরের ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী জানুয়ারির মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়।[১৫৮] ১৯২১ এর ডিসেম্বর আহমেদাবাদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যখন মিলিত হয়, তখন উভয় দলের ঐক্য ধরে রাখার সংকট গান্ধীর নিকট গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। মওলানা হাসমত মোহানী লীগের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। একই সঙ্গে উভয় দলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার রীতির অবসান ঘটে এ সময়েই।[১৫৯]

১৯২২ এর গোড়ার দিকে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়।[১৬০] ফেব্রুয়ারিতে যুক্তপ্রদেশে সহিংস স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে একুশ জন পুলিশ ও চৌকিদার নিহত হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে গান্ধী কংগ্রেস কার্যকরি কমিটির জরুরি সভা আহবান করেন এবং গণআইন অমান্য আন্দোলন অনতিবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর থেকে গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর তার অনুসারীদের আস্থা ক্রমে হ্রাস- পেতে শুরু করে। ১০ মার্চ তারিখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। রাজনৈতিক পেক্ষাপট থেকে গান্ধীর এই অপসারণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কচ্ছেদের প্রথম ধাপের জন্ম দেয়। তাঁর

নেতৃত্বে প্রায় তিন বছর কাল হিন্দু-মুসলমান একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ থাকে; কিন্তু বিশেষ কোন সাফল্য আসেনি। ১৯২২ এর প্রথম থেকেই মুসলমানদের অনেকেই অনুভব করতে থাকেন যে, অহিংস অসহযোগ কোন কার্যকর কর্মসূচি হতে পারে না।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে অরাজকতা প্রশ্রয় পায়। গান্ধীর অনেক সহযোগী ও অন্যান্য রাজনীতিবিদ গ্রেফতার হন। গান্ধী আকস্মিকভাবে অসহযোগ প্রত্যাহার করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে খেলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। খেলাফত নেতৃবৃন্দ ভারতকে দার-উল-হারব বিবেচনা করেন এবং মূলতঃ আলী ভ্রাতৃদ্বয়, আবুল কালাম আজাদ ও জাফর আলী খানের অনুপ্রেরণায় মুসলমানেরা আফগানিস্তানে হিযরতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জায়গা-জমি, ভিটা-সম্পত্তি বিক্রি করে প্রায় বিশ লাখের মতো মুসলমান খাইবার পাস দিয়ে আফগানিস্তানে পাড়ি জমান।[১৬১] দরিদ্র আফগানিস্থান এত লোকের সংস্থান করতে অপারগ হয় তাঁদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। দেশে ফিরে সবাই কর্পদকশূন্য হয়ে পড়েন। অনেক নারী শিশু, বৃদ্ধ পথে মারা যান।[১৬২]

১৯২৩ সালের গয়া অধিবেশন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খান স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। সেপ্টেম্বরের বিশেষ অধিবেশনে দু'দলের মিলন ঘটে এবং আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি করা হয়। ১৯২৩-এর পরে কংগ্রেসের কর্মতৎপরতা স্বরাজ পার্টির উপর বর্তায়[১৬৩] ১৯২৮ পর্যন্ত এর তৎপরতা অব্যাহত থাকে। ১৯২৩-এ জাতীয় আন্দোলন কর্মীদের দুর্ভাগ্য বৃদ্ধি পায়। এ সময় থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। অধিকাংশ হিন্দুর নিকট জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-সম্প্রদায়িকতা অভিন্ন রূপ ধারণ করে। ভারতের মুক্তি ও হিন্দু ধর্মের গৌরব তাদের নিকট একই আদর্শের দুটি দিক রূপে বিবেচিত হয়।[১৬৪] হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্বল্প সময়ে জন্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়েছিলো। লক্ষ্মৌ চুক্তি এবং খেলাফত ও অসহযোগের কালে এ সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এটা ছিলো অতি সংক্ষিপ্তকাল স্থায়ী।

খেলাফত আন্দোলনের সময়ে যে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী হয়, পরবর্তীকালে তা ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং সম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। শুদ্ধি ও সংগঠন নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই নতুন চেহারা দেখে মুসলমান নেতারা শংকিত হয়ে পড়েন। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রিটিশের নিকট যৌথভাবে দাবি পেশ করার জন্যে তাঁরা বার বার চেষ্টা চালান। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরসনের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রবল জোর প্রদান করে। ১৯২৭ সালে জিন্নাহ দিলীতে মুসলিম ঐক্য সম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনে তিনি প্রস্তাব পাশ করেন যে, হিন্দুদের সঙ্গে একটি আপোষের লক্ষ্যে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে স্বাতন্ত্র্য নির্বাচনের দাবি তাদের পরিত্যাগ করা উচিত।[১৬৫] সিন্ধুর স্বাতন্ত্র্যদান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাবে হিন্দুরা রাজী হলে, মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করবেন বলে জিন্নাহ ঘোষণা করলেন। একে দিলী প্রস্তাব নামে অভিহিত করা হয়। ইতোমধ্যে, জিন্নাহ ও স্যার মোহাম্মদ শফি এই দু'জনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়ে। শফির নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের একাংশ দিলী-প্রস্তাবে সায় দেননি; তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি পরিত্যাগ করতে সম্মত ছিলেন না। ফলে, ১৯২৭ সালে জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ মিলন পন্থী নেতারা যে সময়ে কলিকাতায় লীগের অধিবেশন করেন, তখন মোহাম্মদ শফি পৃথকভাবে লীগের অধিবেশন করেন লাহোরে।[১৬৬]

১৯২৮-এর আগস্টে লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু কমিটি প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। সম্মেলন কতিপয় সংশোধনী আনে এবং কমিটিকে আরো লোক নিয়োগের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয়। এই কমিটি জিন্নাহকে সদস্য নির্বাচিত করেন। মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ এ সময় ইউরোপে ছিলেন। তিনি কমিটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে তিনি মুসলমানদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনভেনশনে তাদের দাবি উপস্থাপিত করেন। কিন্তু তাঁদের সকল দাবিই হিন্দু নেতারা

প্রত্যাখান করেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে যান। মওলানা আবুল কালাম আজাদ নেহেরু রিপোর্টের সমর্থনে লীগ ত্যাগ করে মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন।

১৯২৯ এর জানুয়ারিতে আগাখান নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন আহবান করেন। তিনি নেহেরু রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মুসলমানদের স্বার্থ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বিরোধ-মীমাংসার লক্ষ্যে জিন্নাহ নেহেরু রিপোর্টের পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে তাঁর বিখ্যাত দৌদ্দ দফা দাবি তৈরি করেন। মার্চে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে চৌদ্দ দফা নিয়ে আলোচনা হয়।

নেহেরু রিপোর্ট দ্বারা লক্ষ্মৌ চুক্তি ও দিলী প্রস্তাব অস্বীকৃত হয়। এর হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু বুদ্ধিজীবির চার্টার রূপে দেখা দেয়। গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল নেহেরু সকলেই এই রিপোর্টের প্রতি সমর্থন জানান। মুসলমানদের অধিকাংশ দাবিই এতে অগ্রাহ্য হয় ফলে, ১৯২৮ এর হিন্দু- মুসলিম সম্পর্ক নতুন মোড় নেয়।[১৬৭] ১৯২৯ এর ডিসেম্বর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় ও প্রস্তাব পাশ করে। সরকারকে এক বছরের সময় দেওয়া হয়, সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধী ১৯৩০-এর মার্চে বেসামরিক প্রতিরোধ আরম্ভ করেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। নেহেরু রিপোর্ট মেনে নেওয়ার জন্য কংগ্রেস সরকারকে চাপ দিতে থাকে। সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে। একের পর এক নেতা-কর্মীরা গ্রেফতার হন।[১৬৮]

১৯৩০ সালের শেষ সপ্তাহে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ড. মোহাম্মদ ইকবাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বাতন্ত্র্য মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন। তাঁর মতে মুসলমানরা একটি সমধর্মী জাতি, হিন্দুরা অগ্রসর হলেও কিন্তু তারা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি নানাধর্মী জাতি। ভারতের বিভিন্ন জাতি, ভাষা, কৃষ্টি ও সামাজিক প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার কারণে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ভারতে স্থিতিশীল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো আসতে পারে না বলে ইকবাল মনে করতেন। ভারতের ভেতরে মুসলিম-ভারত প্রতিষ্ঠার দাবি তাই যুক্তিসঙ্গত বলে তাঁর ধারনা। তিনি দেখতে চেয়েছেন, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্দু ও বেলুচিস্থান মিলে একটি রাষ্ট্র হোক। ভারতের ভেতর থাকুক কিংবা বাইরে, উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রগঠনই মুসলমানদের অন্ততঃ পক্ষে উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের চূড়ান্ত লক্ষ্য উচিত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[১৬৯]

এরপর কেমব্রিজের একদল মুসলিম ছাত্র চৌধুরী রহমত আলীর নেতৃত্বে *পাকিস্তান*-রূপ একটি জনপ্রিয় নামের উদ্ভাবন করেন। এই নামকরণটি বাদ দিলে পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁদের আর বিশেষ কোন অবদান নেই।[১৭০] বলাবাহুল্য, ইকবাল কিংবা কেমব্রিজের ছাত্রদল কেউই বাংলাদেশের কথা ভাবেননি।[১৭১] ১৯৩১-এর ১৯ জানুয়ারি প্রথম গোল টেবিল বৈঠক মূলতবী হওয়ার পর ভারতে বহু পরিবর্তন ঘটে। প্রায় এক বছর ধরে আইন অমান্য আন্দোলন চলার পর ভাইসরয় আরউইন গান্ধীকে মুক্তি দেন। গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। আরউইন ও গান্ধীর মধ্যে বহু আলাপের পর গান্ধী আরউইন চুক্তি বা দিলী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এতে গান্ধীর মর্যাদা বেড়ে যায় এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বশীলতা স্বীকৃতি পায়। কিছুদিন স্তিমিত থাকার পর হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আবার দাঙ্গা বাধে। কাশী, আগ্রা, কানপুরে সংঘটিত এরূপ দাঙ্গায় মুসলমানদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের প্রশ্নে গান্ধী প্রথম রাজি ছিলেন না। পরে নতুন ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন তাকে রাজি করাতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক থেকে গান্ধী খালি হাতে ফিরে আসেন। ফেরার পর তিনি গ্রেফতার হন। ভাইসরয় কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও নতুনভাবে নির্যাতন শুরু করেন। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসে ১৯৩২ সালে। এতে জিন্নাহকে ডাকা হয়নি। বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে এ বৈঠকের কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। কিছুকাল পরে জিন্নাহ বলেন, হিন্দুদের মানসিকতায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কোনদিনই সম্ভবপর নয়।[১৭২]

কংগ্রেস কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার পর জিন্নাহ ইংলন্ডে চলে যান। ১৯৩২-৩৩ সালে মুসলিম লীগের বিভিন্ন শাখাকে বিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে বহু চেষ্টা চলে। এ সময় *ভারতীয় মুসলমানদের সংসদ* হিসেবে লীগকে পুনর্বাসিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য জিন্নাহকে টেলিগ্রাম করা হয়। এদিকে

মুসলিম লীগের দুই অংশ কলকাতা ও দিলীতে পৃথক পৃথক অধিবেশন করে। *সাম্প্রদায়িক রোঁয়েদাদ* এ সময়েই প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে জিন্নাহ দেশে ফিরে আসেন। আগাখান ও পরে জিন্নাহ মুসলমানদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, তাঁদের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় লীগে বিভেদ পরিহার। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতি হিন্দুদের বিক্ষোভ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, মুসলমানদের সমর্থনও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৭৩]

১৯৩৫ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগ পুর্ণগঠনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেও আলোচনার মাধ্যমে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগ ভারত শাসন আইন সম্পর্কে নিজেদের নীতি নির্ধারণে মনোযোগ দেয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে জিন্নাহ ও ইকবালের মধ্যে একাধিক পত্র যোগাযোগ হয়। ইকবাল জোর দিয়ে বলেন যে, একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টিই মুসলমানদের জন্য এবং ভারতের শান্তির জন্য একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান। ইকবালের এই মত জিন্নাহ সমর্থন করেন।[১৭৪]

১৯৩৬ সালে একে ফজলুল হক বাংলাদেশে কৃষক প্রজা সমিতি পুনঃগঠিত করেন এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কর্মসূচি প্রচার করেন। জিন্নাহ ও ফজলুল হকের মধ্যে বিরোধ বাধে, উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবেশিত হয়।[১৭৫] মুসলিম লীগ আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। জিন্নাহকে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ড গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিস্ময়কর যে, ১৯৩৬ সালে লীগ ঐক্যবদ্ধ ছিলোনা, বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নেতার অধীনে লীগের বিভিন্ন খণ্ডাংশ সক্রিয় থাকে। এত বাধা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ বাংলায় নির্বাচনে প্রচুর সাফল্য অর্জন করে। তবে, অন্যান্য প্রদেশে লীগের নির্বাচনী-ফল শোচনীয় ছিল। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইন সভার এই নির্বাচনে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে জয়লাভ করে। এগুলো হচ্ছে; যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। এদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই ও উড়িষ্যার কোন কংগ্রেসী মুসলিম জয়লাভ করতে পারেননি। যুক্তপ্রদেশে কেবল একজন কংগ্রেসী মুসলিম বিজয়ী হন।[১৭৬]

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গভর্ণররা প্রদেশসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদেরকে মন্ত্রীসভা গঠন করে সহযোগিতা দানের অনুরোধ জানান। অ-কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে (পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে) এই আমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা গভর্নরদের শাসনতন্ত্রনাধীন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ না করার নিশ্চয়তা না দিলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন না বলে হুমকি দেন। গর্ভনররা এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃত জানান এবং আগ্রহী দলের লোক নিয়ে অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফলে, এইসব প্রদেশে আইন সভা ডাকা সম্ভবপর হয়নি। বোম্বাই, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মুসলমানদের নিয়ে অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা হয়। এসব মন্ত্রিসভায় মুসলীম লীগ সদস্য ছিলেন বটে, কিন্তু তা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ছিলো না। কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সমালোচনা করে এবং গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতার আপত্তি জানায়। ভারত সেক্রেটারী ও গভর্নর জেনারেল ব্যাখ্যা ও আশ্বাস দেওয়াতে কংগ্রেসে ১৯৩৭ সালে জুলাই মাসে অফিস গ্রহণ করে এবং ১৯৩৯ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো, কোন মিত্রের প্রয়োজন ছিলো না। এতে দুই বছর কংগ্রেস ও লীগ পরস্পরকে সতর্কতা ও বুদ্ধির সঙ্গে সমর্থন করেন, কিন্তু প্রাদেশিক পরিষদে কোয়ালিশন ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হয় না।[১৭৭] গান্ধী মনে করতেন, ভারতে একটি মাত্র দল আছে এবং তা হলো কংগ্রেস। জওহর লাল নেহেরু মনে করতেন, ভারতে দু'টি মাত্র দল আছে- তা হলো কংগ্রেস ও সরকার। ১৯৩৭-৩৯ সালে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কিছু অভিযোগ ছিলো। অভিযোগের কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক. সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগে ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি;

খ. উর্দুর স্থলে হিন্দী ভাষাকে উৎসাহিতকরণ;

গ. গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ;

ঘ. জাতীয় সঙ্গীতরূপে '*বন্দে মাতরম*' কে গ্রহণ;

ঙ. নির্বাচনের সময়ে সাধারণ ঐক্যজোট করা হয়েছিলো যে যুক্ত প্রদেশে, সেখানে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে কংগ্রেসের অসম্মতি।

মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, শফি ও ইকবালের মৃত্যুর পরে জিন্নাহ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন। পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রিগণ যথাক্রমে সেকান্দার হায়াত খান, এ কে ফজলুল হক ও সাদুলাহ জিন্নাহর সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নেন। ১৯৩৭-এর পর সমগ্র ভারতে মুসলিম লীগের মধ্যে একটি দোলা জাগে। মুসলিম লীগ এখন থেকে গণ সংগঠনের রূপ ধারণ করে। এ বছরের অক্টোবরের দিকে লীগ পূর্ণ-স্বাধীনতার নীতি গ্রহণ করে।[১৭৮] এর পেছনে ইকবালের চিন্তাধারাও জিন্নাহকে অনুপ্রাণিত করছে, এ কথা বলা যায়। ইকবাল ধর্মকে রাস্ট্রের অন্যতম ভিত্তি মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জীবন ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, ইসলামের আদর্শ তার সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন.....। Muslim India Constituted a Nation by itself'[১৭৯] জিন্নাহ ইকবালের এই মত স্বীকার করতেন।

স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র লীগের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ইকবালের ধারণার সঙ্গে জিন্নাহও একমত ছিলেন। কংগ্রেস কিন্তু এক দেশ, এক দল ও এক নেতার মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলো। জওহর লাল নেহেরু হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনি অর্থনৈতিক সমস্যাই একমাত্র সমস্যা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। জিন্নাহ ও নেহেরু দক্ষতার সঙ্গে নিজ নিজ মত প্রচার করতে থাকেন।[১৮০] বন্দে-মাতরম নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সংসদ অধিবেশনের শুরুতে-বন্দে-মাতরম আবৃত্তির কারণে মুসলমানরা *ওয়াক আউট* করেন। হিন্দুরা হিন্দীকে উর্দুর স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হন। চাকরিতে উচ্চপদে মুসলমানরা সম্মান, আস্থা ও প্রভাব হারাতে বসেন। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের কারণে সাধারণ মুসলমান হিন্দু কর্তৃক অপমানিত, নিগৃহীত ও নির্যাতিত হতো। এ সকল কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

১৯৩৯ সাল-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। কংগ্রেস ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন করে না। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ধ্বংশ বয়ে আনবে বলে কংগ্রেস মত প্রকাশ করে এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, এসব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে নিজের শান্তি ও স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াা ভারতের উচিত। গান্ধীর মতে, কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ভারতের জন্যে ঠিক হবে না। আবুল কালাম আজাদ বলেন, ভারত স্বাধীন হলে, গণতান্ত্রিক পক্ষের সঙ্গে থাকাই সমীচীন।[১৮১] ১৯৩৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দু'দিন পর ভারতে ভাইসরয় ও যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি তাড়াতাড়ি ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখেন। জনসমর্থন লাভের প্রত্যাশায় নির্বাহী পরিষদে বিভিন্ন দলের লোকজন নিতে আগ্রহী হয়ে তিনি গান্ধী ও জিন্নাহকে আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা উভয়ে এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেস বলে, তাদের সম্মতি ছাড়া ভাইসরয় নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তাই, এ ব্যাপারে তাদের কিছুই করার নেই। কারো পরামর্শ ব্যতিরেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভাইসরয় ভারতের ক্ষতি সাধন করেছেন বলে কংগ্রেস ধারণা করে। এ কারণে সকল কংগ্রেস মন্ত্রিসভা একযোগে পদত্যাগ করে। এরপর থেকে কেবল পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলায় জনগণের সরকার কাজ করতে থাকে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগের ফলে কংগ্রেস শাসন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ মুক্তি দবিস পালন করে।[১৮২] সেপ্টেম্বর ৮ থেকে ১৫ তারিখে ওয়ার্ধাতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, ভারতের ব্যাপারে ভারতীয়রাই সিদ্ধান্ত নেবে, কোন বাইরের শক্তি নয়। ব্রিটেন প্রথম মহাযুদ্ধের কালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও পরে আর রক্ষা করেনি। এ কারণে ভারতীয় মুসলমানদের নিকট ইংরেজ সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা অটুট থাকেনি।

১৯৪০ সালে ২৩ মার্চে লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে *লাহোর প্রস্তাব* গৃহীত হয়। উত্তর পশ্চিম ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতের মতো যেসব অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাধিক্য, সে সব অঞ্চলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা উক্ত লাহোর প্রস্তাবের মূল দাবি ছিলো। এ. কে. ফজলুল হক এই প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন। তবে ২৪শে মার্চ থেকে তিনি লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন।[১৮৩] মুসলিম লীগের এ দ্বিজাতিতত্ত্ব কংগ্রেসের মনঃপুত ছিলোনা। ১৯৪১ সালে মাদ্রাজে মুসলিম লীগের মূলনীতিতে পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিষয়ে হক জিন্নাহ বিরোধ তীব্রতর হয়। ১৯৪১ সালের দিকে জিন্নাহ মুসলিম লীগের শক্তিশালী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখন থেকে তিনি লীগের সভাপতিই শুধু নন, তিনি এখন কায়েদে আজমও।[১৮৪] স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা জিন্নাহ স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একতরফাভাবে ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করেন এবং লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে হাসান ইস্পাহানীকে তাঁর স্থলে মনোনীত করেন। ফজলুল হক হিন্দু-মুসলমানের সহ-অবস্থানের নীতি সমর্থন করতেন। তিনি জিন্নাহর প্রদর্শিত পথকে কল্যাণকর মনে করেননি। তাঁর মতে পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানদের জন্যে একই রকম ফরমূলা প্রযোজ্য হতে পারে না-দুটো স্বতন্ত্র বিষয়। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ভারতবাসীর জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ফজলুল হক স্বীকার করতেন। ইংরেজী সরকার জিন্নাহ ও হককে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, কিন্তু এতে ফজলুল হককে সম্মত করাতে সরকার ব্যর্থ হয়। জিন্নাহ স্বতন্ত্র

মুসলিম রাষ্ট্রের দাবিতে অটল ছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে তাঁর আর কখনো ঐক্য হয়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যখ্যা করতে গিয়ে জিন্নাহ বলেনঃ

> The Hindus and Muslims belong to two religious philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor Interdine.... and, indeed, they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects of life are different..... Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes, and diffferent episodes. Very often the hero of one is the foe of the other, and, likewise their defacts victories overlap.[১৮৫]

জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব কংগ্রেস মানতে পারেনি। কংগ্রেস প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে যে, স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ভারতের জন্যে একটি নিশ্চিত বিপর্যয়-একটি শিশুকে দুটুকরো করার মতোই একটি জঘন্য ব্যাপার। নেহেরু মনে করেন যে, ধর্ম কখনো Nation-এর ভিত্তি হতে পারে না। মুসলিম লীগ বলে যে, ভারত একটি দেশ নয়, বরং উপমহাদেশ এবং ইউরোপীয় ধারণায় Nation ও Nationality এখানে প্রযোজ্য নয়।[১৮৬]

ঙ. স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গঠনে ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

বিশ্ব পরিমন্ডলে সেকিউলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ বস্তুবাদী চিন্তার ও দর্শনের বিকাশের সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত। মানুষের বৈষয়িক জীবন ও জগতের, উৎপাদন ও জীবিকার সমস্যা-জটিলতা এসবের বহুমাত্রিকতা সৃষ্ট পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ও মতাদর্শ বিকশিত হয়। সেকিউলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতা না হয়ে প্রকৃত অর্থে ইহজাগতিকতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রাক রেনেসাঁস যুগে অবশ্য আরব ভূখণ্ডে ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন প্রমুখ মনীষীরা ধর্মগতভাবে মুসলমান হয়েও ধর্মীয় গোঁড়ামির বাইরে থেকে এবং মোলাতন্ত্রের কট্টর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও জ্ঞানের স্বার্থে, জীবন-জগতের বিকাশ ও কল্যাণের স্বার্থে ও প্রয়োজনে বস্তুবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং সেজন্যেই ইহজগতিক চিন্তা ও দর্শন প্রচার করেছেন।

সামাজিক মানুষও তাদের জীবন-জীবিকার বৈষয়িক সংগ্রাম, বেঁচে থাকার সংগ্রাম একটানা চালিয়ে আসছিলো। চার্চের ও ধর্মের গোঁড়ামী-কুসংস্কার ও ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে এবং রাজতন্ত্রের স্বৈর শাসন ও ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাচার ও লোক ঠকানোর বিরুদ্ধে সমাজ ও সাধারণ গণমানবের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল নিরবচ্ছিন্ন ছিল। এক সময় ধর্ম নিয়ে, চার্চ ও ঈশ্বর নিয়ে বহুকাল ধরে বাকবিতণ্ডা, ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড পর্যন্ত হয়েছে। ধর্মের নামে মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। ত্যক্ত-বিরক্ত মানুষ ক্লান্ত হয়ে পর ধর্মের অপব্যবহারের হাত থেকে নিষ্কৃতি খুঁজেছে।

এভাবেই ইউরোপে তথা পাশ্চাত্যের ধর্মের ও চার্চের ও পরাজয় এবং ক্রমে ক্রমে ঐশ্বরিক তত্ত্বের বুলিবাগীশ রাজতন্ত্রের বিনাশ হয় রেনেসাঁন্স-রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রগতি, ভৌগলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনের বিকাশের প্রেক্ষাপটে। ধর্মের স্থলে ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিকতা মানুষকে স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও প্রশ্নকারী অস্তিত্বের রূপান্তরিত করে। মানুষ তাদের জীবন-সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ প্রচেষ্টার নিরন্তর সাধনার ভেতর দিয়ে এ অবস্থায় পৌছায় এবং সেকিউলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় উপমহাদেশ, তৎকালীন পাকিস্তান এবং আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে সিকিউলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেবল ইহজাতিকতা-এই দর্শন চেতনার ব্যাখ্যায় সীমিত না রেখে আরো বেশি করে সময়, সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক, ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্ম-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যখ্যা দেয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা অবশ্যই ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিকতা। তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সমাজ রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার বিবেচনায় এটা ধর্মকে রাষ্ট্রিক-রাজনীতিক জীবন থেকে সরিয়ে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত রাখার ওপরই গুরুত্ব দেয়।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিকিউলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে এমন জীবন চেতনা বা দৃষ্টিভঙ্গি যা ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়করণ, ধর্মের নামে রাজনীতির অবসান এবং রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ পক্ষপাতশূণ্য অবস্থান-এ তিনটি শর্তকে স্বীয় সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ তিনটি শর্ত মানার ভেতর দিয়ে তা মানুষকে উর্দ্ধে তুলে ধরে, পরমত সহিষ্ণুতা ও মানবিকতাকে বঞ্চিত লক্ষ বলে ঘোষণা দেয় এবং রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অবস্থানের মাধ্যমে ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে পরিকল্পিত উপায়ে সমাজ প্রগতি নিশ্চিত করার সুযোগ পায়।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা জনপদের মানবমণ্ডলীর জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা চেতনার একটা ভিত্তিভূমি ছিল। বাংলায় ধর্ম নির্বিশেষে মানবমণ্ডলীর ভেতর বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানের ভেতর একটা সমন্বিত জীবন যাপন পদ্ধতি ও তার উপরি কাঠামো হিসেবে সমন্বিত লোক সংস্কৃতি বিরাজিত ছিল। অবশ্য এ শতাব্দীর চলিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক জোয়ারে তা ক্ষণিকের জন্য নগরাঞ্চলে ও রাজনীতিতে অনেকখানি বাঁধাগ্রস্ত হয়। এতদঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণ মুসলিমলীগের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল এবং পূর্ববাংলা পশ্চিমাঞ্চলের সাথে গিয়ে এক মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করেছিল ধর্মের নামে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্নে। শোষক ও বৈরী বৃটিশ এবং তথাকথিত প্রতিপক্ষ হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচার প্রক্রিয়ায় ভ্রান্ত পথে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও শোষণমুক্তির শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে পড়ার পরই

পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান ভাইদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রনে উপনিবেশ পর্যবসিত হতে দেরী লাগেনি পূর্ববাংলায় তমদ্দুন ইসলামী পাকিস্তান এর জটাজল ছিন্ন করার প্রয়াসেই এতদঞ্চলের মানবমণ্ডলী তাই ধর্মকে রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত না রেখে সেটাকে পুরোপুরি বিযুক্ত করে ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে পরিণত করতে সর্ব তৎপরতা শুরু করে। এভাবে তারা অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে নতুন করে। বাস্তবতার চাপে এবং রূঢ় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদের সমষ্টিক অস্তিত্ব রক্ষার মানসেই তারা হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর যে ধর্মনিরপেক্ষ সমন্বিত জীবন ও লোক সংস্কৃতি এ যাবৎ বাংলার বুকে বিরাজিত ছিল, তাকেই শেকড় রূপে আঁকড়ে ধরে। তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের তথাকথিত মুসলিম, জাতীয়তাবাদ ও তৎসৃষ্ট নিপীড়নের মোকাবেলায় পূর্ব বাংলার জনমণ্ডলী ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয়ে নিজেদেরকে তুলে ধরে। এটা দেখা দেয় তাদের মৌল প্রেরণা, ঐক্যের আকর, শক্তিভিত্তি এবং সর্বোপরি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার দাবির প্রধানতম যৌক্তিকতা হিসেবে।

অর্থনীতি শোষণ, রাজনীতিক অবদমন, সামাজিক বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নই তাদেরকে আত্মানুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছে, স্বাজাত্য ও স্বকীয়তাবোধে উজ্জীবিত করেছে। ধর্মের নামে অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিক্রিয়ায় তারা যেমন সাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ হয়েছে, তেমনি সাংস্কৃতিক নিপীড়নের মুখেও ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী হতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ করেছে। রাজনীতিক অবদমন ও স্বেচ্ছাচার বাঙালিদেরকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নামিয়েছে এবং এটা তাদেরকে আবার বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ করেছে। ধর্মের নামে রাজনীতি, ইসলামী রাষ্ট্রের অজুহাতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সাম্প্রদায়িক কৌশল, পূর্ব বাংলার বিপরীত পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণতকরণ ও উভয় অঞ্চলের ভেতর সংখ্যাসাম্য নীতি চালু করা ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তকরণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিপরীতে সংখ্যালঘুতে পরিণতকরণ এবং ধর্মীয় বাঙালিরা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং স্বাগত জানিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতিক মতাদর্শকে। এছাড়া অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি, ন্যায়বিচার ও বণ্টন সাম্যের দাবি বাঙালিদেরকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করার ভেতর দিয়ে ও ধর্মনিরপেক্ষ করেছে।

পাকিস্তান-পূর্ব বাংলা সম্পর্ক

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে । ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে ভেসে-যাওয়া ভারতবর্ষের রাজনীতিক ডামাডোলের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতির ফলস্বরূপ ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। কিন্তু, এই রাষ্ট্রে বহুল প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক মুক্তি, সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ইসলামভিত্তিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনতা ও পূর্ব বাংলা, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখে হতবাক হয়েছে গোড়া থেকেই। মুষ্টিময়ের স্বার্থে সংখ্যাগুরু পূর্ব বাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানি কাঠামোর পূর্ব বাংলা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। আর তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তৎকালীন পূর্ব বাংলার জনমণ্ডলীর স্বপ্ন ও মোহ ভঙ্গ হতে থাকে অতি দ্রুত এবং তারা যেন *'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'* করে।

ভৌগলিকভাবে দ্বিখণ্ডিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের ভেতর কোনোরূপ সাদৃশ্যবিহীনতার ফলে কেবল ধর্মের জোড়াতালি দিয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার ভেতরই ছিল একটা অবৈজ্ঞানিকতা। তদুপরি, পাকিস্তানের রাজধানী হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলে, সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিল্প-ব্যাংক-বীমা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল সেখানে। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে ছিল পশ্চিমাঞ্চলের চরম একাধিপত্য এবং এগুলোর হেডকোয়ার্টারও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এদিকে মুসলিম লীগের হাই কমান্ডও ছিল অবাঙালি ও তথায় বসবাসকারী। পুঁজিপতি শ্রেণী ও ব্যবসায়ীরাও ছিল মূলত অবাঙালি ও পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী। এসবের ফলে সরকারি নীতি-কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সুফল, অর্থ-বাণিজ্য-শিল্প-কৃষি নীতির সুযোগ, আমদানি-রপ্তানি, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি যাবতীয় কিছু মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে চলে যায় এবং পূর্ব বাংলা নিগৃহীত ও শোষিত হতে থাকে। উন্নয়নে অসমতা দেখা দেয়। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রায় অনুপস্থিতির

পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত রাষ্ট্র ক্ষমতাও পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ অবর্তমানে এটা আরও তীব্রতর সমস্যা রূপে দেখা দেয়। এসবের ওপর মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম কেন্দ্রীকরণ নীতির-এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক নেতা, এক দল ও এক ধর্ম- ফলে পূর্ব বাংলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং এ অঞ্চলে চরম বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে।

অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কাজ করা থেকে বিরত থাকে। নতুন কোনো জীবন ব্যবস্থা, সমাজ সংস্থা ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারনাই ছিল না। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম নীতি কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। আবার, এই সঙ্গে গণতন্ত্রকে বলপূর্বক ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে নিধন করে স্রেফ নিপীড়ন চালিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়াস পায় মুসলিম লীগ হাই কমান্ড ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এ সময়কার অবস্থা, মূল ঘটনাবলী, সে সবের প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য তথা পূর্ব বাংলার অসম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বিকাশের পথ-পরিক্রমায় দৈশিক পটভূমির চুম্বক-চিত্র নিম্নরূপ ঃ

১. ১৯৪৮-৪৯-৫০-৫১ বছরগুলোতে শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের মুনাফার স্বার্থে ও প্রয়োজনে সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষাবস্থা। চালের প্রচণ্ড অনটন ও ১৯৫১ সালে অভূতপূর্ব লবণ সংকট (১৬ টাকা সের)। এ সময় স্লোগান উঠেছিলঃ "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়", "সাচ আজাদী সিনকে লোও"।

২. ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে জমিদারী উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 'জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন, পাশ করা হয় ১৯৫০ সালে।

৩. শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব বাংলা থেকে বহিস্কার করা হয় এবং তাঁর গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল করা হয়।

৪. ১৯৪৮ সালে রমজানের সময় ঢাকায় ধর্মঘটী বাঙালি পুলিশ কর্মচারীদের বিদ্রোহের মুখে আপোষ আলোচনার কথা বলে অবরুদ্ধ করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রামের মাদ্রাসার কাটাখালে বাঙালি বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হয়।

৫. ভাষা চক্রান্ত করা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ওপর ধর্ম, তমদ্দুন ও ঐক্যের নামে উর্দু চাপিয়ে দেয়া হয়। ১৯৪৮-৫২ সালের দু'পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন সংগঠন। পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনের বিকাশ এবং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান।

৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন কর্মচারী ধর্মঘট।

৭. টাঙ্গাইল দক্ষিণ মুসলিম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য মওলানা ভাসানীর সদস্যপদ এ সময় বাতিল করা হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চে পুনরায় অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীর পরাজয় এবং পূর্ব বাংলার বিরোধী রাজনীতির বিজয়সূচক ঢাকার ১৫০ নং মোগলটুলীর কর্মী শিবিরের শামসুল হকের জয়লাভ।

৮. ১৯৫১ সালে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং ১৯৫৩ সালে সিন্ধু প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অথচ ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার ১৭১টি আসনের ভেতর ৩৪টি শূন্য হওয়া সত্ত্বেও কোনো সাধারণ নির্বাচন দেয়া হয়নি।[১৮৭] টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের অভিজ্ঞতাই মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীকে ভীত করে ফেলে।

৯. ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উসকে দেয়া এবং সমগ্র বাঙালি জনতা কর্তৃক তা প্রতিহতকরণ।

১০. পূর্ব বাংলার সর্বত্র কৃষক সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলন। সিলেটে জমিদারী ও নানকার প্রজাবিরোধী আন্দোলন, ময়মনসিংহে জমিদারী টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন, হাজং আন্দোলন, রাজশাহীর নাচোল

কৃষক বিদ্রোহ, সমগ্র পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও জেল সংগ্রাম এবং অনশন ও গুলির মাধ্যমে ব্যাপক আত্মাহুতি দান।

১১. ব্যাপক সরকারি জুলুম ও তা প্রতিরোধ। সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও হামলা। ছাত্র ও রাজনীতিক কর্মীদের ওপর পীড়ন এবং এসবের প্রতিরোধ।

১২. মুসলিম লীগের ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম সাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণ।

১৩. বাংলা ভাষা ও পূর্ব বাংলার স্বার্থের সর্বাত্মক বিরোধিতা করায় শাসনতান্ত্রিক মূল নীতি কমিটির রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন।

১৪. বিরোধী ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠন এবং অচিরেই 'মুসলিম' শব্দ তুলে দিয়ে এর অসাম্প্রদায়ীকরণ।

১৫. অসাম্প্রদায়িক তমদ্দুন মজলিশ, গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুব লীগ, পাকিস্তান যুব লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, গণতন্ত্রী দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীকালে 'মুসলিম' শব্দটি কেটে দেয়া হয়) ইত্যাদি বিরোধী সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান এ সময়ে একের পর এক গড়ে ওঠে এবং পূর্ব বাংলার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১৬. গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত এবং বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ। সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের বিস্তার।

১৭. কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য ও বৈষম্যমূলক নীতি এবং ছোট দু'একটি উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন, ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার জন্যে মাত্র ৪২ কোটি ৬৬ লাখ টাকা খরচ করেছেন। অপর পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৭৯০ কোটি ৪৭ লাখ টাকা অর্থাৎ, পূর্ব বাংলা যা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক কম পেয়েছে। অনুরূপভাবে, উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত ৩৯ কোটি ১২ লাখ টাকার মধ্যে পূর্ব বাংলা কেবল ৩ কোটি ৩৭ লাখ টাকা পেয়েছিল।[১৮৮]

এ সময় কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েট ৭৩৪ জন সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী এবং আন্ডার সেক্রেটারীর মধ্যে পূর্ব বঙ্গবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪২ জন। এই ৪২ জনের কেউই সেক্রেটারী র‍্যাঙ্কের ছিল না। দুজন ছিল জয়েন্ট সেক্রেটারী, ১০জন ডেপুটি সেক্রেটারী এবং ৩০জন আন্ডার সেক্রেটারী।[১৮৯]

এ সময় সকল সামরিক হেড কোয়ার্টার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলায় প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্নরূপ ঃ

	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বাংলা
জেনারেল	১	০
লেফটেন্যান্ট জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	১
বিগ্রেডিয়ার	৩৫	(কৌশলে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল)
কর্নেল	৫০	০
লেঃ কর্নেল	১৯৮	২
মেজর	৫৯০	১০

এদিকে বিমান বাহিনীর ৬০০ বা ৭০০ অফিসারের মধ্যে ৬০ জন ছিল।

পূর্ব বাংলার আর ৬০০ জন নোভেল অফিসারের মধ্যে মাত্র ৭জন পূর্ব বাংলার।[১৯০]

এভাবেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর একটানা শোষণ-শাসন ও দুস্কৃতিই পূর্ব বাংলার জনমণ্ডলীর সহ্যের সীমাকে ভেঙ্গে দেয়। বিক্ষুব্ধ বাঙালি জনতা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট-এর নির্বাচনী সংগ্রাম ও

তাতে বিপুল বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসনের সংগ্রাম ও তাতে বিপুল জিয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরপর দু'বার স্পষ্টতম জবাব দেয়। এতে করে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ওপর প্রথম বলিষ্ঠ আঘাত দেয়া হয়। এর ফলে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের লড়াই দ্রুত সামনে আসে। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপান্তরিত হয় শক্তিধর রাজনীতিক আন্দোলনে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের নববিকাশ এভাবেই পূর্ব বাংলার জীবন-চলায় একান্ত সঙ্গী হয়ে ওঠে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মতবাদ

জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল কথা ছিল যে, ভারতের মুসলমানরা একটা পৃথক জাতি। তাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি সবকিছু ভারতের হিন্দু ও অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাজেই, মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কায়েমের জন্যে তাদের একটা পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন। এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ ইসলামী আদর্শের প্রবক্তা ও মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহন করে।

লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট গণ পরিষদে তাঁর প্রথম ভাষণে জিন্নাহ একটা '*সেকিউলার নোট*' দেন এই বলে যে, পাকিস্তানে 'কালক্রমে ধর্মীয় অর্থে না হয়ে রাজনীতিক অর্থে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমানরা মুসলমান থাকবে না, বরং সবাই হবে রাষ্ট্রের নাগরিক।[১৯১] কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় সকল ভাষণে তিনি পাকিস্তানে 'ইসলামী সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংকের উদ্বোধনকালে তিনি বলেনঃ "আমাদের ভাগ্য আমাদের নিজেদের পথেই গড়ে নিতে হবে"। [১৯২] ইসলামী মানব সাম্য সামাজিক ন্যায়ের ওপর ভিত্তিশীল একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে হবে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে করাচী বার সমিতির সভায় জিন্নাহ আরো স্পষ্ট বলেনঃ "আমি জানি যে এক ধরনের লোক ইচ্ছাকৃতভাবে দূরাচার করে এবং প্রচার করে যে পাকিস্তানের সংবিধান শরীয়তের ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে না। ইসলামী নীতিসমূহ ১৩০০ বছর আগের ন্যায় আজকের জীবনেও একইভাবে প্রযোজ্য"। [১৯৩]

১৯৪৯ সালে গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটিকে সুপারিশ করার জন্যে গঠিত 'তালিমাত-ই-ইসলামিয়া'র মাধ্যমে গোড়া ইসলাম পন্থীদের মতামত প্রকাশিত হয় এবং ইসলামের প্রথম যুগের খলিফাদের প্রবর্তিত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলে।[১৯৪] অপরদিকে মওলানা আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে মৌলবাদী গোষ্ঠী '*ঐশী-গণতান্ত্রিক*' রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। [১৯৫] এসব গোষ্ঠীগুলোর পরস্পরবিরোধী মত সৃষ্ট গোলযোগেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাঞ্জাবে আহমদিয়া সম্প্রদায় বিরোধী আন্দোলনে।[১৯৬]

আবার চার্লস বার্টন মাশাংল তাঁর "*টেষ্টিমোনীতে*" তে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম নিয়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেও সমস্যা ছিল। কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী মনে করতো যে, বাঙালি মুসলমানেরা বর্ণ প্রথার দৌরাত্মের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিম্ন বর্ণের হিন্দুত্ব ছেড়ে ইসলামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। অপরদিকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে মত ছিল যে, তাদের মুসলমানী ঐতিহ্য আরবীয় পূর্বসূরীদের সাথে সম্পর্কিত এবং তারাই এদেশে ইসলামকে এনেছে। চার্লস বার্টন মন্তব্য করেছেন যে, "তাদের সাধারণ বিশ্বাস তাদেরকে ভারত থেকে আলাদা করতে পারে, কিন্তু এটা তাদেরকে পাকিস্তানি হিসেবে একত্র করে না"। [১৯৭]

১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধানে পাকিস্তানকে ১৯৪৯ সালের '*আদর্শ প্রস্তাব*' অনুযায়ী ইসলামিক রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের মুসলমানদের কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে বলে জানালেও বাস্তবে ইসলামের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। কেবল দু'দিক থেকে ১৯৫৬ সালের সংবিধান ইসলামকে আইনানুগ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথমত, ৩২ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে একজন মুসলমান হতে হবে। দ্বিতীয়ত, ১৯৭ ধারানুযায়ী রাষ্ট্রপতি ইসলামী গবেষণার জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ১৯৮ ধারানুযায়ী আশা করা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি বিদ্যমান আইন সমূহের সাথে ইসলামের শিক্ষার

সঙ্গতি বিধানার্থে সুপারিশ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের কমিশন নিয়োগ করবেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ইসলাম যে স্থান পেয়েছে, সেটাকে একজন বিশেষজ্ঞ সংবিধানের মুসলমান প্রণেতাদের মোনাফেকি ও অস্পষ্টতার দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করেছেন।[১৯৮] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও যে তারা নতুন করে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা দেখালেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা কেবল মুখে মুখে বলে চললেন তার পেছনকার উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. ইসলামের নাম করে, ধর্মের একক ধারক হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরে তারা মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড থেকে নিজেদেরকেও লীগ দলকে ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে সমাসীন রাখার প্রয়াস পান। মেকিম মেরিয়েটের কথায়, "মুসলিম লীগের কাছে ইসলাম ধর্ম ছিল রাজনীতিক প্রয়োজনের ভেতর সীমিত"।[১৯৯]

খ. তাদের ভাষায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে এবং যেহেতু তারাই মুসলিম লীগ তথা ইসলামের ধারকবাহক ও প্রবক্তা, সেহেতু গণতন্ত্র ও নির্বাচন ছাড়াও তারা ক্ষমতায় থাকার অধিকারী। তাদের মতে, ক্ষমতায় বিরোধীদের অধিষ্ঠান ছিল ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্যে বিপজ্জনক। এজন্যে মুসলিম লীগ ও গণপরিষদ ক্ষমতা আঁকড়ে ছিল দীর্ঘদিন ধরে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন না দিয়ে এবং পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী পন্থায়। তারা যে সংবিধান তৈরি করতেও নয় বছর লাগিয়েছে তার পেছনেও অন্যতম কারণ এই। অথচ প্রতিবেশী ভারতে সদিচ্ছা থাকার জন্যেই কেবল স্বাধীনতার দু'বছরের মধ্যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে এক বছর সময়ও লাগেনি।

গ. ইসলামের প্রবক্তা সেজে ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধূয়া তুলে তারা পাকিস্তানের অন্যান্য ধর্মীয় দলের বিপরীতে নিজেদের বৈধতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পায়।

ঘ. সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও ইসলামের রাজনীতির ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা প্রথমাবধিই পূর্ব বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দমনের প্রয়াস পায়। এজন্যে তারা উর্দু চাপিয়ে দেয়া বাংলা ভাষার ইসলামীকরণ, তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃতের প্রভাব থেকে বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালিদেরকে 'রক্ষার ঘৃণ্য' প্রয়াস চালায়। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করে দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে উর্দু না জানার কারণে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ইত্যাদিতে অপাংতেয় ও কোণঠাসা করে রাখতে চেয়েছিল।[২০০]

ঙ. পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমণ্ডলীকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করে রাখতে পারলে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়াতে পারলে, দাঙ্গা ও ভারত বিরোধী চেতনা জাগ্রত রাখতে পারলে পূর্ব বাংলা ও বাঙালিরা কখনো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজি ও রাজনীতিক-আমলা সামরিক চক্রের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫১ সালের দিকে বাঙালিরা ছিল সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ এবং বাঙালি জনতার শতকরা ২২ ভাগ ছিল হিন্দু। [২০১] কাজেই দেখা যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে বিভেদের প্রক্রিয়ায় কার্যত সংখ্যালঘু ও অকেজো করে রাখা এবং তাদেরকে ক্ষমতার বাইরে রেখে নিজেদের শোষণ-শাসন চালিয়ে যাওয়ার নিগুঢ় পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে সমগ্র পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকার ও মন্ত্রীবর্গের তৎপরতা, অর্থ-সম্পদ ব্যয়, প্রচার, *'ইসলাম বিপন্ন'* ধুয়া তোলা ইত্যাদি সত্ত্বেও বিরোধী প্রার্থী শামসুল হকের কাছে মুসলিম লীগ নেতা করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীর শোচনীয় পরাজয়ের পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের এতদঞ্চলের সহযোগিরা আর কোন নির্বাচন দিতে চায়নি বা সাহস করেনি দীর্ঘদিন যাবৎ। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসের ভেতর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের ১৭১টি আসনের মধ্যে ৩৪টি শূন্য হওয়া সত্ত্বেও এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং শাসকগোষ্ঠী এতদঞ্চলে নির্বাচন দেয়নি। তাদের আংশকা ছিল যে, এতে করে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় চলে আসবে এবং পাকিস্তান গণপরিষদে ও সরকারে কর্তৃত্ব পাবে এবং তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী সংবিধান তৈরিতে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগাবে।

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও ভারত বিরোধিতা ইত্যাদি বজায় রাখলে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলে অনুভূতির জগতে আবেদন রাখতে পারলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাঙালি জনমন্ডলির দৃষ্টিকে মূল সমস্যা থেকে, পশ্চিম পাকিস্তানি বৃহৎ বুর্জোয়া ও রাজনীতিক-আমলা সামরিক চক্রের শোষণ-শাসন থেকে তাদের কর্তৃক অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা কুক্ষীগতকরণ ও দখল রক্ষার কর্মকাণ্ড থেকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা যাবে। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে বাঙালি জনমণ্ডলীর মুসলমান ও হিন্দু অংশদ্বয়ের ভেতর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস তৈরি করে জনতাকে সেদিকে নিয়োজিত রাখতে পারলে শাসকগোষ্ঠীকে আড়াল করা যাবে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম থেকে।

উপরোক্ত দিকগুলো ও বিবেচনাসমূহই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিতে, ধর্মান্ধতা ছড়িয়ে জনদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন রাখতে, পূর্ব বাংলায় বিভাজনের ও বিদ্বেষের রাজনীতি চালু করে বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির শক্তিকে নস্যাৎ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই সাম্প্রদায়িক চণ্ডনীতি, ইসলামের রাজনীতির ব্যবহার এবং ধর্মীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার বিরুদ্ধেই পূর্ব বাংলা এর জনমণ্ডলী রাজনীতিদলসমূহ ও নেতৃবর্গ গোড়া থেকে সচেতন হতে থাকে। তারা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায়, বাঙালি জনমণ্ডলী ও নেতৃবর্গের ভেতর অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, ইহজাগতিক রাজনীতি চর্চা ও পূর্ণ গণতন্ত্রের বাসনা ইত্যাদি স্থান করে নেয়। বাঙালিরা এভাবে আয়ত্ত, আত্মস্থ, নিজস্ব করে নেয় ইহজাগতিকতাকে, ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ও আদর্শকে।

পাকিস্তানে নতুন করে সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতা কি? এর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কেমন? সাম্প্রদায়িকতার সাথে বৈষয়িক স্বার্থের যোগ কোথায়? গোড়াতে এ সব প্রশ্নের জবাব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও খোঁজা দরকার।বদরুদ্দীন উমর সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি উদঘাটন করতে গিয়ে বলেনঃ "ধর্মের আচার বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্ম নিষ্ঠা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক জিনিস। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ক্ষতি সাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সাধন করার মানসিক প্রস্তুতি সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় অথবা বিরুদ্ধতা থেকে সৃষ্ট নয়। ব্যক্তি বিশেষ এক্ষেত্রে গৌণ, মূখ্য হলো সম্প্রদায়। [২০২] গোপাল কৃষ্ণের মতে, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে রাজনীতিতে ধর্মের একটা অদ্ভুত ধবংশাত্মক ভারতীয় প্রকাশ, যেটা ধর্মীয় পরিচিতিকে প্রাধান্য দেয় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর কনফেডারেশন বা রাষ্ট্র সমবায় হিসেবে রাজনীতিক সমাজ গঠনের প্রয়াস পায়। [২০৩] ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ বলেন, সাম্প্রদায়িকতা বলতে "ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর এমন ক্রিয়াশীলতা অথবা তাদের প্রতিনিধিত্ব দাবিকারী এমন সংগঠনকে বোঝায়, যেটা এক দিক দিয়ে অন্যান্য গোষ্ঠী বা সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থের পরিপন্থী।[২০৪] কেনেথ জোনস সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় সম্বন্ধে চেতনার ভিত্তিতে সমাজের কোন এক অংশের একাত্মবোধ বলে উল্লেখ করেন। [২০৫] এভাবে নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে অপর সম্প্রদায়ের সাথে পার্থক্য চেতনা ও রেষারেষি গড়ে ওঠে। প্রভা দীক্ষিতের মতে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মাদর্শ ও সামাজিক আচরণে বিভেদ ও সংঘাত তৈরি করে এবং রাজনীতিক জীবনে আনয়ন করে ভয়াবহ বিপর্যয়। সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থে স্বার্থান্বেষী রাজনীতির যোগ সর্বাধিক। [২০৬] উইলফ্রেড স্মিথের মতে, সাম্প্রদায়িকতা এমন একটা আদর্শ যা প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী গোষ্ঠীকে পৃথক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একক বলে বিবেচনা করে এবং এ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর বিভেদ ও সংঘাতকে উসকানি দেয়।[২০৭] বিপন চন্দ্র বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পৃথক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থাধীন করতে চায় যার ফলে মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা এতে করে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। [২০৮]

রিচার্ড ডি. ল্যামবার্ট-এর মতে, "কারও নিজ ধর্মের বিষয়ে গর্ববোধটা সাম্প্রদায়িকতা নয়, অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করাই সাম্প্রদায়িকতা"।[২০৯] ল্যামবার্ট আরো বলেন, "গোড়ামী যখন ধর্মান্ধতার পর্যায়ে পৌছায় তখনও সেটা সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়"।[২১০] হ্যান্স ক্রুজ বলেন, 'যখন কোনো গোষ্ঠীর সদস্যরা রাজনীতিকে আইনগত জাতি-সত্তার আনুগত্যের উর্ধ্বে স্থান দেয় সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ ও অন্ধ আনুগত্যকে, তখন সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়'।[২১১]

বস্তুত, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্ম পালনের কোন সুযোগ নেই। সাম্প্রদায়িকতা একটা বিষয়, ধর্মপালন ভিন্ন আরেকটা বিষয়। উভয়ের উদ্দেশ্য ও পরিণতিও এ কারণে অবশ্যই ভিন্ন। ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য প্রধানত সৎ থাকা, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি এবং পারলৌকিক মঙ্গল লাভ। এদিকে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মপালনকে উৎসাহিত করে না, অধর্ম ও দুরাচার ডেকে আনে। এর উদ্দেশ্য বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থ প্রতিষ্ঠাও বজায় রাখে। আর এটা করা হয় ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে, ধর্মের নামে লোক ক্ষেপিয়ে। গুঢ় চক্রান্তকে সফল করার জন্যে এটা বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এক সম্প্রদায়ের লোককে অপর সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে পরস্পরকে দ্বন্দে-সংঘর্ষে লিপ্ত করে। এভাবে স্বার্থান্বেষী, সুবিধাভোগী শাসক শ্রেণী জনতার ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং তাদের শক্তিকে খর্ব করে চরমভাবে। মুল শত্রুকে তথা নিজেদেরকে আড়াল করে তারা জনতার অর্থনীতিক-সামাজিক-রাজনীতিক স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম এবং প্রগতির পথে যাত্রাকে ব্যহত করে। জনতার গণবিপব এভাবে বিভ্রান্ত হয়। [২১২]

ডব্লিউ. এন. রাউনের মতে, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৃষ্ট পারস্পরিক বিশ্রী অনুভূতি থেকে উদ্ভূত।[২১৩] পামারের মতে, সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষে অন্যতম শক্তিশালী উপাদানসমূহের একটি। এটা বিভাজন ও অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিস্তারে প্রভাব রেখেছে।[২১৪]

সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে রক্ষা করেছে। এটা এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশকে বাঁধাগ্রস্ত করেছে এবং শেষ্যবধি ভারতবর্ষকে সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিভক্ত করেছে। আবার, ১৯৪৭ উত্তর পাকিস্তানে পাকিস্তান-পূর্ব বাংলা সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই সাম্প্রদায়িকতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকেই পূর্ব বাংলায় ইহজাগতিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা নবরূপে জাগ্রত হয়।

১৯৪৭ পূর্ব উপমহাদেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভারতীয় সমাজের দুটি বিরাট জনগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে যে অসমান উন্নতি দেখা দিয়েছিল, সেটা থেকেই সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত ঘটে। ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসর অবস্থা এবং মুসলমানদের পশ্চাতৎমুখীনতাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এটা আর্থিক জীবনে বিশেষভাবে দেখা দেয় এবং জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতার আর্থিক শেকড়। কিন্তু মূলত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্তের স্ব স্ব স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, বজায় রাখা ও প্রসার ঘটানোর প্রয়োজনেই বিকশিত হয় সাম্প্রদায়িকতা।[২১৫]

আর ইংরেজরাও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হিন্দু-মুসলমানের উপরোক্ত স্বার্থগত সংঘাতকে স্বাধীনতাকামী জনগণের আন্দোলন দমনার্থে ও নিজেদের উপনিবেশিক শোষণ-শাসন কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার মৌল প্রয়োজনে *ভাগ কর ও শাসন কর* নীতির ভিত্তিতে ভয়ঙ্করভাবে কাজে লাগায়। হিন্দু-মুসলমানের অসম বিকাশজাত এই পার্থক্য ও বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে বহু কসরত করে এক সম্প্রদায়কে অপর অসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। তারা সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতিক বিরোধও সৃষ্টি করে। ১৯০৯ সালের মলিমালা-মিল্টো শাসন সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে সরকারি স্বীকৃতি দেয় ব্রিটিশ রাজ। উমাকান্ত তিওয়ারী বলেন, '১৯০৬ সালে বৃটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯০৯ সালের আইন মুসলমানদের জন্যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ভারতে বিভাজনের রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করে এবং শেষাবধি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করে।[২১৬]

ওদিকে ইংরেজ লিখিত ইতিহাস পড়েই আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুগণ গজনীর সুলতান মাহমুদ হতে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত সকল মুসলিম শাসককে ঢালাওভাবে বিনা যুক্তিতেই ভারতের স্বাধীনতার শত্রট্ট, অত্যাচারী ভাবতে থাকে। দেখা দেয় প্রবলভাবে। মুসলমানদের বিদেশী ভেবে হিন্দুরা ঐতিহ্য খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়, হিন্দু জাতীয়তাবাদ রামমোহন রায়, রাজনারায়ন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ কেউই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির যৌথ সংস্কৃতিকে তেমন শক্তিশালীভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হননি এবং তারা স্ব স্ব ধর্মীয় ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে ধরেন। অপরদিকে, মুসলমানরাও আরব-পারস্যে তাদের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে, মুসলিম জাতীয়তাবাদ দেখা দেয় মুসলমানদের তথাকথিত সাংস্কৃতিক আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার কায়েমের উদ্দেশ্যে। ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় ও স্বার্থান্বেষী ধর্মান্ধ মহলের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ মুসলমানরা বুঝতে শেখে একজন হিন্দুকে হত্যা করলে হত্যাকারীর চৌদ্দ পুরুষ জান্নাতবাসী হবে। অপরপক্ষে, সাধারণ হিন্দুকে ধারণা দেয় হয় যে, একজন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর কৈলাস বাস নিঃসন্দেহে সম্ভব হবে। এভাবে দেয়া হয় উসকানি, জাগানো হয় সাম্প্রদায়িকতা। এরপরও উত্তেজিত না হলে মসজিদের ভেতর শুকরের মাংস এবং কালী মন্দিরে গরুর মাথা ফেলে রেখে পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো হয়। রাজনীতিক ঘোলাজল তৈরি করা হয় অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক মুনাফা লাভের আশায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের ঠিক পূর্বক্ষণে এনফিল্ড রাইফেলের গুলিতে গরু এবং শুকুরের চর্বি মিশিয়ে সিপাহীদের কাছে সরবরাহ করা সংক্রান্ত তাৎপর্যপূর্ণ গুজবটির পেছনে গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

সাম্প্রদায়িকতা এই আবহাওয়া তৈরিতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানগোষ্ঠী তাদের সাম্প্রদায়িক বৈষয়িক স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের তাগিদে সোৎসাহে সাড়া দেয়। ১৯৩০ এর দশক থেকে উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় খুব উল্লেখযোগ্যভাবে। ১৯৪৬ এর দাঙ্গা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ১৯৪০ এর দশকের সাম্প্রদায়িক জোয়ারের আবর্তেই ভারত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। [২১৭] নরম্যান ব্রাউনের মতে, 'দেশ বিভাগ ছিল সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ ফল'। [২১৮]

১৯৪৭ উত্তরকালে তাই ইসলামী রাষ্ট্রের দোহাই তুলে আচ্ছন্ন রাখা গেল না সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনমণ্ডলীকে। নতুন রাষ্ট্রে বাঙালি উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সমাজ দেখলো, তথাকথিত প্রতিপক্ষ হিন্দুদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু নতুন প্রতিযোগী এসে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভুতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। এই প্রতিযোগিরা মুসলমান বটে, তবে এরা বারোশো মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তানি ও অবাঙালি গোষ্ঠী। ধর্ম ছাড়া এদের সঙ্গে বাঙালিদের আর কিছুতেই মিল নেই।

পাকিস্তান সরকারেও এই পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক বুর্জোয়াদের বা তাদের প্রতিভূ আমলা-সামরিক চক্রের প্রাধান্য ছিল। কাজেই, সূচনা হতে এই বৃহৎ বুর্জোয়াদের শোষণ এবং ইসলাম ও গণতন্ত্রের নামে আমলা-সামরিক চক্রের শাসনে নিস্পেষণ শুরু হয়। এরা পূর্ব বাংলার তুলনামূলক ভাবে স্বল্পোন্নত বুর্জোয়াদের বিকাশকেও বাঁধা করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী ও রাষ্ট্র ক্ষমতাধিকারী সেখানকার আমলা-সামরিক চক্র জাতিগত নিপীড়ন চালিয়ে পূর্ব বাংলাকে পরিণত করে তাদের উপনিবেশে।

পাকিস্তানের কায়েমী শোষক-শাসকেরা পূর্ব বাংলার ওপর তাদের উপনিবেশিক ব্যবস্থা ও তাদের যাবতীয় সুযোগ ও স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী অস্ত্ররূপে নতুন করে প্রয়োগ করতে থাকে। তারা ইসলামী তমদ্দুন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের নামে ধর্মান্ধতা এবং সংখ্যাগুরু বাঙালির জাতিসত্তা, স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি বিরোধী নীতি গ্রহণ ও কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে একের পর এক, একটানা। পূর্ব বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিষাক্ত করে তোলার প্রয়াস পায় তাহা এই প্রক্রিয়ায়। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি, ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দান এবং তথাকথিত ইসলামী তমদ্দুন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের শ্লোগান এই তিনটি দিকে পরিচালিত হয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগিদের কার্যকলাপ।

সাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা

১. বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণ ও পাকিস্তানীকরণ প্রয়াস

সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমণ্ডলীর ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নানা মরণ আঘাত চালাতে থাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, তাদের বংশবদ পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং এ উভয়ের সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক-রাজনীতিক অনুচরেরা।

প্রথমত, আরবী-ফারসি-উর্দু শব্দ বাদ চিবার না রেখে বাংলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষাকে মুসলমানী, ইসলামী এবং পাকিস্তানি রূপদান করার অপচেষ্টা। দ্বিতীয়ত, আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রয়াস। এবং তৃতীয়ত, জোর করে উর্দু চাপিয়ে দিয়ে বাংলাকে ধবংশ করা। এসবের উদ্দেশ্য ছিল সর্ব অর্থে পূর্ব বাংলা ও বাঙালি জনতাকে পঙ্গু করে পাকিস্তানি উপনিবেশিক কাঠামো বজায় রাখা। [২১৯] এ সময় উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্যে সরকার অধিক পরিমাণ টাকা খরচ করতে থাকে। [২২০] কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্যে কোনো মাথা ব্যাথা সরকারের ছিল না।

ছেচল্লিশ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হিসেবে যদিও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তথাপি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে চক্রান্ত করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং নির্বাচিত না হওয়া সত্বেও খাজা নাজিমুদ্দীনকে ঐ পদে বসিয়ে দেয়া হয়। নাজিমুদ্দীদের প্রধানমন্ত্রীত্বে মুসলিম লীগের রক্ষণশীল ও কেন্দ্রীয় হাই কমান্ডের বশুংবদ অংশটি জিন্নাহর আর্শীবাদপুষ্ট হয়ে ক্ষমতা পেয়ে যায়।

বাংলা ভাষাকে দেদার আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ দিয়ে ঠেসে ধরে এটাকে ইসলামী ও পাকিস্তানি করার অপপ্রয়াস নানাভাবে চালু ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। যেমন, রেডিও পাকিস্তান হতে বাংলা সংবাদ প্রচারের ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ "পিছলে এতোয়ার খান গাফফার খাঁর লড়কা গ্রেফতার হয়েছেন। ..... হুকুমতে হায়দারাবাদ হুকুমত হিন্দুস্থানের খেলাফে জং ও জেহাদের ইরাদা জাহির করেছেন"[২২১]। আবার, যেমন একটি সরকারি প্রচার পত্রিকায় সদস্য কেনা একটি ডেষ্ট্রয়রের ছবির নীচে লেখা হয়ঃ 'একটি হাল খরিদ তাবাহকুন'[২২২]। অর্থাৎ একটি সদ্য ক্রয় করা ডেষ্ট্রয়ার।

ভাষাকে ধর্মীয় ভিত্তিতে উদ্ভটভাবে ভাগ করার পেছনে যে পূর্ব বাংলাকে দুর্বল করা, ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে অহেতুক বিতর্ক তুলে জনদৃষ্টিকে শাসকদের শোষণ-কুশাসন থেকে সরিয়ে ভিন্ন দিকে ব্যস্ত রাখা, বাংলা ভাষা হিন্দুদের বা হিন্দু প্রভাবিত এবং সে কারণে পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য নয়..... প্রমাণ করা, সাম্প্রদায়িকতা চাঙ্গা করে 'ঘোলা জলে মাছ শিকার' এর ন্যায় গুঢ় উদ্দেশ্য ইত্যাদি কার্যকর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। উদাহরণ দিলেই পরিস্কার হবে বিষয়টা।

বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী-তুর্কী ভাষায় শব্দ দেদার ঢুকিয়ে এর ইসলামীকরণ ও পাকিস্তানিকরণের প্রস্তাব ও সুপারিশ করার বহু আগেই অসংখ্য আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দকে স্বীয় বিকাশের প্রয়োজনে বাংলা ভাষা নিজেই অঙ্গীভুত করেছিল, আত্মস্থ করে নিয়েছিল। এসব শব্দাবলি, আরবী, ফারসি না তুর্কী তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি ..... না মুসলমান, না হিন্দু। এসব বিদেশী শব্দ যেমন হিন্দুর ছিল না, তেমনি এককভাবে মুসলমানেরও ছিল না। এগুলো বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সাথে ছিল একাত্ম এবং এ ভাষারই সম্পদ। একটা জীবন্ত, সজীব ও গতিশীল ভাষা নিজস্ব প্রয়োজনে এবং অপর ভাষার সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই স্বীয় শব্দ ভান্ডারকে বৃদ্ধি করেছিল। সেক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে চাপানোর প্রশ্ন আসেনি। বাংলা ভাষায় এসে যাওয়া এসব শব্দের কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া গেলঃ

ফারসি শব্দঃ বেয়াদবী, আস্তানা, কারসাজি, কারিগর, হজম, চাকরি, দারওয়ান, চাঁদর, বেকার, দস্তানা, জানোয়ার, কামান ইত্যাদি।

আরবী শব্দঃ বেঈমান (বে), হচ্ছে ফারসি এবং ঈমান হচ্ছে আরবী, কাহিল, বেইজ্জৎ (বে) হচ্ছে ফারসি এবং ইজ্জত হচ্ছে আরবী, নিয়মকানুন (নিয়ম) সংস্কৃত শব্দ এবং কানুন আরবী শব্দ।

তুর্কি শব্দঃ উজবুক।

লক্ষণীয় যে *'নিয়মকানুন'* শব্দটির ক্ষেত্রে সংস্কৃত আর আরবীও একই সাথে রয়েছে, সহাবস্থান করছে। তাতে তো ধর্ম খোয়া যায়নি। কাজেই, এটা স্পষ্ট যে, বাংলা ভাষার যে নিজস্ব ও স্বাধীন সৃজন-বর্ধন প্রবাহ সেটাকে জোর-জবরদস্তি করে সুনির্দিষ্ট খাতে চালিত করার তৎকালীন প্রয়াসই ছিল সাম্প্রাদায়িক কুট বুদ্ধিজাত।

২. আরবী হরফ প্রবর্তনের অপচেষ্টা

বাংলা ভাষা ও বাঙালির বিকাশ সাধণের উদ্দেশ্য উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার প্রয়াসই কেবল ছিল না, বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তন প্রয়াসও একই উদ্দেশ্য করা হয়েছিল।

বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৪৮ সালে করাচীতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠানকালে ইসলামী আদর্শের অজুহাতে বাংলা ভাষার জন্যে আরবী হরফ গ্রহণের প্রস্তাব তোলেন। পেশওয়ারে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের এক সভায় ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে আরবী হরফকেই পাকিস্তানের একমাত্র হরফ করার সুপারিশ করা হয়।

জানা যায় যে, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে একটি পত্র প্রেরণ মারফৎ বাংলায় আরবী প্রচলন করার জন্যে নিয়োগ করা হলে তিনি তা তীব্র প্রতিবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। এ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী মফিজুর রহমান এবং পূর্ব বাংলার অবাঙালি শিক্ষা সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী চট্টগ্রামের জনৈক মওলানা জুলফিকার আলীকে দিয়ে *হরফুল কোরান সমিতি* গঠন করান এবং ধর্মভীরু মুসলমানদেরকে কোরান শরীফের হরফ প্রচারের নামে মাতিয়ে তুলে বাংলায় আরবী প্রচলনের প্রয়াস পান। *হরফুল কোরান সমিতির* প্রতিষ্ঠাতা মওলানা জুলফিকার মনে করতেন যে, কোরানের হরফে মুসলমানদের সকল লেখাপড়া করা উচিত। তিনি আরবী হরফে বাংলা লিখে একটি পত্রিকা চালাতেন এবং ক'টি বইও লিখেছিলেন [২২৩]। যাহোক, এদের এসব প্রচেষ্টার পাশাপাশি আরবীতে বাংলা শিক্ষা দেবার কর্মসূচি চালানো হতে থাকে। স্থাপিত হয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, আরবী হরফের বাংলা বই দেয়া হয় ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে। ১৯৫০ সালের ভেতর ২০টি আরবী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

পাকিস্তানি সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে প্রবল জনমত তৈরি হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বিবেচনাধীন আরবী হরফ প্রবর্তনের বিষয়টির বিরুদ্ধে ১৯৪৯ সালের ২৯ মার্চ পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে প্রশ্ন তোলেন মনোরঞ্জন ধর। বাঙালিদের ওপর আরবী হরফ চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ও জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভাষা কমিটির পক্ষ হতে নঈমুদ্দীন আহমদ সংবাদপত্রে নিম্নের বিবৃতি প্রদান করেনঃ

> "পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত গত বছরের প্রস্তাবটি উর্দু চাপানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ একই পরিষদ গৃহীত প্রস্তাবকে বাতিল করতে পারে না। ভবিষ্যতে নবনির্বাচিত পরিষদও এ প্রস্তাবকে নাকচ করার সাহস করবে না। কাজেই উর্দুর জন্য সামনের দুয়ার যখন রুদ্ধ তখন আরবী বর্ণমালার জিগীর তুলে পশ্চাৎ দুয়ার দিয়ে উর্দু প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে এবং পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব ও বাংলা ভাষাকে খতম করবার ষড়যন্ত্র চলছে। ..... যে জিনিসটা পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবিদের মনে সবচেয়ে বেশি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে এই যে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ১২ থেকে ১৫ জন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৫ জনেরও কম। আরবী বর্ণমালায় দোহাই দিয়ে শতকরা এই ১৫ জন শিক্ষিতকে কলমের খোঁচায় অশিক্ষিতে পরিণত করবার চেষ্টা চলছে। এমননিভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ও ইংরেজী প্রচলন করে ভারতের আরবী-ফারসি শিক্ষিত মুসলমানকে কলমের এক খোঁচায় অশিক্ষিতে পরিণত করবার ষড়যন্ত্রে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল। আরবী বর্ণমালা প্রচলিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের যার ঠিকই থাকবে পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার শতকরা ১৫ থেকে নেমে আসবে নগণ্য ভগ্নাংশে। শিক্ষক অভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমান অবস্থাতেই অচল অবস্থার সম্মূখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় অশিক্ষিত বলে পরিগণিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে। কাজেই তোগলকী প্যানের উদ্যোক্তাদের আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে আরবী বর্ণমালার ধূয়া তুলে গত বছরের ভাষা প্রস্তাবকে নাকচ করার ষড়যন্ত্রকে আমরা কোনমতেই সহ্য করে নেব না। [২২৪]

পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকগণও ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার পরিচয় দিয়ে পাক সরকারের উপরোক্ত প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খাঁন, সৈনিক সম্পাদক শাহেদ আলী প্রমুখ। বাঙালি শিক্ষাবিদদের প্রতিবাদের পাশাপাশি ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হতে হরফ প্রশ্নে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনার বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদত্ত হয়। এতে তারা বলেনঃ

"আমরা মনে করিতেছি যে, আরবী হরফ প্রণয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ স্থানাধিকারী বিপুল ঐশ্বর্যময় ও আমাদের জাতীয় গৌরবের ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করা হইতেছে। ..... পাক বাংলার মনে নুতন পরাধীনতার আশংকাকে কায়েম করিয়া তুলিতেছে।..... বাংলা হরফকে পরিবর্তন করা চলিবে না। পাক বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির উপর কসাইয়ের মত ছুরি চালনা করা চলিবে না। [২২৫]

এই স্মারকলিপি প্রদানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা একটানা সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে আরবী হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা করতে থাকে। সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও ইকবাল হল ছাত্র সংসদ, জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদ, তমদ্দুন মজলিশ উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও সভা অনুষ্ঠান করে। পূর্ব বাংলার অন্যত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। এ সময় আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবও বিভিন্ন স্তরের কিছু কিছু ব্যক্তির তরফ থেকে উত্থাপিত হয়। কিন্তু সারা পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের তীব্রতা দেখে পূর্ব বাংলা সরকার ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৯-এ এক প্রেসনোট [২২৬] জারি করে বলেন যে, বাংলা ভাষা বাংলা হরফে লেখা হবে, না আরবী হরফে লেখা হবে সেটা পূর্ব বাংলার জনসাধারণই তাদের স্বাধীন মতামত দ্বারা নির্ধারণ করবে।

৩. ভাষা কমিটি ও বাংলা ভাষায় সংস্কার প্রয়াস

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ সালের মার্চে একটি ভাষা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে '*পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি*' নামে। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার সংস্কারের কথা বলে একে কাঁট ছাট করে মুসলমানী করার বিভিন্ন কায়দা কানুন বাতলে দেয়া'।

১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রায় দেড় বছর ধরে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর কমিটি তার রিপোর্ট তৈরি করে সরকারকে জমা দেয়। কমিটির অন্যতম সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনের লেখা স্মৃতিকথা থেকেই কমিটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। কমিটির সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক গণেশ চরণ বসু কিছু কিছু ব্যাপারে ভিন্নমত জানালে সদস্যরা বলেছিলেনঃ '*দেখুন গণেশ বাবু*, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আওতা থেকে মুক্ত করে আমরা যেভাবে এর সংস্কার করতে চাইছি, তাতে আপনার মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কোনো কথা না বললেই শোভন হয়। [২২৭]

যাহোক, ভাষা কমিটির রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার ব্যাপক সংস্কারের পরামর্শ প্রদান করা হয়। 'সহজ বাংলা' নাম দেয়া হয় এই নতুন ভাষার। কমিটি বহুবিধ সুপারিশ করে বাংলা ভাষা, বাংলা ব্যাকরণ, বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও হরফ, নতুন টেকনিক্যাল ও বিদেশী শব্দ বাছাই এবং বিদেশী শব্দের প্রতিশব্দ চয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে। পূর্ব বাংলার সকল স্থানে 'সহজ বাংলা' যথাশীঘ্র চালু করার জন্যে তারা প্রদেশের সরকারকে জোর প্রস্তাব দেন। তারা কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে 'সাধু ভাষা' ও 'চলতি ভাষা'-এ উভয়কে মেনে নেন। তবে শর্তগুলো থেকেই সরকার ও কমিটির প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। শর্তগুলো ছিলোঃ

ক. পূর্ব বাংলায় প্রচলিত সরল শব্দ বিন্যাস ও সহজ বাক্যরীতির ব্যবহার নিশ্চিত করে ভাষায় যতদুর পারা যায় সংস্কৃত প্রভাব এড়াতে হবে;
খ. মুসলমান লেখকদের প্রকাশভঙ্গি ও ভাবসমূহ ইসলামী আদর্শের সঙ্গে কঠোরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; এবং
গ. পূর্ব বাংলায় সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ, বাকবিধি, বাক্যাংশ, বিশেষ করে পুঁথি আর ব্যাপকভাবে প্রচলিত সাহিত্যে যেসব ব্যবহৃত হয় সেসব ভাষাতে অধিকতর স্বাধীনভাবে চালু করতে হবে। [২২৮]

কমিটির সুপারিশ ছিল যে, বাংলা বর্ণমালা হতে ঈ, উ, ঋ, ঐ, ঔ, ঙ, ণ, য, ঢ়, ক্ষ, ৎ, ঃ পরিত্যক্ত হবে। যুক্ত হবে নতুন স্বরবর্ণ অ্যা। বর্ণ সংযুক্তকরণের ফলে ব্যবহারের রীতিও বাতিল হবে। [২২৯] এছাড়া কমিটি উর্দু ভাষা চালু করার জন্যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্বতন্ত্র এক প্রস্তাব দিয়ে তাতে বলে যে, স্কুলে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উর্দুকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত তারা উর্দু ভাষা সংস্কারের কথাও উল্লেখ করেন। [২৩০] ভাষা সংস্কার কমিটি তাদের সংস্কার অনুযায়ী যেসব নতুন বাক্যবিন্যাস রীতি প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, তার কিছু দৃষ্টান্ত নিজেরাই দিয়েছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত থেকে ভাষা সংস্কার কমিটির এবং সরকারের ভাষা সংস্কার প্রয়াসের প্রকৃত তাৎপর্য এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক চরিত্রের এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কার পূর্ব বাংলা বিরোধী তৎপরতার স্বরূপ পরিস্কার হয়।

৪. বাংলা বর্ণমালা উৎখাত প্রয়াস

১৯৫১ সালেও পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা বর্ণমালা বাতিলের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের শিক্ষা দফতর এক সরকারি নির্দেশে জানান যে, এখন হতে মুসলমান বালকদের শিক্ষা আরবী বর্ণমালা দ্বারা শুরু হবে। নয় ব্যবস্থার শিশুরা ১ম ও ২য় শ্রেণীতে আরবী অক্ষর পরিচয় শিক্ষা করবে এবং ৩য় শ্রেণীতে তাদের আমপারা শিক্ষা প্রদান করা হবে ৪র্থ ও এর পরের শ্রেণীসমূহে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু পড়ানো হবে। প্রাদেশিক সরকারের এই নির্দেশের ব্যাপারে *ইনসাফ পত্রিকার* 'প্রাথমিক শিক্ষা নয়া কারিকুলাম' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়ঃ

যদি কোন মহলের ধারণা হইয়া থাকে যে, বাংলা বর্ণমালার বাংলা শিখিলে ও শৈশবস্থায় উর্দু (যাহা এখনও রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই) না শিখিলে ধর্মভাব জাগে না, যদি তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, আরবী এবং আরবী বর্ণমালার মাধ্যমে বালক-বালিকার শিক্ষা শুরু না হইলে তাহাদের ইসলামী ভাবধারার উন্মেষ হইবে না, তবে আমরা বলিব তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা অজ্ঞ.....। [২৩১] অতপর 'ইনসাফ'- এর সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন করা হয়ঃ 'তবে পূর্ব বঙ্গের ছেলে-মেয়েরা বাংলা বর্ণমালায় মাতৃভাষা শিখিলে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করিলে গোমরাহ বা ইসলামী ভাবধারাবিহীন হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কা কেন? সেইরূপ আশঙ্কা যদি কাহারো মনে না থাকিয়া থাকে, তবে বর্ণমালা পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষ মহলের এই অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন? [২৩২]

৫. অসাম্প্রদায়িক ভাষা আন্দোলন ও ধর্মনিরক্ষেতার বিকাশ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্বেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ এবং মুসলিম লীগের চৌধুরী খালিকুজ্জামান আলাদা আলাদাভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সুপারিশ করেন। বিপরীতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার অসারতা সম্পর্কে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণ ও শিক্ষিত শ্রেণীকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় '*পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা*' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলেনঃ

> "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ..... যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই"। তিনি আরো বলেনঃ "বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক ও পরাধীনতারই নামান্তর হইবে।

ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে"। [২৩৩]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ ১৭ পৌষ ১৩৫৪ *'তকবীর'* পত্রিকায় *"পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা"* শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধে বলেনঃ "হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির জন্য প্রাথমিক শিক্ষণীয় ভাষা অবশ্যই বাংলা হইবে"। [২৩৪] শহীদুল্লাহর এসব বক্তব্যে বাংলা ভাষার দাবির সাথে সাথে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য, এখানকার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ও যৌথ ও জীবন চিন্তা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াসের পেছনে সাম্প্রদায়িকতা চাঙ্গা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্রের সাথে সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর শোষণ চাপানো, তাদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা এবং পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন ও তাদের ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণী ও লেখক বুদ্ধিজীবিগণ গোড়া থেকেই জনগণকে সচেতন করে দেন। ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন আবদুল হক *"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"* শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলেনঃ

"উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারি চাকুরির অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে- যিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে বাংলায় এমএ পাশ করবে তিনিও, যদি বাংলা সাহিত্যও ভাষা নিয়ে গবেষণা করে তিনি পৃথিবীর অন্যতম পণ্ডিত বলেও গণ্য হন, বা সাহিত্য সাধনার ফলে তিনি যদি নোবেল প্রাইজও পান, তবু আইনত তিনি সরকারি চাকুরির উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন না, উর্দু যদি তিনি না জানেন। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র উর্দু জানার জন্য একজন ম্যাট্রিক পাশ উর্দুভাষীও তাঁর চেয়ে চাকরির অধিকতর উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। অবশ্যই পদমর্যাদার দিক দিয়ে কথা বলছি না, একজন ম্যাট্রিক পাশ উর্দুভাষী অন্তত পিওনও হতে পারবে, কিন্তু উর্দু-অজ্ঞ বাংলায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারী একজন এম.এ. চাকরির কোনোই অধিকার পাবে না- যেমন ইংরেজী না জানলে বর্তমানে কারো চাকরির অধিকার নেই। এইটাই হলো স্বাভাবিক, এইটাই হলো আইনগত ন্যায়ের কথা। ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা বলে বর্তমানে আমাদের যেমন নিম্ন প্রাইমারী থেকে এম.এ. পর্যন্ত ইংরেজী লিখতে হচ্ছে এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করার জন্য সাধনা করতে হচ্ছে, এবং কতখানি আয়ত্ত করতে পারি তার ওপর চাকরির মান, বেতন, উন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করছে, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলেও তখনও তেমনি আমাদের নিম্ন প্রাইমারী থেকে এম.এ. পর্যন্ত উর্দুভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে, আয়ত্ত করার জন্য সাধনা করতে হবে এবং কতখানি আয়ত্ত করতে পারি, তার ওপর আমাদের চাকরির মান, বেতন, উন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করবে। পক্ষান্তরে, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উর্দু শিক্ষিতই চাকরির যোগ্যতা লাভ করবেন এবং প্রত্যেকটি বাংলা ভাষীই চাকরির অনুপযুক্ত হয়ে পড়বেন।

"রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দরুণ উর্দু সংবাদপত্রের মর্যাদাই হবে সবচেয়ে বেশি, যেমন বাংলা সংবাদপত্রের চেয়ে বর্তমানে ইংরেজী সংবাদপত্রের মর্যাদাই হবে সবচেয়ে বেশি এবং এক্ষেত্রে প্রভাবের দিক দিয়ে উর্দুভাষীদের সঙ্গে আমরা কখনোই পারবো না, যেমন ইংরেজী পত্রিকার সঙ্গে আমাদের পারা সম্ভব হয়নি। উর্দুভাষী পরিচালিত সংবাদপত্রের মতো উৎকৃষ্ট এবং প্রভাবমুক্ত আমাদের পরিচালিত উর্দু সংবাদপত্র হবে না। আইন পরিষদে উর্দুভাষীদের মতো উর্দু আমরা বলতে পারবো না, অতএব সেখানে আমাদের প্রভাব হবে অত্যন্ত কম। মোটের উপর পাকিস্তানে উর্দুভাষীর সংখ্যা নগণ্য হলেও তাদের হবে সবদিক দিয়েই সুবিধা এবং অসুবিধা হবে আমাদের....।

"উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে, আমাদের সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক উন্নতি শুধু ব্যাহত হবে না, রুদ্ধ হয়ে যাবে"।[২৩৫]

বাংলা ভাষাকে সাম্প্রদায়িক চেহারায় দেখা এবং এটাকে সংস্কৃত প্রভাবিত, হিন্দুর ও পৌত্তলিকতার ভাষা বলে অপপ্রচার চালিয়ে মুসলমানদের জন্যে এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলে উর্দুর পক্ষে সাফাই গাইতে যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ও প্রাক্কালে উচ্চকণ্ঠে হয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরির জন্য আবদুল হক *"উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে"* শীর্ষক অপর এক প্রবন্ধে বলেনঃ

"বাংলা যে, বাস্তবিকপক্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভাষা, একথা কেউ কেউ অস্বীকার করতে চন। তাঁরা বলতে চান যে, বাংলা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত এবং সংস্কৃত হিন্দুর ভাষা, পৌত্তলিকতার ভাষা, পক্ষান্তরে উর্দু মুসলমানদের ভাষা,আরবী-ফারসির সঙ্গে এর সাদৃশ্য, অতএব মুসলমানদের ভাষা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করতে হবে, হিন্দুর ভাষা বাংলা নেওয়া চলবে না। বাংলা ও উর্দুর প্রতি এরূপ মনোভাব নিয়ে কিছুদিন চললেই মাতৃভাষারূপে উর্দুকে গ্রহণ করা এবং বাংলাকে বর্জন করা আমরা কর্তব্য বলে মনে করে বসব। " যারা বলেন, বাংলা হিন্দুর ভাষা এবং পৌত্তলিককতার ভাষা, মূসলমানদের ভাষা নয়, তাঁরা কেউ এই ভাষা সমন্ধে জ্ঞান রাখেন না"। [২৩৬] এ সময় *"বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা"* শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ বলেনঃ "উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারি চাকরির অযোগ্য হইয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত ও সরকারি কাজের "অযোগ্য" করিয়াছিলঃ।[২৩৭] ১৯৪৯ সালের ২৭ জুন তারিখে সাপ্তাহিক 'মিলাতে' সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেনঃ

> "একটা দেশকে পুরোপুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর যত রকম অস্ত্র আছে তার মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য ও মারাত্মক অস্ত্র হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালির প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়া যাইবে। [২৩৮]

ড. কাজী মোতাহার হোসেন *সওগাত পত্রিকার* অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৭)" রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা শীর্ষক এক প্রবন্ধে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে "বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ রাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের কবলে গিয়ে পড়বে" বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেনঃ

> "বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা করা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধুমায়িত অসন্তোষ বেশিদিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সমৃদ্ধের অবসান হবার আশঙ্খা আছে"।[২৩৯] কাজী মোতাহার হোসেনের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৭১ সালে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের জন্য অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ মে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব বাংলার বাঙালি সদস্য কুমিলার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পরিষদে অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। [২৪০] ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলা সফরে এসে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল, মুসলিম লীগের সভাপতি ও পাকিস্তান গণ পরিষদের সভাপতি মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ মার্চ রেস কোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে যেসব বক্তব্য রাখেন, তা থেকেই পাকিস্তানী শাসকযোগষ্ঠীর মনোভাব ও চক্রান্তের চেহারা স্পষ্ট হয়। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জনমণ্ডলীর ভেতর বিভ্রান্তি তৈরির জন্যে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত বিরোধী মনোভাব বিকশিত করার উদ্দেশ্যে ২১ মার্চ রেস কোর্সের ভাষণে জিন্নাহ বলেনঃ

> "কিন্তু আমি একথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে নানা বিদেশী এজেন্সীর অর্থ সাহায্য পুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে বদ্ধ পরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানকে ধবংশ করা। সোজাসুজিভাবে আমি একথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট এবং বিদেশীদের সাহায্য প্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্ত হবেন। পূর্ব বাঙলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনও পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য" [২৪১]

রেসকোর্স ময়দানে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরর সমাবর্তন উৎসবে জিন্নাহর বক্তৃতা শুনে ছাত্রজনতা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে 'না' 'না' ধ্বনি তোলে। এর অনেক পর পুনরায় ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অথচ, এই নাজিমুদ্দীনই পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে ছাত্রদের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলা ভাষার দাবিকে মেনে নিয়েছিলেন। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপানোর নতুন করে চক্রান্তের ফলে এ পর্যায়ে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, তা ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি-মার্চ ভাষা আন্দোলনের তুলনায় অকল্পনীয় ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করে। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, মিছিল-সভা, ধর্মঘট-হরতাল ইত্যাদি যাবতীয় পন্থা ব্যবহার করে লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি, জেল-জুলুম এবং হত্যা সহ্য করে ঢাকাসহ সারা পূর্ব বাংলা প্রচণ্ড আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি সাংস্কৃতিক বিতর্কের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। পাকিস্তানের গভর্নর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম এই ঘোষণা দেন। উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র মাতৃভাষা। সারা পুর্ব পাকিস্তান জুড়ে পাক গভর্ণরের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন এর মাধ্যমে। ইতিহাসে যা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে। আটচল্লিশ থেকে একান্ন এই তিন বছর ছাত্ররা সমগ্র পূর্ব বাংলায় এই আন্দোলন অব্যাহত রাখে। কিন্তু পাক গভর্নরের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি বিস্ফোরিত হয় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন। এদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালালে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকেই শহীদ হন। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা হয় এক নতুন সংগ্রামের ইতিহাস। অমর একুশে-বাঙালির মাতৃভাষা দিবস। আজ ভাষার জন্য বাঙালির এই ত্যাগ বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভ করেছে। একুশে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির আত্মত্যাগের মহিমার কাছে পরাস্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর শাসকদের এগুয়েমি। সেদিন তারা বাধ্য হয়েছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আর এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি তার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। বুঝতে পারে ধর্ম নয়, ভাষা ও সংস্কৃতিই হচ্ছে জাতিসত্তার প্রধান উপাদান এবং ভাষা আন্দোলনের এই বিজয় বাঙালির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। তাই ইতিহাসবিদগণ যথাযথই বলেন, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে বায়ান্নতেই স্থাপিত হয়।

যদিও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন সক্রিয়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে, তথাপি দেশ বিভাগের পূর্বেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দুইটি এলাকা নিয়ে এক মহান আদর্শকে সামনে রেখে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটো অংশ পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম অংশ বা পশ্চিম পাকিস্তান। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে নতুন রাষ্ট্র ভারত গঠিত হয়। পাকিস্তানের ৮০ ভাগেরও বেশি অধিবাসীর ধর্ম এক ও অভিন্ন, শুধু এইটুকু মিল ছাড়া পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রটির দুইটি অংশের অন্য সর্বক্ষেত্রে ছিল বহু ধরনের বৈসাদৃশ্য। পাকিস্তানের দুই অংশ ছিল ১০০০ মাইলেরও বেশি ভারতীয় ভূখণ্ড- দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই, নয় দুই অংশের অধিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি এবং ভাষা ছিল সম্পূর্ণররূপে ভিন্ন, সেখানে ধর্মীয় ঐক্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ছিল কম।

মূলত পূর্ব পাকিস্তানের ৯৫ ভাগেরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা, এ কারণে তারা সমস্ত পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। অবশ্য এ অঞ্চলে কিছু উর্দুভাষী মানুষও ছিল যারা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময়ও পরে ভারত সরকারেরর মুসলিম বিতাড়ণের ফলে ভারত থেকে এখানে প্রত্যাবসিত

হয়েছিল। এরা পরিচিত ছিল অবাঙালি হিসেবে। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল মূলত পাঞ্জাবি, পাঠান, বেলুচি এবং সিন্ধিদের আবাসভূমি। সেখানে পাঞ্জাবিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তির কোন সম্ভাবনাই লক্ষ্য করা গেলো না। সে কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ খুব একটা উল্লাসিত হতে পারেনি। তাদের কেবল প্রভুর পরিবর্তন হয়েছিল। তাছাড়া সংস্কৃতি, মন-মানসিকতা এবং বর্ণের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রকট। বস্তুত যতই দিন যেতে লাগল, পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচারণও এতই বাড়তে থাকল। সম-অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাকিস্তানকে তাদের কলোনীতে পরিণত করল। মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানীরা বাঙালিদের ওপর দমননীতি চালান শুরু করে। কারণ বলা যায় যে, একটি জাতিকে শোষণ করতে হলে সে জাতির তিনটি বিষয়ের উপর আধিপত্য চাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকেও তার যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চালালো। কারণ আমরা জানিঃ একটা দেশকে পুরোপুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করার জন্য সম্রাজ্যবাদীর যত রকম অস্ত্র আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও মারাত্মক অস্ত্র হচ্ছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে কেটি বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চেয়ে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাধতে চেয়েছিল পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য পাকিস্তানীরা উঠে পড়ে লাগলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষার বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার পর বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। এছাড়া মাইকেল মধুসুদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন এবং জীবনানন্দ দাস এবং ড. শহীদুল্লাহর মত কবি সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষার প্রাচীন ঐশ্বর্য ভান্ডারকে আরো নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের ৬ মাসের মাথায় পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধীবেশনে বিরোধী দলীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়ার জন্য একটি প্রস্তাব আনেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান এবং গণপরিষদের অন্য অবাঙালি সদস্যরা এর বিরোধিতা করেন। এরপর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেন *"উর্দুই হচ্ছে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"* সেদিন ঢাকার নির্ভীক বাঙালি ছাত্রসমাজ সঙ্গে সঙ্গে এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। আর সেই সাথে সূত্রপাত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবিতে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অুনষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্পষ্টই মত প্রকাশ করেছিলেনঃ " আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয় এটি একটি বাস্তব সত্য"। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। শুরু হয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, মধুর ক্যান্টিনে জমায়েত সমাবেশে ভাষা সৈনিক গাজীউল হক একরাশ বেদনা ও ঘৃণা নিয়ে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। গাজীউল হকের বক্তব্যের কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

> "ভাইসব, নাজিমউদ্দিন কাল বলেছেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। আজ ওদের কথার জবাব দেবার সময় এসেছে। ওরা আমাদের প্রাণের ভাষা, বাপ-দাদার মুখের বুলি কেড়ে নিতে চায়। এদেশের মাঝি আর মনের আনন্দে ভাটিয়ালী গান গাইতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেল, সুকান্ত আমাদের কাছে হয়ে যাবে ইতিহাসের বস্তু। মায়ের কাছে চিঠি ও ঠিকানা উর্দুতে লিখতে হবে"।

উক্ত সভায় ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারি স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। ছাত্রীরাও এই ধর্মঘটে শরিক হয়। তারা সমস্বরে আওয়াজ তোলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই; আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। মিছিলের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে দেখা যায় এক বজ্রকঠিন শপথের ইঙ্গিত। বস্তুত ভাষা আন্দোলন আরো জোরদার করতে তুলবার জন্য ৩০ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটিতে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, খিলাফতে রাব্বানী পার্টি, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন দু'জন করে প্রতিনিধি নেয়া হয়। কমিটির আহবায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- আবুল হাশেম, আতাউর রহমান, অলি আহাদ ও আবদুল মতিন প্রমুখ।

এরপর এলো ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। রক্তস্নাত একুশ। সেদিন রাস্তায় যানবাহনের চলাচল খুবই কম। যে দু' একটি দোকান খোলা হয়েছিল তা ছাত্রদের অনুরোধ বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাজপথে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিশের অনেকের কোমরে টিয়ার গ্যাসের বাক্স। কারো হাতে লাঠি, কারো বা বেনয়েট লাগানো রাইফেল। বেলা দশটা থেকে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা কমিটির আহবায়ক আবদুল মতিন ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য করে বললেনঃ " মায়ের অপমান সহ্য করা যায় না। মা তাঁর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ডাক দিয়েছেন। বলুন আপনারা সে ডাকে সাড়া দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবেন, না ঘরে ফিরে যাবেন?" সহস্র সহস্র কণ্ঠে গর্জে উঠলোঃ "১৪৪ ধারা মানব না, মানব না"। এরপর দশ দশজন ছাত্র নিয়ে এক একটি দল তৈরি হল। তারা সমন্বয়ে চিৎকার করে উঠলঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই; ১৪৪ ধারা মানি না; নাজিম-নূরুল নিপাত যাক। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনি দিতে দিতে প্রথম দশজনের দলটি গেটের বাইরে আসামাত্র এক ঝাঁক পুলিশ টেনে হিচড়ে তাদেরকে ট্রাকের উপর তুললো। ট্রাকের উপর থেকে ওরা আওয়াজ দিলো; *"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"*।

ছাত্রদের গগণ বিদারী শ্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা গম গম করতে লাগল। হঠাৎ একটি গুলি এসে একটি ছেলের উরুতে লাগল। ছেলেটির নাম বরকত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, মুর্শিদাবাদে তার বাড়ি। বাড়িতে রয়েছে তার মা। বরকত এ বাংলার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। বরকত, জব্বার, রফিক নিজের জীবন দিয়ে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলার ছাত্র জনতাকে পথ দেখিয়ে গেল। মূলত ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই এই মাটিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। বাঙালিরা তখন থেকে জাতীয় ভাবে প্রতি বছর শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি পালন শুরু করে। প্রকৃত পক্ষে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম জাতিসত্ত্বার স্বতন্ত্র বিকাশের গতিপথ নির্ধারিত হয়ে যায়। বস্তুত বাংলাভাষি মুসলমানদের অব্যাহত চাপের মুখে সরকার পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর দাবির কাছে নতি স্বীকার করল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে ১৯৫৪ সালের ৭ মে গণপরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হল। বিষয়টি পরে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলন বাঙালি, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের মহান একুশের রক্তদানের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয় সেই চেতনা থেকেই বাঙালির মনে জন্ম লাভ করে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা।

ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিকাশ ঘটে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে সংশয় দেখা দেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘদিন পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ পাকিস্তান

গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব স্বয়ং মুসলিম লীগ পাশ করে। পরবর্তীতে প্রচণ্ড চাপের মুখে সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। এতে বাঙালির আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়। অন্যদিকে বাংলা ভাষার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ৪ টি পৃথক ভাবাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা বিদ্যমান ছিল। (ক) মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ; (খ) আংশিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ধারার প্রতিনিধিকারী জাতীয় কংগ্রেস; (গ) বিপ্লবী সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি। (ঘ) মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রগতিশীল গণআজাদী লীগ। এরূপ রাজনৈতিক বিভাজন রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক মেরুকরণ ঘটায়।

ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ছাত্র সমাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়। এ পথ ধরেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। কবি সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তে ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা যে মিছিল বের করে তাতে বরকত, সালামসহ আরো অনেকে শহীদ হয় এবং পরের দিনগুলোতেও আন্দোলন ও আত্মহুতি চলতে থাকে।

এভাবে রক্তের বিনিময়ে, বহু নির্যাতন ও আত্মদানের মাধ্যমে বাঙালি বাংলার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। আবার, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে কেবল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রতিষ্ঠাই নয়, ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদও বিকশিত হয় এতদঞ্চলে। ধর্মীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদকে কবর দেয় বাঙালি জনতা। তারা ধর্মনিরপেক্ষতা রাজনীতির আদর্শকে নিজেদের জন্যে বাছাই করে নেয়। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় মাত্র দু'বছর পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক মুসলিম লীগের নির্বাচনী ভরাডুবি ঘটানোর মধ্য দিয়ে এবং একুশ দফার বিজয়ের মাধ্যমে পরবর্তীকালের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এবং পরিশেষে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এতদঞ্চলে ধর্মীয় পাকিস্তানের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের ফলে।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট তুলে ধরতে গিয়ে হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল যথার্থই বলেন যে, গণতন্ত্র "একক মূল্যবোধ নির্ভর নয়, বরং এটা বহু-মূল্যবোধ নির্ভর। এটা কুক্ষিতগতকরণ বা একচেটিয়াকরণ নয়, বরং অংশীদারকরণে ইচ্ছুক"।[২৪২] বস্তুত, গণতন্ত্র একরৈখিক নয়, এটা বৈচিত্র্যকামী ও বিভিন্নতার মাঝে সমন্বয়-নির্ভর। গণতন্ত্র মুক্ত আলোচনা ও বিতর্ককে উপজীব্য করে। গণতন্ত্র পরস্পর বিপরীত শক্তিসমূহের সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত। এটা বিরোধী মতকে সহ্য করে। আলাপ-আলোচনা, সমালোচনা-সুপারিশের মধ্য দিয়ে সমঝোতায় পৌছে শেষাবধি সংখ্যাগরিষ্ঠের বাছাইকৃত ব্যবস্থাকেই এটা গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করে।

ধর্মের সাথে গণতন্ত্রের মৌল বিরোধ এখানে যে, ধর্ম কেবল নিজেরটাকেই শুদ্ধ ও গ্রহণীয় মনে করে। অন্যেরটা, বা বিরোধী বা অপর ধর্মেরটা তার কাছে কার্যত গ্রহণযোগ্য নয়। নির্দিষ্ট ধর্ম মনে করে যে, সত্য কেবল তার কাছেই। ধর্ম এভাবে বাধ্যতাকে, শর্তহীন আনুগত্যকে অবশ্যম্ভাবী করে। এজন্যে ধর্ম আর গণতন্ত্র শেষ বিচারে হয়ে পড়ে বিপরীতমুখী।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের অর্থনীতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলে। এক সময় ইসলাম ধর্মকে সামনে আনা হয়েছিল এবং এক ধরণের ওপরি-ঐক্য তৈরি করা হয়েছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ভেতর। কিন্তু ১৯৪৭ উত্তরকালে নতুন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, জীবন-জীবিকার সমস্যা মোকাবেলাকরণ ও সুষম বণ্টন প্রয়াস এবং সংস্কৃতি রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্নতার মাঝে, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে,

বহু ভাষা-ভাষীর মধ্যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আর ঐক্য আনা গেল না ইসলামের কথা বলে। পাকিস্তানে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী সমাজ কায়েমের নামে মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভুত্ব ও একচেটিয়াত্ব অর্জন ও বিস্তার প্রবণতা যেমন দিল না ইসলামকে কায়েম করতে, তেমনি দিল না কাঙ্খিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। শাসকগোষ্ঠীর কাছে তাই *'ইসলাম'* হল রাজনীতির শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার। ধর্মের নামে রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনমণ্ডলীর অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রাম। তাই শুরু হল একেবারে প্রথম থেকে।

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্বঘোষিত ধর্মধারক শাসকঘোষ্ঠী ধর্মান্ধনা সৃষ্টিকরণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বরাবর লড়াই করেছে এদেশের অসাম্প্রদায়িক জনগণ। ইসলামের নামে, ধর্মের দোহাই পেড়ে শোষণ-শাসন বজায় রাখার প্রয়াস, জনদৃষ্টিকে মূল সমস্যা থেকে সরিয়ে দিয়ে পানি ঘোলা করার ঘৃণ্য খেলা, কিংবা সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে জনগণ ও তাদের আন্দোলনকে বিভক্ত-বিভ্রান্ত-নস্যাৎ করে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার অপচেষ্টাকে জনগণ বারংবার প্রতিহত করেছে। এভাবে অসম্প্রদায়িক চেতনা, ইহজাগতিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার উন্নত চেতনা পূর্ব বাংলার মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক বোধ ও আদর্শ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেসিক শোষণ-শাসনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা গৃহীত নীতি-কর্মকাণ্ড, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসের মাধ্যমে আসল সমস্যা ও তার সমাধান থেকে জন দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে চালিতকরণ এবং বাঙালি জনতার আন্দোলন-সংগ্রামকে বারংবার বানচাল করার জন্যে তাদের কর্তৃক গৃহীত কৌশল থেকেই শিক্ষা নিয়ে বাঙালি জনমণ্ডলী ও তাদের নেতৃবর্গ ইহজাগতিক চেতনা ও রাজনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনকে স্বকীয়তার ভিত্তিতে আত্মমর্যাদা নিয়ে, স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা নিয়ে বাঁচবার তাগিদেই গ্রহণ করে।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা

১৯৭১ সালের মে মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের জনগণের প্রতি যে ৭-দফা নির্দেশাবলী জারি করেন, সেটার ৫নং তথা 'ঙ' দফাতে স্পষ্ট বলা হয় যেঃ "কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন করা চলবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য দাঙ্গাবাজদের চিহ্নিত করে তাদের নির্মূল করতে হবে"।[২৪৩] ৬ জুন ১৯৭১-এর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে পেশকৃত চারদফা প্রস্তাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক আদর্শের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব পরিস্কার বোঝা যায়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের বক্তব্য সম্পর্কে 'জয় বাংলা' পত্রিকার রিপোর্টের অংশ বিশেষ ছিল নিম্নরূপঃ

> "আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনদিন সাম্প্রদায়িকতা মাথা চড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সকল বাঙালি হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রিস্টান একসাথে লড়েছেন-বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার মাটি সিক্ত করে তারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, এদেশের প্রাণ ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন"।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে তিনি বলেনঃ

> স্বাধীনতার সংগ্রামে হিন্দু কৃষক জীবন দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন মুসলমান কৃষক। মসজিদ পুড়েছে হানাদার দস্যুদের হাতে, পুড়েছে মন্দির গীর্জা, আর বৌদ্ধ বিহার বিধ্বস্ত হয়েছে। বর্বর পাক-সেনারা হত্যা করেছে ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, জোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ও ফজলুর রহমানকে। আমরা একসঙ্গে লড়েছি, একই সাথে জয়ী হবো এবং জয়ী আমরা হবই"[২৪৪]

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বাধীন বাংলাদেশের পুনগর্ঠনের ক্ষেত্রে সরকারের মৌলিক নীতি বলে উল্লেখ করে বলেনঃ

> "স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, যে যে ধর্মেরই হোন না কেন, তাঁদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতন্ত্রের মূল আদর্শের উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলা আমরা গড়ে তুলব"।[২৪৫]

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে পরিচালিত বিপবের মৌল আদর্শ বলে ঘোষণা করেন।[২৪৬] ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।[২৪৭]

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৫ মে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি প্রচারপত্রের মাধ্যমে এক আবেদনে মাওলানা ভাষানী বলেন যে, পাকিস্তানী শোষক-শাসকগোষ্ঠী, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় দলগুলো ধর্ম গেল, সংহতি বিপন্ন, ইসলাম বিপন্ন, কাশ্মীর গেল প্রভৃতি শ্লোগান এবং ভারত বিদ্বেষকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পুর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে বিভক্তি এনে শোষণের পথ উন্মুক্ত রাখার যে প্রয়াস চালাচ্ছে, '২৩ বৎসরের সেই ঘুনে ধরা ও ধসে পড়া' ষড়যন্ত্রে রাখার যে ষড়যন্ত্র বাঙালিরা বিভ্রান্ত হবে না এবং তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ নতুন বাংলাদেশ কায়েম করবেই।[২৪৮] ২২ মে ১৯৭১ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা ভাসানি আর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের ওপর চাপানো গণহত্যার ও তাদের কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর সমালোচনা করেন।[২৪৯]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানি), কমিউনিস্ট বিপবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, পুর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদার), শ্রমিক-কৃষক কর্মীসংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার), পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন) এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি রাজনীতির ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে "বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি" গঠন করেন। এই কমিটি ১ জুন ১৯৭১-এ তাদের বিস্তারিত কর্মসূচি সম্বলিত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জনতার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা হয় এবং সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।[২৫০] ৬ জুলাই ১৯৭১-এ সংসদ সদস্যদের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম যে ভাষণ দেন, তাতেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মূলনীতি এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেনঃ

> "ভাই বন্ধুরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের নীতি আদর্শে আপনারা অটল থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হচ্ছে আমাদের আদর্শ। বিশ বছরের ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এই আদর্শকে আমরা আজকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছি। অসাম্প্রদায়িকতা বা 'সেকুলারিজমের' মহান আদর্শ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছি। এই একটি বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট থাকতে হবে। কোন প্রকারে সাম্প্রদায়িকতার মালিন্যে যেন আওয়ামী লীগের সদস্যবৃন্দের নাম কলঙ্কিত না হয় সে বিষয় আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গণতন্ত্র অর্থই হলো অসম্প্রদায়িকতা যেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সেখানে গণতন্ত্র কোনদিন কার্যকর হতে পারে না। আজ আমরা গনতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই অসাম্প্রদায়িকতা বা সেকুলারিজমে বিশ্বাস করতে হবে। বাংলার প্রতিটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের মনে প্রত্যয় জন্মাতে হবে যে আপনারা সবারই বন্ধ। আর ভবিষ্যৎ বাংলার সুখ আর সমৃদ্ধিকে সবাই আপনারা রূপ দিতে যাচ্ছেন।[২৫১]

মুক্তি সংগ্রামে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে অংশগ্রহণের জন্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ৭ নভেম্বর ১৯৭১-এ যে যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয় তাতেও বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ,

গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্যে সবার প্রতি আবেদন জানানো হয়।[২৫২] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩০ নভেম্বর ১৯৭১-এ বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্যে যে কর্মসূচি ও রূপরেখা তুলে ধরা হয়, তাতেও রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার ঘোষণা থেকে বলা হয়ঃ

> "রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে। যার যার ধর্ম তার তার কাছে পবিত্র এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ জবরদস্তি নেই- ধর্ম প্রসঙ্গে এ নীতি কড়াকড়িভাবে কার্যকরী হবে। ধর্মের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হবে; অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার সুযোগ পাবে। রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মের স্বীকৃতি ও ধর্মপালকদের অবাধ অধিকার থাকবে- কিন্তু ধর্মের নামে কোন প্রকারের জোরজুলুম করা বা শোষণ চলতে দেয়া হবে না"।[২৫৩]

৩ নভেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সভ্য, কর্মী ও দরদীদের জন্যে প্রদত্ত এক পার্টি সার্কুলারে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহবান জানায়।[২৫৪] ১২ মে ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ন শীর্ষক দলিলে উল্লেখ করেনঃ

> বাংলাদেশ সংগ্রামের সাফল্যের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চির অবসান ঘটবে এবং এর ফলে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে"।[২৫৫] একই দলিলের '*জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কর্মসূচি*' শীর্ষক অংশে বাংলাদেশকে একটি '*ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র*' হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা, সকল ধর্মের লোকদের সম্পূর্ণ সমানাধিকার ও নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, যাবতীয় সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধকরণ, সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাজনীতিক দল ও যারা শত্রু সেনাদের সাহায্য করেছে তাদের সবগুলোকে নিষিদ্ধ করা ইত্যাদির ঘোষণা দেয়া হয়।[২৫৬]

তারিখ বিহীন এক প্রচারপত্রে বাংলাদেশের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বিশ্ব বুদ্ধিজীবি মহলের প্রতি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ যে আবেদন জানায় তাতেও বাংলাদেশ আন্দোলনের পশ্চাতে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কাজ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়।[২৫৭] বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ অপর একটি বিবৃতিতেও ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করে।[২৫৮] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তারিখ বিহীন অপর একটি প্রচারপত্রে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট তাদের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কর্মসূচি শীর্ষক যে ঘোষণা দেয় তাতেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সমানাধিকার, ধর্ম পালনের অধিকার, সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধকরণ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি কর্মসুচীসহ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।[২৫৯] বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর এক প্রতিবেদন তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমতের সামর্থন লাভের জন্যে যে প্রয়াস চালায়, সেই প্রতিবেদনও বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থা নির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করা হয়।[২৬০]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা

২১ এপ্রিল ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলা বেতারর কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মোস্তফা আনোয়ার কর্তৃক রচিত "সাম্প্রদায়িকতাঃ সামন্তবাদ প্রসঙ্গ" শীর্ষক কথিকায় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চরিত্র উন্মোচন করা হয় এবং এর বিপরীতে বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের বারতা ঘোষণা করা হয়। কথিকাটির নির্বাচিত অংশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

"তোমরা কি ভেবেছ জমিদার ও কৃষকের শ্রেণী সংঘাতের ইতিহাসটি মুছে দিয়ে আজকের জাগ্রত শ্রেণী সচেতন মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে? ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করে দাঙ্গাবাজ রাজনীতি এদেশের মাটিতে আজ অচল। আজ প্রতিটি বাঙালি জানে, এ যুদ্ধ তার বাঁচার জন্য। এ যুদ্ধ তার চিরদাসত্বের নিগড় থেকে

মুক্তির জন্য। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে, তাই ইতিহাসের কবরে পচে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষে ঘুলিয়ে দেয়া যাবে না। তথাকথিত পাকিস্তান আর নেই। পাকিস্তানের নিশানা আমরা পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছি। আমরা উড়িয়াছি আমাদের বুকের রক্তে রাঙ্গানো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। এই মহান বিপবকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা তাই উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু ওদের রসদ কই? হ্যাঁ, আছে বস্তাপচা রাজনীতি-হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা। বুকে বেপরোয়াগুলি চালিয়ে সমস্ত বাঙালি জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন-ষড়যন্ত্রে মেতে, অখণ্ডতার প্রলেপ মাখানো আর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ভুত দেখানোতে.....।

দাঙ্গাবাজি কলা-কৌশল আর চলবে না। লাঞ্ছিত নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালি গণ মানুষ ওদের কলঙ্কিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ওদের নগ্ন আসল রূপটি অতি দূর্ভাগ্যের রাত্রে আমরা দেখে ফেলেছি। পশুও বুঝি এত নগ্ন নয়- এত বিশ্রী, এত কুৎসিত, এত বিভৎস নয়। ওরা মানুষ হত্যা করেছে- আসুন আমরা পশু হত্যা করি। 'জয় বাংলা'।[২৬১] ২৮ জুলাই ১৯৭১-এ 'সংবাদ পর্যালোচনা শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকায় রচয়িতা আমির হোসেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক নীতির বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তুলে ধরেনঃ

"কিন্তু পশ্চিমা শাসকের দল কোনদিন এই সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। বাংলা আর বাঙালি কথা দুটি ওদের অনুভূতিতে প্রতিনিয়ত ছড়িয়েছে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা। তাই অবিরাম হামলা চলেছে বাঙালি জাতির উপর-বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতির ওপর। ওরা আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখতে চেয়েছে, হাওয়াই হামলা করেছে, ভাষাটাকে মুসলমানী চেহারা দেবার জন্য তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিয়েছে। 'কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে করা হয়েছে 'তাহজিব-তমদ্দুন'। নজরুলের কবিতার 'শশ্মান' কেটে করা হয়েছে 'গোরস্থান' কায়কোবাদের লেখা 'মহাশ্বশ্মান' বই খানির নাম পাল্টিয়ে রাখা হয়েছে 'মহাগোরস্থান'।

কিন্তু কি লাভ? মি. জিন্নাহ থেকে মোনেম খাঁ যা পারে নি- ইয়াহিয়া-টিক্কাও তা পারবে না। ইতিহাসের গতি পশ্চাতমুখী নয়, ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘোরে না। ঠিক জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও কেউ জোর করে হত্যা করতে পারবে না"।[২৬২] তাছাড়া-দেশ-বিভাগের প্রথম দিন থেকেই এরা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমুলে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এবং সেই একই দিন থেকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে বাঙালি যতই লুণ্ঠিত, নিগৃহীত এবং অপমানিত হয়েছে ততই হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতীয়তাবোধ তার কাছে উজ্জ্বলতর দীপ্তি লাভ করেছে। তাই বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন আর অগণিত আত্মপরিজনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশের সামনে দাঁড়িয়ে এক বেদনায় একাত্ম হয়েছে, এক প্রতিজ্ঞায় বাহুবদ্ধ হয়েছে- মৃত্যুর বিনিময়-মূল্যেই তারা মৃত্যুকে রোধ করবে। বাংলার মাটির পূর্ণপীযূষ ধারায় সঞ্জীবিত-প্রাণ একটি বাঙালি বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের এই মুক্তিসংগ্রাম শেষ হবে না"।[২৬৩]

আমরা লড়ব বৈকি। যতদিন একটি হানাদার সেনা (আশ্চর্য, এগুলো আবার ধর্মে মুসলমান) আমাদের জন্মভূমির মাটির উপর থাকবে ততদিন আমাদের সংগ্রামের বিরতি নেই। ব্রিটিশের শিকল ছিড়ে আমরা গোলামির নতুন জিঞ্জির পড়েছিলাম- এতদিন পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী যাকে ইসলামী জেওর বা অলঙ্কার বলে জাহির করেছে। সেই জিঞ্জির ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে। আমরা আর ধোঁকাবাজির শিকার হবো না। আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ব-যেখানে শোষণ চিরতরে নির্বাসিত যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের মেহনতের দাম পায় যথাযথ মর্যাদায় সেখানে অসহায়তা কারো মানুষ্যত্বের বিকাশ পথে বাধা নয়। আমরা গড়বো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পমুক্ত শ্রেয়বোধ প্রিয়বোধে দীপ্ত খাড়া শিরদাঁড়া নাগরিকের কলকণ্ঠে নতুন বাংলাদেশ 'জয় বাংলা'।[২৬৪] ডিসেম্বর ১৯৭১-এ নাসিম চৌধুরী রচিত এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন' শীর্ষক অপর একটি নিবন্ধে আশা প্রকাশ করা হয়। "ইতিমধ্যে সরকার দেশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, বাংলাদেশ আর কোনো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে দেশ আর কলুষিত হতে পারবে না"।[২৬৫]

৪ নভেম্বর ১৯৭১-এ সুকুমার রচিত *'রেনেসাঁর সুচনা';* বাংলাদেশ শীর্ষক একটি নিবন্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির লক্ষ্য ঘোষণা করে এতে বলা হয়ঃ

> "স্বাধীনতা নিজেই একটি জাতির জীবনে অনুপ্রেরণাস্বরূপ হতে পারে এবং তার নবজাগরণ সূচিত করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সে আশাকে সফল হতে দেয়নি। দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করার চক্রান্তের মধ্য দিয়ে তার জাগরণ সম্ভাবনাকে সুপরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় মেতে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী পাঞ্জাবী চক্র। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এর ফল হয়েছে বিপরীত। জলস্রোত যেন আপন গতিপ্রবাহেই সব বাধাকে অতিক্রম করে সম্মুখগামী-তেমনি বাঙালির নবজীবন তৃষ্ণাও কোন ষড়যন্ত্র বা বাধাকে গ্রাহ্য করেনি এবং বিরুদ্ধতা তার শক্তিকে সংহত করেছে"।[২৬৬]
>
> "মুক্ত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন ঠাঁই নেই। আপন ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে আমরা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার সুর্যালোকে আলোকিত হয়েছি। ধর্মকে আমরা আর রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে রাজী নই। বাংলাদেশে তাই আর সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে কোন কথা নেই- প্রতিটি মানুষের আপন আপন ধর্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধিকার নিয়ে বাঁচবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে"।[২৬৭]

কবি নির্মলেন্দু গুণ রচিত 'বাংলাদেশের পুনর্গঠন' শীর্ষক কথিকা ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ প্রচরিত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। এতে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ধরা পড়েছে এভাবেঃ

> "ধর্মের প্রতি মানুষের ভালবাসাকে জাগতিক তথা রাজনৈতিক কাজে লাগানো হয়েছিল বলেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান টেকেনি। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির পটভূমি ছিল ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ লক্ষ প্রাণের রক্তে অর্জিত হলো- তার সংগ্রামী পটভূমিতে যে সত্যটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল তাহলো দেশপ্রেম"।[২৬৮]

জহির রায়হান রচিত 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ' শীর্ষক কথিকা এসময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় এবং এতে বলা হয়ঃ

> "১৯৬৯-এর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নাড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে জনতার এই ঐক্যতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জনতার মধ্যে ভাঙ্গন ও বিরোধ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ম দেয়া..... অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যখনই শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতায় দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, যখনই গদীচ্যুত হবার প্রবল সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে, তখনই যে কোনো একটি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথে চালিয়ে, আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করেছে তারাষ্ট্র।[২৬৯] কিন্তু ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা গেল, যে সমস্ত দল ও গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের দেয়ালে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে- সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি বর্জন করেছে"।[২৭০]

উক্ত কথিকায় আরো বলা হয়ঃ

> পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৃত। বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালির প্রাণ। বাংলাদেশে আর পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।[২৭১]

পত্র-পত্রিকার চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে গোপনে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলিও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক নীতির চরিত্র উন্মোচন করে চলে একটানা এবং তারা অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ নতুন বাংলাদেশ গঠনের পক্ষে তাদের জোরালো মতামত পেশ করে। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায় অত্যাচারী পাকিস্তান সরকারের অতীত ও বর্তমান রাজনীতির প্রধান

হাতিয়ার এই সাম্প্রদায়িকতা। আজ বাংলাদেশের মুক্তির প্রচেষ্টায় যে ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিকাশ ঘটেছে তা বানচাল করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার বাঙালির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। তারা অবাঙালিদের হাতে প্রচুর অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেখানে তারা নতুন করে অত্যাচার শুরু করেছে, রাস্তায় রাস্তায় এইসব অবাঙালিরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে এদিকে ইয়াহিয়া সরকারের প্রচারযন্ত্র একথা প্রচার করেছে যে, বাঙালিদের স্বাধীকারের জন্য যারা সংগ্রাম করেছে এবং এই সংগ্রামে যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে তারা এবং যেহেতু বাংলার সংখ্যালঘুরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক স্বাধিকার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে, কাজেই তারাই পূর্ববাংলার এই দূরবস্থার জন্য দায়ী। এই ঘৃণা, অপ-প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো। লক্ষ লক্ষ বাঙালি আজ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, এ অবস্থায় যদি পাকিস্তানের উস্কানির ফলে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে তাহলে পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাই এই মুহূর্তে সব থেকে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বাংলার শত্রু, ঘৃণ্য পশ্চিমী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, তাদের কোন প্রকার উস্কানিতে কান না দেওয়া বরং দিনের পর দিন মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজেদের তৈরি করা। একথা মনে রাখতে হবে যে, কোন স্বাধীনতা যুদ্ধেই সহজে সাফল্য অর্জন করা যায় না। সুতরাং সংগ্রাম যত কঠিন ও দীর্ঘ হোক না কেন তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।[২৭২]

১৫ অক্টোবর ১৯৭১-এ 'জয় বাংলা' পত্রিকা তার '১ম বর্ষঃ ২৩ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক এক নিবন্ধে দ্বিজাতি তত্তের ভিত্তিতে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার কবর রচনা করে সমগ্র বাঙালি জাতি যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা জীবনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচেছ শোষণমুক্ত সুখী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, তা তুলে ধরা হয় নিম্নরূপভাবেঃ

> "বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজী রেখে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। তাদের সঙ্গে দেশপ্রেমিক কৃষক, মজুর, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী, সাহিত্যিক- এক কথায় ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ যার যার নিজের কর্মক্ষেত্রে এই মুক্তি সংগ্রামের অংশভাগী দেশ মাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করেছে। অসহ্য দুঃখ কষ্ট-লাঞ্ছনা ও প্রতি মুহূর্তে নিশ্চিত মৃত্যু সম্ভাবনার মুখেও তারা জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে আপোষহীন মুক্তির প্রভাত সুর্যের সম্ভাবনায় প্রত্যয়শীল মাত্র চব্বিশ বছর আগে সাম্প্রদায়িক জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভৌগলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার এবং জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে কাতারবন্দী হয়েছে। শুধুমাঠে ময়দানে শ্লোগান দেয়া নয়, এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতিয়ার হাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে হত্যা করছে, প্রাণ দিচ্ছে। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষ, বাঙালি জাতি হিসেবে প্রাণ নেয়া ও দেয়ার মিলিত রক্ত ধারায় যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছে, এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা অনন্য। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কবর রচনায় ইতিহাসের এই অনন্য অধ্যায়ের ভূমিকা অপরিসীম এবং সুদুর প্রসারী। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এটি প্রাথমিক সাফল্য। শুধু যারা উপনিবেশিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মীয় জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক বেদবুদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশিক শক্তির সেই সব দালালরা এই জাতীয়তাবাদের অভূদ্বয়কে ভয় করে। শুধু তারাই এই মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই দু'টি বিপরীত ধারার কথা যদি আমরা বিচার করি তাহলে অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই অভ্যুদ্বয়কেই নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক অগ্রগতি হিসেবে স্বাগত জানাতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক অগ্রগতি হিসেবে স্বাগত জানাতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে এই জাতীয়তাবাদী ধারার দূর্জয় শক্তি পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক জান্তা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে ইয়াহিয়া খানের খসড়া শাসনতন্ত্রে দখলীকৃত বাংলাদেশ হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিভেদ জিইয়ে রেখে সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক জাতীয়বাদকে প্রতিহত করা। এটাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী উপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্য। জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দালাল দলগুলো পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশিক শক্তির সেই লক্ষ্য পূরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে"।[২৭৩]

পত্রিকাটির একই নিবন্ধে 'জিন্নাহ সাহেবের দ্বি-জাতিতত্ত্বের মাথায় পদাঘাত করে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক ক্লেদমুক্ত সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে সংগ্রাম চলছে তারা সুদুর প্রসারী গুরুত্ব ও প্রভাব"-এর কথা উল্লেখ করা হয়।[২৭৪]

২১ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে *'স্বদেশ'* পত্রিকাটির ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যায় 'ধমনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী' শিরোনামে প্রকাশিত ভ্রাম্যমান প্রতিনিধির এক রিপোর্টে বাংলাদেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর মন্তব্য তুলে ধরা হয়। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন যে, "আমাদের সরকার এমন এক রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক যে রাষ্ট্র হবে সার্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এবং যার বৈদেশিক নীতি হবে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ"।[২৭৫] ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর *স্বদেশ"* পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যায় বলা হয় যে, "আমাদের আজকের যুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ..... সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নের যুদ্ধ"।[২৭৬] ১ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখের *'বাংলাদেশ'* পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যায় 'সেই অতীতে যেন আর ফিরে না যাই' শিরোনামে সাম্প্রদায়িক কেন্দ্রমুক্ত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়।[২৭৭]

১৮ জুলাই ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *'মুক্তিযুদ্ধ'* পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যায় *'ইয়াহিয়া' চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন'* শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ "বস্তুতঃ বাংলাদেশের জনগণকে পায়ের তলায় রাখার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী গত ২৩ বছর ধরিয়াই জনগণের বিরুদ্ধে দন্ড দমননীতি এবং ভারত বিরোধী জিগির তথা সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি..... এই দুইটি মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে"।[২৭৮]উক্ত সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

> "বাংলাদেশের জনগণকে বিদেশী ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ঐসব চক্রান্ত সম্পর্কে হুশিয়ার হইতে হইবে। অতীতে গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধে এবং পাক-ভারত উত্তেজনা সৃষ্টির উস্কানী সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকারসমূহের সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। মুক্তিযুদ্ধেও জনগণ অভূতপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ইয়াহিয়া চক্র ও মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিনষ্ট করার জন্য যে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত হানাহানি এবং পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধাইবার জুয়া খেলায় মাতিয়াছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ইয়াহিয়াচক্র যত শয়তানীই করুক, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জনতা মুক্তিযুদ্ধে তাহাদের অটুট একতা রক্ষা করিবেন এবং দস্যুদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া মুক্তিযুদ্ধকে জয়ী করিবেন"।[২৭৯]

২৪ অক্টোবর ১৯৭১-এ প্রকাশিত *'বিপ্লবী বাংলাদেশ'* শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়ঃ

> "বাংলাদেশ যখনি ন্যায়ের দাবিতে জনতার কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে তখনি স্বার্থবাদী শাসক সম্প্রদায় ভারতের সঙ্গে বিরোধ, নয়তো ধর্মের নামে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে জনতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করেছে। এর জন্য বার বার বলি হয়েছে নিরীহ মানুষ। বার বার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার মাটি। কিন্তু স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মুখোস খুলে গেছে এবার। তাই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ লক্ষ লক্ষ শহীদের বেদীমুলে দাঁড়িয়ে ঘৃণা সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়েছে। পাক সাম্প্রদায়িক সরকারের সর্বরকমের উস্কানি ব্যর্থ করে দিয়েছে বাংলার সংগ্রামী জনতা। বাংলার মানুষ আজ বাঙালি। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান নয়, তারা বাংলার মানুষ। জাতি ধর্মের উপরে যে মানব ধর্ম সেই মহান ধর্মে উদ্বুদ্ধ আজ বাঙালি জাতি। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে সে দেশে শুধু মুসলমানের নয়। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান সবার দেশ বাংলাদেশ"।[২৮০]

৫ অক্টোবর ১৯৭১-এ *'বাংলার বাণী'* পত্রিকার মুজিবনগরঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'কাহার সঙ্গে আপোষ, কিসের সঙ্গে আপোষ' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে রাজনৈতিক ভাষ্যকার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন যে, "ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ... প্রতিষ্ঠার সুমহান উদ্দেশ্যে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থামিবে না"।[২৮১] ২৬

সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী জনতার মুখপত্র সাপ্তাহিক *'দাবানল'* পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যায় 'অসুর নিধন উৎসব' শীর্ষক সম্পাদকীয়তের জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িকতা চাঙ্গা করার ঘৃণ্য নীতির সমালোচনা করে সাম্প্রদায়িক কলুষমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়ঃ

> "বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিস্তৃত অংশ দেশের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন, ইয়াহিয়া সরকারের নেকড়ে বাহিনী তাদেরকে ভিটে মাটি থেকে, প্রিয় মাতৃভূমি থেকে, জীবনের নাট্যমঞ্চ থেকে প্রচণ্ডতম পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে দেশের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িকতা আবার বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছে"। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম- সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে শোষক পুঁজিবাদ এর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এক ক্ষমাহীন সংগ্রাম, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি স্বাধীন হবে। বাংলাদেশ তারা সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক কলুষমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ সৃজন করবেন।[২৮২]

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে *'বাংলাদেশ'* পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়, মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী' শীর্ষক সাম্প্রদায়িকয়তে বলা হয়ঃ

"বর্তমান বাংলাদেশে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে তা কোন শোষক শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এ যুদ্ধ সাড়ে ৭ কোটি নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তিযুদ্ধ। পাঞ্জাবী শোষকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক নিস্পেষণ থেকে এ যুদ্ধের জন্ম। এ যুদ্ধ বাংলার জনগণের যুদ্ধ অর্থাৎ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ। অতঃপর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, দখলদার বাহিনীর সরদার জেনারেল ইয়াহিয়া খান যুদ্ধের শুরু থেকে ঘৃণ্য এক রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে এ যুদ্ধকে সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে। কিন্তু বাংলার জনগণ হানাদারদের এ ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত বুঝতে পেরে তা পরিহার করবেন। কেননা ২৪ বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বাংলার জনগণের উপকার হয়নি। সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী বলে তা বাংলার জনগণের কাছে কখনোই কাম্য নয়।[২৮৩]

১৮ নভেম্বর ১৯৭১-এ *'দেশ বাংলা'* পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার 'হিন্দু না ওরা মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন জন? শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ধর্মনিরক্ষে রাষ্ট্র ও ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। সম্পাদকীয়টির নির্বাচিত অংশ নিম্নরূপঃ

> "সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত বাঙালি জাতীয়তার মূর্ত পীঠস্থান এই বাংলাদেশ। বাংলার মুসলমান বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃস্টান, বাংলার আদিবাসী তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয়তার প্রশ্নে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা বাঙালি, বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করে দিয়েছে ধর্ম জাতীয়তার একমাত্র নিয়ামক হতে পারে না, ভাষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক একাত্মতাই জাতীয়তার মৌল ভিত্তি"।[২৮৪]

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ *'দেশবাংলা'* পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ সুস্থ রাজনীতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ

> 'বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ অতঃপর কোন সাম্প্রদায়িক দল থাকবে না। জামাতে ইসলামী, তিন মুসলিম লীগ, পিডিপি ও নেজামে ইসলাম দলকে বেআইনী ঘোষণা করে জনাব তাজউদ্দীন যশোরে স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন এখন থেকে আর ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।
>
> বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছে। বিগত চব্বিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশকে পদদলিত করে রাখার ব্যাপারে পশ্চিমা চক্র ধর্মের লেবাসধারী এই দলগুলিকে সর্বপ্রকারে মদত দিয়েছে এবং বাংলাদেশ একটি প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ-সর্বস্ব দালাল শ্রেণী সৃষ্টি করার কাজে এই দলগুলিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। গণতন্ত্রের টুপি টিপে ধরে, সর্বপ্রকার প্রগতির পথ আগলে দাঁড়াবার ব্যাপারে এইসব রাজনৈতিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট *'সংগ্রাম'*ও করেছে।[২৮৫]

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর '*অভিযান*' পত্রিকার ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যায় বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র জানান যে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।[২৮৬] তাজউদ্দীন আহমদ বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি আরো বলেনঃ "ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিশ্বের কাছে আমাদের এটাই প্রমাণ করতে হবে যে গোটা বাঙালি জাতি সাম্প্রদায়িকতার বিসবাস্পকে পচা আবর্জনার মতো ইতিহাসের আস্তকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে"।[২৮৭] ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের *বাংলাদেশ* নামক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ১ নভেম্বর ২৪ সংখ্যায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে বলে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়।[২৮৮]

তাই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ও দর্শন পাশ্চাত্যে বিকশিত হয়েছিল ইহজাগতিকতা, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদকে ভিত্তি করে। জীবন-জগতের বিকাশ যেমন এই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ও দর্শনকে জন্ম দিয়েছিল, তেমনি এটা পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় ও সামন্ততান্ত্রিক ধর্মতন্ত্র তথা চর্চা, রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি পীড়ন ও চাপের প্রতিক্রিয়ায়ও সৃজিত হয়েছিল। সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছেন দৈনন্দিন জীবনে বৃহত্তর মঙ্গল আনয়ন, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সর্বাত্মক কল্যাণ সাধন ও অগ্রগতিকে সম্ভব করার জন্যে। শেষাবধি পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তি মানুষের জীবনে ধর্মকে (খ্রিস্ট ধর্ম বা অন্য ধর্ম) রেখেও জাতীয় ও রাষ্ট্রীক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রশ্নে ধর্মকে আলাদা করে দিয়েছে বৈষয়িক জীবন থেকে। এভাবে রাষ্ট্র রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য ও উভয়েয় স্বতন্ত্র ক্ষেত্র স্বীকৃত হয়েছে।

তৎকালীন পূর্ব বাংলায়ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সেক্ষেত্রে পাকিস্তানি উপনিবেশিক কাঠামোর মানুষে মানুষে সম্পর্কের ব্যাপারে উদ্ভূত যাবতীয় প্রশ্ন থেকেই বাঙালিদের মনে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। এর সঙ্গে ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুচরেরা তাদের শোষণ-শাসন টিকিয়ে রাখার জন্যে, ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে যেভাবে ব্যবহার করেছে বারংবার, চেষ্টা চালিয়েছে ধর্মের নামে, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানি তমদ্দুন, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের অজুহাতে নিজেদের শাসনকে দীর্ঘায়িতকরণ ও জগণের সংগ্রামকে নস্যাৎ করতে সেসবের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগ্রাম করতে গিয়ে বাঙালিরা অসাম্প্রাদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে কালে কালে। হিন্দু বিদ্বেষ ও ভারত বিদ্বেষ তৈরি করে, বাঙালিরা ভাষা-সংস্কৃতিকে ও বাঙালিকে হিন্দু প্রভাবমুক্ত করে মুসলমানত্ব দান করার অপচেষ্টা তৈরি করে, রবীন্দ্র-নজরুলকে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে ঘোলা জল তৈরি করে মানুষের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার বদ উদ্দেশ্যে লিপ্ত থাকার প্রতিক্রিয়া থেকেই বাঙালিদের বিক্ষোভ দানা বাঁধে। ধর্মের রাজনীতিক ব্যবহারে ও সাম্প্রদায়িকতার বিক্রিয়ায় অতিষ্ঠ হয়েই বাঙালি জনমণ্ডলী, বুদ্ধিজীবি-ছাত্র সমাজ ও নেতৃবৃন্দ অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে ও ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনকে গ্রহণ করে।

এম.এন. রায় বলেছিলেন যে, "ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটা একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল"।[২৮৯] বস্তুতঃ বাংলাদেশের পরিমন্ডলে সেই বহু যুগ ধরে চির এক অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা। বাঙালির নৃতত্ত্ব, ভূগোল প্রকৃতি ও ইতিহাস তাদেরকে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও ধর্মনিরপেক্ষ করেছে। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা লালনের মূল ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এই বাংলাদেশে মধ্যযুগেও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম দর্শন রচনা করে গেছেন বাঙালি কবি চণ্ডীদাসঃ "শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপর মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই"। কিংবা আধুনিক কালে নজরুল লিখেছেনঃ "গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান"। এদিকে বাঙালি মুসলমানের ধর্মে সুফীবাদের প্রস্তাবের ফলে এতদঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠী ধর্মীয় গোঁড়ামীর বাইরে থেকেছে। শাসকদের দ্বারা না হয়ে পীর-ফকির, আওলিয়া-দরবেশ এবং সুফীদের দ্বারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হওয়ায় এখানে মুসলান ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্ম ও তার অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে বরং উপরোক্তদের বিশেষ করে সুফীবাদের ঔদার্যকে নিজস্ব জীবন দৃষ্টিতে ঠাঁই দিয়েছে। বাংলাদেশে সুফীদের বহু হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অনুসারী ছিল। সুফীবাদে মানুষকে ধর্ম

অপেক্ষা বড় করে দেখা হয় বিধায় এখানকার সাধারণ মুসলমানরাও হিন্দু বা অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে আসতে কোনো আপত্তি দেখেনি। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাঙালিরা তাই হিন্দু আর মুসলমানে ভাই ভাই হয়ে থেকেছে। তাদের উভয়ের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার এক শুভ চেতনা বরাবর জাগ্রত ছিল। হিন্দুর পালতে-পার্বনে, মুসলমানদের ঈদে-চাঁদে-মহরমে উভয়েরই জীবনকে খুঁজে পেয়েছে একে স্থলে, এক মোহনায়।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা রয়েছে সর্ব প্রাধান্য, কেননা এ দুটো দিকই সমাজের বলতে গেলে সব ক'টি স্তরকে স্পর্শ করেছে। আর এই বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত উভয়টিই চূড়ান্ত বিচারে দীর্ঘদিন ধরে অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিকতাকে মৌল বিবেচ্য করে টিকে থেকেছে ও বিকশিত হয়েছে। এখানকার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় একযোগে ঠাঁই নিয়েছে, মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সহাবস্থান করেছে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে। ধর্মকলহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকলেও পরস্পর যোগ ও সমন্বয় চিন্তাও বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। সেজন্যে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে দেখি সুফীবাদ ও যোগসাধনা এবং বাউল গানে। আবার, সাহিত্য ও সঙ্গীতে ধর্মীয় বিষয়াদি এলেও ধর্ম অপেক্ষা বরাবরই ব্যাপ্তি, গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়েছে মানবতার সমস্যা। এজন্যেই মঙ্গল কাব্যে দেবতা অপেক্ষা মানুষ বড় হয়ে ধরা দেয়। এজন্যেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লেখেন অবৈষ্ণব কবি। এজন্যেই অমুসলমান কবি লেখেন কারবালার কাহিনী। একালে নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত রচনার পেছনে প্রেরণাও ওই একই পরিবেশজাত। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের এই অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতার চেতনাই বাঙালি জনমণ্ডলীকে ধর্মানুবর্তী রেখেও উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ করেছে। পাকিস্তানি আমলের ২৪ বছরের উপনিবেশিক যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট পূর্ব বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক নিদারুণ অভিজ্ঞতাই তাদেরকে রাজনীতিতে অসম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে বেশি করে। কিন্তু এর ঐতিহাসিক শেকড় ছিল বাংলার জনজীবনে এবং তার সাহিত্যে ও সঙ্গীতে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

লক্ষণীয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে আগমণের প্রাক্কালে ও পরেই কেবল নানা কারণে হিন্দু-মুসলানের অসম বিকাশজাত পরিবেশ এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বরত গণবিরোধী উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ও স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা চারাগাছকে বিশাল বিষবৃক্ষে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে পাকিস্তান জন্ম নেয়। কিন্তু এর পরপরই পাকিস্তানি উপনিবেশিক ব্যবস্থা পীড়নে ও সাম্প্রদায়িক নীতি-কর্মকাণ্ডের ফলে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যুগ যুগ লালিত অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি আবার নতুন করে স্বীয় উত্থান ঘটায়। নিজ দেশে পরবাসী হয়ে যাওয়া অবস্থায় বাঙালি মানস আবার যেন 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' করে। তারা নিজেদেরকে আবিষ্কার করে নতুন করে। এই আবিস্কারই তাদের অসাম্প্রদায়িক করে তোলে। ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ব বাংলার জনগণের আদর্শে পরিণত হয়। রাজনৈতিক দল ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নীতি-কর্মসূচি কর্মকান্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয়। সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এর প্রতিফলন ঘটে। ১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় এই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অভূতপূর্ব গণরায় প্রদর্শিত হয়। অতঃপর ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে এ দর্শন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনে। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে বাঙালি জনমণ্ডলীর রাজনীতিক ঐকমত্য হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা মৌল সংবিধানিক আদর্শ হিসেবে ঠাঁই পায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণ পরিষদে ভাষণ দানকালে এই ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেনঃ

> "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার-এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে.....। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না"।[২৯০]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বক্তব্য ২৪ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা-সৃষ্ট। এই বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনের ব্যাপারে সমগ্র বাংলাদেশের ঐকমত্যই ধ্বনিত হয়েছে।

বিভিন্ন দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক বহু পূর্বেই বলেছেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। বস্তুত ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা বিষয় এবং একটি অপরটির বিপরীতমুখী। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংখ্যালঘুর অঞ্চলগত এবং একেবারে মুষ্টিমেয় শ্রেণীগত আর্থনীতিক স্বার্থে ইসলামের রাজনীতিক ব্যবহারের মাধ্যমে, মুসলিম তমদ্দুনের অজুহাতে ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছিল। এই চেপে বসার পরিণতিতে, ধর্মীয় মুখোশের এই ঘৃণ্য পীড়নের প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার মানবমণ্ডলী দিনে দিনে মুসলমান থেকে বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়। তারা তাদের হারানো ইতিহাস-ঐতিহ্য, গৌরব, অভিন্নভাষী জনমণ্ডলীর অসম্প্রদায়িক ঐক্য চেতনা ইত্যাদি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। ধর্মীয় পাকিস্তানের প্রচণ্ড ধাক্কায় তারা যেন লুপ্ত জ্ঞান ফিরে পায়। তারা তাদের আত্ম পরিচিতি অন্বেষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এই প্রক্রিয়ায় তারা আরব-পারস্য, তুর্কী-কাতার, মোগল-পাঠান কেচ্ছার জগৎ ছেড়ে স্বদেশের কোলে প্রত্যাবর্তন করে, স্বভূমিতে স্বজনের মাঝে ফিরে আসে। স্বজাত ও স্বকীয়তা তাদেরকে ধর্মীয় বিভ্রান্তির কবলমুক্ত করে বাঙালিত্ব ফিরিয়ে দেয় নবরূপে এবং পূর্বাপেক্ষা শতগুণ হাজারো গুণ বলিষ্ঠ করে। তার অসাম্প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শকে গ্রহণ করে সামাজিক-রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। গ্রহণ করে রাষ্ট্রিক পরিমন্ডলে ন্যায্য হিস্যা লাভের আন্দোলন সংগ্রামের মৌল দর্শন হিসেবে। বৈষয়িক জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা ও বাঙালি জনমণ্ডলীকে শোষণ, বঞ্চনা ও পীড়ন দিয়ে পাকিস্তানি উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ও অবাঙালি শোষকগোষ্ঠী এতদঞ্চলে ধর্মের নামে, ইসলামী রাষ্ট্রিক-সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের আওয়াজ তুলে, মুসলমান তমদ্দুনের স্বাতন্ত্রের অজুহাতে যে স্বেচ্ছাচারকে অর্নিদিষ্টকাল ধরে স্থিতি দানের অপপ্রয়াস চালায়, তার বিরুদ্ধেই গোড়া থেকেই পূর্ব বাংলা ও বাঙালি জনমণ্ডলী প্রতিবাদে-প্রতিরোধ, আন্দোলন-সংগ্রামে নামে। অর্থনৈতিক জীবনে নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃক বণ্টন সমস্যাজাত পাকিস্তান-সংগ্রামে নামে। অর্থনৈতিক জীবনে নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃক বণ্টন সমস্যাজাত পাকিস্তান-পূর্ব বাংলা সম্পর্ক ও জীবন প্রক্রিয়ায় এই দ্বান্দ্বিকতাই শেষাবধি ধর্মপন্থার বিরুদ্ধে এ্যান্টি থিসিস বা প্রতিবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালিত্বের বিকাশ ঘটায়। এরই সিনথেসিস বা সমাধান করতে গিয়ে অনিবার্য হয়ে পড়ে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। অতঃপর ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শ ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌল-রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় অন্যতম এক ঐকমত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

এ উপমহাদেশের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক জীবন-প্রক্রিয়ায় মূলতঃ অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়-এ তিনটির এবং আরো কিছু জাতির মিশ্রণে তৈরি আজকের যে বাঙালি জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের পূর্ব পুরুষগণ, যারা প্যাগান থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে মুক্তিলাভের কামনায় প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম ও পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা নানা পরিবেশে ও প্রতিবেশে, চাপে ও চাওয়ার শেষাবধি স্বাতন্ত্র খুঁজেছে। নিজস্বতা ও স্বকীয়তার ভেতর তারা মুক্তি চেয়েছে। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও স্বপ্নে লালিত বাঙালি মানবমণ্ডলী তাই বারংবার বিদ্রোহ ও স্বাতন্ত্র ঘোষণার ভেতর দিয়ে হিন্দু-পাঠান-মোগল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল পেরিয়ে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বীয় আত্ম-প্রকাশ ঘটিয়েছে, গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রিক রাজনীতিক জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শ। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাঙালির দীর্ঘ ঐতিহাসিক জীবন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সৃষ্ট এই সিদ্ধান্তই প্রতিফলিত হয়। যদিও ১৯৭৫ পরবর্তী কাল থেকে বাঙালি, বাংলাদেশের মানুষের এই সিদ্ধান্ত, চেতনা, মৌল ঐকমত্য ও রাজনীতিক মতাদর্শকে গণবিরোধী সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র কাঠামোর অস্ত্রশক্তিতে বিপর্যস্ত করা হয়েছে, তথাপি এই সাময়িক পরাভবকে ধ্বংশ করে দিয়ে এদেশের মানুষ সচেতন, সজ্ঞান সিদ্ধান্ত নিয়ে, সামাজিক সংগ্রামের মাধ্যমে আবার যে মানব সাম্য, মানবিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রকৃত গণনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবে, কায়েম করবে- সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সাময়িক কালের জন্যে সমাজকে পিছনে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা করা হলেও জীবনের গতি কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সম্মুখের দিকে।

মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা

বাংলাদেশের মানুষের সমাজবদলের স্বপ্ন বহু প্রাচীন। ইতিহাসগ্রন্থ, লোকসাহিত্য, প্রাচীন শিল্পকলা আর বৌদ্ধনাথ-যুগীদের সাধনতত্ত্বে এবং তাদের রচিত চর্যাগীতিকায়, এমনকি মধ্যযুগের বাঙালির নানা কাব্যে এর বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ আছে। সমাজবদলের, সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের এই আকাঙ্খা কৌমসমাজের বা আদিম সাম্যবাদী সমাজের শুভবুদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণচেতনারই প্রতিফলন। প্রাচীনকালে নানা কৌমচেতনা মধ্যযুগে হয়ে একালের সমাজভাবনার প্রগতিপন্থা বা রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন '*মানবপন্থী*' ধারা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। একালের বাঙালির দ্রোহী-চেতনা, মুক্তবুদ্ধির সাধনা বা স্বাধীনতার আর্তিকে শক্তিশালী করেছে আমাদের এই ভূখণ্ডে মানুষের কাল-কালান্তরের ঐতিহ্যবাহী মানবপন্থী ধারা। উনবিংশ শতকের শেষ বা বিংশ শতকের সূচনায় উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের নতুন অধ্যায় যখন শুরু হলো, তখনো ইতিহাসনিষ্ঠ আধুনিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-তাত্ত্বিকেরা এ দেশের ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রগতিশীল রাষ্ট্র নির্মাণে, সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনাকে তার মৌল উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

ফলে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রনির্মাণ-প্রয়াসে যুক্ত হয়েছে স্বদেশের নানা মানবপন্থী শ্রেয়-চেতনার উজ্জ্বল ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার এবং পাশ্চাত্য জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের নানা আধুনিক উপাদান। এই প্রয়াসে আধুনিক পলিটিক্যাল সোসাইটি নির্মাণে সমাজ ও সংস্কৃতি বদলে দিয়ে কীভাবে একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণ করা যায়, সচেতন বাঙালি রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবি ও ভাবুক-চিন্তকেরা পাকিস্তানের অদ্ভুত রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেও তার সন্ধান চালিয়েছেন এবং ১৯৭১ সালে আমাদের এই সাবেক পূর্ব বাংলা ভূখণ্ডে শেখ মজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা বাস্তব রূপও লাভ করেছে। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। অতএব, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এর গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ, আমাদের এই বর্তমান ভূখণ্ডে উপনিবেশিক ও সামন্তবাদী শোষণে কৃষকেরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে শত শতবার বিদ্রোহ-বিপ্লব করছে, কিন্তু সফল হতে পারে নি; বদলাতে পারে নি শোষণ-নির্যাতনের অন্যায় সমাজব্যবস্থা। এমনকি শেরপুরের কৃষক নেতা টিপু পাগলা তাঁর অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেও বাস্তব কারণেই আড়াই দিনের বেশি সে স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারেনি। তাই বলে বাংলার কৃষকের এই দীর্ঘ সংগ্রাম তাৎপর্যহীন এবং ইতিহাসে উপেক্ষণীয় এমনও নয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে টিপু পাগলা, তিতুমীর, ইলা মিত্র বা তেভাগা নানকার কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহ্য ধারণ করেই সফল হয়েছে এবং এটাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সমাজবদল ও তাদের ভাগ্যবদলের সম্ভাবনা দেখেই কৃষকেরা ছিল বাঙালির ওই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে লড়াকু সৈনিক।

ইতিহাস কাঙ্খিত পথে বিকশিত হতে না পারলে কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্য পড়েও সাময়িকভাবে একটু দম নিয়ে নতুন করে বিভ্রান্তিমুক্তির পথ খোঁজে। ধর্মভিত্তিক সামন্তবাদী রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোষাণার পরই তরুণ প্রজন্মের বাঙালি রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবিরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্ভাব্যহীনতা এবং ওই রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজবদল অর্থাৎ ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ ও দুঃখী-দরিদ্রজনের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো সুযোগ রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হতে না দেখে এবং পাকিস্তানের বহুজাতিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের অস্বীকৃতির আশঙ্কায় মোহযুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে মুক্ত দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাঁরা বলেনঃ

> দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের স্বাধীনতা দুইটি পৃথক জিনিস। বিদেশী শাসন হইতে একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জণ করিতে পারে। কিন্তু তাহার অর্থ এই যে, সেই দেশবাসীরা স্বাধীনতা পাইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই, যদি সেই স্বাধীনতা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনায়ন না করে; কারণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিব।[২৯১]

এই নতুন সংগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুবলীগ। তরুণ বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও র‍্যাডিক্যাল ছাত্র-যুবকরা এই সংগঠনে যুক্ত হয়ে জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে শুরু করেন। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলন ও শহরাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে ব্যাপৃত থাকে। এরই মধ্যে পাকিস্তান সরকার শুধু উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার স্বৈরতান্ত্রিক ঘোষণা দেওয়ার দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। সাহিত্য, শিল্প-ভাস্কর্যে, সু-উন্নত বাঙালি জাতি এমন জাতিগত নিপীড়ন মেনে নিতে পারে নি। শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ছাত্র-তরুণের আত্মহুতিতে শুধু যে ভাষার সংগ্রামে বাঙালি জয় লাভ করে এমন নয়। এর ফলে 'পাকিস্তানবাদ' বা 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' যে ভ্রান্ত, অতএব অগ্রহণযোগ্য-এটাই প্রমাণিত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বাঙালিদের চিরতরে প্রত্যাখ্যান সময়ের দাবিতে পরিণত হয়। ষাটের দশকে নানা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'স্বাধীন বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু পাকিস্তানের মতো সামরিকতন্ত্র- আমলাতন্ত্রনির্ভর সামন্তবাদী শোষণপ্রবণ রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহজে স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধিকার দেবে, এমন তো হতে পারে না, হয়ও নি। অতএব, বাংলাদেশকে একটি কঠিন মুক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জয় লাভ করেই পাকিস্তানের অদ্ভুত রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙ্গে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়বাদকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ঘোষণা করে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এমন একটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শর্তানুযায়ী আধুনিক, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র গঠন এক চমৎকার ঘটনা। পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ, হতদরিদ্র, সংস্কারাচ্ছন্ন এবং অর্থনৈতিক ও শিল্পকাঠামোগত অনুন্নত এমন একটি রাষ্ট্র যে গঠিত হতে পেরেছিল, তার জন্য শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্বের অসাধ্যসাধনা-ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধিজীবি ও সংস্কৃতিকর্মীদের সুদীর্ঘ সংগ্রাম এই এলাকার লাখ লাখ নিগৃহীত-নিপীড়িত মানুষের নিজেদের ভাগ্য বদলের জন্য হেলায়-জীবনদানের ক্ষমতাকেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। কবি আবু হাসান শাহরিয়ারের কবিতা উদ্ধৃত করে বলা যায়ঃ

কে আছে শোনেনি সেই রাখালের বজ্র চেরা বাঁশি?
সে যদি তর্জ্জনী তোলে গোরস্থান দূর্গ হয়ে ওঠে।
আজও তাঁর নাম শুনে শোষকের সিংহাসন কাঁপে।
সে এক সময় গেছে মৃত্যুকেও মনে হত বালকের খেলা।
বাল্মীকি আসেনি তাই কোনো মহাকাব্য নেই একাত্তর নিয়ে।

সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রকাঠামো বদলের মাধ্যমে একটি প্রকৃত গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনই ছিল পাকিস্তানি শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে ২৩ বছরের বহুমুখী সংগ্রামের পর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালির অকুতোভয় আত্মাহুতিদানের প্রেরণা। স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের জন্য জীবনদানে এমন দ্বিধাহীনতা ইতিহাসে নজিরবিহীন। সে জন্যই একটি অমিত সম্ভাবনাময় আধুনিক ও গণতন্ত্র অনুশীলন প্রবণ ধর্মনিরপেক্ষ মানবপন্থী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে। মাত্র এক বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল একটি আধুনিক সংবিধান। একে সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে সমাজবদলের প্রক্রিয়া দ্রুততর হতো বলেই আমাদের ধারণা।

স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় রাজনৈতিক পটপরিববর্তনের ফলে তা হতে পারেনি। আধুনিক রাষ্ট্র বাংলাদেশঃ এই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা, এই রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে বহু মৌলিক ধারাকে ক্ষমতা দখলকারী নব্য শাসকেরা কেটে ছেঁটে এমন করে ফেলেন যে, 'মনে হয়, আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জন করি, ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছি'। ধর্ম নয়, ইহজাগতিকতা ও সংস্কৃতিই যে আমাদের রাষ্ট্রের মূল শক্তি, এটা না বুঝে সামরিক শাসন জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনী এবং আরেক স্বৈর সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে সংবিধানকে সার্বিক সামাজিক অগ্রগতি এবং সব ধর্মের নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণে অক্ষম করে তুলেছেন। বাংলাদেশের ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত

ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবপন্থী সমাজবিকাশের ধারার বিপরীত হীন রাজনৈতিক স্বার্থে স্বাধীনতাবিরোধীদের ভোটের আশায় সংবিধানের অমন অনৈতিক কাঁটা ছেঁড়া করে শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধে ৩০ লাখ আত্মবলিদানকারী মানুষের প্রতি অসম্মানই করা হয়নি, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা ও কল্যাণধর্মী সামাজিক অগ্রগতিকেও অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফররুখ আহমদের কবিতায় উল্লেখ রয়েছেঃ

'আহা বেশ বেশ
শতেক শয়তান মিলে উজাড় করে দেশ
ইসলামের নাম নিয়ে ইসলাম করে শেষ।
ধর্মের দোহাই দিয়ে চালায় ধর্মের গলায় ছুড়ি
পাকা খেলোয়াড় ছাড়া কার এমন বাহাদুরি'।
অথবা
'ধর্মের সামান্য জেনে দেখাও বাহাদুরি।
অপিচ অবাদ্য থেকে মারি না সত্যের পিঠে ছুরি।
মোলাকি ইসলাম নয়, খোলাখুলি
বলে রাখি আজ
মোনাফেকিটাও নয়, সাচ্চারাহে
শুরু হোক কাজ'।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ইসলামের নামে যে ভণ্ডামী চলছে, তার এর চেয়ে যোগ্য উত্তর আর কে দিতে পারতেন।

চ. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে রেনেসাঁসের চেতনায় সমৃদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্বোধন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-৭১)

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন যে রেনেসাঁসের ফসল- সে রেনেসাঁস বাংলায় ইউরোপের ন্যায় পূর্ণাঙ্গরূপে সর্বব্যাপি ঘটেনি- ঘটেছিল বিক্ষিপ্ত রূপে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজে, সম্প্রদায়ে- বিভিন্ন সময়ে এবং ভিন্নভিন্ন কারণে ও উপকররেণর মাধ্যমে। পূর্ব বাংলায় ঊনিশ শতকে সূচিত রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত জাগরণ পূর্ণতা পায়-১৯৭১ সনে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৩৮ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা আরম্ভ করলে, ১৯৩৭ সনে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' তথা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান পুরুষ, মনীষী আবুল হুসেন অকালে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোপরি পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে সাময়িককালের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। সক্রিয় ও শক্তিশালী দৈনিক হয়ে ওঠে আজাদ-মোহাম্মদী তথা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি পন্থী পত্র-পত্রিকা, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও লেখক বুদ্ধিজীবিরা। কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ মুজতবা আলীর মত সামান্য ব্যতিক্রম বাদে প্রায় তাবৎ মুসলমানই তখন '*পাকিস্তান চাই*' বলে আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিলেন। বুদ্ধি-যুক্তিবিচার এর পরিবর্তে তখন প্যানইসলামী আবেগ প্রাধান্য পায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একে একে সকলের স্বপ্ন ভাঙ্গে। কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙ্গার নতুন যুগের প্রগিতিশীল চিন্তা-চেতননার বিকাশ ঘটেছিল বাঙালি মুসলমানের একাংশের বুদ্ধিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের রথি মহারথিরা। এই অংশের মধ্যে রয়েছেন মার্কসীয় মতবাদে দীক্ষিত অনুপ্রাণিত তরুণদল। তারা রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক্ষেত্রে নানা আন্দোলন গড়ে তোলেন বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। এদের পাশাপাশি জনমত তৈরিতে কাজ করেছেন সাংবাদিক, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিকেরা। তাই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ও চিন্তাচেতনার বাস্তবায়ন ঘটলো যে স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সনে গৃহীত মহান সংবিধানে, তার পটভূমি তৈরি হয়েছিল ৪৭-৭১ পর্বের পাকিস্তানী রাজনৈতিক কার্যক্রমে। কিন্তু পাকিস্তানী রাজনীতির আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না- যদি না সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার সংশ্লেষ ঘটানো হয়। কারণ পাকিস্তান-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই প্রতিরোধ প্রথমে প্রতিবাদের স্বরূপে উচ্চারিত হয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সকল মতের সংস্কৃতিকর্মীদের বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে জনমত গঠন করতে গিয়ে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিদ্রোহী বাংলার উর্বর ক্ষেত্ররূপে চট্টগ্রাম বহু আগে থেকেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিপোষক চট্টগ্রাম অঞ্চলে কলকাতা থেকে আগত প্রগতিশীল সাহিত্যিক শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদের একটা উজ্জল দল জড়ো হয়েছিলেন, কারণ তখন চট্টগ্রামের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ভাল। তদুপরি তখন চট্টগ্রামে যে সব প্রাগ্রসর ভাবুক চিন্তক কর্মীগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেল, তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য-শুভাকাঙ্খী। বলাবাহুল্য, বিভাগ-পূর্ববর্তী কালেই চট্টগ্রামে সুসংহতভাবে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টির কার্যধারা সচল ছিল।

রাজধানী ঢাকায় আগত সংস্কৃতি কর্মী ও লেখক সাহিত্যিকেরা (অধিকাংশই) সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাকিস্তানী ইসলামী জোসে উজ্জীবিত ও পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তারা ছিলেন নগদ প্রাপ্তির ধান্দায়। প্রগতিপন্থী তরুণেরা মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতনের মুখে শিকড় গাড়তে পারছিলেন না। তবু তারা কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।, যার বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

তরুণেরা কতিপয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রবীণের সমর্থন পেয়ে এ ধারাকে সচল করতে সক্ষম হন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ, (১৮৮৫-১৯৬৯), ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮২), কবি সুফিয়া কামাল (১৯১১-২০..) এবং প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করেছিলেন- যা ১৯৫৩-৫৪ থেকে জোরদার হয়। ১৯৪৭ সংলগ্ন সময় কালে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের

এক উৎসাহী কর্মী আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম) লিখেছেন- 'যখন পূর্ব পাকিস্তানের কোন জায়গায়- এমনকি ঢাকায়ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা ছিলনা- সেই সময়ে চট্টগ্রামে প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনায় হয়।

১৯৪৭ সনের আগেও চট্টগ্রামে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছিল। উপরন্ত বিভাগ-পরবর্তী (৪৭) কালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার এক ঝাঁক কর্মী চাঁটগায়ে এসে একত্রিত হয়ে দেশ ভাগের ফলে উদ্ধাস্তরূপে ভারতগমনের ফলে সৃষ্ট হিন্দুদের শূন্যস্থানে এসে সংস্থাপিত হলেন। এঁদের মধ্যে শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী, কলিম শরাফী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রধান গবেষক চিন্তাবিদ লেখক এবং উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদের অবস্থান আগে থেকেই ছিল। এঁদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ওহীদুল আলম, মাহবুবউল আলম, আবুল ফজল, কবিয়াল রমেশ শীল এবং চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সম্পাদক ননী সেন গুপ্ত, প্রগতি লেখক সংঘের সুধাংশু সরকার, '*সীমান্ত*' পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী এবং সুচরিত চৌধুরীর কথা বলতেই হয়। এঁদের মধ্যে- তরুণতর সংগঠক মাহবুবউল আলম চৌধুরী অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বক্তব্য নিয়ে '*সীমান্ত*' নামে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন ১৯৪৭ সানের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই। সীমান্তর পক্ষ থেকেই সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সনের ১৬-১৯ মার্চ হরিখোলার মাঠে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রগতিশীলতার বদ্ধ দুয়ার যেন খুলে গেল।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দেশের সংস্কৃতি তথা বাংলা ভাষার জন্যে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের নিন্দা এবং যুদ্ধ বন্ধ রাখার এবং শান্তির অনুকূলে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেখানে ঘোষিত হয় যে, প্রগতি শান্তি ও জীবন সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন বদ্ধপরিকর। চট্টগ্রামের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নতুন প্রেরণা দিয়ে টেনে নিয়ে যায় ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পথে। সংঘটিত হয় ১৯৫২ সনে কুমিলায়, ১৯৫৪ সনে ঢাকায়, ১৯৫৭ সনে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বিখ্যাত সব সাংস্কৃতিক সম্মেলন ধ্বনিত হয় অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী সমাজমনস্ক গণতান্ত্রিক চেতনার সুর। এই সাংস্কৃতিক-কর্মকাণ্ডকে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারের ব্রত নিয়ে প্রকাশিত হয় *মুকতি, যান্ত্রিক, অগত্য, স্পন্দন, সমকাল, উত্তরণ, পূবালী, পূরবী, পূর্বমেঘ, পলিমাটি* প্রভৃতি প্রগতিবাদী সাহিত্য পত্রিকা। এতে লিখেছেন আমাদের দেশের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রধান প্রধান লেখকেরা। তারা জনমত সৃষ্টিতে, উদারনৈতিক সমাজ সৃষ্টিতে মনীষীদের চর্চা করেছিলেন বলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বিকশিত হয়েছিল। এই উর্বর মননভূমি তৈরিতে যে সকল কবি-সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছিলেন- তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের সমকালীন লেখকেরা, ছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মনীষী, লেখক- কর্মবীরেরা (কাজী আনোয়ারুল কাদির ও আবুল হুসেন বাদে) ছিলেন পঞ্চাশের দশকে আত্মপ্রকাশিত নতুন মেধাবীরা।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিখা-গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ ৪৭-পরবর্তী সময়ে কলকাতায় অবস্থান করলেও পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিবৃদ্ধিক চর্চার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, কবি আবদুল কাদির পূর্ব বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে ষাট-সত্তর ও আশির দশক পর্যন্ত দোর্দন্ডপ্রতাপে সক্রিয় ছিলেন। এদের সঙ্গে ক্ষুরধার লেখনী ও সৃজনীশক্তি নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন মনীষী আবদুল হক, সিকান্দার আবু জাফর, শওকত ওসমান, আহমদ শরীফ, হাসান হাফিজুর রহমান, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শামসুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, ফজলে লোহানী, ডা. আহমদ রফিক, মুস্তফা নূরুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ। বস্তুতপক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, ডাক্তার লুৎফর রহমান, এস. ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকারী শিখা- গোষ্ঠীর লেখকদের 'সাহিত্য-চর্চার' ফলে, এদের চিন্তাচেতনা বিচার-বিশ্লেষণ করে লেখা

রচনা প্রকাশ করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়া-কর্ম ও কাণ্ড সংঘটিত হয় ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত তাতে ১৯৪৮ সনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মুক্তি-সংগ্রাম এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এটি কোনো একক ব্যক্তি, লেখক, সংগঠক ও সংগঠকের কর্ম ও সাধনার ফল নয়। এটি ছিল জাতীয় সাধনা। এই সাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্মরণীয়, বরণীয় প্রধান হয়ে রয়েছেন বহু ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সঙ্গী সহযাত্রীগণ। সাময়িকপত্র জগতে সওগাত-সমকাল ও তাঁদের সহযাত্রী পত্রিকা-গোষ্ঠী ও তাদের সম্পাদক কর্মকর্তাবৃন্দ।

সাহিত্যক্ষেত্রে লেখকদের অবদানের চেয়ে একালে প্রকাশিত উলিখিত প্রগতিপন্থী সাময়িক পত্রিকাগুলোর অবদান অমূল্য অপরিসীম অভিধায় আখ্যায়িত করতে হবে-কারণ বৈরি পরিবেশে, সরকারের রেষানলকে উপেক্ষা করে তাঁদেরকে সাময়িকীসমূহ প্রকাশ করতে হয়েছিল। একালের পত্রিকার মধ্যে সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছিল *'সমকাল'* আর সর্বাধিক মনীষা, দূরদর্শিতা ও দঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এর সম্পাদক (স্বত্ত্বাধিকারী) কবি সিকান্দার আবু জাফর। তিনি এতে নিজে লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদায়ী গণসংগীত 'জনতার সংগ্রাম চলবেই', ১৯৭১ এরও সাত বছর আগেঃ.....

"আমাদের সংগ্রাম চলবেই
হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই, চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"

বাংলা ভাষার প্রতি মমতা জাগানিয়া শামসুর রহমানের ধ্রুপদী পংক্তি 'দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটিও সমকালেই ছাপা হয়েছিল- (জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৭৫)

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আজো আমার সত্তায়
মমতা নামের পুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলী শৈশবে 'পাখী সব করে রব' বলে মদনমোহন
তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি
অবিচ্ছিন্নঃ পরস্পর মমতায় লীন।
ঘুরেছি কাননে তার নেচে নেচে,
যেখানে কুসুম-কলি সবই ফোঁটে। জোটে অলি ঋতুর সংকেত।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার
ঊনিশ শ বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহিয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেংরার নোংরামি,
এখন তোকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষ-মাস
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

ছ. পাকিস্তান আমলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের সাহিত্য ও সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভূমিকা

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে শিখা গোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখকই 'পূর্ব পাকিস্তান' আমলে সাহিত্য ও সমাজ সংস্কৃতিক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন এমনকি মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম সভার পুরোহিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তথা লাল সূর্যোদয়ের সামান্য আগে (১৯৬৯ সনে) পরলোক গমণ করেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্বোধন সংগীত রচয়িতা ও অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'ধর্মনিরপেক্ষ' স্বাধীন বাংলাদেশে চার বৎসর (অসুস্থ অবস্থায় হলেও) জীবন-যাপন করেছেন (১৯৭৬ এ মৃত্যু)।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী পাকিস্তান আমলের প্রথম দশকে প্রধান-প্রবীণ লেখক হিসেবে জীবিত ছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ পৌরহিত্য করেছেন ১৯৫১ সনের প্রথম প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের। কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির মুক্তবুদ্ধির চর্চা অব্যাহত রাখেন বাংলাদেশের সৃজন মুহূর্ত পর্যন্ত। এদের লোকান্তর ঘটে স্বাধীন বাংলার আশির দশকে। এই সময়ে নতুন যাঁরা বাঙালির চিন্তাজগতে প্রখর পান্ডিত্য ও সৃজনশীল মনস্বিতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়– আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭২–১৯৫৩), আবদুল হক (১৯২০–) আহমদ শরীফ (১৯২১–১৯৯৯), বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬) আনিসুজ্জামান (১৯৩৭), আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪) প্রমুখের নাম।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১–১৯৫৩)

বাঙালির চিন্তাচেতনার ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস-পরিক্রমায় আবদুল করিম (১৯৭১–১৯৫৩) কে আমরা পাই 'সাহিত্য বিশারদ' 'গবেষক' ও অন্যতম প্রধান বাঙালি-চিন্তাক-ভাবুক লেখক হিসেবে। তিনি বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ ও উদঘাটন করেছেন 'ধর্মনিরক্ষে' দৃষ্টিতে। সমাজ গঠন করতে চেয়েছেন অসাম্প্রদায়িক অখণ্ড বাঙালির সংস্কৃতির ভিত্তিতে। তিনি ছিলেন প্রকৃত পক্ষেই বাঙলার নবজাগরণের ধারার একজন মহৎ লেখক। প্রচলিত চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন কামী কর্মযোগী মনীষী, রামমোহন রায়ের যুক্তিবিচার ও মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগ তাঁর সকল রচনাতেই লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের নামে প্রচলিত সামাজিক আচার আচরণসমূহকে সুনীতি ও কুরুচির দিক থেকে আপত্তিকর ও ভদ্রসমাজে বহাল থাকার বিরুদ্ধে কেবল মত দেওয়া হয় না, বাস্তব কর্মযোগ গ্রহণ পূর্বক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামও করেছিলেন আবদুল করিম। তাঁর চিন্তা ও কর্ম গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছিল।

উনিশ শতকে আবির্ভূত মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দ ও তাদের পত্র পত্রিকা ও কার্যাবলি বাঙলার জাগরণের ইতিহাসে খুব তাৎপর্যমণ্ডিত কিছু নয় বটে, কিন্তু তা দিয়েই সূচনা করা হয়েছিল মুসলমানদের জাগরণের অভিযাত্রা। এই ধারার বিশ শতকের গোড়াতেই মুসলিম সম্পাদিত 'নবনূর' (১৯০৩) প্রকাশিত হয়– যাতে লিখে সমাজের কু-প্রথাও অধর্মসমূহ– ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল– সেগুলোকে লেখক ও সম্পাদকগণ দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ শুধু নবনূরেই লেখেননি, তিনি তৎকালীন প্রকাশিত হিন্দু ও মুসলমান সম্পাদক-প্রকাশকদের প্রকাশিত প্রায় সকল কাগজই বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির আদিরূপ ও উৎসের সন্ধানমূলক রচনাবলি লিখে চলেছিলেন। ১৯১৮-তে প্রকাশিত 'সওগাত' পত্রিকায় তাঁর নাম সম্পাদক (যৌথ) হিসেবে ছাপা হয়েছে 'ইসলামাবাদ' নামে একটি কাগজও তিনি সম্পাদনা করেন। তাছাড়া- কোহিনূর সাধনা পূজারি প্রভৃতির সাথেও যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কাগজ সম্পাদানার চেয়ে আবিষ্কৃত পুথির পরিচয় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করে জাতির সামনে বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতেই আনন্দবোধ করতেন তিনি।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্ম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সুচক্রদন্ডী গ্রামে। তাঁর পূর্ব পুরুষ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এফ.এ

বা উচ্চ মাধ্যমিক পড়েন বটে। কিন্তু পাশ কা হয়নি। ১৮৯৫ সন থেকেই তিনি কর্মজীবনের স্কুল-শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। প্রায় দশ বছর তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের কেরানি হিসেবে চাকুরি ধারণ প্রায় ২৮ বছর। ১৯৩৪ সনে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন এবং সাহিত্য সেবার মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৫৩ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পড়ুয়া বালক আবদুল করিম বাংলার জাগরণের বাহক সকল সাময়িকপত্র শৈশবেই পড়ার সুযোগ নন। তিনি মেধাবী, সৃজনশীল। পরিশ্রমী সাহিত্যিক ছিলেন। লেখক জীবনের শুরু থেকেই তিনি সুধা মহলের সপ্রসঙ্গ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

বিশ শতকের প্রারম্ভে বিদ্যাবুদ্ধি, সামাজিক প্রতিপত্ত সবদিক দিয়ে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে কয়েকজন মাত্র বুদ্ধিজীবী-লেখক সমাজ-সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হন। আধুনিক কালের প্রথম লেখক (মুসলিম) মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম ১৮৪৭ সনে, আর তাঁর বিখ্যাত, বিষাদ সিন্ধু, বের হয় ১৮৮৫–৯১ সময়কালে। ১৯১০–১৫ এর মধ্যে মুসলিম সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন কায়কোবাদ, মুন্সী জমীরউদ্দিন, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মোজাম্মেল হক। মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুল রহিম, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ এমদাদ আলী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, নজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। এঁদের দ্বারা কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগেই মুসলিম জাগরণের কাজ সূচিত হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সমাজে জাগরণ ঘটাতে হলে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। আবদুল করিম তাই সকল পত্রপাত্রিকার কর্তাদেরই উৎসাহ দিতেন। জানা যায়, প্রায় ৪০টি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। জানা যায়, প্রায় ৪০টি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। প্রধান, অপ্রধান, মফস্বলীয়, নাগরিক–শহুরে, ডান-বাম-ধর্মপন্থী–সকল পত্রপত্রিকার লেখক এবং হাতে লেখা পুথির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত পত্র পত্রিকার, পুস্তক-প্রস্তিকারও মহৎ সমঝদার। সংরক্ষক ছিলেন তিনি। গোটা বাংলায় এই চরিত্র্যের সাহিত্যসেবী খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি, বাঙালি জাতীয়তাবাদী। খণ্ডিত বাংলার জাগরণকে পূর্ণতাদানের জন্যেই তার মুসলিম ঐতিহ্যানুসন্ধান। কোনো বড় ইঞ্জিনিয়ারই পোক্ত ফাউন্ডেশন ছাড়া বিল্ডিং গড়ার কাজে হাত দেন না। আবদুল করিমের দৃষ্টিতেছিল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সম্ভাবনাময় বৃহত্তর বাঙালি জাতি। আমৃত্যু তিনি এই আদর্শে নিষ্ঠ ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে সে-চেতনাবোধে উজ্জীবিত হয়ে বাংলার ঐতিহ্য সংস্কৃতির সন্ধানেও সম্প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন– বিশ শতকের পাঁচটি দশকের পর্বে-পর্বে তারই তিনি বিকাশ ঘটিয়েছেন ছয় শতের বেশি প্রবন্ধ, নিবন্ধ, টীকা-ভাষ্য ও তের-চৌদ্দটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়।

আবদুল হক (১৯২০–১৯...)

পাকিস্তান আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক তিনি। তাঁর চিন্তা ধর্মভাবমুক্ত, সংস্কারমুক্ত, অনাচ্ছন্ন এবং যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানবুদ্ধি আশ্রিত। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক 'বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে তাঁকে চিহ্নিত করেছেন 'ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সার্থক উত্তর সাধক' বলে। আবুল কাসেম ফজলুল হক আরো অগ্রসর হয়ে বলেছেন– উত্তরসাধক তিনি ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার রেনেসাঁসেরও। বাংলাভাষার মুসলিম লেখকদের চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলোকে কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থের সম্পূরকরূপে গণ্য করা যায়।

জাগরণপন্থী মনীষী আবদুল হক পাকিস্তান আমলে লেখক হিসেবে পালন করেন জাতির দিক-দর্শকের ভূমিকা। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশে, পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের মুখোশ-উন্মোচনে, বাঙালীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা তৈরির প্রয়োজনে কর্ম-পন্থা নির্ধারণে, সময়ের প্রয়োজনে যখন যা করা দরকার, কখন কী করতে হবে–তা তিনি খুব ভাল বুঝতেন। তাই তিনি যত কষ্টই হোক, স্বনামে ও বেনামে প্রবন্ধ লিখে সাময়িকপত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে তিনি হয়ে রয়েছেন কালের দাবি পূরণকারি এক অমর সাহিত্যিক। আবুল কাসেম ফজলুল হকও মূল্যায়ন করেছেন সেভাবেই– "পাকিস্তান আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক তিনি। সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কোলাহলের বাইরে নিভৃতে অবস্থান করেছেন তিনি। তবু এসব বিষয় নিয়েই চিন্তা করেন। বাস্তব পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা, তথ্য, যুক্তি ও তত্ত্বকে ভিত্তি করে প্রসারিত তাঁর চিন্তা। নানা বিষয়ের প্রতি তার অনুরাগের পরিচয় আছে তাঁর প্রবন্ধাবলিতে। তবে স্বদেশচিন্তাই প্রধান। চিন্তার সততা, বিবেকনিষ্ঠা, যুক্তি পরায়ণতা, শ্রম আন্তরিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও লোকহিতকর চেতনা আর বক্তব্যের গুরুত্ব এবং সহজ সরল অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গি এই লেখকের প্রবন্ধের গুরুত্ব লাভের কারণ। সৃষ্টিশীল গবেষক-অনুসন্ধিৎসুর পরিচয় আছে তাঁর লেখায়। ১৯৮০ র দশক পর্যন্ত তাঁর তিনটি বই মাত্র প্রকাশিত হয় আর বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর

মৃত্যুর পরে। কিন্তু পাকিস্তান আমলে 'সমকাল' পত্রিকাতে নামে ও বেনামে তিনি পূর্ব বাঙলার স্বার্থ নিয়ে যে-সকল রচনা প্রকাশ করেন– তাতেই পাকিস্তানের ভিত্তিভূমি গুঁড়িয়ে যেতে থাকে– গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উর্বর ক্ষেত্র। লেখক জীবনের ব্রত কী হবে– এই বিবেচনার ক্ষেত্রে তার একমাত্র সাধনা ছিল 'স্বদেশ'। স্বদেশের হিত ও মুক্তিকামনায় তিনি ছিলেন একাগ্রচিত্তসাধক। তাঁর একটি প্রবন্ধগ্রন্থের ভূমিকায় প্রথমেই তিনি লিখেছেন– 'সাহিত্য, সংস্কৃতি অথবা বৈদেশিক প্রসঙ্গ, বিষয়বস্তু যাইহোক, এ-সংকলনের প্রায় সব প্রবন্ধেরই ধ্রুব নক্ষত্র স্বদেশ।"

এই উক্তির ওপর জনৈক বিখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন : "পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়, সকল রচনাতেই আবদুল হকের ধ্রুব নক্ষত্র স্বদেশ।" তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানকে স্বদেশ ভাবতে পারেননি আবদুল হক। পাকিস্তানে বাস করেও তাই তিনি শুধু বাঙালি সত্তার কথাই ভেবেছেন। বাঙালির শক্তি, সম্ভাবনা, দুর্বলতা, আত্মবিকাশের অন্তরায় নানা কুসংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে আজীবন চিন্তা করেছেন তিনি। লেখার মাধ্যমে বাঙালির মহান সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে বক্তব্য প্রকাশ করলেও কখনো কখনো ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি– সম্পাদকের ঘাড়ে বিপদের ঝুঁকি ন্যস্ত করার সুবিধা নিয়ে।

পাকিস্তানবাদী মুসলিম জাতীয় চেতনার উচ্ছ্বাসের যুগে বাঙালি চেতনাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই সকল বাঙালি মুসলিম লেখকের চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন, যাঁরা পাকিস্তান-আন্দোলনের কালে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করতেন না। কিংবা পাকিস্তান-আন্দোলনের অনেক পূর্ব থেকেই যাঁদের চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিল। বেগম রোকেয়া, এস. ওয়াজেদ আলি, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের চিন্তাধারাকে এজন্যেই তিনি অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের লেখা থেকে প্রয়োজনীয় কথা তিনি নিজের লেখায় উদ্ধৃত করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, আবদুল হকের চিন্তাধারা মূলত বাঙালি মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কিন্তু তাঁর চিন্তার আপতকেন্দ্র মুসলিম সমাজ হলেও তার চিন্তায় কোনরকম ধর্মভাব কিংবা সাম্প্রদায়িক বোধের উপস্থিতি নেই। বাঙালি মুসলমান সমাজকে মুসলিম জাতীয়তাবোধের এবং ধর্মীয় সংস্কারের আবর্ত থেকে মুক্ত করার এবং ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থায় উন্নীত করার উদ্দেশ্যেই এটা তাঁকে করতে হয়েছে।

আবু রায়হান ছদ্মনামে আবদুল হক অগ্রহায়ণ ১৩৭১ সংখ্যা সমকালে ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পরাজয়ের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন ঃ

"সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের সংখ্যা বেশী হওয়া এবং প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অর্থ আজ হোক কাল হোক, কোনো পূর্বপাকিস্তানী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য বর্তমান অপেক্ষা অনেক খর্ব হয়ে যাওয়া। অতএব ওখানে কিছু গণতন্ত্রমনা লোক থাকলেও অধিকাংশ লোক সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাইতে পারে না। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে নির্বাচনী ঐক্য গড়তে গিয়ে পূর্বপাকিস্তানের মৌল স্বার্থকে চাপা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফল এখন এই প্রদেশের জনসাধারণকেই ভুগতে হবে।"

সমকালে আবুল ফজল, আহমদ শরীফ, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, একে নাজমুল করিম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিসুজ্জামান, কামরুল হাসান, আবদুল্লাহ আলমুতী, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল গণি হাজারী প্রমুখ লিখতেন। সমকালই একমাত্র কাগজ যাকে ঘিরে এই হতাশাপ্লাবিত, ক্লান্তিভরা, উদ্দেশ্যবিহীন দেশে চলেছে কিছু সাহিত্য চর্চা। এছাড়া সমকাল এর পাতায় দেখতে পাচ্ছি– আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে, সমাজসংগঠন ও রাজনীতির ধারাকে বুঝে দেখবার, বিষয়গতভাবে আলোচনা করবার একটা প্রচেষ্টা। এটা সৃজনী সাহিত্য না হলেও এর প্রয়োজন ছিল তখন অপরিসীম। কারণ এপথেই ঘটেছে আমাদের আত্মজ্ঞান ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি—স্বাধীনতা। আর এই কর্মযজ্ঞের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন মনস্বী লেখক আবদুল হক। তাঁকে ঘিরে ছিলেন অনেক প্রগতিশীল লেখক– যাঁরা অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বাংলাভাষী উন্নত 'স্বদেশ' তথা 'বাংলাদেশ' সৃষ্টির সাধনা করেছেন গোটা পাকিস্তান আমল জুড়ে, ইতিহাসে তাঁর সাক্ষ্য রয়েছে।

আহমদ শরীফ (১৯২১–১৯৯৯)

বাংলার জাগরণের সার্থক উত্তর-সাধক চিন্তাবিদ গবেষক আহমদ শরীফ। তাঁর প্রিয় পুরুষ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র-নজরুল। ভিন্ন দৃষ্টিতে কালের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে বাঙলার সকল প্রধান লেখক সম্পর্কেই তিনি স্বকীয় মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তা গতানুগতিক বিচারের পরিপন্থী। ফলে তা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় সকল প্রসঙ্গেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্বদেশ-প্রেমের তাড়নায় নিজস্ব মতামত লিখিত রচনার আকারে প্রকাশ করে পাঠক-চিত্তকে পরিবর্তিত

করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে মধ্যযুগের মুসলিম লেখকদের রচনাবলি থেকে জগৎ ও জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন সেরকম চিন্তাবলির সন্ধান করেছেন। মৌলিক প্রবন্ধ লিখেও তিনি যুক্তিবাদী মানবতাবাদী দার্শনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আবুল কাসেম ফজলুল হক 'বাংলাদেশের প্রবন্ধ' গ্রন্থে আহমদ শরীফের রচনাবলিকে উচ্চমূল্য দিয়ে সমালোচনা লিখেছেন ঃ "শিক্ষক, গবেষক ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তিরূপে বিশেষভাবে পরিচিত হলেও একালের একজন প্রধান প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ হিসেবেও আহমদ শরীফের পরিচয় সামান্য নয়। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত তার বিচিত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা এবং জীবনে সমাজে সাহিত্যে– এই চারটি প্রবন্ধগ্রন্থ পাঠকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।"

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরেও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রায় ৩০টি মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থ এবং সম্পাদিত হয়েছে কতিপয় মধ্যযুগীয় গ্রন্থাবলি। এছাড়াও রয়েছে বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও বাঙালির ইতিহাসের পুনর্ভাবনা বিষয়ক বিপুল গবেষণাকর্ম ও প্রবন্ধ। আহমদ শরীফের সাহিত্য-চিন্তার আরম্ভ 'অকেজো সাহিত্যের' প্রতি অনুরাগ ও সমর্থন নিয়ে, প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আছে এই প্রবণতায়। কিন্তু ক্রমে তিনি 'কেজো সাহিত্যের' প্রতি আকৃষ্ট ও অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমদিকে তিনি 'শিল্প শিল্পের জন্য' এই তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। কিন্তু ক্রমে এই তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করে আরো অগ্রসর চিন্তার দিকে এগিয়েছেন। লক্ষ্যযোগ্য যে, যে-সময়ে তিনি বুর্জোয়া সাহিত্য ও গণসাহিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন, সে সময়ে বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রাবন্ধিক এসব বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেননি। এই চিন্তা তখন ছিল অগ্রসর চিন্তা।

পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদী লেখকদের ধর্ম, জীবনাদর্শ, সংস্কৃতি, জাতীয়তা সমাজ, সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য তিনি খণ্ডন করেছেন এবং স্পষ্টভাবে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। পুরাতন ও প্রচলিতের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ সোচ্চার। তাঁর মতে, "যাঁরা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অতীতরূপের ধ্যানে আসক্ত, কিংবা বর্তমান রূপের অনুরাগী ও অনুগত তারা জীবনবিমুখ, প্রগতিভীরু। তাদের বুদ্ধি স্বল্প, দৃষ্টিক্ষীণ ও বোধ অগভীর। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন লোকের সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।"

চিন্তাবিদ আহমদ শরীফ, সকল সময়ে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে, আর ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্বে তিনি তাঁর ধারণা অনুযায়ী নতুন আর ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। নতুনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল তীব্র, অনুসন্ধিৎসা ছিল অপরিমিত এবং নতুনের লালনে তিনি ছিলেন সদাসচেষ্ট। ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-কুৎসিত, ভালো মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয় তাঁর সচেতনতা অতিশয় তীব্র আকারে প্রকটিত আছে তাঁর রচনাবলীতে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের মূল্যায়নে : "রেনেসাঁস পন্থীদের মতই সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ধর্মভাব ও রক্ষণশীলতার তিনি ঘোর বিরোধী। তাঁর রচনায় প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অস্বীকৃতি অত্যন্ত প্রবল, স্পষ্ট ও সোচ্চার। একটা লোকহিতকর প্রবণতা আর সর্বজনীন কল্যাণচিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা অবশ্য সর্বত্র বর্তমান। তবে তাঁর প্রবন্ধে চিন্তার নেগেটিভ দিকটি যত স্পষ্ট, পজেটিভ কোনো দিক তেমন স্পষ্ট নয়। আহমদ শরীফ মনে করেন–

"দুটো বহুল-প্রচলিত জনপ্রিয় আপ্তবাক্যের পুনর্বিবেচনা দরকার এবং লোকশ্রুত আস্থার দুর্গে আঘাত হানার জন্য জরুরি। এর একটি হচ্ছে 'ঐতিহ্য প্রেরণার উৎস' এবং অপরটি হচ্ছে– "ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়"। এই ধরনের প্রকাশভঙ্গিতে লেখকের প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় দুঃসাহসী প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্ত বকে পরিবর্তন করতে অভিলাষী তিনি।

আহমদ শরীফের অনেক প্রবন্ধেই তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে। তাঁর দৃষ্টিতে-

> এই পুরনো পৃথিবী প্রতি মানুষের চোখে নতুন করে দেখা দেয় বলেই পৃথিবী সুন্দর। প্রতিটি জীবন নতুন করে আবিষ্কার করে আপনার ভুবন। নতুন জীবনের চাহিদা মিটাতে দেশগত ও কালগত জীবনের অনুগত করে বদলাতে হয় ধর্মনীতি, সমাজরীতি ও রাষ্ট্রবিধি। প্রাণের সচলতার প্রতীক হচ্ছে সৃজনশীলতা–নতুনের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের দিকে এগুবার আগ্রহ। জরা ও জড়তার ধর্ম হচ্ছে অতীতকে ও স্থিতিকে আঁকড়ে ধরে রাখা। কেননা জরা ও জড়তার ভবিষ্যত নেই, কেবল অতীতের স্মৃতিই থাকে। ভবিষ্যতে তাঁর মৃত্যুত্রাস, অতীতে তাঁর মধুর স্মৃতি। পূর্বপুরুষের দানে নয়, মানুষকে বাঁচতে হয় স্বকালে স্বদেশে স্বকীয় সৃষ্টিতে। অন্যের কৃতির ফল ভোগ করার গ্লানির মধ্যে নয়, নিজের কৃতি ও কীর্তির উল্লাসের মধ্যে বাঁচাই যথার্থ বাঁচা। মানুষের এ-ই কাম্য।"

জীবনকে সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করে সাহসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মোকাবিলা করাকেই জীবন-যাপনের প্রকৃষ্ট পথ বলে মনে করেন তিনি। এজন্য নিরীহ জীবনের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা নেই। তাঁর মতে, "জীবন-জীবিকার কোনো ক্ষেত্রেই যে অপরের প্রতিযোগী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সে-ই নিরীহ।" এই নিরীহকে তিনি মনে করেন 'অনুকম্পেয়'। আর 'নিরীহ কারো ঈর্ষা-অসূয়ার পাত্র নয়। নিরীহ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণাবঞ্চিত, আত্মপ্রসারের প্রত্যাশা মুক্ত।'

লেখকের (আহমদ শরীফ) মনে প্রশ্ন জেগেছে :

আত্মসচেতন ও প্রতিষ্ঠাকামী মানুষ নিরীহের অস্তিত্ব স্বীকার করে কী? সম্ভবত উপেক্ষাই করে। প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী ছাড়া কেইবা কাকে হিসেবে ধরে? নিরীহের নিস্নর্দ্বন্দ্ব, নির্বিঘ্ন, নিস্তরঙ্গ জীবনে শান্তি-সুখের স্বরূপ কী? সাফল্যের যে সুখ, বিজয়ের যে আনন্দ, তা থাকে অনাস্বাদিত। প্রতিষ্ঠাকামীর সংঘাত-সংঘর্ষ সংকুল জীবন কি কেবল দুঃখের ও যন্ত্রণার? তাহলে কিসের নেশায় তারা স্বেচ্ছায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়? নিরীহের যে শান্তি-সুখ, তা সুলভ স্বস্তির আরাম। আর কাঙ্ক্ষীর যে সুখ,তা দুর্লভকে লাভ করার আনন্দ প্রসূত। এসুখ সহজলভ্য নয়, এ সুখের স্থিতি অনন্যতায়, অসামান্যতায়। সোনা যে মূল্যবান, তা সুন্দর বলে নয়, দুর্লভ বলে; রূপা যে সস্তা, তা অকেজো বলে নয়, সুলভ বলে; হীরার দাম তার দুর্লভতায়, কাচ কাজের হয়েও কদর পায়না কেবল প্রাচুর্যের কারণে।"

নতুন-নতুন সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা ও অকৃত্রিম স্বদেশভাবনা আহমদ শরীফের সাহিত্য-সাধনার ও জ্ঞান সাধনার একটি বিরাট অঙ্গন জুড়ে আছে। পাকিস্তানকালে বাঙালি জাতীয়তাবোধের জাগরণের কালে প্রকাশিত 'স্বদেশ অন্বেষা' ছাড়াও সকল গ্রন্থেই তাঁর স্বদেশ-ভাবনার পরিচয় বিধৃত। তাঁর কিছু বইয়ের শিরোনাম দেখলেই আমরা তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র্য ও নতুনত্ব অনুধাবন করতে পারব, যেমন– বিচিত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ-অন্বেষন, জীবনে সমাজে সাহিত্যে, সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, যুগ-যন্ত্রণা, কালিক-ভাবনা, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, কালের দর্পণে স্বদেশ, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, বাঙলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন, ইদানীং আমরা এবং আরো ইত্যাদি, বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা, বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, একালে নজরুল, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র, মানবতা ও গণমুক্তি, সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা, গণতন্ত্র সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য বিচিত্রভাবনা, বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব, জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূণ, সংস্কৃতি, শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি, সংকট: জীবনে ও মননে, মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়, প্রগতির বাধা ও পন্থা, এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা, সময় সমাজ মানুষ, দেশকাল জীবনের দাবি ও লক্ষ্য, স্বদেশচিন্তা, জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা, উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্ত া, মানস-মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ, স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র, বিশ শতকে বাঙালী প্রভৃতি।

আহমদ শরীফের গবেষক-চারিত্র্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই বাঙালির ইতিহাসের কিছু জটিল গ্রন্থি তিনি উন্মোচন করেছেন। জাতীয় ইতিহাসের নানা বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করে তুলে ধরেছেন জাতির সামনে ধর্মনিরপেক্ষ সত্যসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে। ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয়– বিশেষ করে আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাঙালির ইতিহাস। তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায়, সকল ধর্ম, আদর্শ, সংস্কৃতি তিনি সমান দরদ দিয়ে উপলব্ধি করে এ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতিবোধের ক্রমবিকাশের ধারা তিনি উন্মাচন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। চমকিত হতে হয় তাঁর যুক্তিসহ বিশ্লেষণ ক্ষমতা দেখে, কি অনায়াসে তিনি সমাজে প্রচলিত পুরাতন সনাতন ও মানুষের মনের কন্দরে বহুকাল ধরে লালিত-শ্রদ্ধেয় স্থিত যে-কোনো বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্গে প্রয়োজনবোধে আঘাত হেনেছেন দ্বিধাহীন অকুণ্ঠিত চিত্তে।

চিন্তাবিদ আবুল কাসেম ফজলুল হকের বিচারে আহমদ শরীফের জীবন জগত সম্পর্কে নিজস্ব সামগ্রিক একটি তত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু তা বিক্ষিপ্তভাবে বিধৃত রয়েছে তার সকল রচনাতে। তাঁর চিন্তার সততা ও স্বতস্ফূর্ততা প্রকাশের মাধ্যমে সৎ সাহসের প্রকাশ ঘটাতে দেখা যায়। নির্দ্বিধায় অকপটে মত প্রকাশ করে তিনি সকল রাজনৈতিক দল, নীতিবান দার্শনিক ও শিক্ষিত সজ্জনের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়েছেন কিন্তু তাঁর সকল রচনারই কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার অনুকূল।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১)

বদরুদ্দীন উমর পাকিস্তান আমলে মুক্তবুদ্ধির চেতনাধারায় উজ্জীবিত একজন প্রগতিপন্থী উদারনৈতিক চিন্ত াবিদ লেখক হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেন, যদিও তিনি তমদ্দুন মজলিসের (১৯৪৭) সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরে তিনি কোনো দলের প্রতি অনুগত না থেকে উদারনৈতিক একাডেমিক গবেষক লেখকের ন্যায় দেশের ও জনগণের উন্নতির অগ্রগতির লক্ষ্যে বাংলাভাষা, বাঙালির সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও মানস-মুক্তি তথা 'বাংলাদেশ-ভাবনা'য় মগ্ন হয়ে যান। পাকিস্তানকালে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭), সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৮) ও পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৭০, প্রথম খণ্ড) রচনাকালে তাঁর মতাদর্শ ছিল সার্বজনীন কল্যাণ এবং তার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনর্গঠন। এসব গ্রন্থে তাঁর প্রতিবাদী, আদর্শ সন্ধিৎসু, সত্যসন্ধ, সাহসীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল রচনা যখন ষাটের দশকে 'পূর্বমেঘ' (১৯৬০) ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল– তখনই পাকিস্তানপন্থী অধ্যাপক লেখক, চিন্তক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন

প্রমুখ বিতর্ক তুলে প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন। কিন্তু বদরুদ্দীন উমর খুব কঠোরভাবে অসহিষ্ণুস্বরে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে সেসব অগ্রাহ্য অবহেলা করেছিলেন। তখন অন্য লেখকদের তুলনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অনেক পরিচ্ছন্ন ও অগ্রসর। বদরুদ্দীন উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় (৫/১) প্রকাশিত হলে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রতিক্রিয়া লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে পরোক্ষভাবে বদরুদ্দীন উমরের চিন্তাধারার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সহায়তা করে–

> "জনাব বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধগুলো পড়ে মনে হলো আমরা যেন ত্রিশ বছরের আগেকার অতীতে ফিরে গেছি। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে পাক-ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের পেছনে মূল প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষবাসীরা এক জাতি কিনা এবং ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর বাস তারা ইউরোপীয় অর্থে জাতি না সম্প্রদায়? মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বের থিউরি যখন প্রথম উত্থাপিত হয় তখন সমালোচক দল এ কথাই বলেছেন যে, লীগ একটা সম্প্রদায়কে জাতি আখ্যা দিয়ে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আর কোনভাবেই সমাধান করা গেলনা তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান এবং ভারত এই দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।"

বদরুদ্দীন উমরের, 'সাম্প্রদায়িকতা'র সারমর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন : "..... সারমর্ম এই যে, 'আমরা পাকিস্তানীরা জাতীয়তাবাদ যাকে বলছি সেটা আসলে সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। মুসলমানেরা একটা ধর্মীয় গোষ্ঠী। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কোন অর্থেই তাদের জাতি বলা যায় না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণেই (যাকে এ্যাকসিডেন্ট বা দুর্ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা চলে) এই গোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এর পেছনে ছিল ইংরেজদের ভেদ-নীতি এবং মুসলমানদের শিক্ষাগত অনগ্রসরতা। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রশ্রয় এবং সমর্থন না পেলে এরা কখনও এভাবে প্রাধান্য লাভ করত না।"– ইত্যাদি।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যের ('সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধের) প্রেক্ষিতে আরও বলেন :

বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্যে জাতীয়তাবাদের সত্যকারের কোনো সংজ্ঞা নেই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র সংজ্ঞানুযায়ী জাতিত্বের দাবি করতে পারেনা। 'সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষাকে জাতীয়তাবাদের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রশ্ন তোলেননি। ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষে কোন ঐক্য নেই এবং শুধু ভাষা নয়, নৃতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেও এদেশে রয়েছে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সমষ্টি। তবু বদরুদ্দীন উমরদের মনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হয়না। অথচ বিনা দ্বিধায় এঁরা বলছেন যে, পাকিস্তান অবাস্তব বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তফাৎ কোথায়? পাঞ্জাবি হিন্দু এবং আসামি হিন্দু অথবা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-ভাষী হিন্দু কোন্ যুক্তিতে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে– তা স্পষ্ট নয়। .... আসল কথা .... বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্য কোন যুক্তি বা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।"

বদরুদ্দীন উমর জবাব দেন : "তাঁর এ আলোচনা পড়ে যেকোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকেরই মনে হবে যে, আমরা প্রায় চৌদ্দশো বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গেছি। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ... সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন আলোচনা কালে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছেন যে বইটিতে আমি শুধু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কথাই বলেছি, মুসলমানদেরকেই সবকিছু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছি।....."

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে ও পশ্চিম বাংলায় ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর অবদানের মূল্য বিচার নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে, সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারায় রচিত হয় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ'। 'বাংলাদেশের চিন্তার নতুন ধারা ও নতুন মূলবোধ সৃষ্টিতে এগ্রন্থ একটি বিশিষ্ট উদ্যোগ।"

তাঁর অপরাপর রচনাবলীতে আছে : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক (১৯৭২), বাংলাদেশে কমুনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা (১৯৭৪), যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ (১৯৭৬), যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ (১৯৭৬), ভাষা-আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮০) বাংলাদেশে মার্কসবাদ (১৯৮১), বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক (১৯৮৭), ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন (১৯৮৪), মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮৬), বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (১৯৮৭), বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা (১৯৮৭), বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার (১৯৮৯), বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি (১৯৮৯) প্রভৃতি।

তাঁর রচিত গ্রন্থ-প্রবন্ধ-গবেষণা সন্দর্ভগুলোর শিরোনামই বলে দেয় তিনি সমাজ সংস্কৃতি নবনির্মানের প্রচেষ্টায় নিরত এক অসামান্য বুদ্ধিজীবী : যেমন তিনি লিখেছেন– সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮৯), পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা; বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে, নব্বইয়ের নাগরিক বুর্জোয়া অভ্যুত্থান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, আমাদের ভাষার লড়াই প্রভৃতি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬)

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পঞ্চাশের দশক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরলসভাবে সৃজনশীল লেখক-গবেষক ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করে আসছেন। ১৯৪৭ সালে গঠিত তমদ্দুন মজলিশ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সিরাজুল ইসলাম। ৫২'র ভাষা-সৈনিক হিসেবেও তাঁর রয়েছে অনবদ্য ভূমিকা। তখন 'দ্যুতি' (১৯৫২) নামের একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে একাত্ম হন তিনি। সম্পাদনা করেন পূর্ব বাঙলার অন্যতম প্রধান পত্রিকা 'পরিক্রম' (১৯৬২-৭০)। এসবের মাধ্যমে পাকিস্তানি আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চালনে তাঁর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া তাঁর নিজের বিরাট লেখকসত্তা দ্বারা অসংখ্য প্রবন্ধ, গ্রন্থ লিখে, সভা-সেমিনারে জাগরণমূলক বক্তৃতা দিয়ে, সৃজনশীল অধ্যাপকের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গত প্রায় ছয়/সাত দশকের বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসরমান চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে তিনি অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর রচনাবলীর তালিকাও দীর্ঘ হবে, যদি সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যদি সামগ্রিক অবদানের কথা বিবেচনায় রেখে আবুল কাসেম ফজলুল হক রচিত 'বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য' গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে মন্তব্য করা যায়,– তাহলে এভাবে বলা চলে, সাহিত্যকে তিনি জীবন-বিচ্ছিন্ন সমাজ-বিচ্ছিন্ন, দেশকাল নিরপেক্ষ কোনো কল্পলোকের বিষয় বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, জীবন সমাজ ও দেশকাল থেকে নিঃসৃত হয়েও সাহিত্য সর্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদনের ধারক হতে পারে। তবে এই সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতাও যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শ্রেণি, স্থান ও সময়ের অধীন, তারও স্বীকৃতি আছে তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীতে।

সাহিত্যের কলাকৌশলগত দিকের প্রতি পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিয়েও তিনি বক্তব্য ও বিষযবস্তুর মূল্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তবে প্রবন্ধে বিধৃত চিন্তা ও মতামতের চেয়ে তার সুন্দর রচনারীতিই পাঠকদের আকৃষ্ট করে বেশি। পর্যবেক্ষণ করলে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাহিত্য চিন্তার ও সামাজিক, সাংগঠনিক সংযোগের একটি স্পষ্ট ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চিন্তায় রয়েছে সূক্ষ্মতা। তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি চিন্তায় ক্রমবিকাশের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। লেখকজীবনের মাঝখানে এসে তিনি মার্কসীয় সাহিত্য ও শিল্পচিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তবে তার দৃষ্টি কোথাও আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। পশ্চাৎবর্তী চিন্তা অতিক্রম করে ক্রমেই তিনি এগিয়ে চলেছেন অগ্রসর চিন্তার দিকে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিশেষ করে জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনাগুলোতে।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অন্বেষণ (১৯৬৪), দ্বিতীয় ভুবন (১৯৭৩), নিরাশ্রয় গৃহী (১৯৭৩) আরণ্যক দৃশ্যাবলী (১৯৭৪), অনতিক্রান্ত বৃত্ত (১৯৭৪) প্রতিক্রিয়াশীলতা। আধুনিক ইরেজি সাহিত্য (১৯৭৫), শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ (১৯৭৫), আমার পিতার মুখ (১৯৭৬), বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক (১৯৭৬), কুমুর বন্ধন (১৯৭৭), উপর কাঠামোর ভেতরই (১৯৭৭), বেকনের মৌমাছিরা (১৯৭৮), স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি (১৯৭৯) একই সমতলে (১৯৮০), উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ (১৯৮০), স্বাধীনতার স্পৃহা, সাম্যের ভয় (১৯৮১), বাঙালী কাকে বলি (১৯৮২), বাঙালীকে কে বাঁচাবে (১৯৮৩), বৃত্তের ভাঙাগড়া (১৯৮৪), টলস্টয় অনেক প্রসঙ্গের কয়েকটি (১৯৮৫), নেতা, জনতা ও রাজনীতি (১৯৮৬), গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ (১৯৮৭), শেষ মীমাংসার আগে (১৯৮৮), উদ্যানে এবং উদ্যানের বাইরে (১৯৮৯), শ্রেণি সময় ও সাহিত্য (১৯৯০), রাষ্ট্রের মালিকানা (১৯৭৭) প্রভৃতি। তাছাড়া তিনি গল্প-উপন্যাস লিখেও সমাজ-গড়ার স্বপ্ন পূরণের প্রয়াস পেয়েছেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের একজন সার্থক উত্তরসূরি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী নানাভাবে সক্রিয় আছেন আমাদের মানসমুক্তির সাধনাতে। একজন অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-নায়ক হিসেবে তাঁর অবদান অপরিসীম।

আনিসুজ্জামান (১৯৩৭)

জাগরণপন্থী গবেষক, অখণ্ড বাঙলার মনীষা-সন্ধিৎসু এক অনন্য চিন্তাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। উনিশ শতকের মুসলিম মানসের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশে যে সমস্ত গবেষণা কর্ম হয়েছে তাঁর মধ্যে পথিকৃৎ লেখক গবেষক ও তত্ত্বাবধায়ক তিনি। তাঁর মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪), মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৯৬৯), স্বরূপের সন্ধানে (১৯৭৬) প্রভৃতি গ্রন্থে সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সাধনাকে ভিত্তি করে উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও কল্পজগত নির্ণয়ের চেষ্টা আনিসুজ্জামানই প্রথম করেছেন। মুসলমানদের জীবনে ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং আবেগ কতটা প্রবল, আবার কোন অর্থে প্রবল তা নির্ধারণের চেষ্টা আনিসুজ্জামানের গ্রন্থে রয়েছে। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয় ভাবধারা কিভাবে কোনও কোনও মুসলমানের সাহিত্য কর্মকে উদ্দীপ্ত করেছিল তাও নির্ণয়ের চেষ্টা আনিসুজ্জামান করেছেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি উল্লেখযোগ্য

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মুসলিম রচিত সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী লেখকদের মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি প্রগতিশীলতার প্রতি বাঙালির মনোযোগ আকর্ষণ বৃদ্ধির সচেতনতা প্রয়াস পেয়েছেন এবং অনেকক্ষেত্রেই তিনি তাতে সাফল্য লাভ করেছেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক হিসেবে তাঁর সামাজিক ভূমিকাও অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি প্রবল প্রতাপশালী সামাজিক ব্যক্তিত্বরূপে বাংলাদেশে 'বুদ্ধিজীবী'র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পাশাপাশি তাঁর একাডেমিক গবেষণা পরিচালনার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি নিজে যতনা লিখেছেন, তার চেয়ে বেশি লিখিয়েছেন দিক-নির্দেশনা দিয়ে। তাঁর রচনাবলীতে যুক্ত হয়েছে ইংরেজি ও বাংলাভাষায় রচিত কয়েকটি গ্রন্থ। আনিসুজ্জামানের অনুসন্ধিৎসা, অভিনিবেশ এবং কুশলী বিশ্লেষণ তাকে বাংলা গবেষণা ক্ষেত্রে যেমন একজন সমাদৃত লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি 'সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা' বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা ও তা প্রচার প্রসার ও প্রকাশনার মাধ্যমে আমাদেরকে অসাম্প্রদায়িক সামজ গঠনের স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে অনন্য সাধারণ সামাজিক ভূমিকা পালন করেছেন সাম্প্রতিক কালে।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪)

বাঙলার জাগরণের মূল চেতনাই গেল যখন খণ্ডিত, বিকৃত ও রূপান্তরিত হয়ে, পাকিস্তান, যখন সৃষ্টি হবে হিন্দু ও মুসলমান-দ্বিজাতিতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তিতে– তখন জন্ম নিলেন বিশ শতকের প্রধান মুক্তবুদ্ধির সাধকও উনিশ শতকীয় জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত, 'বুদ্ধির মুক্তিবাদী' যুক্তিবাদী চেতনায় সঞ্জীবিত সংসকৃতি সাধক ও লেখক আবুল কাসেম ফজলুল হক। পাকিস্তান রাষ্ট্রের (১৯৪৭–৭১) বাঙালিত্ব ধ্বংসকারী যাবতীয় সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক ক্রিয়া-কান্ড, কর্ম-যজ্ঞের মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা.। কিন্তু পরিবেশ তাকে বশীভূত করতে পারেনি। বরঞ্চ তিনি দেখলেন ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরছে। তাই লিখতে শুরু করেছেন কিশোর বয়স থেকে। শুদ্ধ করে বললে ২৯৬০ এর দশক থেকে রেনেসাঁসের স্পিরিট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখতে শুরু করেন পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন সাময়িকপত্রে। কণ্ঠস্বর, পরিমাটি, সুন্দরম, পূবালী, স্বদেশ মোহাম্মদী, সাহেনও, সমকালিন– বিভিন্ন কাগজে তার রচনা সেকালেই সকলের দৃষ্টিতে আসে। বর্তমানে তিনি বাংলার বাঙালির রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক সকল ক্ষেত্রে 'রেনেসাঁস' এর সুফল দেখা দিক– সেই প্রত্যয় ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিরলসভাবে লিখে চলেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিরিশ। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, এস ওয়াজেদ আলি, ডাঃ লুৎফর রহমান, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি সম্পাদনা করে, টীকা-ভাষ্য সংযোগ করে পাঠকের গোচরে আনবার চেষ্টা করে চলেছেন দীর্ঘ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। ১৯৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সম্পাদকদের -বঙ্গ দর্শন তত্ত্ববোধিনী, সমকাল প্রভৃতি পত্রিকার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্নে প্রকাশ আরম্ভ করেন 'সৃজন প্রয়াসী মাসিক লোকায়ত' পত্রিকা। এক নাগাড়ে বিশ বছর ধরে এতে দেশের চিন্তাশীল লেখকদের দিয়ে বিচিত্র বিষয়ে লিখিয়েছেন অসংখ্য রচনা। এতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন– উনিশ শতকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর–অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ সূচিত 'বাংলার জাগরণ' ও শিখা-গোষ্ঠীর সদস্যদের 'বুদ্ধির-মুক্তি আন্দোলন'কারী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' চিন্তা-নায়কদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কোন ধরনের সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা; অথচ এখন কী পথে চলেছে আমাদের স্বদেশ।

আবুল কাসেম ফজলুল হক ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে বিএ অনার্স ও এমএ ডিগ্রি নিয়ে ঐ বিভাগেই গবেষক ও শিক্ষক হিসেবে পেশাগত জীবন যাপন করেন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়ে তার চিন্তাজগতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ফলে তাঁর নিকট স্বাধীন বাংলাদেশ আমলের একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন-পদ্ধতি ও প্রথাকে ইতিহাস-বিচ্যুতির নির্দশন বলে মনে হয়। তিনি প্রতিক্রিয়ায় লেখেন 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন' (১৯৭৬), 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' ও পর্বে পর্বে ভ্রান্তি ও বিকৃতির আবর্তে পতিত হয়েছে। শতক পেরিয়ে নতুন শতকে পদার্পণ করলেও বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ ও লেখকদের মধ্যে নবজাগরণের ধারায় কী বৈপ্লবিক চেতনা দ্বারা জাতিকে উন্নতি-অগ্রগতি ও মুক্তির দিশা দিতে চেয়েছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তা খুব কম সংখ্যক লোকেই অনুধাবণ করতে চেয়েছেন। সেই আক্ষেপ থেকে তিনি লিখলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তর কাল' (ঢাকা ২০০৮)।

শিখা-গোষ্ঠীর মনীষীদের পরবর্তী প্রজন্ম– পাকিস্তানকালের প্রধান চিন্তক-লেখক-গবেষক-ভাবুক আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পররেই রেনেসা পন্থী লেখক হিসেবে আবুল কাসেম ফজলুল হক এর নাম লিখতে হবে। তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : কালের যাত্রার ধ্বনি, উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য, মুক্তি সংগ্রাম, সাহিত্য চিন্তা। নবযুগের প্রত্যাশায়, যুগসংক্রান্ত ও

নীতি জিজ্ঞাসা নৈতিকতা : শ্রেয়োনীতি ও দুর্নীতি, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার প্রভৃতি।

'বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য শীর্ষক বইয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জীবনের বাস্তব পরিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রচলিত জীবন ব্যবস্থা, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনযাপন পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি মানুষের চেতনাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত কের চলেছে। এসব ঘটনা আমাদের চিন্তা কর্ম ও জীবন-সাধনা নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য বলা হয়, বাস্তব অবস্থাই মানুষের চেতনার নিয়ামক। কিন্তু অপর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, মানুষের চেতনাও বাস্ত বকে প্রভাবিত করতে পারে। দেখা যায় মানুষ সচেতন চেষ্টা দ্বারা নিজের জীবনাবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, প্রচলিত জীবন পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙে এবং নতুন পদ্ধতিও ব্যবস্থার সৃষ্টি করে-- বর্হিবিশ্বকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

এই জন্যই বাস্তব অবস্থা মানুষের চেতনার নিয়ামক হলেও মানুষ শুধুই অবস্থার দাস নয়। মানুষ সেই শক্তিরও অধিকারী, যার বলে সে অবস্থার প্রভুও হতে পারে। আইন-কানুন, রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তন করে মানুষ উন্নত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।"

মানুষকে পরিস্থিতি পরিবর্তন করে পরিস্থিতির 'প্রভু' হওয়ার প্রেরণাজাত' সৃজনপ্রয়াসী লেখক আবুল কাসেম ফজলুল হক সক্রিয়ভাবে এখনও নবজাগরণের সল্‌তেতে স্পিরিট মিশিয়ে প্রজ্জলিত রেখেছেন 'শিখা'র অনির্ব সিতাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, তৎকালীন মুসলমান লেখকরা মূলত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ধর্মসিদ্ধ নয়– এবং লেখকের কর্তব্য হলো সমাজের হিতসাধন করা– এই ব্রতে ব্রতী হয়ে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের কাম্য ছিল ইসলামের আদি বিশুদ্ধতা এবং মুসলমানদের জীবনে তারা প্রত্যাবর্তন ঘটুক। তাই তারা মাজার-কবর ইত্যাদিকে মানসিকতার (মানত করা) বিপক্ষে এবং মহররম উৎস ও পীর-প্রথার এবং সাধকদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করার বিরুদ্ধে, আশরাফ-আতরাফ শ্রীকরণ দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক ভেদবুদ্ধিতে অনাস্থা জানিয়ে এবং বিধবা-বিবাহের অপ্রচলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবতার আলোকে, এইসব বিষয়ে লেখনী পরিচালনার করে তারা সমাজের কল্যাণের এবং ইসলামী রীতিনীতি আদর্শের সংস্কারের দ্বারা সমাজ উন্নয়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

তথ্য নির্দেশঃ

০১. 'প্রবন্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ, '*সাহিত্য ও সংস্কৃতি*' (কলিকাতা: মিত্রালয়, ১৩৬৪) পৃ. ১০৮।

০২. শেখ হবিবর রহমান, '*আমার সাহিত্য-জীবন*', পূর্বোক্ত, পৃ.-৭৬।

০৩. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, '*সার্থক শিক্ষা*', (ঢাকা; হাকিম হাউস, ১৯৬০) সূচনা।

০৪. খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, '*আমার জীবন*'(ঢাকা মাহবুবুর রহমান খাঁ, ১৯৬৪) পৃ. ১৪৪।

০৫. '*আমাদের দুঃখ*' '*হানাফী* ' (সাপ্তাহিক), ১ম বর্ষ - ২৭ সংখ্যা (ঈদ সংখ্যা) ১৫ পৌষ ১৩৪১ পৃ. ৫৫।

০৬. '*বাংলা*,'*উর্দু*' ও *বাঙালি মুসলমান*', '*বুল বুল*' ২য় বর্ষ - ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র, ১৩৪১, পৃ-৩৩-৩৫।

০৭. সম্প্রতি আবুল ফজল তাঁর এক প্রবন্ধে '*আব্দুল্লাহ'র* শেষাংশে লেখকরূপে কবি শাহাদৎ হোসেনের (১৮৯৩-১৯৫৩) নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ-তথ্যের উৎস সাংবাদিক মুজিবুর রহমানের (১৮৬৯-১৯৪০) ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ আবুল ওদুদের একটি পত্র। পত্রটি উদ্ধৃত করে আবুল ফজল প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন: "এখানে পরিবেশিত তথ্য ঠিক হওয়াই সম্ভব কারণ কবি শাহাদৎ হোসেনের একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাস লিখার কলাকৌশল তার জানা ছিল। কাজী আনোয়ারুল কাদীর সাহেব খান কয়েক প্রবন্ধ ছাড়া কোন গল্প উপন্যাস লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।" -দ্র. "*আবদুল্লাহ*' উপন্যাসের শেষাংশ কে লিখেছেন"-' *দৈনিক ইত্তেফাক*', । ৯ বৈশাখ,১৩৮৬।

০৮. বি. দ্র. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বুলবুল' ২য় বর্ষ- ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪১, পৃ. ৪৩; Qazi Mutaher Husain. Bengali Literature" The Cultural Heritage of Pakistan' (Karachi: oxford University Press, 1955). p 144; আবদুল কাদির "খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক: *জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি*" কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী-১ম খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৮); পৃ. ৬৫৬।

০৯. '*কাজী আবদুল ওদুদ*' দেশ -৩৭শ বর্ষ -৩৫শ সংখ্যা ১২ই আষাঢ় ১৩৭৭. পৃ. ৯৬২।

১০. '*মানব মুকুট*' নব পর্যায় (কলকাতাঃ মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৩৩) পৃ. ২৩-২৫।

১১. '*মীর পরিবার*' কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৯১৮।

১২. গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র, ৩য় খণ্ড-পত্রাবলী, (কলিকাতা সাহিত্য সনদ, ১৯৬৯), পৃ.-১৯৫।

১৩. '*নদীবক্ষে*' কলিকাতা: মোসলেম পাবলিশিং হাউস,১৯১৯।

১৪. নদীবক্ষে (দ্বি- স, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, তা, বি) সম্মুখের পৃষ্ঠা।

১৫. আবদুল আজিজ আল-আমান, *নজরুল পরিক্রমা* (কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৩৭৬) পৃ. ৩৩০।

১৬. '*আজাদ*' *কলিকাতা*': নূর লাইব্রেরী -১৯৪৮।

১৭. কবি গুরু গ্যোটে - ১ম খণ্ড,পৃ.-১৫৩।

১৮. কাজী আবদুল ওদুদ "*মুসলমান সাহিত্যিক*", প্রবাসী' ১৮শ ভাগ- ২য় খণ্ড -৩য় সংখ্যা, পৌষ-১৩২৫ পৃ. ২১৯-২৪।

১৯. '*প্রবাসী: পৌষ*', সাহিত্য, ২৮বর্ষ-১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৭৪৭-৪৮।

২০. "*মোসলেম ভারত*" '*সবুজ পত্র*', ৭ম বর্ষ-২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ. ১২৪। "*মুসলমান সাহিত্যিক*" ও *সাহিত্যিকের সাধনা*" প্রবন্ধ দুটি আবদুল হক সম্পাদিত কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী -১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮-এ এবং "*বিরাজ-বৌ*" কাজী আবদুল রচনাবলী'- ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯০-এ প্রকাশিত হয়েছে।

২১. নজরুলের '*কামাল*' শীর্ষক প্রবন্ধ '*ধুমকেতু*' পত্রিকায় (আশ্বিন,১৩২৮) এবং "*কামাল পাশা*" কবিতা '*মোসলেম ভারত*' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

২২. শ্রী হরিদাস মুখোপধ্যায় ও অন্যান্য, '*বিনয় সরকারের বৈঠকে*' -২য় ভাগ (কলিকাতা : চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এন্ড কোং লিমিটেড, ১৯৪৫), পৃ. ৫২৪-২৫।

২৩. '*বাংলার জাগরণ*', পৃ. ১৯৪-৯৫।

২৪. "*মানব-মুকুট*" '*মোহাম্মদী*' (সাপ্তাহিক), চিত্র, ১৩৩৯; "*সম্মেহিত মুসলমান*", '*অভিযান*' ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃ. ৪-৭; "*ফাতেহ ই-দোয়াজদাহম*" '*বার্ষিক সওগত*',১ম বর্ষ চৈত্র ১৩৩৩, পৃ. ১২৪-২৫; '*হযরত মোহম্মদ (সঃ)*', মোয়াজ্জিন, ২য় বর্ষ-৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৩৬,পৃ. ৮৪-৮৫।

২৫. '*নবপর্য্যায়*' পৃ. ২৩-২৭।

২৬. '*হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম*' উৎসর্গ, করা হয়েছে- "*ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সহকর্মীদের স্মরণে*"।

২৭. মিশরের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মুফতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (১৮৪৯-১৯০৫)-র মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : কোরআনে যদি এমন কিছু থাকে যা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিরোধী, তবে বুঝতে হবে সে বিরোধ দৃশ্যত, প্রকৃতপক্ষে যা সত্য তার সঙ্গে কোরআনের শিক্ষার বিরোধ হতে পারে না।" -দ্র. কাজী আবদুল ওদুদ, "*মুসলিম জগতে নতুন চিন্তা*", দেশ', ২৪শে বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ. ১০৬।

২৮. '*রামমোহনের বিরুদ্ধে-পক্ষের বক্তব্য*' '*সমাজ ও সাহিত্য*' পৃ. ৭৮।

২৯. '*ব্যবহারিক শব্দকোষ*', কলিকাতা; ডি.কে. বসু ১৩৬০।

৩০. "*রুদ্ধ ব্যথা*" 'ব-ম-সা-প' ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬, পৃ. ৩১৩

৩১. "*নেশার ফের*", *বার্ষিক সওগাত*', ২য় বর্ষ, ১৩৩৪; দ্র. '*আবুল হুসেনের রচনাবলী*'-১ম খণ্ড, পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০।

৩২. সুপ্রকাশ রায়, '*পরিভাষা কোষ*' (কলিকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৮) পৃ.২২: ' বোলশেভিকস' শব্দটির উৎপত্তি রুশভাষার .....শব্দ হইতে। ইহার অর্থ হইল '*সংখ্যাধিক*'। 'রুশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩খ্রিস্টাব্দে) লেনিনের মতের সমর্থনকারী সংখ্যাধিক দল।এই দল সেই কংগ্রেস হইতে লেনিনের নেতৃত্বে 'রুশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি (বোলশেভিক্)' নামে পরিচিত হয়। তারপর লেনিনের করে এবং সর্বশেষ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বোলশেভিক্) নাম গ্রহণ করে।

৩৩. আবুল হুসেনের বিপ্লবী- চেতনার কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

৩৪. '*বাঙ্গালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা*', ঢাকা: মর্ডান লাইব্রেরী, ১৩৩৫।

৩৫. আবুল হুসেনের রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃ. ১৩৫।

৩৬. '*মুসলিম কালচার*' ঢাকা: মর্ডন লাইব্রেরী, ১৯২৮।

৩৭. Muhammed Marmaduke Pickthall, `Islamic Culture', pakistan Edn. Ferozsons, 1952.

৩৮. আবুল হুসেন, "*মহাত্মা আমীর মরহুম*", "*জাগরণ*",১ম বর্ষ-৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫, পৃ. ২৬২।

৩৯. ঐ, পৃ. ২৫৪।

৪০. "*Second Lecture; Causes of Rises of Rise and Decline Culture*"

৪১. "*Third Lecture : science,Art And letters*", Islamic Culture, pp. 48-49.

৪২. "*Fourth Lecture : Science, Art and letters*", Islamic Culture ,p. 62.

৪৩. Ibid, pp. 68-69; PP. 69-70.

৪৪. Ibid, pp. 72-73.

৪৫. "Tolerance",Islamic Culture',pp.81, 89-90, 92.

৪৬. Ibid, pp. 93-94.

৪৭. আবুল হুসেন, '*মুসলিম কালচারের ধারা*', '*সওগাত*', ৬ষ্ঠ বর্ষ- ১১শ সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩৩৬,পৃ.৮০৪-০৭

৪৮. সুফী মোতাহার হোসেন, *"আবুল হুসেন"*, মাসিক মোহাম্মাদী', ১২বর্ষ -১ম সংখ্যা কার্তিক ১৩৪৫ পৃ. ৬৯; **"পুস্তক ও পত্র- পরিচয় : মুসলিম কালচারার", 'সওগাত', ৬ষ্ঠ বর্ষ-৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩৩৫, পৃ. ৩৮৭।**

৪৯. দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

৫০. 'Sultana's Dreams', সাধারন', ৩য় বর্ষ-৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮; দ্র.'রোকেয়া রচনাবলী', পৃ. ৬০১-০২।

৫১. *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'* - ৪র্থ খণ্ড (ত্ব-স; কলিকাতা: ইস্টার্নি' পাবলিশার্স, ১৩৭৮), পৃ. ২১২।

৫২. *"আমার ছেলেবেলা"*, *'সাম্পান'*, ১ম বর্ষ- ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ. ছয়-সাত।

৫৩. *"বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার পথ"*, *'মাসিক মোহাম্মদী'*, ৩য় বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৪৫৪-৫৮, *"সাহিত্যের ভিটামিন"*,*'জয়তী'*, ১ম বর্ষ-১১শ--১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন- চৈত্র ১৩৩৭, পৃ. ২৪১-৪২, *'সমালোচনা-সাহিত্য'*, দিলরুবা', ২য় বর্ষ-৩য়-৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ় -শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ. ২৮১।

৫৪. *"বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার পথ"*, *'মাসিক মোহাম্মদী'*, ৩য় বর্ষ-৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৬, ১৬৯-৮১।

৫৫. বদরুদ্দীন উমর, 'পুর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'-১ম খণ্ড, (ঢাকা : গ্রন্থনা, ১৯৭০), পৃ. ৯৪।

৫৬. *"ভুমিকা"*, নির্বাচিত প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড). পৃ. [৬]। সৈয়দ আবুল মকসুত সম্পাদিত *'মোতাহার হোসেন চৌধুরী রচনাবলী-১'* (ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫)-এর ভুমিকার তারিখ উল্লিখিত হয়েছে।

৫৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে লিখিত পত্র। *'মাসিক মোহাম্মদী'*, ১২শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ. ৭৮৩।

৫৮. *"মোতাহার হোসেন চৌধুরী"*, 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন', পৃ. ৪০৩।

৫৯. *"প্রার্থনা'*, 'সমকাল', ৮ম বর্ষ -কবিতা সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭১,পৃ. ৪৬৮।

৬০. *"দুঃখ", 'ধর্ম', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'* -১৩শ খণ্ড(পুনর্মু দ্রণ; কলিকাতা: বিশ্ব ভারতী,১৩৫৯), পৃ. ৪০০-৪১০।

৬১. কবি কায়সুল হককে লিখিত পত্র, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬। *'সচিত্র সন্ধানী'*, ১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যা, ২৮ আশ্বিন, ১৩৮৫,পৃ. ১৮-২৩।

৬২. *"ধরণী"*, *'মাসিক মোহাম্মদী'*, *"উতলা রজণী" 'ছায়াবীথি'*, ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪০; "ভিক্ষারী" ছায়াবীথি, ১ম বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪০; *"সনেট"*, *'সমকাল'* ৮ম বর্ষ-কবিতা সংখ্যা, পৌষ- চৈত্র, ১৩৭১ ইত্যাদি।

৬৩. *'সংস্কৃতি-কথা'*, ঢাকা: সমকাল প্রকাশনী, ১৩৬৫।

৬৪. *"সংস্কৃতি-কথা"*, *'সংকল্প'* ১ম বর্ষ-৭ম -৮ম সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃ. ১-১৮।

৬৫. সভ্যতা, পৃ: ৫।

৬৬. *'রেখাচিত্র'*, পৃ: ১৩-১৬।

৬৭. আবুল ফজল সংবর্ধনা কমিটি, *'আবুল ফজল সংবর্ধনা'* [পুস্তিকা] (চট্টগ্রাম: ২২শে নভেম্বর- ১৯৫৯), পৃ: ১-২৩।

৬৮. *'আবুল ফজল সংবর্ধনা'* সমকাল , ৩য় বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৬, পৃ-৪৪৫।

৬৯. দিদারুল আলমকে লিখিত মত, ১৫ মার্চ ১৯২৭, পৃ. ৪৩-৪৪।

৭০. সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র এর উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ: কাজী আবদুল ওদুদ ও মরহুম আবুল হুসেন আমার লেখক জীবনের শুরুতে যারা আমাকে যুক্তি আর মুক্ত বুদ্ধির পথ দেখিয়েছেন তাদের মধ্য এ দুজনের নাম সর্বাগ্রে কর্তব্য।

৭১. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরেশ সাহা (সম্পাদিত), *'কথাশিল্পী'* - পৃ. ১৬১।

৭২. *'মানবতন্ত্র'*, ঢাকা: স্বদেশ প্রকাশনী, ১৩৭৯।

৭৩. '*নবীদিবস ও জাতীয় পতাকা*', দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ আশ্বিন, ১৩৬৮।

৭৪. '*সাহিত্যের পথ ও পাথেয়*', সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, পৃ. ৯৪-৯৯।

৭৫. '*কোরআনের বাণী*', ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৩৫৬: হাদীসের বানী, ঢাকা; ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৩৬৭, হযরত আলী, ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৩৭৪।

৭৬. '*দিলরুবা*', কলিকাতা: পি সি সরকার এন্ড কোম্পানী, ১৩৪০;কবিতা-সূচি: "*দিলরুবা*", "*হযরত মোহাম্মদ*" (আবির্ভাব, মহাজীবন, তিরেধান, ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্), "*আজাদ*", "*মোয়াজ্জিন*", "*জয়যাত্রা*", "*উপাসনা*", "*অভ্যুত্থান*", "*পথচারী*", "*চলিতেছে তোমার আদেশে*", "*বন্দী*", "*বিচিত্রা*", *শ্রাবণ-শর্ব্বরী*", "*বীন্‌কার*", "*ক্ষণকাব্য*", "*অভিসার*", "*মত্যুস্বপ্ন*", "*মহাপ্রস্থান*", "*সমাপ্তি*" ও "*ঝরাপাতার গান*"।

৭৭. আবদুল কাদিরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১০ জানুয়ারি ১৯৩৮। '*দিলরুবা*' (তৃ-স: ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৫), সম্মুখের পৃষ্ঠা।

৭৮. শামসুজ্জামান খান (জ.১৯৩৭) কর্তৃত গৃহীত আবদুল কাদিরের সাক্ষাৎকার। চরিত্র; প্রথম সংকলন, বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ,৪৯।

৭৯. 'বাঙ্গলা সাহিত্য ও মুসলমান' কাব্য মালঞ্চ পৃ:-০৩।

৮০. '*কাজী আবদুল ওদুদ*' বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা, ১৭ বর্ষ- ২য়-৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ - পৌষ, ১৩৭৯, পৃ. - ১-৬৪।

৮১. পুস্তক-সমালোচনাঃ '*কাজী আবদুল ওদুদ'গণ* সাহিত্য; ৫ম বর্ষ-৩য়-৪র্থ-৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৮৩,পৃ. - ৯।

৮২. কাজী আবদুল ওদু. '*কবিগুরু গ্যেটে*'-২য় খণ্ড, পৃ. ১২০:.....সাবধান, আধুনিকতম সাহিত্যিকদের মতো বলো না যে রাজনীতিই কাব্য অথবা কবির জন্য যোগ্য বিষয়। ... রাজনীতি বিষয়ে লিখতে চায় তবে তাকে ভিড়তে হবে কোনো দলে; আর তা করলেই কবি হিসাবে হবে তার মৃত্যু; তার স্বাধীনতা, অপক্ষপাত, এসব বিসর্জন দিতে হবে, আর কান পর্যন্ত টেনে দিতে হবে অযৌক্তিক পাক্ষপাত ও অন্ধবিদ্বেষের টুপি। [একেরমানের সঙ্গে আলোচনায় গ্যেটের মন্তব্য]।

৮৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, "*জীবন দার্শনিক ওদুদ*" , '*দেশ*' , ৩৭শ বর্ষ-৩৫শ সংখ্যা, ১২ আষাঢ় ১৩৭৭, পৃ. ৯৫৫-৫৭ : 'বন্ধু দার্শনিক দিশারী বলতে বোঝায় আমার জীবনে এমন ব্যক্তি ক'জনই বা এসেছেন? তাঁদের মধ্যে তিনি [কাজী আবদুল ওদুদ] ছিলেন অন্যতম, বাঙালিদের মধ্যে একতম।..... অনেক সময় আমরা একমত হতে পারিনি। ক্রমাগত তর্কবিতর্ক করেছি। .....ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল যে আমরা একই পালকের পাখি। আমাদের মতভেদের চেয়ে মতের মিল বেশি। মনের মিল তো তার চেয়েও বেশি। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের উভয়ের প্রিয়। তাই সব বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যায় মানবিকবাদের মধ্যস্থতায়"।

৮৪. Kased Ali, Md. Maulana Muhammad Akram Khan (1868-1968), His Life And Works. Ph.D. Thesis, Department of Arabic & Persian, University of Calcutta, India 1989. Chapter II, P-30.

মাওলানা আকরম খাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে একাধিক মতও পরিলক্ষিত হয়। বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,

ড. আনিসুজ্জামান, খুরশিদ আহমদ, এনায়েত রসুল, এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ইসলামিক বিশ্বকোষে

১৮৬৯ সালকে মাওলানার জন্ম তারিখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামি বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৫।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামি ফাউন্ডেশনক বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ.৩৮৪।

এক বর্ণনামতে আকরম খাঁর জন্ম সাল ১৮৭৫ বলেও উল্লেখিত আছে।
Bibliography on the works of Maulana Mohammad Akram Khan, By Md. Shamsul Haq. Diploma course in library cience, Dhaka University 1960-1961 অশোক কুন্ড তাঁর 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জিতে' ১৮৭৭ উল্লেখ করেছেন, তবে
বাংলা বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থমালা, দৈনিক আজাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীর বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যায়,
বিশেষ করে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ডা. আবদুল কাসেম প্রণীত 'বাঙলার প্রতিভা' নামক গ্রন্থে
এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক জনাব এ. টি. এম. আতিকুর রহমানের 'বাংলার রাজনীতিতে
মওলানা আকরম খাঁ গবেষণা সন্দর্ভে ১৮৬৮ সালকেই জন্ম সাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৫. বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮

৮৬. সৈয়দ ইলমুল্লাহর পৌত্র এবং সৈয়দ মুহাম্মদ ইরফানের পুত্র সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬ সালে যুক্ত ১৮৩১ সালের ৬ মে পাঞ্জাবের হাজারা জেলার বালাকোট নামক স্থানে শিখ সৈন্যের হাতে শহীদ হন। একটি গুলি ডান হাতে এবং অন্যটি বুকের পাশে লাগলে সৈয়দ আহমদ সেখানেই ভূপাতিত হন। উল্লেখ, পাঠান মুসলমানদের মধ্যে পায়েন্দা খান ও নজফ খান নামক বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় শিখ যুবরাজ শের সিংহের নেতৃত্বে বার হাজার শিখ সৈন্য এ অফিযান পরিচালন করে,
মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১৩,২০

৮৭. গাজী, মুলত আরব দেশে যে ব্যক্তি গাযওয়া (বেদুইন আক্রমণ) পরিচালনা করতো তাকে 'গাজী বলা হতো। পরবর্তীকালে যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দান করতো তাকে 'গাজী' উপাধি দান করা হতো।
বাংলা বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

৮৮. তিতুমীর ওরফে নিসার আলী (১৭৮২-১৮৩১) বাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের নেতা। ১৮৩১ সালে লর্ড বেন্টিংক তাঁর বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত সিপাহী স্থল ও গোলন্দাজ বাহিনী পাঠালে তারা নারিকেলবাড়িয়াস্থ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ অনুচরসহ তিনি যুদ্ধে শহীদ হন। ৩৫০ জন সৈন্য ধরা পড়ে।

৮৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৪

৯০. আবদুল-লতিফ (১৮২৮-১৮৯১)। ফরিদপুর জেলার রাজপুর গ্রামের কাজী পরিবারের সন্তান। তিনি বাঙালি মুসলমানদের অন্যতম নেতা। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিতৃষ্ণা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে তিনি 'মুহামেডান লিটাররি সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন,
সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫

৯১. মাদ্রাসা আলীয়ার সর্বশেষ ক্লাস ছিল ফাযিল, তখন টাইটেল বা কামিল ক্লাস সেখানে ছিল না। আকরম খাঁ পাস করার ১৬ বছর পর মাদ্রাসায়ে আলীয়ায় কামিল ক্লাস খোলা হয় (কামিল মাদ্রাসার সর্বশেষ ডিগ্রি, এম. এ. ডিগ্রির সমতুল্য)। আবু জাফর (সম্পাদিত),
প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৯২. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪

৯৩. জীবনী গ্রন্থ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, পৃ. ৭

৯৪. প্রাগুক্ত

৯৫. প্রাগুক্ত

৯৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সাংবাদিকতায় বাঙ্গালী মুসলমান, ঈদ সংখ্যা, মোহাম্মদি, পৌষ, ১৩৪২

৯৭. এটি ধর্ম বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯২৬ সালে হানাফী সম্প্রদায়ের মুখমাত্ররূপে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন মাওলানা মুহম্মদ রুহুল আমীন। পরে মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান সম্পাদনা করেন। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রা-ক্ত, পৃ. ৪৪৬। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৫০।

৯৮. পত্রিকাটি ছয় বছরকাল চালু ছিল। পত্রিকার উপজীব্য বিষয়াবলী মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য, স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ এবং মাতৃভাষার সেবা করার নিমিত্তেই আল-এসলামের প্রকাশ। বাঙ্গালী মুসলমান পাঠক সমাজে পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মুসলিম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রা-ক্ত, পৃ. ৪৩৫

৯৯. ড. সুনীল কান্তি দে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা, কৌশলতা, ১৯৯২, পৃ. ১০

১০০. কাসেদ আলী, প্রা-ক্ত, পৃ. ৪৭

১০১. মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, জীবনী গ্রন্থমালা-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

১০২. মাওলানা যফর আলা খা ১৮৭৩ সালে শিয়ালকোট জেলার ওযিরাবাদ তহসীলের কোটমহরথ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক ও আজাদী আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২৭শে নভেম্বর তিনি ইনতেকাল করেন।
ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

১০৩. মাওলানা হাসরত মুহানী ১৮৭৫ খ্রি. উন্নাও জেলার (ইউপি) মুহান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযাদী আন্দোলনের নেতা, প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক ও সূফী ছিলেন। ১৯৫১ সালে ইনতেকাল করেন।
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

১০৪. জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

১০৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫
সহ-উদ্ধৃতি, বশীর আলহেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস (বাংলা একাডেমি, ঢাকা), পৃ.১৫৯।

১০৬. সেবক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেবকের স্থলে নতুন নামে একটি দৈনিক বের করার কথা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করেন। কিন্তু তখন ব্রিটিশবিরোধী পত্রিকার ডিক্লারেশন পাওয়া ছিল দুষ্কর। তার পরিবর্তে সাপ্তাহিক মুহাম্মদির দৈনিক সংস্করণ বের করতে আইনগত কোন বাধা ছিল না। সে জন্যই সেবকের স্থলে দৈনিক মুহাম্মদি চালু হয়।
জীবনী গ্রন্থমালা-১, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, ১৯৮৭, পৃ. ১৯

১০৭. মাওলানা মুহম্মদ আলী রায়পুরী সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত উপমহাদেশের খিলাফত ও আজাদী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা ছিলেন। 'কমরেড' ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। সাহিত্য ক্ষেত্রে পত্রিকাটি ছিল উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান ও প্রখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক। অল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন সক্ষম হয়। কমরেড শুধু ভারতের হিন্দু-মুসলমানরাই পড়তো না, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের কাছেও ছিল জনপ্রিয়। বড়লাট হার্ডিঞ্জের স্ত্রী 'কমরেড'-এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে মুহম্মদ আলীর জ্ঞানের সুনিপুণতা প্রকাশ পায়। তাঁর মৃত্যুলগ্নে বোম্বের Times of India এর সম্পাদক লোভট ক্রেজার বলেন, ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর চমৎকার দখল ছিল। কোনো ভারতীয় তো দূরের কথা, বোধ হয় কম সংখ্যক ইংরেজও তার চাইতে ভাল ইংরেজি লিখতে পারতেন না।

১০৮. ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, ই, ফা, বা, পৃ. ১৪
ছিলেন। তিনি বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের উপর প্রথম পিএইচ. ডি ডিগ্রিধারী। ১৯৯৫ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি ইন্তিকাল করেন। অধ্যাপক তাজাম্মুল হোসেন, আল্লামা ইকবার সংসদ পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ, ৯৫, পৃ.৭

১০৯. মোহাম্মদ কাসেম আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১১০. Abu Jafar, Moulana Akram Khan, a Versatile Genious, Islamic Foundation Bangladesh, 1984, Page-33..

১১১. দ্বিতীয় পর্যায়ে মাসিক মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক মুহাম্মদি প্রেস, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরে ৮৬-এ লেয়ার সার্কলার রোডে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক ১৩৫৪) বের হবার পর দু'বছরের জন্য পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকে। একবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) থেকে আবার প্রকাশ পায় ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা থেকে।
জীবনী গ্রন্থমালা-১ , বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১১২. The monthly was first printed in August 18, 1903 by Monshi Karim Boksh from I Hook Lane, Tantibagan, Caluutta and published by its proprietor Muhammad Akkas Ali, The Edito of the paper was Moulana Akram Khan, Al-Haj Abdullah became its proprietor from the second issue, After the fifth issue (January 19, 1904) perhaps the paper ceased publication and reappeared on November 6, 1927
আরও তথ্য দ্রঃ আহলে হাদিস আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬, টীকা-৫

১১৩ ১৮৬৯ সালে সুধাকর পত্রিকা বের হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বাঙালি মুসলমানদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব-জাতীয় তাহযিব-তমদ্দুন, নিজস্ব ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করে তোলা হয়েছিল। সেকালের দিকদর্শন, বঙ্গদর্শন, হিতকরী, তত্ত্ববোধিনী-এসব পত্রিকায় যে-সব ইসলামবিরোধী ও মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞামূলক লেখা বের হতো, সুধাকর ও তৎসংশ্লিষ্ট মুসলিম মনীষীরা তার যোগ্য জবাব দিকে কসুর করতেন না। সুধাকর অনুসৃত সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম চেতনা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালি মুসলিম জীবনের ঘোর দুর্দিনে এরাই জাতিকে নিজেদের চিনতে ও জাতিকে ঘরমুখো করতে সাহায্য করেছিলেন। মুস্তফা-নুর-উল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

১১৪. মাসিক মুহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২-৩

১১৫. মোহাম্মদ মোদাব্বের, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সচিত্র বাংলাদেশ, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮০, পৃ. অনুল্লেখিত

১১৬. আকবর উদ্দীন, মাওলানা আকরম খা'র কাল ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা (সংকলন, আবু জাফর); মওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬), পৃ. ৫০

১১৭. এ, কে, ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রী, বাংলা, ১ নভেম্বর, ১৯৩৮

১১৮. অতীত দিনের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

১১৯. মোঃ কাসেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১২০. প্রাগুক্ত

১২১. সুভাষচন্দ্র বসু। জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ আগস্ট। মৃত্যু ১৯৪৫ (?) সালে। তিনি সাধারণত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নামে পরিচিত। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি

১২২. বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৬

১২৩. এম আব্দুর রহমান, ভারতীয় সাময়িক দৃষ্টিতে মাওলানা আকরম খাঁ, সাপ্তাহিক বসুমতি, ৭৩শ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫

১২৪. Vincent A. Smith. Percival Spear (ed). The oxford History of India (rep : Iondon. 1970) 652
১২৫. J. N. Farquhar, Modern Religious Movements in India (New Delhi. 1977), 15.
১২৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, ৭৮।
১২৭. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ' (কলিকাতা, ১৯৫৬), অধ্যায়-২ এবং ৩ দ্রষ্টব্য।
১২৮. V. A. Smith, পূর্বোক্ত, 733 : "For its reason. he (Ram Mohan) may be described as the greatest Creative Personality of nineteenth Century India."
১২৯. P. Hardy, The Muslims of British India (London. 1972)- 140.
১৩০. C. F. Andrews and Girija Mukerji. The Rise and Growth of the Congress in India (London, 1938), 123.
১৩১. V. A. Smith, পূর্বোক্ত, 737.
১৩২. P. Hardy, পূর্বোক্ত, 130.
১৩৩. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, P. XV.
১৩৪. P. Hardy, পূর্বোক্ত, 124-25.
১৩৫. P. Hardy, পূর্বোক্ত, 148-49.
১৩৬. A. R. Mallick. "The Muslims and the Partition of Bengal, 1905", Mahmud Hussain et al (ed.), A History of the Freedom Movment, Vol. 111, (Karachi, 1961), 13-15.
১৩৭. P. Hardy, পূর্বোক্ত, 150.
১৩৮. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 52-53.
১৩৯. G.S Chhabra, পূর্বোক্ত, 270.
১৪০. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 59-61.
১৪১. Theompson and Garratt, পূর্বোক্ত, 576.
১৪২. Jamil-ud-Din Ahmad, "Foundation of the All-India Muslim Leaque", A History of the Freedom Movement Vol. Ill, 29-31.
১৪৩. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 79.
১৪৪. Thompson and Garratt. পূর্বোক্ত, 584.
১৪৫. Latif Ahmad Khan Sherwani, "Morley-Minto Reforms", A History of the Freedom Movement, Vol. III, পূর্বোক্ত, 86.
১৪৬. Sharif al-Mujahid, "Pan Islamism", A Hisotory of the Freedom Movements. Vol. III পূর্বোক্ত, 107-108.
১৪৭. K. B. Sayeed, Pakistzan The Formative Phase 1857-1948 (London. 1986), 38-39.
১৪৮. অমলেন্দু দে, 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', (কলিকাতা, ১৯৭২), ১-৪।
১৪৯. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 107.
১৫০. P Hardy, পূর্বোক্ত, 187.
১৫১. K. B. Sayeed, পূর্বোক্ত, 40.
১৫২. Mahmud Hussain. "The Lucknow Pact, 1916", A History of the Freedom Movement. Vol. Ill, পূর্বোক্ত, 137.

১৫৩. P. Hardy, পূর্বোক্ত, 189.
১৫৪. Abul Kalam Azad, পূর্বোক্ত, 7-8.
১৫৫. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 143.
১৫৬. S. Moinul Haq, "The Khilafat Movement", পূর্বোক্ত, 229.
১৫৭. Hossainur Rahman, পূর্বোক্ত, 42-43.
১৫৮. K. B. Sayeed, পূর্বোক্ত, 56.
১৫৯. ২১৫ মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ, 'হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী' ঢাকা, ১৯৭১), ১২৭-২৮।
১৬০. S. Moinul Haq. "The Khilafat Movement", পূর্বোক্ত, 235.
১৬১. B. P. Barua, "Muslim Approaches to Forms of Government in the Indio-Pak Subcontinent. 1919-47", The Indian political Science Review, Vol. XIII(2), 1979, 157.
১৬২. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 148-49.
১৬৩. Abdul Kalam Azad, পূর্বোক্ত, 8-10.
১৬৪ I. H. Quraishi, "Hindu Communal Movements," Mahmud Hussain et al (ed). A History of the Freedom Movement. Vol. III, পূর্বোক্ত, 252.
১৬৫. G. W. Chaudhri, "The nehru Report", A History of the Freedom Movement, Vol Ill, পূর্বোক্ত, 276-77.
১৬৬. Bazlur Rahman Khan, Politics in Bengal 1927-36 (Dhaka, 1978), 36.
১৬৭. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 199-202.
১৬৮. Abdul Kalam Azad, পূর্বোক্ত, 9-10; Sharif Al-Mujahid, পূর্বোক্ত, 309.
১৬৯. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 207; K.B. Sayeed, পূর্বোক্ত, 103-104.
১৭০. Aziz Ahmad, পূর্বোক্ত, 275.
১৭১. K. B. Sayeed, পূর্বোক্ত, 104.
১৭২. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 213.
১৭৩. Sharif al-Mujahid, পূর্বোক্ত, 309-10.
১৭৪. Aziz Ahmad, পূর্বোক্ত, 274.
১৭৫. অমলেন্দু দে, 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক' (কলিকাতা, ১৯৭২), ৩১।
১৭৬. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 215.
১৭৭. প্রাগুক্ত, ২১৬
১৭৮. B. B. Barua, পূর্বোক্ত, 160-61.
১৭৯. Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan (London, 1967), 161.
১৮০. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 218-20.
১৮১. Abdul Kalam Azad, পূর্বোক্ত, 20-21.
১৮২. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 224.
১৮৩. অমলেন্দু, পূর্বোক্ত, 146
১৮৪. K. B. Sayeed, পূর্বোক্ত, 183.
১৮৫. উদ্ধৃত, Abdul Hamid পূর্বোক্ত, 226.
১৮৬. Abdul Hamid, পূর্বোক্ত, 225-27.
১৮৭. কীথ কালার্ড, পাকিস্তান : এ পলিটিক্যাল স্টাডি, লণ্ডন : জর্জ এ্যালেন এণ্ড আনউইন, ১৯৫৭, পৃ.-৫৬।
১৮৮. (সেকেণ্ড) কন্সটিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লী ডিবেটস অফ পাকিস্তান, অফিশিয়াল রিপোর্টস (১৯৫৫-৫৬), করাচী : গভর্ণমেন্ট অফ পাকিস্তান প্রেস, জানুয়ারি, ১৬, ১৯৫৬, ভলিয়ুম ১, পৃ. ১৮১৮-১৯ এবং ১৮৪৬-৪৭।
১৮৯. প্রাগুক্ত, ২৫শে জানুয়ারি ১৯৫৬, ভলিয়্যম ১, পৃ. ২০৫০।

১৯০. প্রাগুক্ত, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৫৬, ভলিয়্যুম ১, পৃ.-১৮৪৫।

১৯১. কন্সটিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লী অফ পাকিস্তান ডিবেটস, করাচী : গভর্ণমেন্ট অফ পাকিস্তান প্রেস, ভলিয়্যুম ১. নম্বর ২, আগস্ট ১১, ১৯৪৭, পৃ.-২০।

১৯২. কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ : স্পীচেজ এ্যাজ গভর্ণর-জেনারেল অফ পাকিস্তান (১৯৪৭-৪৮), জুন ১৯৬৩, পৃ. ২১। প্রকাশকের নাম নেই।

১৯৩. ডব্লিউ এস. মেটজ, পাকিস্তান : গবর্ণমেন্ট এণ্ড পলিটিকস, নিউ হ্যাভেন, কানেকটিকাট : হিউম্যান রিলেশনস, এরিয়া ফাইলস, ১৯৫৬, পৃ. ১০। উদ্ধৃত : তালুকদার মনিরুজ্জমান, দি পলিটিকস্ অফ ডেভেলমেন্ট দি কেইস অফ পাকিস্তান, ১৯৪৭-৫৮, ঢাকা : গ্রীন বুক হাউস লি. প্রথম প্রকাশ ১৯৭১, পৃ. ৩৮।

১৯৪. লিওনার্ড বাইণ্ডার, লিলিজিয়ান এণ্ড পলিটিকস্ ইন পাকিস্তান বার্কলে : ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্ণিয়া প্রেস, ১৯৬৩, পৃ. ১৫৫-১৮২।

১৯৫. খালিদ বিন সাঈদ, "দি জামাত-ই-ইসলামী মুভমেন্ট ইন পাকিস্তান", প্যাসিফিক এ্যাফেয়ার্স, ৩০, ১৯৫৭, পৃ. ৬৭-৬৮।

১৯৬. লিওনার্ড বাইণ্ডারের রচনা ছাড়াও ইসলামের বিভিন্ন দিক ও ইসলমী সমাজ কায়েম নিয়ে মত বিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে-কে. বি. সাঈদ, দি পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ পাকিস্তান, করাচী : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭, পৃ. ১৫৯-১৮৪।

১৯৭. চার্লস বার্টন মার্শাল, "টেস্টিমোনী", পৃ.-৪-৫, উদ্ধৃত : রওনক জাহান, পাকিস্তান : ফেইলিয়র ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৭, পৃ. ২৩।

১৯৮. আর. এন, স্প্যান, কন্সটিটিউশনালিজন ইন এশিয়া, পৃ.-১৪৩-৪৪, উদ্ধৃত : এম. রশীদুজ্জামান, পাকিস্তান এ স্টাডি অফ গভর্ণমেন্ট এন্ড পলিটিকস, ঢাকা : আইডিয়েল লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃ.-১০৪-৫।

১৯৯. ম্যাকিম ম্যারিয়ট, "কালচারাল পলিসি ইন দি নিউ স্টেটস," ক্লীফোর্ড গীরজ সম্পাদিত ওলর্ড সোসাইটিজ এ্যান্ড নিউ স্টেটস, দিল্লী : ১৯৬৩, পৃ : ৪৩।

২০০. পপুলেশন সেন্সাস অফ পাকিস্তান, ১৯৬১, ভলিয়্যুম ১, পাকিস্তান : মিনিস্ট্রি অফ হোম এন্ড কাশ্মীর এ্যাফেয়ার্স, হোম এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন।

২০১. আরো আলোচনার জন্যে দেখুন- আহমদ চৌধুরী, "ফ্রম কমিউনালিজম টু সিকিউলার ন্যাশনালিজম ইন টুয়েন্টিফোর ইয়ারস", দি পিপলস, মুজিবনগর, বাংলাদেশ, ১৯শে আগস্ট ১৯৭১। পর্যবেক্ষক, "আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি", জয়বাংলা, মুজিবনগর, বাংলাদেশ, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭১। হাসান মুর্শিদ, "সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশ," মুর্শিদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, কলকাতা : ইণ্ডিয়ান এ্যাসেসিয়েটেড পাবলিশিং কো., ১৯৭১, পৃ. ১০০-১০৪।

২০২. বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা : প্রকাশক-গ্রন্থনা, পরিবেশক-মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্কারণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ.-১২।

২০৩. গোপাল কৃষ্ণ, "রিলিজিয়ন ইন পলিটিকস্", ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক এণ্ড সোশ্যাল হিস্টোরী রিভিউ, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ.-৩৯২-৯৩।

২০৪. ডোনাল্ড স্মীথ, ইণ্ডিয়া এ্যাজ এ সিকিউলার স্টেট, প্রিন্সটন : ১৯৬৩, পৃ.-৪৫৪।

২০৫. কেনেথ ডব্লিউ, জোনস, "কমিউনালিজম ইন দি পাঞ্জাব", জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, ২৮ (১৯৭৮), পৃ.-৩৯।

২০৬. প্রভা দীক্ষিত, কমিউনালিজম-এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, নিউ দিল্লী : ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৭৪।

২০৭. উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মীথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া, এ সোশ্যাল এ্যানালিসিস, ২য় সংস্করণ, লণ্ডন : ভিক্টোর গোলাঞ্জ, ১৯৪৫, পৃ. ১৪৭।

২০৮. বিপান চন্দ্র, কমিউনালিজম ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী : ভিকাশ পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃ. ১।

২০৯. রিচার্ড ডি. ল্যামবার্ট, লীডারশীপ এণ্ড পলিটিক্যাল ইন্সটিটিউনস ইন ইণ্ডিয়া, পার্ক এন্ড টিমপার সম্পাদিত উদ্ধৃত : ন, আ. তাজুল ইসলাম হাশমী, "সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ," ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৬৬।

২১০. প্রাগুক্ত,

২১১. হ্যান্স ক্রুজ, "সাম প্রবলেমস অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া", সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, নিউ দিল্লী, ১৯৬৮। উদ্ধৃত : ঐ, পৃ. ৬৭।

২১২. বিস্তারিত আলোচনার জন্যে– হাসান উজ্জামান, "সাম্প্রদায়িকতার বিক্রিয়া", পটভূমি, ঢাকা : পটভূমি পকাশন, তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯।

২১৩. ডব্লিউ নরম্যান ব্রাউন, দি ইউনাইটেড স্টেটস এণ্ড ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩, পৃ.-১১২-১৩।

২১৪. নরম্যান ডি, পামার, দি ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, লন্ডন : জর্জ এ্যালেন এণ্ড আনউইন লি., ১৯৬১, পৃ. ১৪।

২১৫. বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন– হাসান উজ্জামান, "বৃটিশ-ভারতে নিয়মতান্ত্রিক আপোসমূলক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি," পটভূমি, ঢাকা : পটভূমি প্রকাশনী, মাসিক জার্নাল, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মে ১৯৭৯, পৃ. ৯-২৪। ঐ সম্প্রদায়িক তার বিষক্রিয়া পটভূমি, ঢাকা পটভূমি প্রকাশনী, মাসিক জানার ৩য় বর্ষ সপ্তম সংখ্যা নভেম্বর সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ২০-২৭। ঐ, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা, ঢাকা : নলেজ ভিউ, মে ১৯৮১। ঐ, আর্থসামাজিক বিকাশ : বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ বাংলাদেশ ও তৎকালীন বৃটেনের মধ্যেকার সম্পর্ক, ঢাকা : নলেজ ভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯৮২। ঐ বাংলাদেশ ধর্ম ব্যবসায়ের রাজনীতি : স্বরূপ উন্মোচন, ঢাকা : সুবর্ণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। ঐ, উপমহাদেশে রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তা স্রোতের বিপরীতে মূল্যায়ন, ঢাকা : বুক হাউস, নভেম্বর ১৮৮৯।

২১৬. উমাকান্ত তিওয়ারী, দি মেকিং অফ দি ইণ্ডিয়ান কন্সটিটিউশন, এলাহাবাদ : সেন্ট্রাল বুক ডিপো, ১৯৬৭, পৃ.-৪।

২১৭. বৃটিশ আমলে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্যে– অশোক মেহতা এবং এ. পট্টবর্ধন, দি কমিউনাল ট্রায়েংগেল ইন ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ : কিতাবিস্থান, ১৯৭২। আর সি. মজুমদার এণ্ড আদারস, এ্যান এ্যাডভান্সড হিস্টোরি অফ ইণ্ডিয়া, লণ্ডন : ম্যাকমিলান এণ্ড কো:, ১৯৫৩। বেনী প্রসাদ, দি হিন্দু-মোসলেম কোয়েশ্চেন, এলাহাবাদ : কিতাবিস্থান, ১৯৪১। মওলানা আবুল কালাম আজদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম, বোম্বে : ওরিয়েন্ট

লংম্যান্স, ১৯৫৯। বিনয় ঘোষ, বাঙলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ১৯৭৩। বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা : প্রকাশক-গ্রন্থনা, পরিবেশক-মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৭। হাসান উজ্জামান, "বৃটিশ ভারতে নিয়মতান্ত্রিক আপোসমূলক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি", পটভূমি, ঢাকা : পটভূমি প্রকাশন,ন ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৭৯।

২১৮. ডব্লিউ, নরম্যান ব্রাউন, দি ইউনাইটেড স্টেটস এণ্ড ইণ্ডিয়া পাকিস্তান, বাংলাদেশ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২, পৃ. ১৩০।

২১৯. বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দেখুন- হাসান উজ্জামান, "বাংলাদেশে বাংলার নির্বাসন", মনন, ঢাকা : মনন প্রকাশনী, আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, পৃ.- ৪১-৫৪।

২২০. কার্ল ভরিস, পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান, প্রিন্সটন : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫, পৃ.-৯০-৯১।

২২১. আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ. নভেম্বর ১৯৭০, পৃ. ৪১২।

২২২. হাসান উজ্জামান, "সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া" পটভূমি, (মাসিক জার্নাল), ঢাকা : পটভূমি প্রকাশনী, তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ.-২৫।

২২৩. আবুল ফজল, রেখাচিত্র, চট্টগ্রাম : বইঘর, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ৩০৭।

২২৪. 'সৈনিক', ৮ই এপ্রিল ১৯৪৯। উদ্ধৃত : উমর, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬০-৬১।

২২৫. পুর্ণ বিবরণ রয়েছে- সৈনিক, ২২শে এপ্রিল ১৯৪৯। উদ্ধৃত : ঐ, পৃ.-২৬২-৬৪।

২২৬. আজাদ, ঢাকা, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৯। উদ্ধৃত : ঐ, পৃ.-২৬৬।

২২৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮, পৃ.-৩৩৩-৩৪।

২২৮. রিপোর্ট, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬-৭।

২২৯. ঐ, পৃ.-১২০।

২৩০. ঐ, পৃ.-৮৬।

২৩১. উদ্ধৃত : সরলানন্দ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ.-১১২-১৩।

২৩২. ঐ।

২৩৩. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, "পাকিস্তানের রাস্ট্রভাষা সমস্যা", আজাদ, ১২ই শ্রাবণ ১৩৫৪, উদ্ধৃত : বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, ঢাকা : প্রকাশক-গ্রন্থনা, পরিবেশক- মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর ১৯৭০, পৃ.-৪।

২৩৪. উদ্ধৃত : উমর, ঐ পৃ.-৫।

২৩৫. আবদুল হক, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা," আজাদ, কলকাতা, ৩০শে জুন ১৯৪৭। প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে- আবদুল হক, ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব, ঢাকা : মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ১৪-১৬।

২৩৬. আব্দুল হক, "উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে," ইত্তেহাদ, কলকাতা, ২৭শে জুলাই ১৯৪৭। প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে- আব্দুল হক, ঐ, পৃ.-২১।

২৩৭. আবুল মনসুর আহমদ, *"বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা"*, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু? ঢাকা: অধ্যাপক এম.এ, কাসেম, এম, এস. সি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তমদ্দুন অফিস, রমনা। প্রিন্টার-এ. এইচ. সৈয়দ, বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৭নং বংশাল রোড, ১ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, পৃ. ১৭

২৩৮. সাপ্তাহিক মিল্লাত, কলকাতা, ২৭ শে জুন ১৯৪৭, উদ্ধৃত, আব্দুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

২৩৯. মোতাহার হোসেনের এই প্রবন্ধটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত তমদ্দুন মজলিসের পুস্তিকা "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?- তেও পুন: প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত: ঐ, পৃ.৪১

২৪০. ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কুমিল্লাতে নৃশংসভাবে হত্যা করে

২৪১. কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পীচেজ এ্যাজ গভর্ণর জেনারেল, করাচী: পাকিস্তান পাবলিকেশনস, তারিখবিহীন, পৃ. ৮৫-৮৬। উদ্ধৃত: উমর, ঐ, পৃ. ১০৫

২৪২. হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল, " ডেমোক্রেটিক ক্যারেক্টার", দি পলিটিক্যাল রাইটিংস অফ হ্যারল্ড ডি, ল্যাসওয়েল, নিউইয়র্ক: দি ফ্রী প্রেস অব গ্লেনকো, ১৯৫১, পৃ. ৪৯৭-৯৮

২৪৩. স্বাধীন বাংলাদেশবাসীর প্রতি-প্রচার দপ্তর, বাংলাদেশ সরকার যে, ১৯৭১। উদ্বৃত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র: তৃতীয় খণ্ড (মুজিব নগর: প্রশাসন) ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৪৩

২৪৪. জয় বাংলা, ১৮ জুন, ১৯৭১ সংখ্যা। উদ্ধৃত: ঐ, পৃ .৫৫

২৪৫. জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ 'বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। উদ্ধৃত: ঐ, পৃ .২৯২

২৪৬. " লেট আস বীল্ড গোল্ডেন বেঙ্গল", এ্যান এ্যাডরেস টু দি নেশন বাই মি. তাজউদ্দীন আহমদ, প্রাইম মিনিস্টার অফ দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, ব্রডকাস্ট অন ডিসেম্বর ৮, ১৯৭১। প্রিন্টেড এ্যান্ড পাবলিশসড বাই দি মিনিস্ট্রি অফ ইনফর্মেশন, গভর্নমেন্ট অফ দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। উদ্ধৃত: ঐ, পৃ .২৯৭-২৯৮

২৪৭.*"স্বাধীনতার সুর্যোদয়ে"* জাতির উদ্দেশে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রদত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তিকা। উদ্ধৃত: ঐ, পৃ .৩২২

২৪৮. *"পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন- দালাল, বিশ্বাসঘাতক ও মোনাফেক হইতে সাবধান হউন"*, মওলানা ভাসানীর প্রচারপত্র, ৫ মে ১৯৭১। উদ্বৃত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র: চতুর্থ খণ্ড ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৪৯৩-৪৯৭

২৪৯. প্রেস স্টেটমেন্ট অফ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রেসিডেন্ট অফ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ, ২২ মে, ১৯৭১। উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৫০৫-৫০৮

২৫০. বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা, ১ জুন ১৯৭১। উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৫০৯-৫১৫

২৫১. বাংলাদেশ পরিষদ সদস্যবর্গের সমাবেশ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ, ৬ জুলাই ১৯৭১। উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৫৪৪

২৫২. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৬০০

২৫৩. "বাংলাদেশের জনগণের সামনে উপস্থাপিত স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার রূপরেখা ও কর্মসূচি", বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, ৩০ নভেম্বর ১৯৭১। ১৯৭১ সালের ৩০, ৩১ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস (দ্বিতীয় বিশেষ গৃহীত রাজনৈতিক দলিলের ভিত্তিতে রচিত), বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড আবুল বাশার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৬১২

২৫৪. "মুক্তিযুদ্ধের নতুন অধ্যায় ও আমাদের করণীয়", বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি সার্কুলার, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১। উদ্বৃতাংশ: ঐ, পৃ. ৬২২

২৫৫. "ইভালুয়েশন অফ দি ফ্রীডম অফ বাংলাদেশ," সেন্ট্রাল কমিটি, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইস্ট পাকিস্তান (বাংলাদেম), ২২-৫-৭১, উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৬২৫

২৫৬. ঐ, পৃ. ৬৩১

২৫৭. "এ্যান এ্যাপীল ফ্রেম দি বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেনশিয়া", বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অফ ইনটেলিজেনশিয়া, ৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৬, ইণ্ডিয়া, তারিখ উল্লিখিত হয়নি। উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৬৩৫।

২৫৮. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৬৩৯

২৫৯. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৬৪৮

২৬০. রিপোর্ট অন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ টিচারস এসোসিয়েশন, তারিখবিহীন। উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৬৬০
২৬১. মোস্তফা আনোয়ার, "সাম্প্রদায়িকতা: সামন্তবাদ প্রসঙ্গ" (কথিকা), চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থাপিত বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত। প্রচার: ২১-৪-৭১। উদ্বৃত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র: পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১৫-১৭
২৬২. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ১২৯
২৬৩. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ২৩৪-২৩৭
২৬৪. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ২৫২-২৫৫
২৬৫. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ২৭৬-২৭৯
২৬৬. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ২৯৯
২৬৭. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৩১০-৩১২
২৬৮. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৩১৪
২৬৯. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৩১৯
২৭০. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৩২০
২৭১. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ৩২৪
২৭২. উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৪৪-৪৬
২৭৩. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৯৩-৯৪
২৭৪. ঐ, পৃ.৯৪
২৭৫. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ১২৯
২৭৬. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ১৩১
২৭৭. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ১৪৭-১৪৮
২৭৮. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ১৭১
২৭৯. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ১৭২-১৭৩
২৮০. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ২৬৪-২৬৫
২৮১. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৩১৯
২৮২. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৪১৬
২৮৩. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৪৭৭
২৮৪. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৪৯৫-৪৯৬
২৮৫. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৫১৮
২৮৬. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৫৮২-৫৮৩
২৮৭. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৫৯৩-৫৯৫
২৮৮. উদ্বৃত: ঐ পৃ. ৬৩৪-৬৩৫
২৮৯. এম. এন. রায়, *"সিকিউলারিজম ইনডীড"* ভি, কে. সিনহা, সম্পাদিত, সিকিউলারিজম ইন ইন্ডিয়া, বোম্বে: লালবাণী পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮, পৃ. ১৫৫
২৯০. গণপরিষদ খসড়া সংবিধান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ মজিবর রহমানের ভাষণ, ৪ নভেম্বর ১৯৭২, উদ্ধৃত: খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সম্পাদিত, বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, ঢাকা: পৃ. ১০৮-১৮ (পুরো ভাষণ)
২৯১. গণ আজাদী লীগের কর্মসূচি, জুন-জুলাই ১৯৪৭।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতাঃ ১৯৭২-১৯৮৮

পৃ.২০১-২৪৩

ক. সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন

খ. বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাতৃভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

নবী করিম (সাঃ) আদর্শে বঙ্গবন্ধু, মাতৃভাষা চেতনা ও বঙ্গবন্ধু, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন করা, তাবলীগ জামায়াতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য জমি প্রদান, বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার, ওআইসি'র অন্তর্ভুক্তি, ধর্মনিরপেক্ষতায় বঙ্গবন্ধু

গ. সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান

প্রেসিডেন্ট পদে জিয়াউর রহমান, 'হ্যাঁ' ভোট 'না' ভোট, এমেন্ডমেন্ট বিল, আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন- ১৯৭৮ ৩রা জুন, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর বৈধতা, জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল গঠন, সাধারণ নির্বাচন-১৯৭৯, পঞ্চম সংশোধনী বিল, জিয়াউর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ঘ. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সংবিধান পরিবর্তন ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, রাজনৈতিক নেতাদের ধরপাকড়, প্রেসিডেন্ট পদে জেনারেল এরশাদ, এরশাদের গণভোট, উপজেলা নির্বাচন, ১৯৮৬ সালের নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন - ১৯৮৬, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন -১৯৮৮, অষ্টম সংশোধনী বিল গৃহীত

ক. সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন

আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাসে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি;ফলে ভয়াবহ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, বিপুল মানুষের নিঃস্ব অবস্থায় দেশত্যাগ ও হানাহানি বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানে সংখ্যা গুরু বাঙালি শোষণে, বঞ্চনায় ও সামরিক স্বৈরশাসনে উপনিবেশিক ধারায় নিষ্পেষিত হয়ে অবশেষে জাতিগত এবং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অনন্ত সম্ভাবনাময় গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এই শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন। আবার সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে না পারা এবং প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও চার প্রতিষ্ঠিত নেতাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার পর দুটি সামরিক স্বৈরশাসন আমলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মৌল রাষ্ট্রসত্তা বর্জন করে তাতে একটি বিশেষ ধর্মের যোগ দেওয়ায় বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

বলা হয়ে থাকে, ''জনগণ যত অসচেতন ও অশিক্ষিত থাকে ধর্মের অফিম তাদের বেশী গেলানো যায়।" উভয়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ছিল অসচেতন ও অশিক্ষিত। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠি এ সুযোগ সঠিক সদ্ব্যবহার করে। *"ইসলাম বিপন্ন"* এই ধুয়া তুলে মানুষের অধিকারকে খর্ব করেছ, ইসলাম রক্ষার নামে প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। প্রথম দিকে তাদের এই কৌশল সফল হলেও পরিনামে শেষ রক্ষা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানী অসাম্প্রদায়িক ও অধিকার সচেতন জনগণের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যায়নি। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান, সংখ্যালঘু হিন্দু ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের আশাভঙ্গের সূত্রপাত। একদিকে তেভাগা ও টঙ্ক আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকার দমন, অন্যদিকে মুহম্মদ আলীর জিন্নাহর স্বৈরাচারী ও জাতিগত নিপীড়নমূলক পদ্ধতিতে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণাতে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একমাসের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষা বিতর্কে বাংলা ভাষার উপযুক্ত স্থান দাবিকরী অগ্রচারী লড়াকু যোদ্ধা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫১ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত এক শিক্ষক সম্মেলনে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াসকে পূর্ব বাংলায় গণ হত্যার শামিল এবং রাজতৈক অধীনতার নামান্তর বলে উল্লেখ করেন। বুদ্ধিজীবি ও প্রগতিশীল রাজনীতিক এবং ছাত্রসমাজের এই তীক্ষ্ণ বোধ ও প্রখর সচেতনার ফলে ১৯৪৮ ও ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেই পূর্ব বাংলা এক মৌলিক ও বড় তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক রূপান্তর ঘটে যায়; ভিত্তি তৈরি হয় ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার।

পূর্ববাংলায় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে মুসলীম লীগকে নির্মূল করে দিতে সক্ষম হওয়া রক্ষণশীল ও গণসম্পর্কহীন সাবেক মুসলিম বাঙালি নেতাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান ঘটে এবং জমিদারী উচ্ছেদের ফলে এদের রাজনৈতিক ভিত ধ্বশে যায়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে নতুন বাঙালি জাতিয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টি হয় তার ফলে পাকিস্তান গণপরিষদের পূর্ববাংলার জনপ্রতিনিধি শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি তুলে ধরেন এবং তখনকার পূর্ব বাংলার তরুণ জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবর রহমান ওই গণ পরিষদেই ঘোষণা করেনঃ

I will here and now speak in Bengali and no body can prevent me from doing that.[১] 'পূর্ববাংলা' নাম পরিবর্তন করে পূর্বপাকিস্তান' করার প্রতিবাদে শেখ সাহেব গণপরিষদে বলেনঃ

The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it.[২] আবার বলেনঃ So far as the changing of name is concerned, we would like to be called ourselves as Bengali.[৩]

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে তরুণপ্রাণের আত্মদান ও রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলার বাঙালির বিপুল আবেগঘন জাতিসত্তাগত জাগরণ এবং ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এর মারকুটে রূপের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালে শেখ সাহেবের ওই উচ্চারণ ছিল জনগণের সেই ঘনসংহত আবেগ এবং বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির মর্যাদা রক্ষার সুদৃঢ় অবস্থানের প্রতি এক আন্তরিক অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ে পূর্ববাংলার বাঙালির বিপুল ঐক্যের ভিত তৈরি হয়। এবং নির্বাচনের ওয়াদা হিসেবে বংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫) বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশে বাঙালিত্বের প্রতীক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্যদিকে, ১৯৫৭ সালে সিকানদার আবু জাফরের সম্পাদনায় *সমকাল* মাসিক পত্রের প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চিন্তার এক নবযুগের সূচনা হয়। এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে সমকাল প্রাকাশনীর উদ্যোগে সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি কথা (১৯৫৮) বইটি প্রকাশের মাধ্যমে।

বাঙালির জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির সংগঠিত বিকাশের আঁচ পেয়েই পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠী ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন বাতিল করে মার্শাল-ল জারি করে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তরের বহুমাত্রিক ও পর্যায়ক্রমিক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। সামরিক শাসন অমান্য করে ১৯৬২ সালে ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলনে এ সূচনা। একই সঙ্গে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের পাকিস্তানে 'দুই অর্থনীতি'র তত্ত্ব বাঙালি জাতির স্বধিকারের প্রশ্নকে গভীরতর মাত্রা দান করে। সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক গণচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হন। পাকিস্তান সরকার এ সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করায় (১৯৬৭) শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক, গণবিরোধী ও বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী নানা কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সাহসী ভুমিকা পালন করেন আবুল ফজল, আবদুল হক, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখ। *উমরের সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬) ও *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৮) আবু আহসান ছদ্মনামে সমকালে প্রকাশিত আবদুল হকের প্রবন্ধ *'যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা'* (১৯৬৬) ও *মুসলিম জাতীয়তাবাদঃ পুনর্নিরীক্ষা* (১৯৬৬) এবং আবুল ফজলের বক্তৃতা, বিবৃতি, ভাষণ এবং একের -পর -এক যুক্তিভিত্তিক, বিচারনিষ্ঠ ও মানবতন্ত্রের বাণীসমৃদ্ধ প্রবন্ধসমূহ ধর্মের ভেকধারী পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিকে ধসিয়ে দেয়।

আবুল ফজল ছিলেন এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী। ১৯২০-এর দশকে বাঙালি মুসলমান সমাজের অচলায়তন ভেঙে বিবেকী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজের তরুণতম সদস্য হিসেবে আবুল ফজল, আবুল হোসেন ও আবদুল ওদুদের নেতৃত্বে সীমিত পরিসরে যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ১৯৬০-এর দশকে এসে তা মানবমুক্তির আন্দোলনে পরিণত হয়ে গোটা পূর্ববাংলার বাঙালিকে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে তোলে। ফলে রাজনীতি ও সংস্কৃতির এক অনন্য সংযোগ ও সমন্বয় ঘটে। সাহিত্য-শিল্প, চিত্রকর, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের জাতীয় পরিসরে এই সমন্বিত ভূমিকা জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করে। এই পটভূমিকায় ১৯৬৬-এ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ৬-দফা আন্দোলন এক নতুন মাত্রিকতা ও জনসমর্থন-ধন্য সর্বোচ্চ গতিবেগ লাভ করে। ফলে ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান এসব মূল
দ্বন্দ্বের মীমাংসাপ্রত্যাশী বিস্ফোরণ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণ শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামীলীগকে বিপুলভোটে নির্বাচিত করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দান করে। জনগণ এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী বৈধতা দেওয়ায় তিনিই হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা।

কিন্তু পরবর্তীতে *"ইসলাম বিপন্ন"* এই ধুয়া তুলে ১৯৭০ এর অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক বিজয়কে অস্ত্রের মুখে ছিনিয়ে নেয় পাকিস্তানী সামরিক জান্তা। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসে ইসলাম রক্ষার নামে বাঙালিকে নিচিহ্ন করার

অভিযান শুরু হলে বাঙালিরা ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। পাকিস্তান ও ইসলামকে অভিন্ন দাবি করে পাকিস্তান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের ইসলামের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ মানুষের উপর চলে সীমাহীন নির্যাতন। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপামর বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যায় মাতৃভূমি স্বাধীনতার লক্ষ্যে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পরে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির প্রাণ এবং এদেশের দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে জন্ম লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এই নিধনযজ্ঞে ও নির্যাতনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিল ইসলামের ধ্বজাধারী জামাত, মুসলীমলীগ, নেজামে ইসলামী, পি. ডি. পি সহ ইসলামপন্থি দল গুলো। এসব রাজনৈতিক দলগুলোর বিভ্রান্ত সদস্যরা ইসলাম রক্ষার নামে আল বদর, রাজাকার ও আল শামস বাহিনীতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করে এবং যতরকম অপরাধ কল্পনা করা যায় তার সবগুলো এদের সহযোগিতায় সংঘটিত হয়। ইসলামের চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে এধরনের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের নজির নেই।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র যে ধর্মীয় না হয়ে অসাম্প্রদায়িক হবে তার প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭১ সনের ১৭ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে, যেখানে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হবে সেকথা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় নেতারা বহুবার বলেছেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বলেনঃ বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে এবং এর ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তিতে হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিপেক্ষতা।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রে অনুমদিত হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের ভাষণের গণতন্ত্র, ও সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিবরণ নিচে উদ্বৃত করা হলোঃ

> আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র-সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে, দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই, শোষিতের গণতন্ত্র এবং শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো- আমরা দেশে যে গণতন্ত্রের যে বিধিলিপি আছে তাতে সেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক শিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং নিশ্চয় আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্ত যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জণগনের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্রের ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গনতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সে জন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।
>
> সোশ্যালিজম্-অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলো জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না; তাদের আগে বুঝা উচিত সমাজতন্ত্র কি। সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেলো, অথচ এখনো তারাও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয় অমনি চেয়ে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিন সময় প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায়।
>
> এবং সেজন্য পহেলা——স্টেপ যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি- শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কি আবহাওয়া, কি

ধরনের অবস্থা, কি ধরনের মনোভাব, কি ধরনের আর্থিক অবস্থা সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে চীন তা করেনি; সে অন্যদিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলছে। ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র ——তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না——যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে তারাও সেগুলো করতে পারেন নাই – এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা Process –এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাইনা এবং করবোনা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে – তাদের কেউ বাধা দিতে পারবেনা। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এইযে, ধর্মকে নিয়ে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার – এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবেনা। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলবো সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।

এভাবে বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের ভাষণে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যখ্যা তুলে ধরেন। তাছাড়া দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৩ মার্চ নিজ বাড়িতে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় সব আয়োজনই সম্পন্ন করে দিয়েছিলেন। এ সবই সবুজ সংকেত হিসাবে যথেষ্ট।

বঙ্গবন্ধু এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন, যা ভারতীয় উপমাহাদেশে একেবারেই নতুন। এটা পাকিস্তানের মতো অদ্ভুত রাষ্ট্র নয়, এমনকি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর চেয়েও উন্নত ধরনের। পাকিস্তান ও ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, যা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুমোদিত নয়। যদিও পণ্ডিত নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও তাঁদের সহকর্মীরা গণতন্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে ভারতকে পরে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন।

বাংলাদেশ উপমহাদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে ওঠা এক আধুনিক রাষ্ট্র। ভৌগোলিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রসীমানা, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং যুগ-যুগ ধরে এই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বিকশিত জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও মননধারাগত বিকাশ এ নবীন প্রজাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণরূপ লাভ করবে - এটিই এ রাষ্ট্রের অঙ্গীকার। ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং তার মাধ্যমে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একে অনন্যতা দিয়েছিল। উপমহাদেশে পাঞ্জাবি, বেলুচি, সিন্ধী, মারঠি, তামিল প্রভৃতি বড় বড় অনেক জাতি থাকলেও বাঙালি জাতিরই শুধু একটি নিজস্ব রাষ্ট্র আছে।

স্বল্প সময়ে একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, তার ওপর গণভোটের মতো সাধারণ নির্বাচন (১৯৭৩), বিপুল পুনর্গঠন উদ্যোগ, বহুদেশের স্বীকৃতি আদায়, আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন, দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে বাধ্যতামূলক সমবায়, শোষিতের গণতন্ত্র প্রভৃতির অন্তর্ভূক্তি উল্লেখযোগ্য।

হাজার বছরের শ্রেয়বোধ ও কল্যাণচেতনা এবং জনগণের মৌলিক বিশ্বাস ও জীবন - সাধনার চয়ন করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা রুপায়িত হয়েছিল চার রাষ্ট্রিয় মৌলনীতিতে। জাতীয়তাবাদ অর্থহীন ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া, সে-অর্থে রাষ্ট্রের মূল পরিচয়চিহ্ন ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখাযাবে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কার মুক্ত। আর তারই ফলে এই ভূখণ্ডে স্বাধীনতার স্পৃহাও একবারে মজ্জাগত। শাস্ত্রগত-সংস্কার মুক্তি ও স্বাধীনতা বোধ একটা পরিপক্ব স্তরে উন্নীত হয় নানা ধর্মের মানুষের সহ-অবস্থান, ধর্মীয় সহনশীলতা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধায়। এখনকার সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য সেটাই। ধর্মনিরপেক্ষতা ও নানা জাতিগোষ্ঠীর বিচিত্র, কখনো ভিন্নধর্মী মতের সমন্বয় সাধনের প্রবণতাই এখানকার জনমানসের প্রধান প্রবণতা। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে বর্জন করে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম-তিনটি ধর্মই প্রাচীন-কাল থেকে এখানে নিজেদেরকে সমন্বিত করেছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে। শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশেই গড়ে উঠেছে মানবিক, প্রতিবাদী, এস্টাবলিসমেন্ট-বিরোধী লোকধর্ম। এর বীজ আছে এখানকার আদিবাসীদের সাধনায়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিবাদী চেতনায়, চৈতন্যদেবের বেদ-উপনিষদের গণমুখী চর্চায়, ইসলামের মানবিক সুফিবাদী ও মরমী সাধনায়, বৈষ্ণব বাউল ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিন্তা ও ভাবনায়, লোকসাহিত্য ও লোকজীবনের এক সর্বজনীন ও মানবিক চৈতণ্যে ভাস্বর বোধে।[4]

সকল আধুনিক রাষ্ট্রই অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপালনের স্বাধীনতাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা। ধর্মনিরপেক্ষতা সেই অর্থে, রাষ্ট্র থেকে ধর্মের উচ্ছেদ নয়। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যিক শর্তের অন্তর্গত। এই মৌলনীতি কার্যকর হলেই গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ধাপে ধাপে আসে সামাজিক অগ্রগতির পূর্ণতা। একেই বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র বলে মনে করতেন।

অপরদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের নয় বছর পরে সংবিধান রচিত হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামীলীগ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার দশ মাসের মধ্যেই জনগণকে একটি উন্নত মানের সংবিধান উপহার দেয়। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ছিল এই সংবিধানের মূলনীতি। এই সংবিধানের দ্বাদশ অনুচ্ছেদে একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে, অন্যদিকে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিশেষ ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা দান, কোনো প্রকার রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারীর প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য বিলোপ করা হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেনঃ "ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এই জন্য যে ভবিষ্যতে কেউ যেন ধর্মকে রাজনৈতিক অঙ্গণে টেনে এনে কলুষিত করতে না পারে; ধর্ম ও রাজনীতি নিজ নিজ এলাকায় যেন সুষ্ঠুভাবে সহাবস্থান করে।[05] বাহাত্তরের শাসনতন্ত্রে শুধু সাম্প্রদায়িকতাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল মুসলিম লীগ,জামাত-ই-ইসলামী ও নেজামে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ।

সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে সন্নিবেশিত হবার সাথে সাথেই সরকার বিরোধী এবং পকিস্তানপন্থী শক্তিসমূহ একজোট হয়ে অপপ্রচার চালাতে থাকে যে, বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। ধর্মনিরপেক্ষ নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠী মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কৌশলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলছে। সে সময়ে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স এক বৎসর হয়নি তখন সবাইকে রীতিমতো অবাক করে বর্ষীয়ান জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের ডাক দেন। ভারতকে বাংলাদেশের এক নম্বর শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং এ দেশের মুসলমানদেরকে হিন্দুবাদী আগ্রাসন

থেকে প্রতিহত করার আহবান জানান। আবেদ খান মনে করেন, "সেই সময় চীনপন্থী উগ্র বাম এবং পাকিস্তান পন্থী উগ্র ডান এক সঙ্গে মাওলানা ভাসানীকে অধিকার করে নিয়েছিলো।[06]

মুজিব সরকারের প্রথম দিকে এ নীতি অনুসরণ করা হলেও ক্রমান্নয়ে ধর্মীয় কার্যক্রমের প্রীতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সাধারণ ক্ষমার সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দালালদের অনেকে মুক্তি পায় এবং গোপনে সংগঠিত হতে থাকে। জামাত ও মুসলিমলীগ নিজেদের পরিচয়ে মাঠে না নামলেও তারা একেবারে মাঠের বাইরেও ছিলনা। ধর্মীয় জলসা, ওয়াজ নসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে এবং অরাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে তারা ইসলামের নামে সংগঠিত হতে থাকে। এসব তৎপরতা সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের তেমন কোন উদ্বেগ ছিল বলে মনে হয় না। ১৯৭৩ এ শেখ মজিব ১৯৭১ এর ঘৃণিত যুদ্ধ অপরাধীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে এক অধ্যাদেশ বলে বাহাত্তরে বিলুপ্ত ইলামিক একাডেমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ করা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন। অত্যন্ত কঠিন অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে শেখ মুজিব ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বিশেষভাবে কাজ করেছে; ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর নৈতিক সমর্থন, তাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি এবং তাদের তেল ও প্রেট্রো ডলার। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন এবং তা হলো, ঐসময় এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল দারুনভাবে বিপর্যস্ত এবং পশ্চিমা সাহায্যও ছিল অনিশ্চিত। ক্রমবিলিয়মান জনপ্রিয়তা এবং সংকটাপন্ন প্রশাসনের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব মনে করলেন যে, ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বভাবিক হলে তিনি ডানপন্থী ও ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানদের শ্রদ্ধা ও আস্থা ফিরে পাবেন। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মনে করেন, "এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত পররাষ্ট্রনীতির সূচনা হয়েছিল তিনটি ঘটনার মাধ্যমে ১৯৭৪-এ পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভ, ইসলামী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি এবং ১৯৭৫-এ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হবার গৌরব অর্জন এর স্বার্থে। [৭]

খ. বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাতৃভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন দরবেশ আউয়াল। তিনি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র)'র প্রিয় সঙ্গী ছিলেন। ১৪৬৩ খ্রীস্টাব্দে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বাগদাদ থেকে বঙ্গে আগমন করেন। পরবর্তীকালে তারই উত্তর পুরুষেরা আধুনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। জাতির জনক হচ্ছেন ইসলাম প্রচারক শেখ আউয়ালের সপ্তম অধঃস্তন বংশধর। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের সুখ্যাতি ছিল সূফি চরিত্রের অধিকারী হিসেবে। জাতির জনক নিজেও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রান লোক। তিনি ইসলামী আদর্শ ঈমান ও আকীদা, তাওহীদ, রিসালাত, ইসলামী তাহযীব তমুদ্দুন ও সুন্নতি তরিকা সমুন্নত রাখতে সদা তৎপর ছিলেন। তিনি তার ব্যক্তি, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের হুকুম আহকামভিত্তিক সুন্নতি তরিকা অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন। তিনি ইসলাম সহ সকল ধর্মের যথাযথ স্থান সঠিকভাবে নির্ধারনের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৃত অর্থেই একজন মুসলমান এবং একজন খাটি বাঙালি ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যত গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল তার প্রত্যেকটিরই বিরোধিতা করেছে মৌলবাদী এবং পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর তাবেদার অনুচররা। প্রতিটি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রায়ই ধর্মের নামে তারা বঙ্গবন্ধুর নামে কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশর স্বাধীনতা লাভের পরও তাদের অপপ্রচার থামেনি; বরং কিছু উচ্চাভিলাষী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর স্বাধীনতার শত্রুরা ধর্মীয় লেবাস পরে ইসলাম ধর্মকে স্বাধীনতা বিরোধী কাজের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং লক্ষ লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের আক্ষরে লিখিত সংবিধানকে সংশোধনের নামে কুলষিত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মহীন ছিলেন বলে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে। এ মিথ্যে অপপ্রচারের অপনোদনকল্পেই তার জীবনের কর্মময় ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশপ্রেম ও পরবর্তী স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান আলোকপাত করা হল।

নবী করিম (সাঃ) আদর্শে বঙ্গবন্ধু

একজন খাঁটি মুসলমান নাগরিক হিসেবে স্বদেশপ্রেম ও দেশ পরিচালনা এবং নেতৃত্বের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি নবী করিম (সাঃ) কে অনুসরণ করতেন। কেননা দেশপ্রেমের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে দেশের স্বার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখা, দেশের সীমান্ত অটুট ও সুদৃর রাখার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মহানবী (সাঃ) এর মাদানী জীবনের দিকে তাকালে তাঁর দেশপ্রেমের এই কর্তব্যধারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তিনি ছোট বড় যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তার সিংহভাগই দেশ ও জাতির কল্যানের চেতনায় সমৃদ্ধ। বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করার পরে মক্কার কুরাইশ কাফিররা ইসলাম ও মুসলমানদের দেশ মদীনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলে মহানবী মদিনা ও মদিনাবাসীকে অক্ষত রাখার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক ওহুদের যুদ্ধে। খন্দকের যুদ্ধকে তো আমরা ইসলামী দেশ বহিঃশত্রু থেকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখার কালজয়ী দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করতে পারি। এভাবে ইসলামের প্রায় সকল যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক দেশ ও জাতির হেফাজতের স্বার্থে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দেশের সীমান্ত পহাড়ায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর সাহাবা-ই কিরামকে এ কাজে যুগপৎ উৎসাহিত করে তুলেছেন। তিনি মুসলিম উন্মাহর জন্য এ পর্যায়ে যে বিধান রেখে গেছেন তা হচ্ছে মুমিন মুসলমানরা যে দেশে, যে রাষ্ট্রে বসবাস করবে, সে দেশের সীমান্ত অটুট রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ

করবে। নিজেদের দেশের সীমানা যদি সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত না থাকে তবে সেই দেশের অধিবাসীদের জান ও মাল হিফাজত করবে কীভাবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

> আল্লাহর পথে একদিন দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়ার ওপর যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। আর (এ কাজের বদৌলতে) তোমাদের কেউ যদি জান্নাতের এক চাবুক পরিমান জায়গা পায়, তাহলে তা দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। [৮]

হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেনঃ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় একদিন ও একরাত দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া একমাস ধরে সিয়াম পালন করা ও সালাত আদায় করার থেকে বেশী মূল্যবান। এই দায়িত্ব পালনকালে যদি সে মারা যায় তাহলে সে কবরের আজাব ও কবরের বিপদ (পরীক্ষা) থেকে সে নিরাপদ থাকবে। [৯]

হযরত ফুদালা ইবন উবায়দ (রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

> আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া তা মাসভর রোযা রাখা ও ইবাদাত করা থেকে উত্তম। এ অবস্থায় সে যদি মারা যায়, সে কবরের আজাব ও কবরের বিপদ (পরীক্ষা) থেকে সে রেহাই পাবে এবং তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। [১০]

হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেনঃ

> আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিনের ইবাদাত-বন্দেগী থেকে মূল্যবান। [১১]

এ হাদিস গুলোর সারর্মম দাড়ায় যে, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রহরীর ভুমিকায় অবর্তীন হওয়ার মতো ফযীলত ও বরকত অন্য কোন ইবাদাত বন্দেগীতে নেই। দেশ প্রেম বলতে যদি দেশের মানুষের প্রতি অর্থবহ দেশ প্রেম বুঝায়, দেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বুঝায়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মক্কা বিজয়ের ঘটনায় দেশ প্রেমের মৌলিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। মাতৃভূমি মক্কার যেসব লোক তাকে নিপীড়ণ করেছে, নির্যাতন করেছে, দেশ থেকে উৎখাত করেছে, সেই ঘোর শত্রুদের প্রতি তাঁর আবেগাপ্লুত সহমর্মিতার ঘোষণা, "লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওম আনতুমুত তুলাকা" "ওহে মক্কাবাসী! তোমাদের প্রতি আজ আমার কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন প্রতিশোধ ভাব, তোমরা মুক্ত মানুষ।" মানবতার মহান প্রেম জগতে কে দেখাতে পেরেছে? দেশপ্রেম বলতে যদি দেশের ভবিষ্যত ও সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণ বুঝায়, তাহলে হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনার চেয়ে দেশ প্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন আর কি হতে পারে? দেশের মানুষের সকল প্রকার কল্যাণ সাধন ও উন্নতি বিধানের গ্যারান্টি দেয় ইসলাম। ইসলামই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করে সর্বপ্রকার ধ্বংস ও পতনের রাহুগ্রাস থেকে। ইসলামেই নিহিত রয়েছে দেশপ্রেমের সার্থক ও সাবলীল রূপ।

এ রূপ মহান আদর্শ ও নৈতিকতার দিক মাথায় রেখে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন দেশের নাগরিক মাথা তুলে দাঁড়াবার রঙিন আশায় বুক বেঁধে এমনি করেই একদিন মুসলিম জনগণ ভোট দিয়েছিলেন মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু দিন না যেতেই দেখেছেন পাকিস্তানের জন্মলগ্নে জনগণের দেয়া সুস্পষ্ট ম্যান্ডেটের প্রতি এদেশের এক শ্রেণীর নেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সব সপ্ন তাদের ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। কেবল বাংলার সারে সাত কোটি মানুষই নয়, সারা দেশের বারো কোটি মানুষই ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিজ দেশের মধ্যেই পরবাসী।

পরাধীন আমলেও এ চেহারা এদেশের মানুষের ছিল কিনা তা জনগণই তা বিচার করবে। স্বাধীনতা উত্তর জীবনে বিগত ২৩টি বছর ধরে সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন, লাঞ্চনা-গঞ্জনা, শোষণ ও বঞ্চনা মানুষকে পোহাতে হয়েছে, তার সাক্ষী এদেশের প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ। তাঁদের সন্তান সালাম-বরকত বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে যে সংগ্রামী চেতনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিল, তারই সূত্র ধরে এদেশের আরও শত শত সোনার সন্তানের আত্মদানের পরে হাজার হাজার ছাত্র শ্রমিক রাজনৈতিক কর্মীর অপরিসীম নির্যাতন ভোগের ফলে এদেশের মানুষ এবারই সর্বপ্রথম দেশের আপামর মানুষের মতামত নিয়ে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর

নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণেরই মতামত নিয়ে পাকিস্তানের বুকে, শোষণহীন, ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে সুযোগ এসেছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের উপরই এদেশের আপামর জনসাধারণের ভবিষ্যত নির্ভরশীল। [১২]

> মাতৃভূমি ও জনগণের মুক্তির জন্য আমরন প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। বঙ্গবন্ধু বলেন "ব্যক্তির কৈফিয়ত হিসেবে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার বক্তব্যঃ নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের ভাবি নাগরিকের জীবনকে কন্টকমুক্ত করে যেতে পারি, আজাদী আন্দোলনের সূচনাতে এদেশের মনের পটে যে সুখী সুন্দর জীবনের ছক একেছিল, সে সপ্নের বাস্তব রুপায়নের পথ কিছুটাও যদি প্রশস্ত করে যেতে পারি, তাহলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করব। [১৩]
>
> তিনি ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মাতৃভূমি ও তার অধিবাসীদের মুক্তি কামনা ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যু অবধি সংগ্রাম করেন। তিনি বলেনঃ আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। তবু আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে এ অপবাদ দিয়ে চলেছেন। বিগত ২৩ বছর ধরে ক্ষমতার আসন আমি কবে কখন আঁকরে ধরেছি তার বিবরণ তারা দেন না। বিগত গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমাকে প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আমি তা দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছি। এতে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের অনেকে রুষ্টও হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ বা স্বার্থের বখরায় শরীক হয়ে দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া আমার রাজনীতির লক্ষ্য কোনদিন ছিলনা, আজও নাই। তাই রুষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রলোভনের মুখে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে নিজ বিবেককে আমি বিকিয়ে দিতে চাইনা। তাঁদের দৃষ্টিতে এ আমার হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় দেশবাসীর দৃষ্টিতে নয়।[১৪]
>
> তিনি আরও বলেনঃ " আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিতে চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশ কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কোন কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সে জন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল, কাল থেকে চলবেনা। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি গর্ভনমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দিবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তোমরা আর গুলি করার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।[১৫]

তিনি সকলের মুক্তকণ্ঠের আওয়াজের প্রত্যাশা করে তাঁর কণ্ঠে উল্লেখ করেই বলেন, "ভুললে চলবে না যে, পাকিস্তানে এবার সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের মূল সমাজ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে।" বাংলাকে শোষনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে এদেশের বারো কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই মুক্ত কণ্ঠের আওয়াজ সে আওয়াজ তুলতে হবে বাংলার জনপ্রতিনিধিদের। [১৬]

> বঙ্গবন্ধু বলেন, কথা তোলা হয়েছে যে, নির্বাচনি ঐক্যজোটে সম্মত না হয়ে আমরা বাংলার স্বার্থরই ক্ষতি করছি। এর উত্তর হলঃ বাংলা স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা নির্বাচনী ঐক্যজোটে বিশ্বাসী নই। অতীতে বহুবার, এমনকি ১৯৫৪ সালে ঐক্যজোট গঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। বারংবার মানুষ গভীর আশায় বুক বেঁধে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছিল কিন্তু আমরা দেখেছি যুক্তফ্রন্টের নাম নিয়েই আওয়ামীলীগ সদস্যরা ছাড়া আর সব অঙ্গ দলের সদস্যরাই কেন্দ্রের সেই বিকৃত দলটিতেই ভিরে গিয়েছেন, যে দলকে দুদিন আগে বাংলার আপামর মানুষ বাংলার মাটি থেকে সমুলে উৎখাত করেছে। ফলত সর্বনাশ হয়েছে বাংলা আর বাঙালির, সর্বনাশ হয়েছে এদেশের কোটি মানুষের। তাই এবার আর আমরা ভিন্ন চিন্তাদর্শের মানুষের সাথে ঐক্যজোট গঠন করে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। এবার আমাদের কথা হল কর্মসূচি থেকে থাকলে তার ভিত্তিতে জনগণের দরবারে

যান, জনগণ আপনাকে গ্রহণ করলে জাতীয় পরিষদে গিয়ে প্রয়োজন হলে আপনার সাথে ঐক্যজোট গঠন করবো, এখন নয়।[১৭]

তিনি আরো বলেন, এদেশের আপমর তথা সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়ার বাসনাকে সার্থকরূপ দেওয়ার যে বড় গুরু দায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, সে দায়িত্ব আজ আমাকেই স্কন্ধে তুলে নিতে হচ্ছে। এদেশের ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্য প্রনয়নের দায়িত্ব বাংলার মাটি হতে অঙ্কুরিত আওয়ামীলীগকেই গ্রহণ করতে হবে। আমি ও আমার দল সে দায়িত্ব গ্রহনে সম্পূর্ন প্রস্তুত, কেবল প্রয়োজন জনগণের দোয়া ও শুভেচ্ছা যা কি-না আমাদের এবারের চলার পথে একমাত্র পাথেয়।[১৮] তিনি বলেন, নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের ভাবী নাগরীকের জীবনকে কন্টকমুক্ত করে যেতে পারি, আজাদী আন্দোলনের সূচনাতে এদেশের মানুষ মনের পটে যে সুখী সুন্দর জীবনের ছক একেঁছিল সে স্বপ্নের বাস্তব রুপায়নের পথ কিছুটাও যদি প্রশস্ত করে যেতে পারি তাহলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করব।[১৯]

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতোই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এজন্য উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।[20] পার্বত্য চট্রগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যেগ নেয়া প্রয়োজন। জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিৎ। এর ফলে স্থানীয় জনগনের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগনের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রয়োজনঃ ৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে- সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মত আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থি হতে পারে না। [২১] পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-আজ বিশ্ব জুরে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোন মতেই জরিয়ে পড়তে পারিনা। এ জন্য আমাদের সত্যিকারের স্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরন করতে হবে। [২২]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সারে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রানের চেয়েও প্রিয়।[২৩]

> পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, জনাব ভুট্রো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি দু'দেশের মধ্যে একটি শিথিল সর্ম্পক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারিনা। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্রো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দিবে। [২৪]
>
> আজ দেশের অবস্থা সর্ম্পকে আপনাদের জানা দরকার। ত্রিশ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে ২৫ মার্চ রাত্রে ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী আমার উপর আক্রমন চালায়। সেদিন রাত্রে আমার অবস্থা যে কেমন ছিল সেটা কেবল আমিই জানি। আমি জানতাম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলি করে মারবে। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু বাংলার মাটিকে আমি ছাড়তে পারিনাই। রাত্র ১১ টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে, আওয়ামীলীগের নেতাদের হুকুম দিলাম বের হয়ে যাও। যেখানে পার এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খবরদার, স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেও। [২৫]

আমার দেশ স্বাধীন দেশ। ভারত হোক আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট বৃটেন হোক, কারো এমন শক্তি নেই যে, আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। [২৬]

রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।[২৭]

বঙ্গবন্ধু একজন প্রকৃত মুসলমান ছিলেন বলেই তিনি প্রিয় নবীর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশকে প্রানের চেয়েও বেশী ভালোবেসেছিলেন। তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে সবসময় এদেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী যেমন মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, হায়রে আমার জন্মভূমি মক্কা আমি তোমাকে অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশী ভালোবাসি। তোমার লোকজন তোমাকে ছেড়ে যাবার জন্য যদি বাধ্য না করত তাহলে আমি কখনও কোনদিনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থেকে একদিকে ফাঁসির মঞ্চ অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যন করে জোর গলায় বলেছিলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা, বাংলার মানুষের মুক্তি চাই, বাংলার স্বাধীনতা চাই"। [২৮] তিনি আরও বলেছিলেন, "আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল"। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোরা হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। [২৯] আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাও আপত্তি নাই। তবে তোমাদের প্রতি অনুরোধ আমার লাশটি আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলায় পাঠিয়ে দিও।

মৃত্যুকে অবধারিত জেনেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তাতেই বোঝা যায় যে, তিনি কত বড় মাপের একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। কত বড় একজন দেশপ্রেমিক হলে একথা বলা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

মাতৃভাষা চেতনা ও বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা করার ঘোষণা দেয়। অথচ উর্দু পাকিস্তানের কোন এলাকার মাতৃভাষা ছিল না। মূলত উর্দু ভাষা দিল্লির মুসলিম শাসকদের আমলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী, ফার্সী, তুর্কি এবং স্থানীয় বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠা একটি ভাষা। একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে পাকিস্তানের জনগণ কিছুতই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। বাংলার পাশাপাশি উর্দুকেও তারা পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম ভাষা করার দাবি মেনে নিয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বপাকিস্তানের শতকরা ৯৫ জন অধিবাসীর মাতৃভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেওয়ায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের এ অবাস্তব ও অযৌক্তিক ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পূর্বপাকিস্তানের মানুষ নিজের মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যের ভাষার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা করেননি।

মানুষের মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে মাতৃভাষা অন্যতম। মাতৃভাষা ছাড়া মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। পৃথিবীতে কোন কবি বা লেখকই তার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় অমর সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। যশোরের সাগরদাঁরি গ্রামের বড় ধরনের প্রতিভাসম্পন্ন মাইকেল মধূসুদন দত্তের ন্যায় ইংরেজী ভাষা চর্চা করা সত্ত্বেও ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তেমন খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন নি। অবশেষে যে মাতৃভাষাকে চরম অবজ্ঞা করতেন, সেই মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চা করেই খ্যাতিমান হতে পেরেছেন। মূলত অন্য ভাষা শিক্ষা করলেও অন্য ভাষার কোন কিছু বোঝার জন্য মাতৃভাষায় তা অনুবাদ করার মাধ্যমেই তা আমরা বুঝে থাকি। কোন কিছু বুঝার জন্য মাতৃভাষার অনুষঙ্গ তাই একান্ত আবশ্যক। এ জন্য মাতৃভাষাকে ভালবাসা মানুষের এক সহজাত প্রবনতা।

মাতৃভাষার প্রতি মানুষের অনুরাগ সহজাত। স্বকীয় প্রতিভা বিকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম মাতৃভাষা। কিন্তু তাই বলে অন্য কোন ভাষা শেখা বা চর্চা করা যাবেনা এমন নয়; বরং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য অন্য যে কোন ভাষা সাধ্য অনুসারে শেখা যেতে পারে। মনীষীরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন দেশে যাবার

উপদেশ দিয়েছেন। ভাষা শিক্ষা ছাড়া জ্ঞানের তালিম সম্ভব নয়। জ্ঞান অন্বেষণে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে গিয়ে যে কোন ভাষা শেখার জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অতিশয় উদার ও বিশ্বজনীন। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রর্দশনের সাথে সাথে অন্য ভাষার প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব প্রর্দশন ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা।

বিশ্বে প্রায় বিশ কোটির বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। সে হিসেবে এটা পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম ভাষা। মাতৃভাষার জন্য আমরা দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পৃথিবীর ভাষাসমূহের ইতিহাসে এক অন্যান্য দৃষ্টান্ত ও গৌরবোজ্বল অধ্যায় রচনা করেছি। মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছিল মূলত হাজার বছর আগে এ ভাষার জন্ম লাভের অব্যবহিত পরেই। বিভিন্ন যুগে এ সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ ও বৈচিত্র ঘটেছে। এ সংগ্রামের সর্বশেষ ও চুড়ান্ত পর্যায় হলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর।

বাংলাভাষীদের উপর বিদেশী ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলে। বাংলার মানুষ এটা মেনে নেয়নি। ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক কৃষক সকলেই এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দীর্ঘ আপোসহীন সংগ্রাম এবং চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার এ মর্যাদা আরও সুদৃঢ় ও তাৎর্পযময় হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার অস্তিস্ব রক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এবং সর্বোপরি এর যথার্থ লাভের সুর্দীঘ সংগ্রাম ও রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে আমরা যথার্থই আবেগাপ্লুত ও উদ্দিপ্ত হই। বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে বিশ্ব ভাষার দরবারে এর গৌরবময় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক এ প্রত্যাশা নিয়েই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়-

"মাতৃভাষা, বাংলাভাষা, খোদার সেরা দান
বিশ্বসভায় এ ভাষারই আসন মহিয়ান।"

১৯০৫ সালে তদানিন্তন বঙ্গদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী করে একটি পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায়। আবার ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্তির পর ঢাকা পুনরায় পূর্ব বঙ্গের রাজধানী হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, তারা ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তি পেলেও পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠির খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। আর তা অচিরেই স্পষ্ট হয়ে যায় ভাষার প্রশ্নে। বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানি শাসকচক্র আক্রমণ করল, শুধু ভাষাই নয় এদেশের সংস্কৃতির উপরও তারা কৌশলে হামলা করলো। ১৯৪৭ সালে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী সম্মেলনে তৎকালিন ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাব উত্থাপন করেন, "মাতৃভাষা হবে শিক্ষার বাহন এবং পূর্ববঙ্গের আইন আদালতে ভাষা হবে বাংলা।" ১৯৪৭ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" দাবি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ন হয়। আরো কয়েকটি সংগঠন পরবর্তীতে এ আন্দোলনে যুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরপর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার দাবিতে প্রথম সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট সফল করার জন্য সচিবালয়ের প্রথম গেইটে পিকেটিং কালে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তির ফলে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য ছাত্র নেতাগণ ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে গমন করে ৮ দফা চুক্তির বিষয়ে ঘোষণা করেন যে, যেহেতু "এ ৮ দফা চুক্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা দাবি স্বীকৃত হয়নি, সেহেতু এ চুক্তি তিনি মানেন না।" ১৬ মার্চ ৮ দফা চুক্তির বিরুদ্ধে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের "বেল তলাতে" শেখ মুজিবুর রহমান এক সভা আহবান করেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং তিনিই ছিলেন সেদিনের সভায় একমাত্র

বক্তা। সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি ৮ দফা চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলে মিছিল সহকারে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবন ঘেরাও করেন এবং দাবি উত্থাপন করেন যে, "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করতে পারলে গণপরিষদ থেকে পূর্ববঙ্গের সকল সদস্যকে পদত্যাগ করতে হবে। সেদিন ১৬ মার্চ এ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং শেখ মজিবসহ অন্যান্য ছাত্রনেতার উপর নির্যাতন চালায়। ২১ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে তিন লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল সমাবেশে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তার ভাষনে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবার কথা ঘোষণা করলে শেখ মুজিবুর রহমান এই সমাবেশেই এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। এখান থেকেই ভাষা আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এর চরম বিস্ফোরন ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য জীবন দেন সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর, রফিকসহ নাম না জানা আরো অনেকে। ২১ ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাইল ফলক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ৫২ ভাষা আন্দোলনের নেতা জনাব গাজীউল হক, জনাব জিল্লুর রহমান, ডাঃ গোলাম মাওলা এবং সামসুল হক চৌধুরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। এ সময় তিনি রাজবন্দীদের মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জেলে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট করা এবং মিছিল করে পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদ সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালি জাতি যখন ক্ষত-বিক্ষত তখনই বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান।

শত শহীদের রক্তস্নাত আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে অবশেষে ১৯৭১ এর ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী ময়দান) লাখো লাখো বিক্ষুব্ধ জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তাঁর সারগর্ভ ভাষণ দেন। এটিকে শুধু গেটিসবার্গ এড্রেসের সাথে তুলনা করা যায়। সে দিনের বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে পর্যাচোলনা করলে দেখা যায় যে, একদিকে তিনি যেমন প্রকারান্তের স্বাধীনতার প্রকাশ ঘোষণা দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি যে একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমান তারও দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যেমন তিনি তার ভাষণে বলেছেন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।" "তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।" তিনি আরো বলেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।[30]

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের শেষোক্ত 'ইনশাআল্লাহ" দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহর প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস বা ঈমান ছিল। "ইনশাআল্লাহ " অর্থ হলো যদি আল্লাহ পাক চান। মানুষ যা কিছু করতে চায় তা হওয়া না হওয়া সবকিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আর যারা এ মতের উপর বিশ্বাসী তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় মুমিন বলা হয়। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন খাঁটি মুমিন মুসলমান ছিলেন। এজন্য তার ভাষণে দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো এ উক্তির সঙ্গে "ইনশাআল্লাহ" শব্দটি যোগ করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য উদিত হয়। ফলে আল-কুরআন ও হাদিসসহ বহু ইসলামী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়। ফলে গোটা জাতি আজ কুরআন হাদিসসহ সকল ইসলামী গ্রন্থ খুবই সহজে মাতৃভাষায় তার মর্মবাণী বুঝতে সক্ষম হচ্ছে।

আর ভাষা আন্দোলন না হলে বা মাতৃভাষার প্রতি জাতির জনকের গভীর ভালবাসা না থাকলে এটা হয়তো বা সম্ভব হতো না। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার যে ভালোবাসা তারই প্রকাশ ঘটেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"। বাংলাকে শুধু রাষ্ট্রভাষা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বাংলা ভাষাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনি বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষাকে গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত

করেছিলেন। আজ জাতিসংঘে বাংলা ভাষা একটি স্বীকৃত ভাষা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আপন মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন কিন্তু অন্য কোন ভাষাকে নিয়ে তিনি হেয় প্রতিপন্ন করেন নি; বরং এটা ছিল তার ঈমানের, ইনসাফের, ইসলামের, আদর্শের দাবি।

ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তাই তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং ধর্মীয় দিকগুলো নিয়ে আলোচনা আবশ্যক। কেননা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী বিশেষ করে যারা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধিতা করেছিলেন, তারা বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু বাংলাভাষী সকল মানুষের কাছে স্বীকৃত। কিন্তু এটাই তাঁর গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনের শেষ নয়; বরং তিনি একজন ভাল বাঙালি মুসলমানও ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানগুলো মূল্যায়ন করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে এক নির্দেশে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। [৩১] এতে প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গবন্ধু ছিলেন আল্লাহর শক্তিতে বলীয়ান। কারণ ঐ মূহুর্তে এরূপ একটি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ক্ষমতায় আসার পর একদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে হাত দিলেন, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধর্মের নামে ব্যবসায় চিরতরে বন্ধের লক্ষ্যে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে জ্ঞানী আলেমদের সম্পৃক্ত করেএক অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করেন।[৩২]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার প্রসার ও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করার মহান লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠত হয়।[৩৩] ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মুকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমিক নামক তৎকালীন দুটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় দায়িত্ব এবং কর্মসূচি নব গঠিত ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত করা হয়। [৩৪]

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম (তৎপূর্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি) বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। সরকার দেশব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯-৮০ সনে চারটি বিভাগীয় এবং তিনটি জেলা সদরে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করে। ইসলামি সংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর নাম পরিবর্তন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা করা হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ময়মনসিংহ ইত্যাদি নামে দেশের ৬৪ টি জেলায় ফাউন্ডেশনের শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন তার প্রধান কার্যালয় ও এর শাখাগুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। তার কর্মসূচিসমূহের মধ্যে প্রধান ক'টি কর্মসূচি নিম্নরূপ ঃ

ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন, মসজিদভিত্তিক ইসলামী পাঠাগার স্থাপন, ক্যাসেট তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ, ফাউন্ডেশন পুরষ্কার প্রদান, গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশ, ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ ইত্যাদি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অনন্য দূরদর্শিতা ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন, উল্লিখিত অধ্যাদেশে বিবৃত কর্মপরিকল্পনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধুর এ কর্মপরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন

ব্যক্তি জীবনে বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান ছিলেন । তিনি বাংলাদেশে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলামী বিধানের পরিপন্থী মদ, জুয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। উক্ত পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে অন্যতম হল মাদরাসা শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন। এ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের ফলে গোটা দেশের ছাত্র সমাজ আজ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলামী আকিদাভিত্তিক জীবন যাপন করতে পারছে।

বঙ্গবন্ধু মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করার কারণে বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম, মানবতার ধর্ম, সকলের অধিকার এ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে ভালো জ্ঞান লাভ করতে পারছে। তিনি ইসলাম সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক ও সঠিক আকিদাভিত্তিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেদিন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন ও মাদরাসা শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করেছিলেন।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। বঙ্গবন্ধু বলেন যে, ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গনতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।[৩৫]

তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য জমি প্রদান

পবিত্র হজ্জের পর মুসলমানদের সমাবেশ গুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম সমাবেশ হলো তাবলীগ জামাতের সমাবেশ। যেটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাত একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন। এ জন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর সে জন্যই তারা অতি সহজে দাওয়াতী কাজে সক্ষম হয়। তাঁরা প্রতিবছর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে এক আন্তর্জাতিক মহাসমাবেশে সমবেত হন। আর উক্ত (তাবলীগ জামাতের) বিশ্ব এজতেমা সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে উক্ত জায়গা প্রদান করেন। সে হতে অদ্যাবধি বিশ্ব তাবলীগ জামাত ঐস্থানে তাদের বিশ্ব এজতেমা করে আসছে।

এছাড়া বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের মারকায বা কেন্দ্র নামে পরিচিত কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারনকল্পে রমনা পার্কের অনেক খানি জায়গা যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দ্বিধায় কাকরাইল মসজিদকে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করে দেন। [৩৬] একজন সরকার প্রধানের কাছে এতটুকু ইসলামী অনুভুতি কম কথা নয়। কাকরাইল মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো বা তার এরিয়া বঙ্গবন্ধুর ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি সজাগ মনোভাবের প্রতিফলন ও দিক নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

মুসলমানদের ধর্মীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পবিত্র কালাম বা ওহী দ্বারা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর কাছে অবতীর্ণ করেছেন। যা শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়্যাত-রিসালাতের সভ্যতার অন্যতম প্রমাণ।

কুরআন তিলাওয়াতে অধিক সাওয়াব লাভ হয়, যা পৃথিবীর অন্যকোন গ্রন্থ পাঠে হয় না। কুরআনের একটি হরফ উচ্চারণ করলে ১০ টি সাওয়াব পাওয়া যায়। এদিক বিবেচনা করে বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শাসনামলেই তাঁরই নির্দেশে সর্ব প্রথম বেতার ও টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসির প্রচার করার সুব্যবস্থা করেন। ফলে সকালের শুভ সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং ঠিক কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের শেষ হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই এ ব্যবস্থা চালু হয়।

ওআইসি'র অন্তর্ভুক্তি

১৯৬৯ সালে জেরুযালেমে অবস্থিত পবিত্র মসজিদুল আকসায় ইহুদী কর্তৃক অগ্নিকাণ্ডের পর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ২৪ টি মুসলিম দেশ মিলিত হয়ে ওআইসি প্রতিষ্ঠা করেন।এর মূল উদ্দেশ্য হল মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুকবল ও নিরাপদ রেখে ইসলামিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করা। ওআইসি এর সদর দপ্তর হল জেদ্দা (সৌদি আরব)। সদস্য সংখ্যা ৫৪। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রথম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ১৯৭৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে এই সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ব মুসলিমের নিকট বাংলাদেশের ইসলামী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বাংলাদেশের স্থান করে নেন। এ কাজ গুলো কাউকে খুশি কিংবা ব্যাথিত করার জন্য করেননি। তিনি তার ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থেই তা করেছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতায় বঙ্গবন্ধু

নিরপেক্ষ বলতে, "নেই কোন পক্ষ যার, সেই নিরপেক্ষ" এই যুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীরা ব্যাখ্যা দেয়, "নেই কোন ধর্ম যার সেই নিরপেক্ষ" অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা ধর্মহীনতা বলে প্রচার করে। যেমন, মাওলানা আব্দুল মুজিদ গাজীপুরী বলেন যে, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা।[৩৭] আর নিরপেক্ষ শব্দের পূর্বে যখন ধর্ম শব্দটি সংযুক্ত করা হবে তখন অর্থ হবে নাই কোন ধর্ম যার সেই ধর্মনিরপেক্ষ।

কিন্তু আসলে পৃথিবীতে কোন মানুষ ধর্ম ব্যতিরেকে জন্ম গ্রহণ করে না। থাকতেও পারে না কোন মানুষ ধর্ম ছাড়া। কারণ যাদের ধর্মীয় পরিচয় নাই তারা মানুষ হিসেবে কিভাবে পরিচয় দিবে? আর ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যদি ধর্মহীনতা হয় তবে যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তাদের পরিচয়ই বা কি হবে? মহানবী (সাঃ) শিশুর জন্ম সম্পর্কে বলেছেন, "প্রতিটি নবজাতক শিশু তাদের ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করেন।" অর্থাৎ মুসলমান পরিবারে যে জন্ম হয়, সে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হিসেবে এবং মুসলিম শরীয়াত অনুযায়ী তার কানে আযান দেয়া হয়। এতে বুঝা যায় নবজাতক শিশুকে জন্মের পরপরই জানানো হয় তোমার পরিচয় তুমি একজন মুসলিম। আর অন্যান্য ধর্মের পরিবারে জন্মগ্রহন করলে স্ব স্ব ধর্মের নিয়মানুযায়ী তাকে (নবজাতককে) জানিয়ে দেয়া হয় যে, তুমি অমুক ধর্মের, তোমার পরিচয় এই। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যদি ধর্মহীনতা হয় তাহলে উক্ত মতানুসারীদের পরিচয় কি হবে?

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যারা ধর্মহীনতা মনে করেন এটা আসলে সম্পূর্নরূপে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ছারা আর কিছুই নয়। যার প্রমাণ আমরা দেখতে পেলাম ১৯৯৭ সালে পবিত্র ঈদই মিলাদুন্নবী (সাঃ) অনুষ্ঠানে। ১৯৯৭ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ঈদই মিলাদুন্নবী পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা বিরোধী, দেশদ্রোহী, মৌলবাদী অপশক্তি কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অপমানিত করার ঘটনা।[৩৮] নেতাদের প্রতি তাদের এরূপ ঘৃণ্য তৎপরতার দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছে যে, (মৌলবাদে বিশ্বাসী) তারা ছাড়া অন্য কেউ ইসলামের তাহ্যীব-তমুদ্দুন ও শরীয়াতের হুকুম-আহকাম ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে অন্যদের কোন অধিকার রাখে না। মৌলবাদীদের ঘৃণ্য আচরণে দেশবাসী আজ উদ্বিগ্ন। কেননা, পবিত্র কুরআন মাজীদে নেতার আনুগত্যের প্রতি সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

হে মুমিনগণ! নির্দেশ মান্য কর আল্লাহর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের আর তাদেরই যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয় মতভেদ দেখা দেয়, সেটাকে আল্লাহ ও রাসূলের সম্মুখে রুজু কর। যদি আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখ, এটা উত্তম এবং এর পরিণাম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।[৩৯]

এ মহন বাণীতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, নেতার আদেশ মান্য করা ফরজ। আর দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের সকল নাগরিকের নেতা (ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়) তাই তার অনুগত্য করা একজন নাগরিকের একান্ত কর্তব্য। এর বিকল্প কিছুই নেই। প্রশ্ন জাগে যে, ইসলাম ধর্ম, মুহম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের ধর্ম, মানবতার ধর্ম, মুক্তির ধর্ম, তবে কি শুধু মৌলবাদীদের জন্য? না তারা এটা জোর করে আদায় করে নিতে চায়? আসলে তা কোনদিন হবে না। কেননা, ইসলাম কোন গোষ্ঠী বা কোন জাতির ধর্ম নয়, সকলের ধর্ম ইসলাম। এক কথার প্রমাণ আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দেখতে পাই। যেমন, আল্লাহ পাক সকল বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,"সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই। [৪০] এ মহান বাণীতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক বিশ্বজগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ইত্যাদি। তিনি কোন গোষ্ঠির, কোন জাতির, কোন এলাকার বা কোন সম্প্রদায়ের বা কোন রাজনৈতিক দলের নন, বরং তিনি সকল এলাকার সকল মানুষের, সকল রাজনৈতিক দলের পালনকর্তা। তিনি হলেন রব্বুল আল-আমীন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। তিনি সকল ধর্মের মানুষের পালনকর্তা, রিযিকদাতা ইত্যাদি। তিনি শুধু মুসলমানদের পালনকর্তা নন। কেউ যদি মনে করেন যে আল্লাহ পাক শুধু আমাদের (মুসলমানদের), পালনকর্তা তবে সেটা আল্লাহর রবুবিয়াতের খেলাপ হবে। কেননা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ্য আছে "তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশে বিশ্বাস কর আর কিয়দংশে অবিশ্বাস কর?" সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে দুর্গতি এবং কিয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[৪১]

এতে বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআনে কোন স্থানে রাব্বুল মুসলিমীন বলা হয়নি। আল্লাহ পাককে রাব্বুল মুসলিমীন মনে করা মানে মহাগ্রন্থের কিছু অংশ মেনে নেয়া আর কিছু অংশ অস্বীকার করার নামান্তর। বিধায় আল্লাহ পাক রাব্বুল আল-আমীন এ প্রসঙ্গে বলেন, "নিশ্চয়ই তা সোলায়মান (আঃ)–এর নিকট থেকে এবং নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নাম সহকারে জিনি পরম দয়ালু করুণাময়।"[৪২]

আল্লাহর এই মহান বাণীর রহমান ও রাহীম শব্দদ্বয়ের অর্থের পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য করা যায়। তাফসীরকারকদের নিকট শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এরূপ যে, "আর রহমান ফিদ দুনিয়া।" অর্থাৎ আল্লাহ পাক রহমান (দয়ালু) দুনিয়ার সৃষ্টির জন্য সকল কিছুর জন্য তিনি রহমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষের জন্য তিনি হলেন দুনিয়ার রহমান। তাঁর দয়া সকলেই সমানভাবে প্রাপ্ত হবে। এখানে শুধু মুসলিম–এর জন্য এমনটা উল্লেখ নেই। তাই আল্লাহ পাক যদি শুধু মুসলিমদের জন্য না হন তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা কেমন করে হবে? ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন আমরা "বিসমিল্লাহির" মহান বাণীতে পেয়ে থাকি। আর "রহিম" ফিল আখিরাত, অর্থাৎ আল্লাহর দয়া পরকালে শুধু নেক আমলকারীগণ বা যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছে, তারাই পাবে। [৪৩] এখানে শুধু মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে। যারা ভাল কাজ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে তাঁরা তাঁর দয়া প্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেনঃ

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য ফেরদৌস নামক জান্নাতই আতিথেয়তা। [৪৪] মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেনঃ

নিশ্চয়ই যাঁরা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছ তাঁদের জন্য এসব বাগান রয়েছে যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। এটাই হলো বড় সফলতা।[৪৫] এতে বুঝা যায় যে, পরকালের শান্তি ও শান্তি কোন গোষ্ঠির জন্যই নয়, যারা নেক আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে, তারাই পাবে বেহেশত, আর যারা ব্যর্থ হবে তারাই পাবে শাস্তি। এ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়েও আল্লাহ পাক বলেনঃ

"নিশ্চিয়ই সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত।" বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক। [৪৬] এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কাবা শরীফ কোন জাতির বা কোন গোষ্ঠীর বা কোন ধর্মের লোকদের জন্য বরকতময় বা হেদায়েত স্বরূপ নয়, তা সকল ধর্মের সকল বর্ণের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের এ পবিত্র ঘরও কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়, সকলের জন্য। তাই বলা যায় এ পবিত্র ঘরেরও নিরপেক্ষতা আছে। তাই বলা যায়, সকল কিছুর যখন নিরপেক্ষতা আছে তখন ধর্মের থাকবেনা কেন? যদি ধর্মে নিরপেক্ষতা না থাকে এবং একই দেশে যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান মেনে নিয়ে বা রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয়ে থাকতে পারে। সেখানে কি তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার খর্ব করার বিধান ইসলামে আছে? যদি না থাকে তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতায় মানুষের অসুবিধা কোথায়?

আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ পাঠিয়ে তার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রচার করার সুব্যবস্থা করেছেন। আর আমাদের শেষ নবীর পূর্বে যত নবী ও রাসূল দুনিয়ায় এসেছিলেন তাঁরা সবাই তাদের গোত্রের তাদের নিজেদের কওমের, এলাকার জন্য নবী হিসেবে এসেছিলেন। কিন্তু শেষনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কোন গোত্রের কোন গোষ্ঠীর বা কোন এলাকার জন্য আসেননি। তিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ এসেছিলেন। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। [৪৭]

আল্লাহপাকের মহান বাণীতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (সাঃ) কোন জাতি বা কোন গোষ্ঠির নন। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। মহান আল্লাহপাক মানব জাতির জন্য একমাত্র মহাগ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন। আর এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুসলিম জাতির সংবিধানও বলা যায়। পবিত্র কালাম হিসেবে তার একক প্রাধান্য আছে। এ কিতাব সম্পর্কেও আল্লাহপাক বলেনঃ "এটাতো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ স্বরূপ"। মহাগ্রন্থ কুরআনও কোন জাতির এবং কোন গোষ্ঠির জন্য নয়। এ আয়াত তা প্রমাণ করে। যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই পবিত্র কুরআনে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে। এমনকি আমাদের প্রানের চেয়ে মাতৃভাষা বাংলাতেও পবিত্র কুরআন অনুবাদ করেন, তার মর্মবাণী সকল শ্রেনীর মানুষের সহজে অনুধাবন করার নিমিত্তে প্রথম অনুবাদ করেন একজন অমুসলিম ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম গিরিশ চন্দ্র সেন। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বে আজ মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এক কথায় সকল ধর্মের মানুষ আল-কুরআনের জ্ঞান চর্চা শুরু করেছেন। এর অনেক সুফল আমরা লক্ষ্য করেছি। অনেক অমুসলিম নিজ নিজ মাতৃভাষায় আল-কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছেন। আল-কুরআন শিক্ষার জন্য কোন ধর্মের মানুষ হওয়া শর্ত নেই। শুধু পবিত্রতার শর্ত আছে। এসব দিক বিচার করলে দেখা যায় যে ইসলাম ধর্মের সকল বিষয়ে একটা নিরপেক্ষতা আছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় ধর্ম কোন গোষ্ঠির জন্য নির্দিষ্টভাবে নয়। ধর্মের নিরপেক্ষতা বিদ্যমান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রান একজন মুসলমান। ইসলামী আদর্শ, আকীদা, তাহযিব, তমদ্দুন প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার টেলিভিশনে ভাষণদানকালে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে যে আমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নই।" এ কথার জবাবে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট। আমরা কেবল সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত মুহম্মদ (সাঃ) -এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘমন্ত্রে। ইসলামের প্রবক্তা সেজে যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের ৮৫ ভাগই মুসলমান সে দেশের ইসলাম বিরোধী আইন পাশের কথা ভাবতে পারে, তারাই যারা ইসলামকে ব্যবহার করে দুনিয়াটা ফারস্থা করে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। [৪৮]

সেদিনের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেয়া ভাষণে ইসলামের বিধানের প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি কোন আইন পাস না করার অঙ্গীকারের

ঘোষণায় মুসলমানদের মনোবল বহুগুন বেড়ে গিয়েছিল। এটা তার ঈমান ও ইসলাম প্রীতির একটি অনন্য নজীর হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞ আলিমদের সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন আওয়ামী ওলামা পার্টি। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে ইসলাম সম্পর্কে যাতে ওলামায়ে-কেরাম সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশ পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে অনেকেই অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস ছিল মহানবী (সাঃ) এর ঐতিহাসিক "মদিনার সনদ"। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাহমুদুল হাসান এর 'ইসলামের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উক্ত সনদের অংশবিশেষ উদ্বৃত করা হলো রাসূল (সাঃ) বিশ্ববাসীকে এবং যারাই তার সাথে যোগ দিবে সকলকেই এই সনদ দিচ্ছেন।"

১. মদীনার ইয়াহূদী-নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেহই কারো ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
২. কেউ মুহম্মদ (সাঃ)-এর বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।
৩. নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও তার রাসূলের মিমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করতে হবে। বাইরের কোন শত্রুর সাথে কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না।
৪. মদিনার নগরীকে পবিত্র মনে করবে এবং যাতে তা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।
৫. এই সনদ যারা ভঙ্গ করবে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।

মদিনার সনদের প্রথম ও দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মদিনার সনদই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান দলিল। মদীনা সনদে ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ধর্মান্ধ মৌলবাদী অপশক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে প্রচার করে সহজ সরল মানুষের ধর্মীয় অনুভুতিকে পুঁজি করে ধর্মের নামে ব্যবসা করছে। বঙ্গবন্ধু নিজে এই সব ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীদের চিহ্নিত করে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পর্দাপন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল সমাবেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র"। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং মুসলমানরা, মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে, বৌদ্ধরা তাদের নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। এখানে ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার আলবদর পয়দা করতে দেয়া হবে না।[৪৯]

গণপরিষদে দেশের খসড়া সংবিধানের উপর ভাষণ দেয়ার সময় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালনে জনগনের মৌলিক অধিকার নিশ্চয়তা বিধানে তার সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর আবারও ঘোষণা করেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।" বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবো না। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সহ সকল জাতি তাদের স্বীয় ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। তাদের কেউ বাধা প্রদান করতে পারবে না। সকলেই যার যার ধর্ম তার তার মতো পালন করবে। কোন প্রকার বাধা আসতে পারে না। কিন্তু আমাদের আপত্তি শুধু এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক হাতিয়ার বা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।[৫০] তিনি আরো বলেন– "বিগত ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি বেঈমানী, অত্যাচার, খুন খারাপী, ব্যভিচার এই বাংলার মাটিতে অহরহ চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেহ বলে এতে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। বরং সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। [৫১] এর আট দিন পর ১২

অক্টোবর ১৯৭২ গণপরিষদে আবারও ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে সেই একই ভাষায় তার সরকারের সদিচ্ছার কথা ঘোষণা করে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়"। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বাংলার মানুষ এটা চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেহ ব্যবহার করে তবে বাংলার মানুষ তাকে প্রত্যাখান করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। [৫২] আমরা দেখতে পাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ইসলামের চেতনা ও মূল্যবোধ এবং ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর আদর্শের একটি সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কেবল ঘোষণা বা বক্তৃতা দিয়ে তিনি তার দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং তা বাস্তবায়নে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার উপদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহপাক যথার্থই উপদেশ দিয়ে বলেনঃ

"ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নেই"।[৫৩]

আল্লাহপাক আরো বলেন, "তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) তোমাদের এবং আমার দ্বীন (ধর্ম) আমার"।[৫৪] শেষনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর মদিনার সনদ, বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহ পাকের কালাম থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু নবী (সাঃ)-এর আদেশ অনুসরণ করে বিভিন্ন সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিয়ে সকল ধর্ম ও সকল মানুষের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা যথাযথাভাবে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

গ. সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নতুন কোন বিষয় নয়। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন ভোটাধিকার, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার, স্বাধীনতা-সংগ্রামকে ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহার মোকবেলা করেই এগোতে হয়েছে এ বাঙলায়। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রধান ছিল ধর্মের সাম্প্রদায়িক ব্যবহার এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা। যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম, তার মূলে ছিল এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। এই রাজনীতির বাহন ছিল সাম্প্রদায়িক প্রচার ও বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস।

বাংলাদেশে ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহারের সর্বোচ্চ রূপ আমরা দেখতে পাই, এদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মের নামে আক্রমণ করে এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে, তাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক দল। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় পাকিস্তানিদের সক্রিয় সমর্থনে রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনীগুলো গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রশ্নকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে আলবদর ও আলশামস বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনীগুলো গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রশ্নকে চুড়ান্তভাবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে আলবদর ও আলশাম্‌স বাহিনী গঠনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম ও ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজাকারদের মূলত ব্যবহার করা হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহযোগী ফোর্স হিসেবে সেখানে আলবদর, আলশাম্‌স বাহিনীর ভিত্তি ছিল পরিপূর্ণ রাজনৈতিক। একাত্তরের ডিসেম্বরের মধ্যভাগে আলবদর বাহিনী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে যে হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তার পেছনে জামায়াতের রাজনৈতিক লক্ষ্য কাজ করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের ইতি ঘটায়। প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতিতত্ত্বের খণ্ডন। বাংলাশের মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের বিপরীতে ভাষাভিত্তিক পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশের এই রাষ্ট্রপরিচয় অতি স্বাভাবিকভাবেই অসাম্প্রদায়িক ছিল এবং তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজনে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের সর্বোচ্চ প্রয়াস হিসেবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মকেই জন আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আর সে কারণে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যখন নিষিদ্ধ করা হয়, তখন এদেশের মানুষ তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটাতে রাজি হয়নি।

কিন্তু ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার কেবল রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। এর সঙ্গে আর্থ-সামাজিক প্রশ্নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যে আর্থ-সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার ঘটে, তাকে বহাল রেখে এর সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু নতুন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের প্রশ্ন রাজনৈতিকভাবে মীমাংসিত হলেও তার আর্থ-সামাজিক ভিত্তির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। পাকিস্তানি আমলের পুরনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বাংলাদেশ-পরবর্তীকালেও বহাল রেখে দেওয়া হয়। এমনকি পাকিস্তানি পুরনো শাসন কাঠামোও বাংলাদেশের ওপর পুনঃস্থাপন করা হয়। সুতরাং ওই আর্থ-সামাজিক ও শাসন ব্যবস্থায় ধর্মের ব্যবহার, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবমানস-সব বিষয়ই অটুট থেকে যায়। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হলো তারাও মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সময়ের সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে পুরনো শাসকগোষ্ঠীর মতো ধর্মের ওই প্রশ্নের মধ্যে সমাধানের পথ খুঁজতে থাকে। এ কারণেই দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের অর্জন হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংযোজিত হলেও শাসকগোষ্ঠীর কাছে তার ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা না হয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। খুব স্বাভাবিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি রাষ্ট্রের ওই অবস্থানকে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু

জনগোষ্ঠীর অধিকারের বিপরীত বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে সুযোগ করে দেয়। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা হিসেবেও ব্যাখ্যা প্রদান করে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মীমাংসিত এ রাজনৈতিক প্রশ্নটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। কেননা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ যে বৈরিতার সম্মুখীন হয়, তাকে অতিক্রম করতে ওই শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মুসলিম পরিচয় তুলে ধরাকেই অধিকতর শ্রেয় কৌশল বলে বিবেচনা করেন। মুসলিম বিশ্বের পশ্চাৎপদ দেশগুলো, যারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় পাকিস্তানের সহযোগিতা করেছে, তাদের সমর্থন আদায় করতে গিয়ে বাংলাদেশ তার অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রসত্তার চরিত্র ছেড়ে নিজেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় করাতেই অধিকর আগ্রহী হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো ডলারের আকর্ষণও এ ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ভাঙার ক্ষেত্রে যে স্খলন ঘটা শুরু হয় তারই প্রতিফলন দেখি এই বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানে।

বাংলাদেশে এই ধর্মীয় রাজনীতি উত্থানের নতুন ভিত্তি প্রদান করেন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান। পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ভাঙ্গার মূলে আগাত হেনে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবলোপনই কেবল করেননি, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহ ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' এর সংযোজন ঘটান। অন্যদিকে, কোলাবরেটর আইন বাতিল করে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীদের যেমন ছেড়ে দেওয়া হয়, তেমনি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি করার ওপর নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ধারাও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজনীতিতে ধর্মের এ ব্যবহারের ধারাবাহিকতা আমরা দেখি আরেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ কর্তৃক সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংক্রান্ত বিধি সংযোজনের মধ্য দিয়ে। সংবিধানে এ বিধি সংযোজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতির পুরোপুরি অবলোপন ঘটে। ধর্মের এ রাজনৈতিক ব্যবহার শুধু সামরিক শাসনের মধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নব্বই-উত্তর ক্ষমতার লড়াইয়ে বিএনপি-আওয়ামী লীগের ওই সব ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মিত্রের সন্ধান, নিজদের কথা-আচরণে ধর্ম পরিচয়কে উর্ধ্বে তুলে ধরা, এমনকি সংবিধানে ধর্মীয় ওই ধারগুলো বহাল রেখে দেওয়ার উদাহরণও আমরা দেখতে পাই। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলো যে ভিত্তি পেয়েছে, তাই-ই আজ তাদের এখন এক প্রায় দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত করেছে।

অর্থাৎ ধর্মীয় রাজনীতি উত্থানের নতুন ভিত্তি প্রদান করেন প্রথমে সামরিক জেনারেল জিয়াউর রহমান। জেনারেল এরশাদ জিয়ার ন্যায় রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখেন এবং পূর্ণতা দেন। পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধান সংযোজনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রাদায়িকতা আরো একধাপ এগিয়ে দেন। জেনারেল জিয়া ও এরশাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

প্রেসিডেন্ট পদে জিয়াউর রহমান

১৯৭৬ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েমের কাছ থেকে সিএম এল এ অর্থাৎ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি গ্রহণ করেন। অবশ্য এ পদটি গ্রহণ করতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। কারণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিচারপতি সায়েম। তিনি ইতিমধ্যেই জনগণের আস্তাভাজন হয়েছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে।

দেশ একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সায়েমের এই ধরনের পদক্ষেপ জেনারেল জিয়াউর রহমান মেনে নিতে পারেননি। কারণ তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী। ক্ষমতা অন্যের হাতে চলে যাবে এটা

তিনি চাননি। তাই তিনি সায়েমকে প্রথমে এ পদ ছেড়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন, এবং সায়েম তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান হারবার পাত্র নন। তিনি সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহযোগে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে সিএমএলএ পদটি দখল করে নেন। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর চীফ হবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল এরশাদকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ হিসেবে নিযুক্ত করেন।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়ার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হন। তার মূল লক্ষ্য ছিল, দেশের সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া যদিও তার জন্যে একটা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। কিন্তু সে সময়কেও তিনি দীর্ঘায়িত করতে চাইলেন না। ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সায়েমকে অপসারণ করে প্রেসিডেন্ট এর পদে নিজেকে নিযুক্ত করেন। যদিও তিনি সায়েমের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তবুও তার এই ক্ষমতা দখলকে বৈধ করার জন্যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে দিয়ে বেতারে একটি ভাষণ আদায় করে নেন। সায়েম সে ভাষণে নিজেকে অসুস্থ বলে ঘোষণা দেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

মূলত তৃতীয় বিশ্বের সামরিক নায়কেরা ক্ষমতায় এসে বেসামরিক আবরণে চলে যায়। জিয়াউর রহমান ঠিক একই কায়দায় ক্ষমতায় আসেন। তবে পার্থক্য হলো তারা আসে বন্দুকের নলের সাহায্যে, আর জিয়াউর রহমান এলেন এক সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

'হ্যাঁ' ভোট 'না' ভোট

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সপ্তম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলেন। এরপর তিনি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। যা এই উপমহাদেশে আর কখনও ঘটেছে মনে হয় না। তিনি নিজের পদটাকে বৈধ করার জন্যে আরো একটি পদক্ষেপ নিলেন, তা হলো "হ্যাঁ" ভোট "না" ভোট। এর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের জনগণকে দুভাগে বিভক্ত করে ফেলেন।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে এক প্রহসনমূলক গণভোটের আয়োজন করেন। অর্থাৎ জনগণ তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চায় কি- না? সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, এই নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না। অর্থাৎ এই ভোটের মাধ্যমে তিনি তার জনপ্রিয়তা ও বৈধতা একই সঙ্গে বোঝাতে চাইলেন। নির্ধারিত তারিখে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। সরকার এই নির্বাচনে মোট ভোটারের ৮৮% লোক ভোট দেয় বলে দাবি করে। কিন্তু কথাটি ছিল অবিশ্বাস্যই, কারণ ১৯৭০ সালে যখন বাঙালির একটা গণজোয়ার ছিল, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া, সেই সময়েও এর চেয়ে কম ভোটার অংশগ্রহণ করেছে। যাই হোক, নির্বাচনের পর দেখা গেল এই "হ্যাঁ" "না" ভোটে "হ্যাঁ" বাক্সে ভোট পড়েছে ৯৯%। "না" বাক্সে ভোট পড়েছে মাত্র ১%। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জিয়াউর রহমান ঐ সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন একথা সত্য, কিন্তু ৯৯% ভোট পাওয়ার মত জনপ্রিয় তিনি ছিলেন না। আর বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, ঐ নির্বাচনে গুটিকয়েক লোক সীলের পর সীল মেরে বাক্স ভরেছিল। আসলে জিয়াউর রহমানের এই অভিনব নির্বাচন দেয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বের কাছে প্রমাণিত করা যে, তিনি এদেশের জনগণের কাছে খুবই জনপ্রিয়। যাই হোক, এরপর থেকে জিয়াউর রহমন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং চীফ অব আর্মি স্টাফ-এই তিন গুরুত্বপুর্ণ পদে বহাল থাকলেন।

এমেন্ডমেন্ট বিল

রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তিনি শাসনতন্ত্রে হাত দিলেন। এমেন্ডমেন্ট বিলের মাধ্যমে তিনি শাসনতন্ত্রের কয়েকটি সংশোধনী আনেন। এর ফলে আমাদের জাতীয় মূলনীতিগুলো পরিবর্তিত হয়ে যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ পাল্টে গিয়ে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নিম্নরূপ গ্রহণ করেঃ

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর অগাধ আস্থা ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

২. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।
৩. গণতন্ত্র।
৪. সমাজতন্ত্র যার অর্থ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার।

আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস

শেখ মজিবর রহমানের আমলের ধর্মনিরপেক্ষতাকে জিয়াউর রহমান পাল্টে দিলেন আল্লাহর নামে বিশ্বাসে। মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি। পাকিস্তান সৃষ্টি হলো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে। পাকিস্তানের দুটি অংশ যার একটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ। ইসলাম ধর্মে সাম্যতার কথা আছে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের সাথে উপনিবেশ আচরণ করতে থাকে। বাংলাদেশের মুসলমানরা ধর্মপ্রাণ কিন্তু গোঁড়া নয়। তাছাড়া কুরআন শরীফে সুস্পষ্টভাবে লেখাই আছে,

"যার যার ধর্ম তার তার কাছে।"

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) যখন মদিনা জয় করলেন তখন তিনি বিধর্মীদের ধর্মের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা তাই ধর্মহীনতা নয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধর্মের দোহাই দিয়ে যে লজ্জাজনক কাজ করেছিল জনগণের স্মৃতি থেকে তা এত তাড়াতাড়ি মুছে যায়নি। তাই রাষ্ট্রীয় চার মূল নীতির এক নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা কোন অযৌক্তিক ব্যাপার ছিল না। সম্প্রাদায়িকতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যই তা প্রয়োজনীয় ছিল।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন দেখলেন আওয়ামীলীগের খুব অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া কেউই তার দলে ভিড়ছে না, তখন ঘাপটি মেরে থাকা দল জামায়াতে ইসলামের দিকে হাত বাড়ালেন। ঐ সময় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই জামাতের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল। তাই স্বাধীনতা বিরোধী খ্যাত এই জামায়াতকে খুশি করার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাকে উঠিয়ে দিয়ে জিয়াউর রহমান এক সংশোধনীর মাধ্যমে স্বাধীনতার মাত্র ছয় বছরের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করলেন।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

বাংলাদেশের কিছু উপজাতি ছাড়া আর সবাই বাঙালি। ব্রিটিশ আমলেও বাঙালিরা তাদের বাঙালিত্ব বিসর্জন দেয়নি। পাকিস্তান আমলেও পাকিস্তান শাসকবর্গের রক্তচক্ষুকে বাঙালিরা উপেক্ষা করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, বাঙালিরা নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা বাঙালি, এ আমাদের অহংকার এবং আমাদের গৌরব। তাই সঙ্গত কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির এক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু কথা হল, এ বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীরা মূলতঃ দুটি দেশে বাস করে। অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিবঙ্গে। উভয় অঞ্চলের লোকেরাই বাঙালি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নাগরিক তাই বহির্বিশ্বে আমাদের একটা আলাদা পরিচিতি থাকা দরকার। যেমন ইন্ডিয়ায় তামিল, বাঙালি, কাশ্মিরি, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের লোক বাস করলেও তারা সবাই ইন্ডিয়ান বলে পরিচিত। সেই হিসেবে ধরে নেয়া হয়, আমরা ভাষায় বাঙালি কিন্তু জাতিতে বাংলাদেশী। অর্থাৎ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী নামে পরিচিত।

বাংলাদেশী কথাটা বললেই বিদেশের লোকেরা বুঝতে পারে যে, আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ হিসেবে যে দর্শন দিয়েছেন তাও ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সঠিক। কারণ, যুদ্ধের সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধটা হয়েছিল কিন্তু কালের প্রবাহে দেখা গেল, এই বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও কিছু উপজাতি বাস করে। তাই সবাইকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্যে জিয়াউর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদ পাল্টে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ-এ রূপান্তরিত করা যুক্তি যুক্ত মনে করলেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন- ১৯৭৮, ৩ জুন

জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন। এদিকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমান 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। লক্ষণীয় এই যে, দলের আহ্বায়ক হিসেবে তার নাম ছিল না। কারণ সে সময় তিনি সামরিক আইন প্রশাসক তথা সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যদি কেউ কোন লাভজনক চাকরিতে অধিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ সরকারি চাকরি করে তাহলে সে কোন পার্টি বা রাজনীতিতে জড়িত থাকতে পারে না। জেনারেল জিয়া তা জানতেন। তাই তিনি পার্টির নেপথ্যে থাকলেও সামনাসামনি আসেননি।

তৃতীয় বিশ্বের সামরিক কর্তারা প্রথমে ক্ষমতা দখল করে এই বলে যে, তারা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি রক্ষার্থে ক্ষমতায় এসেছেন। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসলেই ব্যারাকে ফিরে যাবেন। তাদের কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, জনগণকে ভাওতা দিয়ে তারা ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্যে কিছু সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের নিয়ে একটি নতুন দল গঠন করে বসেন। এবং কিছু ভাল ভাল কর্মসুচিও গ্রহণ করেন।

জিয়াউর রহমান ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব। জিয়াউর রহমানের এই রাজনৈতিক দলের আহ্বায়ক হলেন বিচারপতি সাত্তার। যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। লক্ষণীয়, এই কমিটিতে ১৬ জন সদস্য ছিলেন। এই ১৬ জন সদস্যদের মধ্যে ১০ জনই ছিলেন জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। এ থেকেই বোঝা যায়, জিয়াউর রহমান এই দলটির মাধ্যমে বেসামরিক আবরণে ফিরে আসতে চেয়েছেন। যদিও এই রাজনৈতিক দলে জিয়াউর রহমান নিজে যোগ দেননি। তবে এই দলটি খুব সাফল্য বা জনগণকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

এরই ফলে ১৯৭৯ সালের মে মাসে জিয়াউর রহমানের নির্দেশে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল সংক্ষেপে যাকে বলা হত 'জাগদল' আরো কয়েকটি পার্টির সমন্বয়ে একটি নতুন ফ্রন্ট খোলেন। নতুন ফ্রন্টের নাম দেয়া হয় "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট"। এই ফ্রন্ট যোগ দিয়েছিল দেশের ৫টি রাজনৈতিক দল, যথা ন্যাপ (মশিউর রহমান), মুসলিম লীগ, ইউপিপি, লেবার পার্টি ও তফশীল জাতি ফেডারেশন।

এখানে লক্ষণীয় যে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা বিরোধী দল মুসলিম লীগ ও লেবার পার্টির সাথে ঐক্যজোট গঠন করেছিলেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধা, সেই সঙ্গে জেড ফোর্সের অধিনায়ক। যুদ্ধে তার অবদানের জন্যে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপধি বীর উত্তম-এ ভুষিত করেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তিনি যে কাজটি করলেন তা তার চরিত্রের সাথে মানানসই ছিল না। তবে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আমল থেকে। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমাই করেছিলেন, রাজনৈতিক অধিকার দেননি। অন্যদিকে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ক্ষমতার ভাগও দিয়ে দিলেন স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে ।

যে সব ব্যক্তিবর্গ আমাদের ইতিহাসের যুব সন্তানদের হত্যা করেছে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে আঁতাত করেছে, ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালি নিরাপরাধ মানুষের হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে সেই সব ব্যক্তিবর্গকে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করলেন-এর চেয়ে কলঙ্ক আর কি হতে পারে? শেখ মুজিবুর রহমান একটা ভুলের সূচনা করে গেলেন আর সেই ভুলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন জিয়াউর রহমান। লক্ষ্যণীয়, একজন এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহাপুরুষ, অন্যজন মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্যে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' জিয়াউর রহমানকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। বিপক্ষে ছিলেন বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত প্রার্থী জেনারেল ওসমানী। নির্বাচনে জিয়াউর রহমান বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তবে অনেকের মতে এই নির্বাচনে যথেষ্ট কারচুপি হয়েছিল। সেই সঙ্গে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র, যেমন- টেলিভিশন-রেডিওকে জিয়াউর রহমান নিজের ইচ্ছে মত ব্যবহার করেছেন। সেই সঙ্গে

নিয়েছেন যানবাহনের সুযোগ সুবিধা। পত্র পত্রিকাগুলোকে নিজেদের জন্যে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি বিরোধী দলের বিপক্ষে লেখার জন্যে বাধ্য করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সময়ে জিয়াউর রহমান মোটামুটি জনপ্রিয় ছিলেন। নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় না নিলেও তিনি জয়লাভ করতেন। কারচুপির তেমন একটা প্রয়োজন ছিল না, তথাপি জিয়াউর রহমান সাবধানী হয়েছিলেন। কারণ তার বিপক্ষে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনিও এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আতাউল গণি ওসমানী। তিনি ছিলেন দেশের একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। দেশের জনগণ সামরিক বাহিনীকে যদি বয়কট করে তবে তাঁকেই তারা বেছে নেবে। আর এই জন্যেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান ছিলেন অতিমাত্রায় সতর্ক।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পর পরই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। জিয়াউর রহমান ৬টি দলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' ভেঙ্গে দেন এবং ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে নিজের উদ্যেগে বাংলাদেশ 'জাতীয়তাবদী দল' নামে একটি নতুন রাজনৈতক দল গঠন করেন। যার সংক্ষেপ নাম বি.এন.পি। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বিভিন্ন নেতারা এসে এতে যোগ দেন।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর বৈধতা

জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও তাঁর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। স্বয়ং বিরোধী দলের প্রার্থী আতাউল গণি ওসমানী তারঁ বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি পদে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণ অসাংবিধানিক। কারণ জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে যে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডিন্যান্স জারি করেন তাতে নিম্নোক্ত বক্তব্য ছিল।

যারা প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না ঃ

ক. যাদের বয়স ৩৫ বছরের কম।

খ. যদি কেউ এমপি নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

গ. যদি কেউ সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদে থেকে বহিষ্কৃত হয়ে থাকেন।

ঘ. সংবিধান অনুযায়ী তারা প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না যারা সরকারি মাধ্যমে বেতন গ্রহণ করে থাকেন।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরিতে বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। আইনত সংবিধান বিরোধী। অবশ্য জিয়াউর রহমান এই যুক্তি নাকচ করার জন্য ১৯৭৮ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখে একটি সংশোধনী বিল পাস করান, তা হলোঃ

১. চীফ মার্শাল 'ল' এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানদের মাধ্যমে এই সব বাহিনীর পরিচালনা নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ করেন।

২. চীফ মার্শাল 'ল' এ্যাডমিনিষ্টেটর প্রথম থেকে বেতনভোগী সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। কিন্তু ঘটনা তা ছিল না। নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময়ে তিনি কার্যত সরকারি চাকরিতে অবস্থান করছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ কোনমতেই অযৌক্তিক ছিল না।

জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল গঠন

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার নির্দেশিত 'জাগদল' ভেঙ্গে দিয়ে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। যার নাম 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' সংক্ষেপে বিএনপি। তিনি পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার লক্ষ্যে দলকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে দাঁড় করাতে চাইলেন। প্রথমেই আওয়ামীলীগের সাহায্যে প্রার্থনা করেন। আওয়ামীলীগ তাঁর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর জিয়াউর রহমান অন্য পথে পা বাড়ান। তিনি তার দলের মঙ্গলের জন্যে দেশের সামরিক বেসামরিক আমলাদের দলে টেনে আনলেন। শুধু তাই নয় তিনি মুসলিম লীগ, লেবার পার্টি, ভাসানী, ন্যাপসহ বিভিন্ন দল থেকে লোক জোগাড়ের দিকে মনোনিবেশ

করলেন। এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা সরাসরি পাকিস্তানীদের সমর্থন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চরম বিরোধিতা করেছিল তাদেরও তিনি সাদর আমন্ত্রণ জানান।

বাংলাদেশে যারা দীর্ঘদিন যাবত দালাল নামে অভিহিত হচ্ছিল, তারা রাষ্ট্রপতির এই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করে। বস্তুত এটি ছিল দালালদের জন্যে চরম সুযোগ। এছাড়া জিয়াউর রহমান এমন সব ব্যক্তিদের তার দলে টেনে নিলেন যারা 'দালালীর' অভিযোগে অভিযুক্ত কিংবা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। তার দলীয় স্বার্থে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।

বিএনপি আওয়ামীলীগ কর্তৃক সৃষ্ট চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি-বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাতিল করে দেয়। সেক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থাকে প্রবর্তন করে।

সমাজতন্ত্র কে সম্পূর্ণরূপে বাতিল না করে সেক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের দলকে অর্থাৎ বিএনপি'কে একটি ধর্মীয় আবরণে ঢাকার চেষ্টা করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী প্রতীক ব্যবহার শুরু করে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ধর্মভীরু জনগণকে নিজেদের দলে টানা এবং এটা প্রমাণ করে যে, বিএনপি ভারতীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত। মূলত তাদের এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সফল হয়।

বিএনপি সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার বলে ব্যাখ্যা করলেও সে পথে পা রাখেনি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ধনবাদী নীতি গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকারি বা রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি হাতে ফিরিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহন করে। এছাড়াও বিএনপি পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে পূর্বের নীতিকে পরিবর্তিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে।

জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি বিভিন্ন মতাদর্শের লোকের দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন। কাজেই রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সবাইকে খুশি রেখে তার দলের নীতিমালা নির্ধারণ করেছিলেন। তার এ দলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এ দলে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির প্রাধান্য। জিয়াউর রহমান নিজের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে তাঁদের কাঁধে ভর করলেন। বিএনপি'র মাধ্যমে দালালদের তিনি রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

সাধারণ নির্বাচন-১৯৭৯

রাষ্ট্রপতির প্রতি আস্থা ভোট "হ্যাঁ" "না" এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয় ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে দাঁড় করাতে নিরলসভাবে খেটে চলেন। বিশেষ করে তাঁর দলকে আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে দাঁড় করাবার জন্যে দেশের বিভিন্ন মতাদর্শের লোকদের তিনি তাঁর দলে টানতে লাগলেন।

উল্লেখ্য যে, এই ক্ষেত্রে তার কোন বাছবিচার ছিল না। স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠীকেও তিনি দলে টেনে আনেন। শুধু তাই নয়, নিজের দলের ভিত্তিকে মজবুত করার জন্যে তিনি দলের অভ্যন্তরে সামরিক ও বেসামরিক আমালাদেরও ঢুকিয়ে ছিলেন বলা চলে। তার বিএনপি ছিল বিভিন্ন দলের সংমিশ্রণ। যা হোক, জিয়াউর রহমানের দল বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্যে তিনি যাদের মনোনয়ন দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলো স্বাধীনতা বিরোধী কার্যকলাপের জন্যে সাজাপ্রাপ্ত অর্থাৎ দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত।

১৯৭৯ সালের দুই নির্বাচনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান জনগণের রায় পেয়ে যান। এবং তাঁর দল একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তিনি একটি বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৫ই এপ্রিল জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, প্রথম দিনের অধিবেশনে সামরিক শাসন চলাকালীন সময়ে সকল কার্যকে অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয় এবং ৬ এপ্রিল থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নির্বাচনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান একটি বেসামরিক সরকার গঠন করলেও তার মন্ত্রিপরিষদে ছিল সামরিক বাহিনীর লোকদের আনাগোনা। কেননা, তাঁর মন্ত্রিপরিষদে ৬ জন সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। বেসামরিক প্রশাসন ক্ষেত্রেও এই অবস্থা চালু রাখলেন। বেসামরিক প্রশাসনেও সামরিক বাহিনীর লোকদের ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং তারাই বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত।

জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের দলকে প্রতিষ্ঠিত করলেও আসলে তার শাসন আমলকে আধা-সামরিক শাসন আমল বলা যায়। কেননা তিনি সামরিক বাহিনীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেননি। কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরও তিনি সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। বরং 'সশস্ত্র বাহিনী'র সর্বাধিনায়ক' নামে একটি পদ সৃষ্টি করেন এবং সেই পদে নিজেকে নিযুক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি রাজনৈতিক দলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচন করলেও সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন জিয়াউর রহমান স্বয়ং। ক্ষমতা তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হতো।

পঞ্চম সংশোধনী বিল

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই সংবিধানের কিছু কিছু সংশোধন আনতে থাকেন। কারণ তিনি সামরিক প্রধান হিসেবে থেকেই বেসামরিক কার্যকলাপ শুরু করেন; যেমন তিনি প্রথমেই বিচারপতি সাত্তারের মাধ্যমে জাগদল গঠন করেন। জাগদল কয়েকটি দলকে সাথে নিয়ে একটা ঐক্য জোট গড়ে তোলে। এই ঐক্য জোটের পক্ষ থেকে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি পদে পদপ্রার্থী হন, এবং নির্বাচনে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি জাগদলকে ভেঙ্গে দেন এবং নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নামে একটি দল গঠন করেন। এই দল ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

নির্বাচনের পূর্বেই জিয়াউর রহমান সংবিধানের উপর হাত দেন, এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশের পরিবর্তন করেন। যেমন, সংবিধান থেকে রাষ্ট্রীয় মূল চারনীতির দুই নীতিকে পাল্টে দেন। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বর্জন করেন। তার এই রাজনৈতিক দলটি ছিল মূলতঃ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বেরিয়ে আসা নেতাদের নিয়ে গঠিত। এবং তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন মতের অনুসারী। মূলত তাদের জন্যেই তিনি সংবিধানের পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। নির্বাচনে জয়লাভ করে তার দল ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় সংসদ বসে। জাতীয় সংসদেই এটি উত্থাপন করেন। এই বিলই পঞ্চম সংশোধনী বিল নামে খ্যাত। এই বিল মূলত পূর্ববর্তী সংশোধনসমূহের অনুমোদন করা।

এই পঞ্চম সংশোধনী বিলের মাধ্যমে যে বিষয়সমূহ অনুমোদন করা হয় সেগুলো ছিল ঃ

ক. প্রথম সংশোধনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের চার মূল রাষ্ট্রনীতির একটি ছিল 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও সংবিধানে উল্লিখিত 'মুক্তি সংগ্রাম' শব্দটির পরিবর্তে' স্বাধীনতা যুদ্ধ' শব্দটির প্রবর্তন করে।

খ. রাষ্ট্রের আর এক নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা। এই সংশোধনের মাধ্যমে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে নেন। তার পরিবর্তে লিখেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"। এর উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে স্থির করা হয়। এছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভোটাধিকার ও

রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত দলসমূহকে ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয়। এদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণ ছিল, এরা মুক্তিসংগ্রামের অসহযোগিতা ও পাকিস্তানী শাসকবর্গের প্রতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল।

গ. পূর্বেই বলা হয়েছে, বিএনপি ছিল বিভিন্ন দলের সংমিশ্রণ। ফলে বহু গোষ্ঠীকে তাদের সন্তুষ্ট করতে হত। এর ফলে সংবিধানে উল্লিখিত সমাজতন্ত্রের উপরও আংশিক হস্তক্ষেপ করেন। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে পুরোপুরি বাতিল না করে সেই স্থলে লেখা হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার।

ঘ. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের স্বাধীনতা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং দুজন প্রবীণ বিচারপতিদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যার নামকরণ করা হয়"সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল।" এই পরিষদের আরো একটি কাজ ছিল সেটা হলো, এই পরিষদ বিচারকদের আচরণ ও সামর্থ্য সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি এই পরিষদের রিপোর্ট অনুযায়ী বিচারকদের অপসারণ করতে পারবেন।

ঙ. এই সংশোধনীর আরো একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিসমূহকে ক্ষতিপূরন প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা। এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানার বিধান জারি করা হয়। অবশ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চ. এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আরো একটি পরিবর্তন আনা হয়। যেমন সংবিধানের প্রথমেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লাইনটি লেখা হয়।

ছ. পঞ্চম সংশোধনীর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখা। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। পূর্বে অর্থাৎ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সংসদে সদস্য হবার যোগ্য যে কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয় যে, প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই সংসদ সদস্য হতে হবে এবং সংসদের আস্থাভাজন হতে হবে। মন্ত্রিপরিষদে নিযুক্ত মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর বহাল থাকবে এবং বাহির থেকে নিযুক্ত মন্ত্রীদের সংখ্যা কিছুতেই এক-পঞ্চামাংশের বেশি হতে পারবে না।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড

১৯৮১ সাল ৩০ মে বাঙালির জাতীয় এক অভিশপ্ত রাত। উল্লেখ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতালোভী কয়েকজন উচ্চাভিলাষী সামরিক বাহিনীর কর্মচারী দ্বারা নিহত হন, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে ঠিক তেমনি আরো একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। চট্টগ্রামে নিহত হলেন বাংলার বীর সন্তান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এই দুই বীর সন্তানের মৃত্যু প্রায় একই রকম। দু'জনই নিহত হলেন সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষী কয়েকজন অফিসার দ্বারা।

জিয়াউর রহমানের অবশ্য চট্টগ্রাম যাওয়ার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাঁর যাওয়ার কথা ছিল জেদ্দায়। ইরান-ইরাক যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু সে বৈঠক অনিবার্য কারণবশত বাতিল হয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর জেদ্দা যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার পরপরই তাকে সে সফরও বাতিল করতে হলো। কারণ, সেই মুহূর্তে তাকে চট্টগ্রাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

কারণ চট্টগ্রাম বিএনপি'র দুটি গ্রুপের মধ্যে চরম বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই দুই গ্রুপের নেতা ছিলেন দুইজন। একজন হলেন উপপ্রধান মন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ এবং অন্যজন হলেন ডেপুটি স্পীকার সুলতান

আহম্মেদ চৌধুরী। এই দুটি বিবদমান দলের নিস্পত্তির জন্যে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে রওনা হলেন। ২৯ মে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম পৌঁছেন।

চট্টগ্রামে তখন জেনারেল মঞ্জুর অবস্থা'ন করছিলেন। জেনারেল মঞ্জুর-এর সঙ্গে জিয়াউর রহমানের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। এর মধ্যে আরো একটি ঘটনা ঘটে। জেনারেল মঞ্জুরকে সহসা ঢাকায় বদলি করে দেয়া হয় এবং তাঁকে ঢাকায় মিলিটারী স্টাফ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এটা ছিল জেনারেল মঞ্জুরের জন্য চরম অপমান। কারণ জেনারেল মঞ্জুরই ছিলেন উচ্চপদে (জেনারেল) অধিষ্ঠিত একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা। শেখ মুজিবুর রহমানের সময় সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু জিয়াউর রহমানের আমলে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তার আমলে ধীরে ধীরে অমুক্তিযোদ্ধাগণ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন।

যাই হোক, জেনারেল মঞ্জুরকে আরো একটি ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তা হলো তিনি যেন পতেঙ্গা বিমান বন্দরে ইপস্থিত না থাকেন। কারণ, এটি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক সফর। এই নির্দেশ জেনারেল মঞ্জুর ভীষণ অপমান বোধ করেন এবং তার কিছু সহকর্মীদের নিয়ে 'জিয়া হত্যার' ষড়যন্ত্র করেন। এবং সেদিন দিবাগত রাতে জেনারেল মঞ্জুরের নির্দেশে কয়েকজন সামরিক অফিসার সার্কিট হাউজে অবস্থানরত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়ই পাঁচ বছর আগের এক রাতে কয়েকজন ঘাতকদল শেখ মজিবর রহমানের বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান ঘর ছেড়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ান এবং দীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, কি? কি চাও তোমরা? ঘাতকেরা মুখে কোন জবাব দেয়নি, জবাব দিয়েছিল বুলেটে।

পাঁচ বছর পর।

সার্কিট হাউজে ঘাতকদল আগ্নেয়স্ত্র নিয়ে ছুটাছুটি করছে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং দীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন - কি? কি চাও তোমরা? ঘাতকরা মুখে কোন জবাব দেয়নি। জবাব দিয়েছিল বুলেটে।

একই ঘটনা ইতিহাসে দুবার ঘটলো, এটাই ভাবতে আশ্চর্যই লাগে। যা হোক মঞ্জুরের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর অফিসাররা জিয়াকে হত্যা করে। অতঃপর জেনারেল মঞ্জুর এই বিদ্রোহের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করে সৈন্যদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সৈন্যগণ বা অন্যান্য অফিসারগণ তাদের সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ৪৮ ঘন্টা পরে জেনারেল মঞ্জুরের সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। জেনারেল মঞ্জুরের এই সামরিক অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দেয়ার পেছনে জেনারেল এরশাদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শক্ত হাতে এই বিদ্রোহকে দমন করেছিলেন।

জেনারেল মঞ্জুর ৩১ জুন সকালে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেন। এবং একটি গার্ডেনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি গ্রেফতার হন এবং সেখান থেকে বন্দী অবস্থায় চট্টগ্রাম ক্যান্টনম্যান্টে নিয়ে যাওয়ার সময় একদল সশস্ত্র সৈন্য কর্তৃক জেঃ মঞ্জুর নিহত হন। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন সশস্ত্র সৈন্যের উপস্থিতিতেই জনতার গণপিটুনীতে মঞ্জুর নিহত হয়।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যু ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনা। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষমতার লড়াই এর এ এক নগ্ন দৃশ্য। যা সাধারণ মানুষের কাম্য হতে পারে না। কিন্তু তাতে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কিছু যায় আসে না। তবে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকারের মাথার উপর খড়গ হতে দাঁড়িয়েই থাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনা তাই প্রমাণ করে।

ঘ. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে সংবিধান পরিবর্তন ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বৈধ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে অপসারণ করে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। স্বাধীনতার ১২ বছরের মাথায় দু'বার সামরিক শাসন জারি হয়। এরশাদের সামরিক শাসন জারির পেছনে তৎকালীন বিএনপি সরকার যেমন দায়ী তেমনি বিরোধী দলের রাজনীতিবিদরা কিছুটা হলেও দায়ী। কারণম জেনারেল এরশাদ যে সামরিক শাসন জারি করবে তার আগামবার্তা তারা পেয়ে গিয়েছিলেন এরশাদের তৎকালীন কথা বার্তায়। বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভার একাংশ সামরিক শাসন জারি হওয়ার কিছু আগে থেকেই এরশাদের সাথে একটা আঁতাত গড়ে তোলে।

রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এরশাদকে সেনাবহিনীর প্রধান করেছিলেন। কারণ জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি যথেষ্ট বাধ্য ছিলেন। যার ফলে সামরিক বাহিনীতে তার বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও একজন অমুক্তিযোদ্ধা সৈনিককে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই নিয়েই জেনারেল মঞ্জুর ও জিয়াউর রহমানের সাথে গোলমালের সুত্রপাত ঘটেছিল। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পেছনে যে কটি কারণকে মুখ্য হিসেবে ধরা হয় এটি তার মধ্যে অন্যতম।

তাছাড়া সাত্তারের সাথে এক পর্যায়ে তার ব্যক্তিগত সংঘাত সৃষ্টি হয়। জেনারেল এরশাদসহ সামরিক এলিটগণ ভেবেছিলেন বিচারপতি সাত্তারের মত দূর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে চাপ দিয়ে তাদের দাবি দাওয়া আদায় করে নেবেন। কিন্তু নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি সাত্তার তাঁর কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন সশস্ত্র বাহিনীদের এদেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। তাঁর সেই বক্তব্যের পর থেকেই এরশাদসহ সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিরা দেশে সামরিক শাসন জারি করার অজুহাত খুঁজতে থাকে। জিয়াউর রহমান এর মৃত্যুর পরপরই এরশাদ দেশে সামরিক শাসন জারির পক্ষে ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এরশাদকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, তাহলে জনগণ জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর জন্যে সামরিক বাহিনীকেই দায়ী করবে।

কিন্তু পরবর্তীতে দেশের ক্রমবর্ধমান আইন-শৃংখলার অবনতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি, ছাত্র অসন্তোষ, ধর্মঘট, দুর্নীতি, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন, জারি করেন এবং সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্রে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে বলেন-

দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে। সীমাহীন দুর্নীতি সমাজের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে কোন্দলের ফলে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেমিক শক্তির ধারক হিসেবে মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও রহমত নিয়ে আমি লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছি এবং এখন থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলে ঘোষণা করছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি তৎকালীন কিছু পত্রিকা এরশাদের সামরিক আইন জারিকে স্বাগত জানিয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত বাংলার বাণী ও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত দৈনিক বাংলা। এরশাদ সামরিক আইন জারিকালে নিজেকে একজন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন এবং দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের সামরিক শাসকের সাথে জেনারেল এরশাদের কৌশলগত কোন পার্থক্য ছিল না।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

জেনারেল এরশাদের আদি নিবাস ভারতের কুচবিহার জেলায়। পরে তারা রংপুরে চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার বাবা একজন আইনজীবী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পূর্বেই এরশাদ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন লেঃ কর্নেল। তখন তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান সরকার একটা ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। এই ট্রাইব্যুনাল রাষ্ট্রদ্রোহী সৈনিকদের বিচারের ব্যবস্থা করে। লেঃ এরশাদ এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হন।

একথা আশ্চর্য হলেও সত্যিই, এর জন্যে তাকে কোনরকম শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। উপরন্তু তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনীরা বাংলাদেশে ফিরে আসে এবং তারপরই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাদলের মধ্যে সংঘাত। প্রত্যাগত সেনাদলের মধ্যে ছিল এক হাজার অফিসার ও বিশ হাজার সৈন্য।

মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের সিনিয়রিটি দেয়া হলে সংঘাত আরো তীব্র আকার ধারণ করে। কারণ পাকিস্তান প্রত্যাগতরা সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও দুবছরের জ্যেষ্ঠতাপ্রাপ্তদের চেয়ে পদোন্নতি, পদমর্যাদা এবং আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ফলে এদের মনে তীব্র অসন্তোষ জমতে থাকে। এদের মধ্যে অল্প সংখ্যক অফিসার ও সৈনিক ছাড়া সবারই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু কিছু অফিসার ও সৈনিক বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানীদের সমর্থন করেছে। এদের মধ্যে এরশাদ অন্যতম। যুদ্ধের পর শেখ মুজিবুর রহমান সকল দালাল রাজাকারদের ক্ষমা করে দিলেন কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর এই সব বিশ্বাসঘাতক লোকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমন কি তাদের চাকরি থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়নি। দেশে ফিরে এসে সেনাবাহিনীরা পুনরায় চাকরি ফিরে পায়। জেনারেল এরশাদ ছিলেন পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার। যার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তার পদোন্নতি ছিল চোখে পড়ার মত। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ঃ

ক. ১৯৭৩ সালে এরশাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল (কর্নেল)।

খ. ১৯৭৫ সালে কর্নেল হিসেবে নয়া দিল্লীতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে যোগদান।

গ. ১৯৭৫ সালে তাকে বিগ্রেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়।

ঘ. ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পরে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

ঙ. ১৯৭৬ সালে সেনাবাহিনীর উপ-স্টাফ প্রধান হন।

চ. ১৯৭৮ সালে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

ছ. ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে তাকে লেঃ জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের সময়ে তার সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় হলে তিনি বিচারপতি সাত্তারকে দিয়ে তার কার্যকালের মেয়াদ বাড়িয়ে নেন।

জ. ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ তিনি দেশে সামরিক আইন জারি করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সেনাবাহিনীতে তার কার্যকালের মেয়াদ আবারও বাড়িয়ে নেন।

জেনারেল এরশাদ ছিলেন একজন উচ্চভিলাষী সামরিক অফিসার কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ভেবেছিলেন জেনারেল এরশাদ কখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু তার এ ধারণা যে কত বড় ভুল, বিএনপি সরকার বা জিয়ার অনুসারীরা পরবর্তীকালে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পরবর্তীতে এরশাদ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তও হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক নেতাদের ধরপাকড়

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিচারপতি সাত্তারকে দিয়ে টেলিভিশন ও রেডিওতে এই বলে বিবৃতি দিতে বাধ্য করেন যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীকে আসতে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অস্ত্রের মুখে সাত্তারকে স্বীকার করতে বাধ্য করে তার শাসন আমল ছিল ব্যর্থতায় ভরা। অন্যদিকে ক্ষমতা গ্রহণের আগে সেনাবাহিনীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, সেনাবাহিনী যদি এ সময়ে ক্ষমতা দখল না করে, দেশের শাসনভার চলে যাবে আওয়ামীলীগের হাতে। আওয়ামীলীগ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর একটা আতংক ছিল। সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার ও জোয়ানরা তখনও বিশ্বাস করত আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসলে সেনাবাহিনীকে সংকুচিত করা হবে। ফলে তাকে অতি সন্তর্পণে আগাতে হয়েছিল।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং দুর্নীতির সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের বিচার করার লক্ষ্যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। সেই সঙ্গে শুরু হয় দেশে ধরপাকড়। এই ধরপাকড়ের শিকার হলেন দেশের রাজনীতিবিদরা। বিএনপি সরকারের কিছু রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জেলে পুরলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন বিএনপি সরকারের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ তৎকালীন ঢাকার মেয়র আবুল হাসনাত, জামালউদ্দিন, ওবায়দুর রহমান প্রমুখ।এসব করে তিনি দেশবাসীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। দেশবাসীকে বোঝাতে চাইলেন তিনি সত্যি সত্যিই দেশ থেকে দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করার জন্য বদ্ধপরিকর। আসলে ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকম। দেশের দুর্নীতিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তাদের গ্রেফতার বা বিচার করা হয়নি। দেশে যাতে কার্যকর কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে, তার জন্যেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট পদে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

সামরিক শাসন জারির কিছুদিন পর জেনারলে এরশাদ যে কাজটি করলেন তা হলো, নিজেকে সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্যে বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করা। কাজটি করে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। কেননা তার সামরিক শাসন জারি সামরিক বাহিনীর অনেকেই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু সামরিক শাসন জারি করে দেশ পরিচালনা করতে হলে সর্বস্তরের সেনাবাহিনীর সমর্থন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যেবশত জেনারেল এরশাদের সেই সমর্থন ছিল না। তাছাড়া অনেক উচ্চপদস্থ সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ সামরিক শাসন জারি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। জেনারেল এরশাদ অল্প কয়েকজন অফিসারের সমর্থনে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর বড় অংশ ছিল তার বিরুদ্ধে।

এমতাবস্থায় এরশাদ প্রেসিডেন্ট পদটি না নিয়ে বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধিরীকে দান করলেন। কিন্তু তা ছিল অতি অল্প সময়ের জন্যে। সামরিক বাহিনীতে বিভিন্ন রকম সুবিধা, এবং অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দু-দুবার বেতন বাড়িয়ে তাদের মানসিক উত্তাপ কিছুটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। নানা কৌশল অবলম্বন করে তাদের সমর্থন আদায় করে নিলেন।

পরিস্থিতি কিছুটা তার পক্ষে চলে আসার পর তিনি তার অভিলাষ পূরণের দিকে এগিয়ে যান। অবশ্য প্রথম থেকেই এই সাধটি তিনি মনের মাঝে লালন করে রেখেছিলেন। শুধু সময় ও সুযোগের অভাবে তিনি তা করতে পারেননি। অবশ্য আহসান উদ্দীন নামে মাত্র বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাকে সর্বদাই প্রথম সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে সকল কাজ করতে হতো। প্রেসিডেন্টর নিজস্ব কোন নির্দেশ বা নীতিমালা প্রণয়ন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এরশাদই ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দিনকে শুধু জনগণের সামনে তুলে ধরা হত। এবং আকার ইঙ্গিতে এরশাদ সারাক্ষণ এটাই বোঝাতে চাইতেন, তিনি অতি শীঘ্রই ব্যারাকে ফিরে যাবেন। কেননা তাঁর কোন রাজনৈতিক উচ্চভিলাষ নেই। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তিনি সংসদ নির্বাচন দেবেন এবং সংসদের নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে

ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ঘটনা ঘটেছে বিপরীত। তিনি কেবলমাত্র প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি নিয়ে সন্তুষ্টি থাকতে পারলেন না। তিনি প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের পদটি দখল করে নেন। প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী বিনা প্রতিবাদে প্রেসিডেন্টের পদটি ছেড়ে দেন।

এরশাদের গণভোট

রাষ্ট্রপতি এরশাদ হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে তিনি নেপথ্যে থেকে জনদল গঠন করেন। কিন্তু 'জনদলের' অবস্থা খুব একটা ভাল যাচ্ছিল না। অর্থাৎ দলের অভ্যন্তরে দৈন্যদশা চলতে থাকে। তিনি একদিন সচিবালয়ের মিটিং এ নির্দেশ দেন, মন্ত্রিপরিষদের সবাইকে জনদলে যোগ দিতে হবে। সেই মোতাবেক সকলেই জনদলে যোগ দেয়। মাহবুবুর রহমানকে করা হলো জনদলের মহাসচিব এরশাদ অঘোষিত চেয়ারম্যান।

প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমানকে দলের ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি নিয়ে সন্তুষ্টি থাকতে হয়। এরই মধ্যে সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন করলেন। সেই সাথে উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু বিরোধী দলের চাপের মুখে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে এরশাদ অন্য পথ অবলম্বন করলেন। নিজের এবং তার সরকারের বৈধতা অর্জন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এটা সম্ভব হল নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু যখন সম্ভব হলো না তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সামরিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করলেন। আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও জেলা সামারিক আইন প্রশাসকদের পুনর্বহাল করা হলো।

সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ও সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলেন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ বহু রাজনীতিবিদদের আটক করেন। সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতগুলো আবার চালু করা হলো। সে সঙ্গে ঘোষণা দিলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে তিনি বহাল থাকবেন এবং তার এই অবস্থান সম্পর্কে জনগণের রায় নেয়া হবে। অর্থাৎ তাকে জগণ চায় কি না, তা যাচাই করার জন্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

তাঁর নির্দেশ অনুসারে ১৯৮৪ সালের ২১ মার্চ গণভোট এর তারিখ দেওয়া হলো। এবং যথারীতি "হ্যাঁ" ভোট "না" ভোট অনুষ্ঠিত হলো। সরকার টাকার বিনিময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কিনে নিলেন গণভোটের দিন দেখা গেল নির্বাচন কেন্দ্রগুলো শূন্য। জনগণের উপস্থিত বলতে গেলে নেই। তবে ভোটের ব্যালটে বাক্স ভরে গেছে।

উপজেলা নির্বাচন

জেনারেল এরশাদ গণভোটের মাধ্যমে ৭২% ভোটের ৯৪% ভোট পেয়ে নিজেকে বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেই সঙ্গে সামরিক আইনের কড়াকড়ি আরো বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আস্থাভোট পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে উপজেলা নির্বাচনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে করেই হোক উপজেলা নির্বাচন করতে হবে। সমস্ত বিরোধী দলসমূহ এর প্রতিবাদ করে। কিন্তু প্রকাশ্য প্রতিবাদের সুযোগ না থাকায় এরশাদের জন্যে সুবিধা হয়ে গেল। তাদের সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

সরকার যদিও এই উপজেলা নির্বাচনকে, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু ঘোষণাটি ছিল নির্ভেজাল এক মিথ্যে ভাষণ। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে করেই হোক নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। সেই হিসেবে সরকার সফলতা অর্জণ করেছে বলা চলে। কারণ বিরোধী দলের প্রবল বাধা সত্ত্বেও উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

১৯৮৬ সালের নির্বাচন

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জেনারেল এরশাদ প্রকাশ্যে রাজনীতি করার উপর থেকে সকল বিধি নিষেধ তুলে নিলেন। অর্থাৎ প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেয়ায় এর মাঝে জেনারেল এরশাদ নিজেকে অনেক খানি প্রতিষ্ঠিত করে নেন। অর্থাৎ প্রকাশ্য রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে নিজের দলের উত্তরণের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি নিজেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে আসছিলেন ইতিমধ্যে তার মন্ত্রিসভায় প্রধান দুই বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকে বিশিষ্ট নেতাদের ভাগিয়ে আনতে সক্ষম হন। তারা এরশাদের রাজনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে দেশে প্রচার চালাতে থাকেন এবং এরা জনদলে যোগদান করেন।

জেনারেল এরশাদ পরবর্তীতে আরো একধাপ এগিয়ে যান। জনদল, বিভিন্ন দলের সাথে একটি ঐক্য জোট গঠন করে। এর নাম দেয়া হয় 'জাতীয় ফ্রন্ট'। এই ঐক্য জোটে যোগদান করে ইউপিপি, গণতান্ত্রিক পার্টি মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী) এবং বিএনপি (শাহ্ আজিজ) এর দলসমূহ। এই জোটটি সরকার সমর্থিত জোট বলে নিজেদের পরিচয় দেয়।

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি, এই জোটভুক্ত দলগুলো একত্রিত হয়ে একটি নতুন দল গঠন করে। এই দলের নাম দেয়া হয় জাতীয় পার্টি। জেনারেল এরশাদ প্রথম অবস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান না করলেও জাতীয় পার্টির বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থাকতে শুরু করেন। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১২ জানুয়ারিতে বায়তুল মোকাররামের এক জনসভায় সগর্বে ঘোষণা করেন জাতীয় পার্টি আমার দল।

তিনি ২১ মার্চ রাতে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ঘোষণা দেন, ২৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, বিরোধী দলসমূহ যদি আজ রাতের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত না জানান তবে পরদিন সকাল থেকে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হবে। পরদিন ২২ মার্চ ছিল পূর্ণ দিবস হরতাল। কিন্তু প্রেসিডেন্টের ভাষণ বিরোধী দলকে বিভ্রান্ত করে তোলে। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করে ১৫ দল নির্বাচনে যেতে রাজী আছে বলে, প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেয়। জামায়াতে ইসলামীও নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৭ দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচন বর্জন করে তারা সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে রাজি হলো না। তাদের সিদ্ধান্ত তারা অটল থাকে। ৭ দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সামরিক শাসকের অধীনে কখনই নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। কাজেই ৭ দল অবাধ ও নিরপেক্ষ সরকারের নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছাড়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না। যাইহোক জনগণের এই জিজ্ঞাসার জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, জেনারেল এরশাদ তার জাতীয় পার্টির মাধ্যমেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করবেন এটা হবে ফাকা মাঠে গোল দেওয়ার মত। এই সুযোগ জেনারেল এরশাদকে দেয়া যাবে না। কাজেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তার আগ্রাসী নীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে। বিরোধী দলের নির্বাচনে যাওয়ার আশ্বাস দেয়ার ফলে জেনারেল এরশাদ নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়। ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল এরশাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপক কারচুপি ও সন্ত্রাসের মাধমে ১৫৩টি আসন দখল করল। সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থীর ২৫ জনকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে তাদের পক্ষে ভাগিয়ে নেয়। এছাড়া মহিলা আসনের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনই জাতীয় পার্টি লাভ করে। ফলে জাতীয় পার্টির আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২১০।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-১৯৮৬

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা মানুষের মন হতে দূর হবার আগেই জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩১ আগস্ট "চীফ অব দি আর্মি ষ্টাফ" এর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল আতিকুর

রহমানকে এই পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি সশস্ত্র বাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে থেকে পদত্যাগ করেননি।

পরদিন অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং সেই পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। জেনারেল এরশাদ কোন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব কিংবা রাজনীতিবিদদের এই নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করতে সক্ষম হলেন না।

অবশেষে জেনারেল এরশাদকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয় কয়েকজন অখ্যাত কুখ্যাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। এই নির্বাচনের মোট ১৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে, তার মধ্যে হাফেজ্জী হুজুর যিনি ধর্মের সাধক, তিনিও ঐ ষোলজনের একজন। আর একজন বিশেষ ব্যক্তি এরশাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যিনি একটি নৃশংস খুনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি হলেন কর্ণেল ফারুক। সামরিক শাসকদের ছত্রছায়ায় থেকে তিনিও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন।

যা হোক, দেশের সমস্ত বিরোধী দল একযোগে এই প্রহসনের তীব্র প্রতিবাদ করে। ৮ দল, ৭ দল, জামায়াতে ইসলামী দল ১৫ অক্টোবর হরতাল আহবান করে। পরবর্তীতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় পার্টির কর্মীরা ভোট কেন্দ্রে যায়, ভোটদান করে। জেনারেল এরশাদ এসব অখ্যাত, কুখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হন। যদিও অতি নগণ্য কিছু লোক এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তথাপি সরকার ঘোষণা করে ৫৪% ভোটার এই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এবং জেনারেল এরশাদ ৮৪% ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। জেনারেল এরশাদ নির্বাচনে জয়লাভ করে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি পদটাকে কেবলমাত্র পাকাপোক্ত বা বৈধ করে নিলেন এবং এটা এদেশবাসীর জন্যে না হলেও বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্যে যা ছিলো অতীব প্রয়োজনীয়।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন -১৯৮৮

নানা উত্তপ্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে থাকে। সরকার সংবাদপত্রের উপর কড়া 'সেন্সরসীপ' আরোপ করেন। সংবাদ পত্রে কোথাও হরতাল কিংবা ধর্মঘট শব্দটি ব্যবহার করতে দেওয়া হলো না। এসব শব্দের উপর কাড়াকড়িভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে পত্রিকাসমূহ এগুলোর প্রতিশব্দ 'কর্মসূচি' ব্যবহার করতে থাকে। ইতিপূর্বে অর্থাৎ আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহুর্তে বিবিসি কে সত্য খবর প্রদানের অপরাধে বিবিসি-র ঢাকার সংবাদদাতা আতাউস সামাদকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবী মহলে মারাত্মক রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

তার আগে 'বাংলার বাণী' দৈনিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বুদ্ধিজীবী মহল আতাউস সামাদ এর মুক্তি ও বাংলার বাণীর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য দাবি জানাতে থাকে। কিন্তু এরশাদ সরকার সে দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে ঢাকাস্থ বিবিসি'র সকল কার্যক্রম বন্ধ করে। সরকার তাদের কার্যক্রমকে নাশকতামূলক কার্যক্রম বলে আখ্যা দেয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এরপরও ঘোষণা করেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে আওয়ামীলীগ বা বিএনপি-র দরকার পড়বে না। এমনিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অষ্টম সংশোধনী বিল গৃহীত

জেনারেল এরশাদ নির্বাচনে জয়লাভ করেও তার দলের বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা আনতে পারলেন না। আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে, এবং দিনের পর দিন তার স্বৈরশাসনের প্রতি মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অবশেষে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে এবং আন্দোলনের ধারাকে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে নেবার জন্যে একটি অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তিনি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের আঁকড়ে ধরলেন। তাদের সহানুভূতি পাবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। তাছাড়া, অর্থনৈতিক অপচয় করতে গিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌছে। মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাহায্য একান্তভাবে কাম্য ছিল।

ফলে তাদের দৃষ্টি ফেরাবার লক্ষ্যে এরশাদ জাতীয় সংসদে 'অষ্টম সংশোধনী' বিল উত্থাপন করে। এতে বলা হয়, ইসলাম হবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম। এটা অন্যান্য ধর্মের প্রতি কটাক্ষ নয়, অন্যান্য ধর্মের লোকেরা শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।

'অষ্টম সংশোধনী'র বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দল এবং দেশের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। তাদের বক্তব্য হলো, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা কেবল অবান্তরই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থীও। তাছাড়া ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত অবৈধ সংসদে সংবিধানে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা মানেই দেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করা। এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোটের আহ্বানে ১২ জুন তারিখে সারা বাংলাদেশে হরতাল পালন করা হয়। এভাবে রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান ঘটালেন প্রথমে জেনারেল জিয়া এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের আসনকে কন্টকমুক্ত করতে চাইলেন জেনারেল এরশাদ, এর ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠত হইল হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ঐক্য পরিষদ। তারা এই সংশোধনীর প্রতিবাদ করে সারা বিশ্বকে জানালেন এই সংশোধনী তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিকে পরিণত করেছে এবং বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রকে অবমাননা করেছে।

বলাবাহুল্য, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি যখন তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনে আলোড়ন তুলেছিল, তখনো রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক দলের বিষয় নিয়ে কোন রকম বিতর্ক দেখা যায়নি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তখনো এই বিবেচনার মধ্য আসেনি। কেননা সমাজে ধর্মের উপস্থিতি ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচরণের সঙ্গে রাজনীতির একটা দূরত্ব বজায় থেকেছে। আর তা ছাড়া বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ায় একবার নিষ্পত্তিও হয়ে গিয়েছিল। বাঙালির ভাষাভিত্তিক পরিচয়ের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে পাকিস্তান দাবির পেছনে ধর্মের বিবেচনা সত্ত্বেও এবং এ বিষয়ে চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমানের অকুণ্ঠ সমর্থন সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, মুসলীমলীগকে কখনোই ধর্মভিত্তিক দল বলে বিবেচনা করা হয়নি। বাঙালি মুসলমান ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ২৫ বছরের ইতিহাসেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রশ্ন কখনোই বাংলাদেশের রাজনীতির মূল প্রশ্ন হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক দল গঠনের সুযোগ ছিল না। সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রশ্ন ওঠেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির যোগসাজসে ৭৫ এর সামরিক অভ্যুত্থানের শুরুতেই বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং ক্ষমতা দখল করেন খন্দকার মোশতাক আহম্মদ। মাত্র ৩০ দিনের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে তার ঘোষিত লক্ষ্যে ছিল সংবিধান ও শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামীকরণ, পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তারপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব নেন বিচারপতি আবু সায়েম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, জেনারেল জিয়াউর রহমান। তার আমলেই ধর্মীয় রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে সামরিক সরকার জিয়াউর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করার ফলে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের পূর্ণাঙ্গ পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যা ও নারী নির্যাতনের অভিযোগে যাদের বিচার চলছিল সেই সব যুদ্ধাপরাধীরাও বিনা বিচারে মুক্তি পেয়ে যায়। এই বছরেই আগস্ট মাসে আর একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণবিরোধী আচরণের অপরাধে নিষিদ্ধ ঘোষিত মুসলিম লীগ, জামায়াত, নেজামে ইসলামসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

১৯৭৬ সালে ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যাণে ইসলামী জলসা নামে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একাত্তরের নর-ঘাতক আলবদর রাজাকাররা সমবেত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ গোলাম তাওয়াব। তিনি বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার দাবি জানালেন। সেখানেই স্বাধীনতা বিরোধীদের পক্ষ থেকে ছয় দফা দাবি তোলা হয় এবং

সেটাও গৃহীত হয়। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে, পতাকা পাল্টাতে হবে, নতুন জাতীয় সঙ্গীত চালু করতে হবে, '৫২' এর ভাষা আন্দোলনের শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে, একাত্তরে নিহত রাজাকারদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে।[৫৫] অত্যন্ত সাবধানী জেনারেল জিয়াউর রহমান ঘটনাটির তাৎপর্য অনুধাবন করে মে মাসে তওয়াবকে চাকরিচ্যুত করে দেশত্যাগে বাধ্য করলেন এবং একই সাথে নিজের চারপাশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির এক অংশকে সমবেত করলেন। নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও একাত্তরের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী মৌলবাদীদের নিয়ে দল করলেন এবং তাদেরকে মন্ত্রীসভায়ও ঠাই দিলেন। জিয়া এভাবে ইসলামের নামে নিজের ভিতকে মজবুত করার চেষ্টা করেন।

১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল এক সংশোধনী আদেশ বলে জিয়াউর রহমান সংবিধানের দ্বাদশ অনুচ্ছেদ উচ্ছেদ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি ধর্মনিরপেক্ষতাকে অপসারণ করেন। এই সংশোধনী আদেশ অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সে স্থানে হবে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস' এবং সংবিধানের শুরুতে থাকবে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম'। এ ছাড়াও ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংরক্ষণ এবং জোরদার করার নীতিও ঐ এক আদেশ বলে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের আমলেই স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরুজ্জীবিত স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ক্রমবিকাশ শুরু হয়।[৫৬]

বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালের পর জামায়াতে ইসলামী এবং ১৯৮১ সালে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহর (হাফেজি হুজুর) রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার মধ্য দিয়ে কওমী মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ইসলামপন্থীরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চার করেছে। জিয়া ও এরশাদের আমলে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য সংবিধানিক বৈধতা প্রদান, রাষ্ট্রধর্মের ঘোষণা এবং একই সময়ে প্রধান দুই দল বিএনপি ও আওয়ামীলীগের আশ্রয় যেমন জমায়াতে ইসলামীকে শক্তিশালী করেছে, তেমনি কওমী মাদ্রাসা প্রসারের কারণে মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামপন্থী দলগুলোর ভিত্তি জোরালো হয়েছে। সামরিক শাসকেরা তাদের অবৈধ শাসনকে বৈধতা দিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির শরনাপন্ন হয়েছেন। অন্যদিকে ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী রাজনীতির অতিসরলীকৃত অঙ্কের বিবেচনায় আওয়ামীলীগ ও বিএনপি ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছে। দলগুলোর আচরণ থেকে মনে হয়, তাদের এই ধারণা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার প্রমাণ দিতে হলে ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে সবসময় তাদের সঙ্গে রাখা দরকার।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এই দেশের জনসংখ্যার ৮৮ ভাগই মুসলমান। আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের প্রধান বিষয়। ধর্মপ্রাণ জনগণের বিশ্বাস চিন্তা চেতনার প্রতিফলন হিসেবেই সংবিধানের পঞ্চম সংসধনীর মাধ্যমে শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসকে সংবিধানের প্রধান মূলনীতি হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান মহাজোট সরকার সংবিধান সংশোধন করে। সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মূলনীতি থেকে মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের স্থলে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি যুক্ত করে।

১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী করা হয়েছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে স্বপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ১৫/৮/১৯৭৫ থেকে ৯/৪/১৯৭৯ পর্যন্ত সামরিক আমলের সকল কর্মকাণ্ড বৈধকরণসহ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছিল, এগুলো হলো, (১) জাতীয়তাবাদ (২) সমাজতন্ত্র (৩) গণতন্ত্র এবং (৪) ধর্মনিরপেক্ষতা। পঞ্চম সংশোধনীতে সমাজতন্ত্র এর পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র' নীতিটি গৃহীত হয়েছিল এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা নীতিটি গৃহীত হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। আপিল বিভাগ কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণার পর ৩০ জুন, ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়। বর্তমানে সংবিধানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনর্বহাল করা

হয়। সত্যিকার অর্থে পঞ্চম সংশোধনী ছিল সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া। এটা ছিল সামরিক শাসক থেকে রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হওয়া জিয়াউর রহমানের ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের প্রয়াস মাত্র। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিষিদ্ধ জামাত ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন করে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। সামরিক শাসনের হাত ধরে ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির শুরু; গণতন্ত্রের পথ ধরে নয়। সামরিক শাসনের কর্মকাণ্ডকে বৈধ করার জন্য এই সংশোধনী করা হয়েছিল।

অপরদিকে ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তার ক্ষমতায় আগমনের পর থেকেই ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানে নতুন গতি সঞ্চার হয়। প্রথম থেকেই তিনি স্পষ্ট করে বলেন, মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান মুলনীতি হবে ইসলাম। জিয়াউর রহমানের মতো ইসলামের নামে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখাই ছিল এরশাদের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। সংশোধনীতে বলা হয় ঃ "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে"। এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করলে ধর্মরাজনীতির উত্থান কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। এরশাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী আর্দশের কতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে বা ঘটছে তা নিয়ে জনমনে অনেক প্রশ্ন থাকলেও নিয়মিত মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা দিয়ে, পীরদের দোয়া নিয়ে, দীর্ঘ নয় বছর তিনি ধর্মরাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

অনেকের ধারণা, জিয়াউর রহমান যেভাবে আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্জন করেন, জেনারেল এরশাদও তেমনি জিয়াউর রহমানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা দেন। কিন্তু এরশাদের ভাবা উচিৎ ছিল যে, সকল নাগরিকদের সংবিধান যে সমান অধিকার দিয়েছে তা এরশাদের এ সংশোধনীতে লংঘন করা হয়েছে। আওয়ামীলীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টি (বিএনপি) এবং সব কয়টি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল এর এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সংশোধনী সংশোধনের দাবি জানিয়েছে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাংলাদেশে 'হিন্দু -বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' গঠিত হয়েছে। এই পরিষদের সদস্যগণ মনে করেন এবং সঠিকভাবেই মনে করেন যে, এই সংশোধনী এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। অষ্টম সংশোধনীর সমালোচনা করে আনিসুজ্জামান বলেন ঃ " কোনো অমুসলমানের পক্ষে সংবিধান রক্ষার এবং এর প্রতি অনুগত থাকার শপথ নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো বিসমিল্লাহির প্রতি তার আনুগত্য ঘোষণা।"[৫৭] ১৯৮৮ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় এদেশের প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই সংশোধনীর সমালোচনা করেছিল।

সে সময় শেখ হাসিনা বলেছিলেনঃ "রাষ্ট্রধর্ম বিল সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। স্বৈরাচারীর ক্ষমতার মসনদ রক্ষার কৌশল হিসেবে পবিত্র ধর্মকে ব্যবহারের চক্রান্ত চলছে।"

অপরদিকে খালেদা জিয়ার বক্তব্য ছিলঃ "রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ধর্মের নামে জাতিকে বিভক্ত করে অনৈক্য সৃষ্টি ও জনগণকে ধোকা দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র"।[৫৮] কিন্তু বিগত বছরগুলোতে এই সংশোধনী সংশোধনের সুযোগ থাকলেও এদুটি দলের একটিও এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। তাদের আশংকা এ ব্যাপারে যে-ই উদ্যোগ নিবে তার ভোটের সংখ্যা কমে যাবে।

হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অবিরাম গতিতে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, এই পরিষদ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, সাবেক সংসদ সদস্যসহ অনেক গন্যমান্য ও দায়িত্বশীল নাগরিকদের নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলছে। তাদের বক্তব্যঃ

ইসলামকে একমাত্র রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করার ফলে এই দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদের বিজাতীয়করণের সমান নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা, ধর্মের অনুশাসন পালনে রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ, জাতির সহিত

একাত্ম প্রক্রিয়া সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশংকা পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের আশংকা, শিশুকাল হইতে বিধর্মী বলিয়া পরিচিত হওয়ার আশংকা তথা গোটা জাতির একটি মিলিত অবস্থান হইতে বঞ্চিত করিয়া ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ পৃথক অবস্থানে ঠেলিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা।[৫৯]

পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের ৯ জুলাই সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হলে সামরিক সরকার হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ স্থগিত করতে বাধ্য হয়। আর রাষ্ট্রধর্মের বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায় এবং যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে বর্তমানেও বহাল রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল সে সংবিধান ছিল একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। সেই সংবিধানের মূলনীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছিল তাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ছিল।

বাংলাদেশের জনগণ শতকরা ৮৮ জন মুসলমান। জনসংখ্যার তথ্য হিসাবে এটা ঠিক আছে। রাষ্ট্র পরিচলানার মূলনীতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রধান্য দেয়া হবে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু সংবিধানে তো কোন ধর্মীয় দলিল নয়, এটা রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল। কোন সংবিধান ছাড়াই মুসলিম ও অমুসলিম শাসন আমলে অর্থাৎ সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরে বাঙালি মুসলমানের ঈমান ও আকিদা নষ্ট হয়নি। ব্রিটিশ আমলেও মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হয়নি। সংবিধানে বা শাসনতন্ত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস যখন লেখা ছিল না তখন ও মুসলমানদের ঈমান অটুট ছিল।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট সমাজে রাষ্ট্র কিভাবে অন্যান্য ধর্মকে দেখবে এবং রাষ্ট্র যে ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না সে বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন। তথাপি ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি এখনও মীমাংসিত নয়। যে সকল রাষ্ট্র শরীয়াতকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে সেগুলোও খোলাফায় রাশেদীনের আমলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এছাড়া ইসলামে নানা রকম মাজহাব আছে, গোষ্ঠী আছে, বৈচিত্র আছে সব মিলিয়া পরিপূর্ণ সর্বসম্মত ইসলামী রাষ্ট্র এখনোও পৃথিবীর কোথাও নেই। ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে যেগুলো পরিচিত তারাও কিন্তু পারস্পরিক হানাহানি ও যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। কারণ শিয়া সুন্নি বিরোধ ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করছে। অথচ রাষ্ট্র তার সকল ধর্মের নাগরিকদের এমনকি একই ধর্মের নানা গোষ্ঠির অনুসারীদের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য।

সর্বোপরি দেখা গেছে, বাংলাদেশের সংবিধানে যতদিন ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল ততদিন সাম্প্রদায়িক হানা হানি কম ছিল এবং ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ জোরদার ছিল। বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান নিয়েই ওআইসির সম্মেলনে যোগদান করেছিল। ওয়াইসির কোন সদস্য রাষ্ট্র এ ব্যাপারে আপত্তি করেনি।

উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের ধর্ম চর্চার রক্ষা কবচ যে ধর্মনিরপেক্ষতা তা ভারতে মুসলিম শাসকদের অবদান। বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসন আমল এবং ভারতে মোগল শাসনের বড় উদাহরণ। সম্রাট আকবর তার শাসনকালে মোল্লাতন্ত্রের বিপরীতে ভারতে সর্ব ধর্ম সমন্বয় শুধু নয়, ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রতি জোড় দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। আওরঙ্গজেব মোল্লাতন্ত্র দিয়ে মোগল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাও প্রমাণ করল ধর্মীয় রাষ্ট্র সমাধান নয়। তাই ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও মিয়ানমারের মুসলমানেরা এখনো ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রাম করে, কারণ তারা জানে ধর্মনিরপেক্ষতা, তাদের ধর্মচর্চার গ্যারান্টি দেবে। কমিউনিষ্ট চীনেও মুসলমানেরা অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে হজব্রত পালনে সহযোগিতা পাচ্ছে। তাই ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মসমূহ বরং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমূহতেই নিরাপদ।

তথ্য নির্দেশঃ

১. *Speeches of Sheikh Mujibur Rahman in Parliament* (1955-56) Vol.-1 Edited by Ziaur Raman, Hakkani Publishers, Dhaka, 1990
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৪. এ বিষয়টিকে খুব নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেনঃ
মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কার মুক্ত।
বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি মত এদেশে বা তার আশে পাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন বাংলার সঙ্গেই ছিল একঘরে অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে দেখা যায় সেই স্বাধীনতা। তাদের সাহিত্যে ও গানে অলঙ্কার বা শাস্ত্রের গুরুভার তারা কখনও সইতে পারেনি। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই অথচ কি গভীর কি উদার তার ব্যঞ্জনা। এদেশে কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানে কোথাও তার তাল মেলে না, কুল মেলে না। বাংলার সাধনাঃ ক্ষিতিমোহন সেন-এ উদ্ধৃতি, ১৯৬৫ সাল, পৃ. ৭
৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন *"বাংলাদেশে ধর্মের রাজনীতি"* বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, পৃ. ৪৫
৬. আবেদ খান, *"বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা", বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকট*, পৃ. ২৪৬
৭. আবেদ খান, ঐ, পৃ. ২৪৭, আরও দ্রষ্টব্যঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৮. সহীহ বুখারী, খণ্ড,৩, পৃ. ১০৫৯; তিরমিযী, খণ্ড ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং-১৬৬৪
৯. *মুসনাদে ইবন আবিশ মায়বা*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৮
১০. *মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল*, খণ্ড ১,পৃ. ৬৫
১১. *মুসনাদে শামীইন*, খণ্ড ১, পৃ. ২২১
১২. ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ভাষণ, মিজানুর রহমান মিজান সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, (ঢাকা ঃ নভেল পাবলিকেশন্স,১৯৮৯) পৃ. ১৭
১৩. ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ভাষণ থেকে, প্রাগুক্ত, পৃ.২২
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ, প্রাগুক্ত.পৃ.৩২-৩৩
১৬. ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ভাষণ , প্রাগুক্ত, পৃ.২০
১৭. ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ভাষণ থেকে, প্রাগুক্ত, পৃ.২১
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২২
১৯. প্রাগুক্ত
২০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯
২১. ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ভাষণ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০
২৩. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভাষণ থেকে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩
২৫. ১৯৭২ সালের ৭ জুন ভাষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭
২৭. ১৯৭২ সালের ৭ জুন ভাষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
২৮. ১৯৭১ সালের ৭মার্চ ভাষণ, প্রাগুক্ত.পৃ.৩২-৩৩

২৯. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভাষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩০. ১৯৭১ সালের ৭মার্চ ভাষণ থেকে, প্রাগুক্ত.পৃ.৩৩
৩১. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ৭১ এর দশ মাস (ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ.৩
৩২. স্বরণিকা শোকদিবস সংখ্যা, ১৫ আগস্ট ১৯৯৩, ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ প্রকাশিত
৩৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে দু.ধরনের তথ্য পাওয়া যায়।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীণ রাষ্ট্রপতি উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি সরকারিভাবে বাংলদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ২৮মার্চ ১৯৭৫ সনে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পকাশিত *"বাংলা পিডিয়ার"* প্রথম খণ্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে " ১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমিকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫সনে ইসলামি ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট প্রণীত হয়
৩৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৯৬
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২
৩৬. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, *বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্ম চিন্তা*, অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, (ঢাকা ঃ ইফাবা- ১৯৯৮), পৃ. ১২৮
৩৭. মাসিক মদীনা, অক্টোবর সংখ্যা ১৯৮৮
৩৮. আজকের কাগজ, ২৩ জুলাই ১৯৯৭
৩৯. আল কুরআন, ৪ ঃ ৫৯
৪০. আল কুরআন, ১ ঃ ১
৪১. আল কুরআন, ২ ঃ ৮৫
৪২. আল কুরআন, ২৭ ঃ ৩০
৪৩. আব্দুস সালাম, তাফসীরে ইবন আব্দুস সালাম, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১
৪৪. আল কুরআন, ১৮ ঃ ১০৭
৪৫. আল কুরআন, ৮৫ ঃ ১১
৪৬. আল কুরআন, ৩ ঃ ৯৬
৪৭. আল কুরআন, ২১ ঃ ১০৭
৪৮. ১৯৭০ নভেম্বর, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১
৪৯. ১৯৭২ সালের ৭ জুন, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১
৫০. ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৫১. আল কুরআন, ২ ঃ ২৫৬
৫২. ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৫৩. আল কুরআন, ২ ঃ ২৫৬
৫৪. আল কুরআন, সূরা ১০৯ ঃ ৬
৫৫. আবেদ খান *"বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা"*, *বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম-সম্প্রদায়িকতার সংকট*, পৃঃ ২৪৭
৫৬. আবদুস সালাম *"বাংলাদেশ ধর্মের রাজনীতি উত্থান ও ক্রমবিকাশ"*, *বাংলাদেশে বুদ্ধিঃ ধর্ম-সম্প্রদায়িকতার সংকট*, *পৃঃ ১০৬*
৫৭. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬
৫৮. দৈনিক ইত্তেফাক ৮/৬/১৯৮৮ পত্রিকা
৫৯. প্রাগুক্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহারঃ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এবং বাঙালির চিন্তা-চেতনায় এর প্রভাব

২৪৪-২৬৭ পৃ.

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এবং বাঙালির চিন্তা-চেতনায় এর প্রভাব

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী-দর্শনের বিকাশে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে-বিষয়ে পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এই চেতনার ক্রমবিকাশ ইতিহাসের সকল স্তরে একই মাপে থাকেনি। বিকৃতি, ভিন্নমাত্রা ও উল্টোযাত্রাও দেখা গিয়েছে। বাঙলা ভাষার অন্যতম লেখক ও ভাবুক, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এবিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে ২২.০১.২০০৮ তারিখে একটি 'পাবলিক লেকচার' প্রদান করেন। তার বক্তৃতায় ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকালের বৌদ্ধিক অগ্রগতি সম্পর্কে নতুন চিন্তার উদ্রেক করে। কারণ তিনি প্রগতিশীল নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ কামনা করে শতবর্ষের ইতিহাসের সকল সঙ্গতি ও অসঙ্গতির বাঁকে বাঁকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিকাশের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা করেছেন। 'পাবলিক লেকচারটি' পুস্তক আকারে প্রকাশের সময় (২০০৮) তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেন–

> 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতৃত্বে গৌরবজনক দিকগুলোর সঙ্গে ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতার দিকও ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালের সূচনা থেকেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার দিক প্রধান হয়ে উঠতে থাকে।'
>
> ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণের পরেই তাজউদ্দিন সরকার এক আদেশবলে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী ও পাকিস্তান ডেমোক্রোটিক পার্টি– এই চারটি দলকে যুদ্ধকালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ও হানাদার বাহিনীর সহযোগী হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এ দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়। পরে জিয়াউর রহমানের শাসনকালে পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশনের ফলে এই দলগুলো রাজনীতির মাঠে আসে। রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন পক্ষ-প্রতিপক্ষ তৈরি হয় ও নতুন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। পরে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধারায় এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৮ সালে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। তাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা চরমে ওঠে। এরই মধ্যে জামায়াত ইসলামীর শক্তি বাড়ে। পুরাতন পরাজিত সব চিন্তা-ভাবনা ও রীতি-নীতি পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। এ অবস্থায় ১৯৮০র দশকের মাঝামাঝি থেকেই প্রগতির প্রয়োজনে ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও পরবর্তী বৌদ্ধিক অগ্রগতির বিবরণ দেশের বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপনের তাগিদ আমি অন্তরে অনুভব করি।"

'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল' শীর্ষক আলোচনার প্রারম্ভে আবুল কাসেম ফজলুল হক কয়েকটি মন্তব্য করেছেন– যা এ বিষয়ের আলোচনায়ও উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন : ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি বলা শুরু করেন যে 'ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘুরছে। এদেশের প্রগতিশীল শক্তি ভুল পথে চলেছে বলেই ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘোরা শুরু করে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু তারপরও এদেশের বিদ্যুৎসমাজে কোনো আত্মজিজ্ঞাসার আত্মসমালোচনার কিংবা আত্মোপলব্ধির কোনো প্রবণতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। একজন প্রগতিবাদীর অবস্থানে থেকে তাই তিনি এই বিশ্লেষণটি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রগতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ থাকেনা। জাতীয় জীবনে প্রগতি প্রয়াসী সংঘশক্তির অভাবে কখনো কখনো সে পথ বিলুপ্তও হয়ে যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো প্রগতিশীল সংঘশক্তি না-থাকায় প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলতে চেয়েছেন– 'প্রগতি ও পরিবর্তন' এক নয়। 'উন্নতি' ও 'উন্নয়ন'ও এক নয়। প্রগতির ধারণা ও উন্নয়নের ধারণাও ভিন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে– অর্থাৎ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলোত্তর কালে উন্নতি ও প্রগতির ধারণাকে আর বিকশিত করা হয়নি। বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক–রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রযোজিত 'উন্নতি'– 'প্রগতি'– Progress– এবং ভাওতাবাজি ধারণামুক্ত সুন্দর-সমৃদ্ধ-প্রগতিশীল ভবিষ্যত গড়ার আকাঙ্ক্ষায় ইতিহাস চর্চা করতে হবে। নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে হলে অতীত

সম্পর্কে ধারণাকে পুনর্গঠিত ও নবায়িত করা প্রয়োজন। অতীত সম্পর্কে প্রচলিত সব ধারণা অপরিবর্তিত রেখে উন্নত ভবিষ্যত সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এজন্যেই ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনোত্তর ঘটনাবলি নিয়ে এই অভিসন্দর্ভে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের উপর্যুক্ত 'পাবলিক লেকচার অনুসরণে এই উপ-অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে। শিরোনামটিও তাঁর থেকে নেয়া।

নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে মুসলিম হল (পরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, তারপর সলিমুল্লাহ হল, পুনরায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) ছাত্র-সংসদের অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ১৯২৬ সনের ১৯ জানুয়ারি মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সামজ'। এই সংগঠন জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে, এবং সেজন্য উত্তরকালে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের মর্যাদা লাভ করে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ মুসলমান বাঙালিদের সার্বিক উন্নতির জন্য চিন্তামূলক যে আন্দোলন পরিচালনা করে, তাই 'ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'। এই সংগঠনের বার্ষিক মুখপত্র শিক্ষা ১৯২৭ সন থেকে পর পর পাঁচ বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়। *শিখা*-য় প্রধানত মুসলিম সাহিত্য সামজের সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি ও কার্যবিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। *শিখা*-র প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৩) প্রকাশিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক কার্যবিবরণে সম্পাদক আবুল হুসেন উল্লেখ করেছেন : "স্নেহাস্পদ শ্রীমান আবদুল কাদির প্রমুখ আমাদের কয়েকজন নবীন সাহিত্যপ্রাণ বন্ধু মিলে গত বছর ১৯শে জানুয়ারি শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পৌরোহিত্যে এই সাহিত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার এগারো দিন পরে এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন কুলীণ ব্রাহ্মণ-আমাদের চুলপাকা-নবীন গল্পনিপুণ শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।"

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতারা অনুভব করেছিলেন, প্রত্যেক জাতির নবজীবন শুরু হয় সেই জাতির স্বল্পসংখ্যক শীর্ষস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে, ক্রমে সেই ব্যক্তিদের চিন্তাস্রোতই সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত সকল স্তরে প্রবাহিত হয় এবং তাতে জাতির অন্তর্গত সকলে পুনরুজ্জীবিত হয়– জাতি নবজীবন লাভ করে। রেনেসাঁসও এই রকমই একটি ব্যাপার। এই উপলব্ধিবশে তাঁরা চিন্তাচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। 'The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the state and spreads outward and downward.'– মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌সের (১৮৪২–১৯১০) এই উক্তি দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'A small group of committed thoughtful active citizens can change the whole state and society.' বাংলা ভাষার দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বিত সাধনা দ্বারা উন্নত জাতি গঠন ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল লক্ষ্য। জাতিগঠনের প্রশ্নে এই সংগঠনের দৃষ্টি বহু জাতি-অধ্যুষিত মহাজাতিক ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃত থাকলেও তাঁরা কাজ করেছিলেন বাংলা ভাষী অঞ্চলে– বাংলা ভাষার জনগোষ্ঠীকে নিয়ে। বাঙালি জাতি ও ভারতীয় মহাজাতির ধারণা ছিল তাঁদের মনে। রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁরা ছিলেন গণতন্ত্রী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমের পর্যাপ্ত মূল্য এবং শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা কামনা করতেন তাঁদের কেউ কেউ। তবে রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে রেখে যাননি। হিন্দু-মুসলমানের ক্রমবর্ধমান বিরোধ ও দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গার উন্মত্ততার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনে অগ্রসর হয়ে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, বাংলা ভাষার দেশে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় জনসংখ্যার দিক দিয়ে শতকরা দশভাগ বড় হলেও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। আসলে ইংরেজ আমলের হিন্দু শিক্ষিত সমাজ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, আর মুসলমান শিক্ষিত সমাজ উদীয়মান। ওই অবস্থায় মুসলমানদের পশ্চাৎবর্তিতাকে তাঁরা বাংলায় সমন্বিত জাতি গঠনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় মনে করেছিলেন। এজন্যে তাঁরা পশ্চাৎবর্তী মুসলমান বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজেই প্রায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

মুসলমান বাঙালিদের সমাজে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায়, তখনো ঢাকার নবাব পরিবারের কায়েমি স্বার্থবাদী নেতৃত্বে রক্ষণশীল আলেমদের অর্থাৎ মোল্লা-মৌলবিদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বিচারে ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার শিক্ষা, ওয়াজ-নসিহতের মাহফিল, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের যে মানসিক ভিত্তি বা mindset তৈরি হয়েছিল এবং অভ্যাসের দাসত্ব চলছিল, তাই ছিল তাদের উন্নতির মূল অন্ত রায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিকাশশীলতার তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁরা দেখেছিলেন দরিদ্র, শিক্ষা-দীক্ষায় অনুন্নত, জিজ্ঞাসাহীন, গ্রহণবিমুখ, অন্ধ-শাস্ত্রানুগত্য ও বদ্ধ-বিশ্বাসে বন্দি। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, মুসলমান

সম্প্রদায়ের ওই মানসিক ভিত্তি বজায় রেখে তাদের উন্নতি অসম্ভব। তাই তাঁরা মুসলমান বাঙালিদের বিশ্বাসের জগতে, চিন্তাধারায়, মানসিক ভিত্তিতে, আচার-আচরণে ও কর্মধারায় সার্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাকে উন্নতিশীল করে তুলতে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁদের এই তৎপরতাই 'ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'। রেঁনেসাঁসের স্পিরিট নিয়ে কাজ করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। মানুষকে তাঁরা সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে– কর্তার অবস্থানে রেখে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বাস উন্নত হলে মানুষের আচরণ ও কাজ উন্নত হয় এবং জাতীয় জীবনে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতায়, মুসলমান বাঙালিদের সমাজে পরিবর্তনের অন্তরগরজও দেখা দিয়েছিল। সে অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) সাত বছর আগে মুসলমানদের দৃষ্টিকে আধুনিক শিক্ষা ও গতিশীল জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট করার যুক্তি দেখিয়ে সারা বাংলায় ছয়টি নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল (১৯১৫)। নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইংরেজ সরকারের দিক থেকেই দেখা দিয়েছিল। নিউ স্কিমে অবলম্বন করা হয়েছিল ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার আর হাই ইংলিশ স্কুলের পাঠ্যসূচির মিশ্রণে দুইয়ের মাঝামাঝি একটি পাঠ্যসূচি। তাতে আখেরাতের সঙ্গে দুনিয়াদারিকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করা হয়েছিল। নিউ স্কিম মাদ্রাসার ধারাবাহকিতায় সারা বাংলায় দু-তিনটি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজও স্থাপিত হয়েছিল। নিউস্কিম ধারার শিক্ষার্থীরা সরাসরি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত যা ওল্ড স্কিমের শিক্ষার্থীরা কল্পনাও করতে পারত না। অবশ্য ওল্ড স্কিম ছিল এমন এক ব্যবস্থা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে-রকম কোনো আকাঙ্ক্ষাই জাগত না। মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তকেরা নিউ স্কিম ধারার মাদ্রাসাও সমর্থন করতেন না; তাঁরা চাইতেন ধর্মনির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার এক ধারা। তাঁরা চাইতেন একই স্কুলে সকল ধর্মের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করুক। নিউ স্কিমকে ইংরেজ সরকারের Divide and Rule Policy-র product-ও মনে করা হয়েছে। ধারণা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্কুল শিক্ষা থেকে দূরে রাখার জন্য নিউ স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছিল। আবুল হুসেন বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে, নিউ স্কিম প্রবর্তনের পর বাংলায় স্কুলগামী মুসলিম শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। পরে অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পাকিস্তানকালে আইয়ুব সরকার নিউ স্কিম মাদ্রাসাকে হাই ইংলিশ স্কুলে এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে কলেজে রূপান্তরিত করে। নিউ স্কিম প্রবর্তনের আগেই কোনো কোনো মুসলমান পরিবার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে স্কুল শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিল। তা-ছাড়া মাদ্রাসা ধারার কেউ কেউ বাংলা ভাষায় চিন্তাচর্চায় ও সাহিত্যচর্চায়ও অগ্রসর হয়েছিলেন। এ-অবস্থায় নিউ স্কিম প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না।

বিশ শতকের শুরুতেই মুসলমান বাঙালিদের পুরাতনপন্থী ও নব্যপন্থীদের মধ্যে বিরোধ জোরদার হয়েছিল। বিরোধ যতটা চিন্তাগত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল স্বার্থগত। সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষাকে ফারসি ভাষার স্থলাভিষিক্ত করার ফলে এবং ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার শিক্ষা আরবি-ফার্সি উর্দু ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জীবন-জীবিকার ও অর্থ আয়ের ক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল একেবারেই সীমিত, আর নব্যপন্থীদের সামনে এ-ক্ষেত্রে উন্মুক্ত হয়েছিল অবারিত সম্ভাবনা।

বঙ্গভঙ্গের সময় (১৯০৫–১১) থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ রাজনৈতিক রূপ লাভ করছিল। এতে ব্রিটিশ সরকারের Divide and Rule Policy ও কার্যকর ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত একাদিক্রমে গিয়েছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার রক্তরঞ্জিত কাল। দাঙ্গার মূলেও ছিল স্বার্থ। অর্থনৈতিক ও ক্ষমতাকাঠামোগত বিষয়গুলো সন্ধান করলেই এটা বোঝা যায়। সেই দাঙ্গার কালেই কেটেছে মুসলিম সাহিত্য সমাজের সমগ্র আয়ুষ্কাল (১৯২৬–৩৮)। প্রথম পাঁচ বছর (১৯২৬–৩১) এই সংগঠন খুবই সক্রিয় ছিল। তখন পুরাতনপন্থীরা এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও মারমুখী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে এই সংগঠন ক্রমেই পুরাতনপন্থীদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে এবং পুরাতনপন্থীরাও সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু হতে থাকেন। সংগঠনটির কার্যবিবরণে এর সর্বশেষ অনুষ্ঠান দেখা যায় ১৯৩৮ সনে, এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনীষী

আবুল হুসেনের মৃত্যুর পর এক অনাড়ম্বর ঘরোয়া শোকসভা। মাত্র বারো বছর মুসলিম সাহিত্য সমাজের মোট আয়ুষ্কাল।

আবুল হুসেন (১৮৯৭–১৯৩৮) ছিলেন এর মূল সংগঠক। তাঁকে বলা হত মুসলিম সাহিত্য সমাজের দেহ-অনেকে বলেছেন কর্মযোগী, সারথী। মৃত্যুর পরে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছিল 'চিন্তানায়ক' বলে। তিনি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে বাণিজ্যিক অর্থনীতির সহকারী প্রভাষক ও পরে আইন বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। রক্ষণশীল মহল থেকে লেখার মাধ্যমে কবি গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭–১৯৬৪) অবমাননাকর বক্তব্যে আহত হয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ত্যাগ করে স্বাধীন আইন ব্যবসা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেড় বছর পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে ঢাকা জজ কোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছিলেন। পরে আইনে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের ও পেশাগত উন্নতির জন্য তিনি ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন এবং কলকাতা বারে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তখনো তাঁর ঢাকায় নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ ছিল। যে লক্ষ্য নিয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি রাজনীতিতে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করতেন। কলকাতায় আইন ব্যবসায়ে থাকা কালে একবার তিনি যশোর জেলা বোর্ডের সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবুল হুসেনের কলকাতায় যাওয়ার পরে মুসলিম সাহিত্য সমাজের কার্যক্রম কমতে কমতে ১৯৩৮ সনে আবুল হুসেনের মৃত্যুর পর তা একেবারে শেষ হয়ে যায়।

বহুমুখী চিন্তার অধিকারী কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪–১৯৭০) ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান চিন্তক। তাঁকে বলা হত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মস্তিষ্ক-অনেকে বলেছেন ভাবযোগী। তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করতেন। অর্থনীতিতে এমএ পাশ করে তিনি আজীবন বাংলায় অধ্যাপনা করেছেন। হৃদয়বৃত্তি প্রধান সঙ্গীতপ্রিয় মার্জিতরুচি কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭–১৯৮১) ছিলেন এই সংগঠনের আর একজন চিন্তক। তাঁকে বলা হতো মুসলিম সাহিত্য সমাজের হৃদয়। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। আবুল ফজল (১৯০৩–৮৩), আবদুল কাদির (১৯০৬–৮৪), আবদুল মজিদ, শামসুল হুদা (১৯১০–৮৯) প্রমুখ ছিলেন ছাত্র-কর্মী। সংগঠনটি যখন পুরাতনপন্থীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় কর্মনীতি গ্রহণ করে তখন আবুল ফজল এর নেতৃত্বে আসেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজে বামপন্থী ও ডানপন্থী ধারা ছিল। আবদুর রহমান খাঁ (১৮৯০–১৯৬৪), আবুল ফজল, আবুয্ যোহা নূর আহমদ প্রমুখ ছিলেন ডানপন্থী ধারায়, আর মূল সংগঠকেরা সবাই ছিলেন বামপন্থী ধারায়। কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭–১৯৪৮) ছিলেন সংগঠনটিতে প্রবীণতম চিন্তাবিদ। তিনি যশোর জিলা স্কুলে আবুল হুসেনের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রদের সৃষ্টিশীল মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত করতেন এবং তাদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাতেন। পরে তিনি ঢাকা কলেজে যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপর্বে পি জে হার্টগ উপাচার্য থাকাকালে তিনি উপাচার্য অফিসের সচিব ছিলেন। 'আমাদের দুঃখ' নামে তাঁর একটি গ্রন্থে বাঙালি মুসলমান সমাজের সমস্যা বিষয়ে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা সঙ্কলিত আছে। এই সংগঠনের আর একজন গুরত্বপূর্ণ লেখক ছিলেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩–১৯৫৬)। তিনি তখন কুমিল্লা ইউসুফ হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এসে তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের সভায় অংশগ্রহণ করতেন। আবদুল কাদিরের পরিচিতি কবি হিসেবে; তবে তাঁর রচনাবলি প্রমান করে, তিনি ছিলেন এক অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রগতিশীল চিন্তক। বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ লুতফর রহমান, আবুল হুসেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের রচনাবলি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে তিনি এক অসাধারণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। আরো অনেক লেখক এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যাঁরা সেকালে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

মনে হয় আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেনই ছিলেন এর মূল সংগঠক। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় আবুল ফজল এবং আবদুল কাদিরও পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আবুল হুসেনের ব্যক্তিত্বে ছিল দুর্জয় সাহস, দূরদর্শী সংস্কারকের চেতনা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, অসাধারণ জ্ঞানানুরাগ, গভীর চিন্তাশীলতা এবং মহান-কিছু অর্জনের জন্য ছোট-কিছু ত্যাগ করার সদাপ্রস্তুত মনোভাব। চিন্তাশক্তি, শ্রমশক্তি, অর্থ সবই তিনি অকাতরে ব্যয় করে গেছেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের এবং মুসলমান বাঙালিদের মানসিক ভিত্তি, মনোবিন্যাস,

জীবনযাত্রা-প্রণালি ও চিন্তাধারার প্রগতিশীল বিকাশের ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টির কাজে। ১৯৬৮ সনে প্রকাশিত *আবুল হুসেনের রচনাবলী*-র ভূমিকায় আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন, "আবুল হুসেনের জীবনে ছিল গগনচুম্বী মনীষার অধিকারী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।" মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম সাহিত্য সমাজকে কেন্দ্র করে অন্তত কিছুকালের জন্য ঢাকা পরিণত হয়েছিল সমগ্র বাংলার মুসলমান শিক্ষিত সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাচর্চার কেন্দ্রে। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ আমলে ঢাকা পরিণত হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান জ্ঞানকেন্দ্রে। সে সময়টাতেই স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুশীলনের, চিন্তাচর্চার ও জ্ঞানবিস্তারের কার্যকর সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজ।

শিখা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রথম বর্ষে আবুল হুসেন, দ্বিতীয় বর্ষে কাজী মোতাহার হোসেন, তৃতীয় বর্ষেও কাজী মোতাহার হোসেন, চতুর্থ বর্ষে মোহাম্মদ আবদুর রশীদ এবং পঞ্চম বর্ষে আবুল ফজল। *শিখা*-র প্রথম দুই বছরের দুটি সংখ্যায় দুটি বার্ষিক কর্মী-সংসদের নাম দেওয়া আছে। প্রথম বছরের 'কর্মী-সংসদ : মৌলভী এ এফ এম আবদুল হক (মুসলিম হল); মৌলভী এ জেড নূর আহমদ (ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ); মৌলভী আবদুল কাদির (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ); অধ্যাপক আবুল হুসেন এমএ, বিএল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।" এখানে আবুল হুসেন শিক্ষক, বাকি সবাই ছাত্র। দ্বিতীয় বছরের 'কর্মী-সংসদ : আবদুস সালাম খাঁ বিএ; এএম তাহেরউদ্দিন এমএ; বিলায়েত আলী খাঁ বিএ; খান মুহম্মদ আতাউর রহমান; মৌলভী গোলাম আহাম্মদ; আবদুল কাদির; মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বিটি—সহকারী সম্পাদক; কাজী মোতাহার হোসেন—সম্পাদক।" তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ বর্ষ ও পঞ্চম বর্ষের সংখ্যায় কর্মী-সংসদের নাম নেই। পঞ্চম বর্ষের সংখ্যায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের নিয়মাবলি' মুদ্রিত আছে। এই নিয়মাবলিকে সমাজের গঠনতন্ত্র বলে মনে হয়। এর পরিসর অর্ধ পৃষ্ঠার সামান্য বেশি। এতে চৌদ্দটি পয়েন্ট আছে। কয়েকটি পয়েন্ট হুবহু উল্লেখ করছি ;

২। উদ্দেশ্য : সত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চা।

৫। সাধারণ সভা নয়জন-সভ্যের কর্মী-সংসদ গঠন করিবেন—সম্পাদক; দুইজন সহকারী সম্পাদক ও ছয়জন নির্বাচিত সদস্য।

৬। প্রতিবৎসর নতুন কর্মী-সংসদ গঠিত হইবে।

৭। বৎসরে অন্তত ছয়বার সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

৮। বার্ষিক সভা সাধারণত ইস্টারের ছুটিতে হইবে।

আগে বার বার 'চিন্তাচর্চা'-র কথা বলা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে 'সাহিত্যচর্চা'। চিন্তাচর্চায় চিন্তার বিষয়াদির ব্যাপ্তি অনেক বেশি ছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধির সত্যাগ্রহের প্রভাবে 'সত্য' কথাটা তখন খুব চালু ছিল। সত্য বলতে লোকে তখন fact বুঝত না, বুঝত fact-এর অতীত এমন একটা কিছু যা পরম ন্যায়, পরম কল্যাণ ও পরম সুন্দরের আধার। সত্য কথাটিকে ঈশ্বর অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। যে-কোনো ঘটনার মূল্য বিচার করা হত সত্যের সঙ্গে সেই ঘটনার সম্পর্ক দিয়ে। ইংরেজিতে fact এবং truth-এ পার্থক্য আছে। fact truth-এর আধার হয় তখনই, যখন তা পরম ন্যায়, পরম কল্যাণ ও পরম সুন্দরের অভিমুখী হয়। সত্য বা truth-এর সঙ্গে পরম সত্য বা Absolute Truth, চূড়ান্ত সত্য বা Ultimate Truth ইত্যাদি কথাও এসেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে সত্য কথাটির প্রতি লোকের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ছিল। লোকে বিশ্বাস করত, যত মন্থর গতিতেই হোক, চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে মানবজাতি সত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং একদিন পরম সত্যে পৌঁছাবে। 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী'-এই কথাটি তখন জনজীবনের সকল স্তরেই নীতিবাক্যরূপে উচ্চারিত হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখা ছিল, Truth Shall Prevail.

শিখা-র প্রথম তিনটি সংখ্যায় প্রতি বছরের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়-ব্যয়ের বিবরণ মুদ্রিত আছে। বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য আয় ও ব্যয় দুই-ই প্রথম বছরে একশো একান্ন টাকা পনের আনা, দ্বিতীয় পভচরে একশো একান্ন টাকা, তৃতীয় বছরে একশো তিয়াত্তর টাকা ছয় আনা। তৃতীয় বছরের সংখ্যায় শিখা-র প্রথম দুই বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণ মুদ্রিত আছে। মোট ব্যয় প্রথম বছরে তিনশো পঁচিশ টাকা বারো আনা, দ্বিতীয় বছরে দুইশো

পনেরো টাকা দুই আনা। শিখা বিক্রির টাকা বাদ দিয়ে তাতে প্রথম বছরে একশো তিরানব্বই টাকা চার আনা এবং দ্বিতীয় বছরে চৌষট্টি টাকা দশ আনা 'এখনো বাকি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা শুনেছি, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল ও আবদুল কাদির সভা-সমিতিতে বক্তৃতায় ও ব্যক্তিগত আলাপে উল্লেখ করেছেন—মুসলিম সাহিত্য সমাজের কাজে টাকা-পয়সার ঘাটতি হলে কিংবা বিপদ-আপদ আসলে আবুল হুসেনই তা সামলাতেন। কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল ফজলের লেখায়ও এর উল্লেখ আছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তকেরা পরস্পরের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫—১৯৬৯), এ এফ রহমান (১৮৮৮—১৯৪৫), তসদ্দুক আহমদ, মাহমুদ হাসান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১—১৯৬৮) প্রমুখ অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের সমর্থন ও সহায়তা ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতি। তৎকালীন বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার, মুসলমান সমাজের আধুনিকতা-মনস্ক ছাত্র-শিক্ষকদের, সাংবাদিকদের, সাহিত্যসাধক ও সাহিত্যানুরাগীদের, প্রগতিপ্রয়াসীদের প্রায় সকলেরই কোনো-না-কোনো রকম সংযোগ গড়ে উঠেছিল এই সংগঠনের সঙ্গে। তবে তাঁদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসপ্রবণতা একমুখী ছিল না। ঢাকার নবাব পরিবারের এবং মওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮—১৯৬৮) নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলেরা ও কায়েমি স্বার্থবাদীরা প্রবলভাবে বিরোধিতা করেছিলেন এই সংগঠনের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের। নবাব পরিবার সাধারণ মানুষদের মধ্যে (আতরাফদের মধ্যে?) শিক্ষার বিস্তার চাইত না।

সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে হিন্দুদেরই বিরাট সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল। ঢাকা শহরে এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরেও আধুনিক শিক্ষিত সমাজ বলতে তখন হিন্দুদেরকেই বুঝাত। বাংলার আধুনিক শিক্ষিত সমাজে মুসলমানেরা তখন মাথা তুলতে আরম্ভ করছে মাত্র। কায়েমি স্বার্থবাদীরা তাঁদের মাথা ভাঙতে চেয়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সংগঠকেরা তাঁদের জ্ঞানসাধনায় ও চিন্তাচর্চায় বাঙালি হিন্দু সমাজের জ্ঞানসাধকদের ও চিন্তকদেরও অংশগ্রহণ চাইতেন। *শিখা*-র লেখক-তালিকায় এবং মুসলিম সাহত্যি সমাজের সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিকারঞ্জন কানুনগো, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, করুণাকণা গুপ্তা, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কে সি মুখার্জি, পরিমলকুমার ঘোষ, জে সি ঘোষ প্রমুখের নাম মুদ্রিত আছে। বিপিনচন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা থেকে এসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান সংগঠকদের। মুসলিম হলে রবীন্দ্রনাথকে যে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তার অভিনন্দনপত্র লিখেছিলেন আবুল হুসেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ যখন কাজ করছিল তখন এর পরিচিতি ও প্রভাব যা ছিল, ক্রমে পাকিস্তানকালে তা বৃদ্ধি পায়। উত্তরকালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও '৭১-এর স্বাধীনতা-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয় এর চেতনা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, উত্তরকালের রাজনীতিবিদেরা এবং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা অনেকেই এব্যাপারে সচেতন কিংবা জ্ঞাত থাকেননি। বাংলাদেশে আবার যদি আমরা বড় কিছু মহান কিছু অর্জনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও গণজাগরণ কামনা করি, তাহলে নানা কিছুর সঙ্গে অবশ্যই আমাদের স্মরণ করতে হবে মুসলিম সাহিত্য সমাজ পরিচালিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, এবং সামনে চলার প্রয়োজনে আত্মস্থ করতে হবে পূর্বসাধকদের উজ্জ্বল সব অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের ভাবুক ও কর্মীদের সব ভাবনা-চিন্তা ও কাজ ঠিক ছিল, আর তাঁদের প্রতিপক্ষীয়দের সব চিন্তা ও কাজ ভুল ও অন্যায় ছিল-আজ এমন ধারণা নিয়ে চললে আমরা মারাত্মক ভুল করব। প্রগতির প্রয়োজনে উভয় ধারার প্রতিই আমাদের পক্ষপাতমুক্ত বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। বিষয়টিকে আমাদের দেখা উচিত এদেশের সেকালের মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের বিরোধ রূপে। এই ধরনের বিরোধ ঐতিহাসিক কালে পৃথিবীর সর্বত্র সব সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। প্রগতিশীলদের ও রক্ষণশীলতার মধ্যকার বিরোধের প্রকৃতি আমাদের বুঝতে হবে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সহায়তায়। আমরা মুসলিম সাহিত্য সমাজ সৃষ্ট ধারার উত্তরসাধক এবং এ-ধারার বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধী। এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে, পক্ষ অবলম্বন করা আর পক্ষপাতিত্ব করা এক রকম কাজ নয়। এখন আমরা সেই

কালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও উত্তাপ-উত্তেজনা থেকে অনেক দূরে, ভিন্ন কালে অবস্থান করছি। নতুন প্রযুক্তির অভিঘাতে এবং আরো নানা কারণে কালের চরিত্র বদলে গেছে। আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাও বদলে গেছে।

এ-অবস্থায় পূর্বধারণামুক্ত, পক্ষপাতমুক্ত, স্বাধীন মন নিয়ে অতীতের ঘটনাবলিকে বিচার করা আমাদের কর্তব্য। সে বিচার যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমাদের কালের সমস্যা সমাধানেও আমরা যোগ্য থেকে যোগ্যতর হয়ে উঠব। আমাদের মন এখন অতীতের মোহে আচ্ছন্ন! অতীতের গর্ভ থেকে বর্তমানকে মুক্ত করতে হবে এবং প্রগতিশীল সমৃদ্ধ-সুন্দর ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, অবস্থান যে-ধারাতেই হোক, কোনো মানুষই অভ্রান্ত নন, কোনো মানুষই ষোল আনা পূর্ণ ও একবারে ত্রুটিমুক্ত হন না; মানুষের ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে অনেক চেষ্টায়ও মানুষ নিজের চিন্তা, উপলব্ধি ও অভীষ্ট বক্তব্যকে একবারে নির্ভুল, নিখুঁত ও যথাযথ করে প্রকাশ করতে পারেন না। যাঁদেরকে আমরা রক্ষণশীল কিংবা ভুলপথগামী মনে করি, উত্তরকালের ভিন্ন বাস্তবাতায় তাঁদের বক্তব্য ও অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা নিজেদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু-না কিছু পেতে পারি। নিজের বক্তব্যের অভ্রান্ততা সম্পর্কে একটুখানি সংশয় ও বিচারপ্রবণতা আমাদের সত্যের দিকে যাত্রায় সহায়তা করে। অনুতাপহীন অপরাধীদের ছাড়া বাকি সকলের প্রতিই সহানুভূতি রক্ষা করতে হয়। শরৎচন্দ্রের মহান উক্তি : "ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। ... মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির হয়, তখন তাহার দোষ-ত্রুটিকেও সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না"

মুসলিম সাহিত্যসমাজ কোন স্পিরিট নিয়ে কীভাবে কী কাজ করেছিল, তার কিছুটা সন্ধান নেয়া যাক। আমাদের মনে রাখতে হবে, তখনকার অবস্থা আজকের অবস্থা থেকে সব দিক দিয়েই অনেক পশ্চাৎবর্তী ছিল-ভিন্ন ছিল। ধর্মভিত্তিক জনপ্রকৃতিতেও ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্তন। ১৯৪৭ সনের দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলা থেকে অন্তত বিশ লক্ষ্য মুসলমান পরিবার বাস্তুত্যাগী হয়ে পূর্ব বাংলায় চলে আসে এবং পূর্ব বাংলা থেকে অন্তত তিরিশ লক্ষ হিন্দু পরিবার বাস্তুত্যাগী হয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। এক্ষেত্রে জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ ও কলকাতার আকর্ষণও বড় ব্যাপার ছিল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের কাজের মধ্যে ছিল নিয়মিত মাসিক সভা ও বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান, বার্ষিক শিখা পত্রিকা প্রকাশ করা এবং শিখা-য় যথাসম্ভব সংগঠনের কার্যবিবরণ এবং সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি ও আলোচনাদি প্রকাশ করা, সহযোগী অন্যান্য পত্রিকায়-যেমন তরুণপত্র, অভিযান, জাগরণ, জয়তী, শান্তি, সাধনা, সঞ্চয়, সহচর, নব্য বাংলা, বুলবুল, মাসিক সওগাত, সাপ্তাহিক সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রভৃতিতে চিন্তা-মূলক, তথ্যসমৃদ্ধ, মতামত-সংবলিত লেখা প্রকাশ লিখিত চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হলে লিখিত চিন্তা দ্বারা তার জবাব দেওয়া ইত্যাদি। তাঁরা তাঁদের সংগঠনের কাজের বিবরণ উত্তরকালের জন্য সযত্নে লিখিতভাবে রক্ষা করতেন। তাঁদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের প্রগতিপ্রয়াসে কাজে লাগবে– এ বিশ্বাস তাঁদের দৃঢ় ছিল। আবুল হুসেন ঢাকার Peace এবং কলকাতার Calcutta Review, Muslim Standard, Musalman, Amritabazar Patrike প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকাতেও লিখতেন। কলকাতার *মোহাম্মদী* গোষ্ঠী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী আশরাফতন্ত্রীদের দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, এবং *সওগাত* গোষ্ঠী ও সমন্বয়বাদীদের সমর্থন ও সহায়তা তাঁরা লাভ করেছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা হিন্দুদের বাইরে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাধনার জোড় দিতেন আর সমন্বয়বাদীদের লক্ষ ছিল হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র সাধনা দ্বারা জাতি (Nation) গড়ে তোলা। *মোহাম্মদী* গোষ্ঠীর সঙ্গে ছিল *দৈনিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, মোসলেম দর্পণ, ছোলতান, ইসলাম নূর, শরীয়তে ইসলাম* প্রভৃতি পত্রিকা। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সহযোগী পূর্বোক্ত পত্রিকাগুলোর সঙ্গে আরো ছিল *গণবাণী, সাহিত্যিক, খাদেম, মোয়াজ্জিন, নওরোজ* প্রভৃতি পত্রিকা। প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় ধারায়ই অনেক পত্রিকা ছিল স্বল্পায়ু কিন্তু কার্যকর। বাংলার মুসলমান সমাজে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তখন স্পষ্ট ছিল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ তার সদস্যদের ও শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদার টাকা এবং *শিখা* বিক্রির টাকা দিয়ে সংগঠনের সকল কাজের ব্যয় নির্বাহ করত।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত অল্পকিছু ব্যক্তির চিন্তামূলক আন্দোলন হলেও তা গোটা বাংলার আলেম সমাজ ও মুসলমান শিক্ষিত সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলার নবোদ্ভূত

'বুদ্ধিজীবী সমাজ' প্রতিষ্ঠিত 'আলেম সমাজকে সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো থেকে অপসারিত করে এবং জনজীবনের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ও ইংরেজি, ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এবং পার্থিব জীবনের উন্নতিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, আর আলেমরা আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় ইসলামচর্চায় এবং পরকালের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের কথা প্রচারে বিশেষ উৎসাহি ছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্ব দিতেন স্বাধীন চিন্তাশীলতায়, আর আলেমরা বিশ্বাসের দৃঢ়তায়। বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা ছিল মানুষের মন থেকে অলৌকিকে বিশ্বাস ও অদৃষ্টবাদকে উচ্ছেদ করার দিকে, আর আলেমদের তৎপরতা ছিল অলৌকিক বিশ্বাস ও অদৃষ্টবাদকে সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করার দিকে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তকেরা শাস্ত্রীয় যুক্তিবাদের বিরোধিতা করে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলেমদের সঙ্গেও কোনো কোনো ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন এবং আলেমদের মতো আচরণ করেছিলেন। অপরদিকে আলেমদের থেকেও কিছু ব্যক্তি ইংরেজি শিক্ষিতদের সঙ্গে এসেছিলেন এবং আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বুদ্ধিজীবী সমাজ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, মুসলমান জনসাধারণের মানসিকতায় ও আচার=-আচরণে অনেক গলদ ঢুকেছে এবং তার জন্য দায়ী আলেম সমাজ। অভিযোগ তোলা হয়েছিল, মোল্লা-মৌলবিরা মিলাদ-মাহফিলে, ওয়াজ-নসিহতে এবং প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানাদিতে নানা মতলবে অনেক মনগড়া হাদিস প্রচার করে থাকেন। হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আলেমদের ধর্মের অপব্যবহার ও অপব্যাখ্যার নজির তাঁরা তুলে ধরতেন। তাঁরা মত প্রকাশ করতেন, যেসব হাদিস কাণ্ডজ্ঞানের পরিপন্থী কিংবা আজকের দিনে অনুপযোগী, সেগুলো অনুসরণ করার দরকার নেই। কোরানের ব্যাখ্যা অপরিবর্তনীয় একথা তাঁরা স্বীকার করতেন না, এবং মত প্রকাশ করতেন যে, কোরানের সুরাগুলোতে তৎকালীন মক্কা ও মদিনার জীনজীবনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য আছে, ফলে দেশ-কালের পার্থক্য অনুযায়ী কোরানের নতুন নতুন ব্যাখ্যা অপরিহার্য। 'ইসলাম চিরন্তন', 'ইসলাম শাশ্বত', 'ইসলাম রিচকালের জন্য মানবজীবনের সকল সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান দিয়ে গেছে'– এই ধরনের কথার তাঁরা বিরোধিতা করতেন। কাণ্ডজ্ঞানকে তাঁরা ধর্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনাচরণ, ভালো-মন্দ বিচার ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই তাঁরা আলেমদের থেকে ভিন্ন ছিলেন। তাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। নানাভাবে তাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষার অনুপযোগিতার কথা বলতেন। তাঁরা নারী শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করতেন এবং কর্মক্ষেত্রের প্রায় সকল পর্যায়ে পর্দাপ্রথা তুলে দিয়ে মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত করে দেওয়ার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করতেন। মেয়েরাও তখন অবরোধ অতিক্রম করে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আসতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা Anti-Purda League নামে সংগঠন করে পর্দপ্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা আল মামুন ক্লাব নামে প্রতিষ্ঠা করে মোতাজেলাদের অনুসরণে ইসলামের বিকাশশীলতার কথা বলতেন এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য ইসলামচর্চার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় মুসলমানদের উৎসাহিত করতেন।

তাঁরা মুসলমান সমাজের মানসিক ভিত্তি ও মনোবিন্যাস বদলে দেয়ার জন্য সৃষ্টিশীলতা ও বিকাশশীলতার পক্ষে মত প্রকাশ করতেন। তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন ইরানের মোতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তনপদ্ধতি ও ধর্মদৃষ্টি দ্বারা। ধর্মের বেলায় তাঁরা কেবল ইসলাম নয়-সকল ধর্ম সম্পর্কেই মুসলমানদের জ্ঞানলাভের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতেন। তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭–৯৮) ও বাংলার সৈয়দ আমির আলির (১৮৪৯–১৯২৯) চিন্তাধারাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। মুতাজিলা ধারার চিন্তক ছিলেন এঁরা। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভাবুকেরা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তুরস্কের মোস্তফা কামালের (১৮৮১–১৯৩৮) রাষ্ট্রবিপ্লব (১৯২২) দ্বারা। তা-ছাড়া তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন উনিশ শতকের বাঙালির নবচেতনা ও ইউরোপের রেনেসাঁসের দ্বারা। রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল দল, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের স্পিরিট ও ভাবধারা দ্বারা তাঁরা তাঁদের মনকে আলোকিত করেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ কলকাতার ইয়ং বেঙ্গলদের (১৮২৬-৩৯) ও তুরস্কের ইয়ং টার্কসদের অনুসরণে নিজেদেরকে 'মুসলমান সমাজের ইয়ং বেঙ্গল' বলে আত্মপরিচয় দিতেন। রুশ বিপ্লবও (১৯১৭) তাঁদের কারো কারো মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হজরত মুহম্মদের ইসলাম প্রচার ও গণমানুষের কল্যাণে আরবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারাও তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

তাঁদের ঝোঁক ছিল গণতন্ত্রের এবং জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি। আলেম সমাজ ওই বুদ্ধিজীবী সমাজ সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছিল যে, তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেন, যুক্তি দিতে দিতে তাঁরা ইসলামের সীমা অতিক্রম করে যান– শেষ পর্যন্ত আর ইসলাম মানেন না। তাঁদের অভিযোগ ছিল– ইসলামের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে অর্থাৎ আল্লাহ, রাসুল, কোরান, হাদিস, সিনাসাফ, ওহি, মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর, হাসর, কিয়ামত, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, ইবলিশ, হুর-গেলমান, পির-ফকির, কেরামত, মাজেজা, মাজার, দরগা, খানকা, দায়রা ইত্যাদি সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীরা এমন সব মত প্রকাশ করেন যে, তাঁরা আর মুসলমান থাকেন না। অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, তাঁদের জীবনাচরণে ইসলাম খুঁজে পাওয়া যায় না। যুক্তি-পাল্টাযুক্তি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারায় বুদ্ধিজীবীরা আলেমদের দ্বারা সরাসরি বেইমান, কাফের, নাস্তিক, পাষণ্ড ইত্যাদি বলেও অভিহিত হয়েছিলেন।

বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সংখ্যায় ক্ষুদ্র, তাঁদের অনুসারীরাও ছিলেন সংখ্যালঘু। আর আলেমরা ছিলেন সংখ্যায় বড়, তাঁদের অনুসরীরাও ছিলেন বিরাট-সংখ্যাগুরু। ক্রমে অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছর পার হতে-না-হতেই আলেম সমাজ সংখ্যালঘুতে এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল স্তরে আলেম সমাজ সম্পূর্ণরূপে নেতৃত্ব হারায় এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ নেতৃত্ব দখল করে।...

... মুসলিম সাহিত্য সমাজ বাংলার মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ বা রেনেসাঁস এবং জনজীবনে সার্বিক উন্নতির তৎপরতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। খণ্ডিতভাবে একটি-দুটি কাজ দিয়ে তাঁদের ভাব-আন্দোলনকে কিংবা কর্মধারাকে বিচার করলে তাঁদের পরিচয় অল্পই পাওয়া যাবে। সেই ১৯২৬ সন থেকে মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে লেখালেখি, বাদ-প্রতিবাদ, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষন চলে আসছে। বিষয়টি বিরাট। কাজী আনোয়ারুল কাদির, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভেতরকার লেখকদের রচনাবলি অনেক। এই আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তৎকালীন বাংলার মুসলমান ভাবুবক ও কর্মী সকলের কথাই এসে পড়ে। এস. ওয়াজেদ আলি, মোহাম্মদ লুতফর রহমান, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, মাহবুব-উল আলম, নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান, হবিবুল্লাহ বাহার, শামসুন্নাহার মাহমুদ, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সমসাময়িক চিন্তকদের রচনাবলিতে ইসলামকে যুক্তি দিয়ে বুঝবার প্রবণতাই প্রধান।

ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁরা নানারকম মত ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী কালে আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, সিকান্দার আবু জাফর, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মুতী, গোলাম মুরশিদ, আবুল হাসনাত (মিলন সঙ্ঘ), আলীম আল-রাজী, আরজ আলী মাতুব্বর, বেগম সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, মমতাজুর রহমান তরফদার, আনোয়ার পাশা, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রহমান, রশীদ আল ফারুকী, সরদার ফজলুল করিম, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, খান সারওয়ার মুরশিদ, কবীর চৌধুরী, সনজীদা খাতুন, আহমদ রফিক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বশীর আল হেলাল, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, খোন্দকার সিরাজুল হক, রফিকুল ইসলাম, ওয়াকিল আহমদ, মনসুর মুসা, আহমদ কবির, আবুল আহসান চৌধুরী, হাবিব রহমান, শামসুজ্জামান খান, সৈয়দ আবুল মকসুদ, সাঈদ-উর রহমান, মুনতাসীর মামুন, শফিকুর রহমান, মোরশেদ শফিউল হাসান, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, আহমদ নূরুল ইসলাম, রফিক কায়সার, শাহাদাত হোসেন খান, তৌফিকুল হায়দার, রহমান হাবিব, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায়, যতীন সরকার এবং আরো অনেকে অনুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল লেখক তাঁদের অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তা ও কর্মের পরিচয় সন্ধান ও মূল্যবিচার করেছেন।

এঁদের কেউ কেউ এ-বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন বুদ্ধির মুক্তির ভাবধারা দ্বারা। অনেকে এর সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করেছেন। হুমায়ুন আজাদ,

তসলিমা নাসরিন প্রমুখের চিন্তা কি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ধারায় বিকশিত? মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রচেষ্টাকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে অভিহিত করে এই আন্দোলনের লেখকদেরকে মুক্তবুদ্ধি নামক এক আইডিয়ার জগতে বাঁধা পড়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাঁদের কল্যাণপ্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আহমদ ছফা ও আবদুল মান্নান সৈয়দও মুসলিম সাহিত্য সমাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবদুল মওদুদ, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় লেখনি চালনা করেছেন। সেই ১৯২০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত-বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন আলোচনায় থেকেছে সব সময়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে এ এফ রহমান, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মাহমুদ হাসান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোহম্মদ ইব্রাহিম ও মাহমুদ হোসেন– উপাচার্য থাকাকালে কিংবা তার আগে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এবং সমর্থক ছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মমতাজউদ্দিন আহমদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আবুল ফজল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন। আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খাঁ প্রমুখ রাজনীতিবিদও ছাত্রজীবনে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শিখা পত্রিকার মটো (motto) হিসেবে এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকত : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" মুসলিম সাহিত্য সমাজেরই মতো ছিল এই উক্তি। বুদ্ধির মুক্তিবাদের মর্মবাণীও বিধৃত আছে এই উক্তিতে। আবুল হুসেন এর রচয়িতা। তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের 'নির্মোহ জ্ঞাননিষ্ঠা ও সর্বব্যাপী শ্রেয়োবুদ্ধির অকপট ঘোষণা' এই উক্তি। এ উক্তি সাধারণভাবে সব ধর্মের ও সব মতাদর্শের অনুসারীদের সামনে নিয়ে করা হয়েছে। তবে মুসলিম সাহিত্য সমাজ কথাটা বিশেষভাবে বলেছে বাংলার তখনকার মুসলমানদের মানসিক অবস্থাকে সামনে নিয়ে। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, বাংলার মুসলমান সমাজের, বিশেষ করে নেতৃত্বকারী আলেম-সমাজের, জ্ঞান 'কোরআন-হাদিসের দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত'। এই আলেমরা প্রচার করতেন, কোরআন-হাদিস চিরকালের সকল জ্ঞানের আধার-চিরকালের সত্য, কোরআন-হাদিসের বাইরে কোনো জ্ঞান নেই—কোনো কালে থাকবেও না; কোরআন-হাদিসের নির্দেশকে তাঁরা মনে করতেন চিরকালের জন্য কার্যকর-অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয, সনাতন, শাশ্বত, চিরন্তন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান চিন্তকেরা লক্ষ করেছিলেন, সব ধর্ম ও সব মতবাদের অনুসারীরাই নিজেদের ধর্মগ্রন্থ, মতবাদ-প্রতিষ্ঠাতার রচনাবলি এবং ধর্মপ্রবর্তকের কিংবা মতবাদপ্রতিষ্ঠাতার জীবনাচরণের প্রতি এই রকম বিশ্বাস ও ভক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে থাকেন। স্বধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরধর্মের প্রতি তাঁরা অশ্রদ্ধা ও অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। স্বধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্মকেই তাঁরা মনে করেন মিথ্যা। তাঁদের মত বাস্তবতাবর্জিত। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তকদের বিচারে এই রকম বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের বিচারক্ষমতা ও বোধশক্তির মৃত্যু ঘটায়—বুদ্ধিকে আড়স্ট করে ফেলে। যে-জনগোষ্ঠীতে স্বাধীন বিচার-বিবেচনা, যুক্তি তর্ক, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা; সংশয়, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়ন-অনুশীলন নেই, সে জনগোষ্ঠীর লোকেরা বুদ্ধির জড়তা, পরাধীনতা, দারিদ্র্য, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, রোগ-বালাই ও অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তাঁরা মনে করতেন, অলীক অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী কখনো উন্নতি করতে পারে না। তাঁদের মতে, উন্নতির জন্যে চাই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা-পুরুষকার। ভুল ও অনুচিত বিশ্বাসের বন্ধন থেকে তাঁরা বাঙালি মুসলমানদের মনকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মনুষ্যত্বসাধনায় ব্রতী ছিলেন তাঁরা।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তকেরা মানবজীবনে ও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন উপলব্ধি করতেন; কিন্তু কোনো বিশ্বাসকেই তাঁরা সনাতন, বা শাশ্বত, বা চিরন্তন, বা আনাদ্যন্ত-কালের-জন্য-সত্য মনে করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, প্রকৃতি বিকাশশীল; প্রকৃতির অন্তর্গত সবকিছুই বিকাশশীল। মানুষও প্রকৃতির অন্তর্গত এবং বিকাশশীল। তাঁরা মনে করতেন, বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে– কালে কালে পুরাতন বিশ্বাসকে ত্যাগ করে উন্নত নতুন বিশ্বাস উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁরা মনে করতেন বিকাশশীল প্রকৃতিই মানুষের সবচেয়ে মূল ও বড় শিক্ষক। তাঁরা প্রচলিত বিশ্বাসকে ত্যাগ করে উন্নততর নতুন বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হতে চাইতেন। তাঁরা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আর বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা অবলম্বন করে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় উন্নততর নতুন বিশ্বাস

উদ্ভাবন ও আয়ত্ত করতে তৎপর ছিলেন। নিজেদের নতুন নতুন উপলব্ধিকে তাঁরা নিজেদের সমাজে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করতেন। প্রচলিত, সেকেলে, অকেজো, ক্ষতিকর বিশ্বাস ও শৃঙ্খলাকে তাঁরা ভাঙতে চাইতেন উন্নততর, নতুন, কল্যাণকর বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা প্রবর্তন করার জন্য; বিশৃঙ্খল অবস্থা তাঁদের কাম্য ছিল না। সভ্যতার বিকাশে ধর্মের ভূমিকাকে তাঁরা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝতে চাইতেন। সমকালীন মুসলমান বাঙালিদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে তাঁরা সামাজিক উন্নতি বা প্রগতির মূল অন্তরায় রূপে পেয়েছিলেন। সেজন্য এই বিশ্বাসকে তাঁরা ভাঙতে চেয়েছিলেন কাণ্ডজ্ঞানসম্মত, বিবেকসম্মত, যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানভিত্তিক, উন্নততর, নতুন কল্যাণকর বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁদের ঝোঁক ছিল দৈশিক জাতীয়তাবাদ আর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে। তাঁদের ঝোঁক ছিল নিজেদের বাঙালিত্বের মধ্যে, মুসলমানত্বের মধ্যে, বহির্বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করে স্বকীয় বিবেচনা অনুযায়ী আরো উন্নত বাঙালি হওয়ার, আরো উন্নত মুসলমান হওয়ার দিকে। তাঁদের এই উন্নত বাঙালি ও উন্নত মুসলমান হওয়ার ব্যাপারটাকেই তাঁদের প্রতিপক্ষীয়রা সহ্য করতে চাইতেন না। বুদ্ধির মুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানসম্মত মানববাদী আদর্শে উত্তীর্ণ হওয়ার স্পিরিট নিয়ে তাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইতিবাচক, সদর্থক, ধনাত্মক, পজিটিভ, গঠনমূলক। নেতিবাচক, নঞর্থক, ঋণাত্মক, নেগেটিভ, বৈনাশিক কোনো কিছু নিয়ে তাঁরা দাঁড়াতে চাইতেন না। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকল লেখক ও কর্মীর চিন্তা ও কাজে, নানা মতপার্থক্যের মধ্যেও, বহমান ছিল ধনাত্মক চেতনা। তাঁরা ভাঙতে চাইতেন নতুন করে ভালো করে সুন্দর করে গড়ার জন্য—শূন্যতা সৃষ্টির জন্য নয়। প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে তাঁরা উন্নততর নতুন প্রথা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বর্ষের কার্য-বিবরণে (শিখা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৪) কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন :

"আমরা চক্ষু বুজিয়া পরের কথা শুনিতে চাই না, বা শুনিয়াই মানিয়া লইতে চাই না; আমরা চাই চোখ মেলিয়া দেখিতে, সত্যকে জীবনে প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে। আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ-আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞানশিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকামুক্ত করিয়া ভাস্বর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না, আমরা চাই বর্তমান মুসলমান সমাজের বদ্ধ কুসংস্কার এবং বহুকাল-সঞ্চিত আবর্জনা দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না, আমরা চাই কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যতকে মহিমান্বিত করিতে। আমরা জীবনকে 'ভোজের বাজি' মনে করিয়া ঐহিক উন্নতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে চাই না, আমরা চাই জগতের সমস্ত জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান, বলবান ও ঐশ্বর্যবান হইয়া জীবনের পদ্ধতি মার্জিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে। আমরা সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার মাতব্বর সাজিয়া ছড়ি ঘুরাইতে চাই না। আমরা চাই সমাজের চিন্তাধারাকে কুটিল ও পঙ্কিল পথ হইতে ফিরাইয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের সত্যপথে চালিত করিয়া আমাদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে। এক কথায় আমরা বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিয়া প্রশান্ত জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা বস্তুজগত ও ভাবজগতের ব্যাপারাদি প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে চাই।"

এই কার্যবিবরণেই তিনি উল্লেখ করেছেন, "আশার কথা যুগধর্ম আমাদের সহায়। যাঁহারা একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারাই প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রীতে এই স্পন্দন জাগাইয়া তোলাই আমাদের প্রথম কাজ।' মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে প্রকাশিত *নির্বাচিত প্রবন্ধের* (প্রথম খ, ঢাকা, ১৯৭৬) ভূমিকায় কাজী মোতাহার হোসেন উল্লেখ করেছেন : 'যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এক গোঁড়া, শাস্ত্রাচারে আবদ্ধ, প্রগতিবিমুখ সমাজের সঙ্গে লড়েছিলাম তা-যে অনেকখানি সার্থক হয়েছে— আজকের প্রগতিশীল বাংলাদেশের সমাজ দেখে তা বলা যায়। কিন্তু যে-কথাটি সেদিন আমরা বলেছিলাম সে-কথা সেদিন বলা খুব কঠিন ছিল। আমাদের চেতনার মধ্যে সততা থাকাতে এবং অবস্থা-পরিবর্তনের দিকে বৃহত্তর সমাজের আগ্রহ-যে আছে, সে-বিশ্বাস থাকাতে আমরা ঐ ধরনের বৈপ্লবিক চিন্তায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দ্বিধা করিনি।'

১৯৪০-এর দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনের কালে বুদ্ধির মুক্তি চেতনা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা যে কাঠমোল্লা ছিলেন, কিংবা খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তা নয়; তাঁরাও আধুনিক ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন— পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। নিজেদের সম্প্রদায়ের বৈষয়িক স্বার্থকে তারা গুরুত্ব দিতেন। তাঁদের মতামতও তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার অনুকূল ছিল না। তাঁদের দৃষ্টিতে ওহাবি

আন্দোলন ও ফরাজি আন্দোলন মুসলমানদের উন্নতির অন্তরায় হয়েছিল। ১৯৪০-এর দশকের রাজনীতিতে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সুস্পষ্ট ঐহিক স্বার্থচেতনা নিয়ে—জাতীয়তাবাদ (nationalism) পরিহার করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ (muslim communilism) নিয়ে। তৎকালীন ভারতের বাস্তবতায় সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই তাঁরা জাতীয়তাবাদ বলেছিলেন এবং দ্বিজাতি-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। ধর্মের প্রতি মুসলিম লীগ গ্রহণ করেছিল সুবিধাবাদী নীতি। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সমর্থক ও সাধারণ কর্মীদেরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে। পরে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ রূপে শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে স্থান পেতে দেখে, রাষ্ট্রের নামের সঙ্গে People's Republic দেখে, কাজী মোতাহার হোসেন অনুভব করেছিলেন, ১৯২০ ও '৩০-এর দশকের ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চেতনা, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি ও পিছুটান অতিক্রম করে, এসবের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে প্রসারমান।

বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, মীর মশাররফ হোসেন, রিয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী, কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে নবচেতনার বীজ রোপিত হয়েছিল, ১৯২০-এর দশকে পৌঁছার আগেই তা অঙ্কুরিত হয়েছিল। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা হয়ে ওঠে বাংলার মুসলমানদের জন্য এক যুগান্তকারী নবচেতনার কেন্দ্র। কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ প্রজ্ঞাবান অসাধারণ জনপ্রিয় মনীষীরা আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা থেকে ঢাকা এসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সভায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম বার্ষিক সভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে নজরুল বলেছিলেন (শিখা, প্রথম সংখ্যা ১৩৩৩, পরিশিষ্ট : বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ) : "আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নতুন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটা কথা— এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌলভী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে, এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।" নজরুল কেবল ইংরেজ সরকার দ্বারাই নয়, স্বসমাজ দ্বারাও নিগৃহীত হয়েছিলেন। অন্যত্র তিনি লিখেছেন : "মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে? পিজরায় পুরে খুঁচিয়ে মেরেছে ওরা। তবু এই মানুষ—এই পশুর জন্যই আমি গান গাই-তারই জন্য আছি আজো বেঁচে।"

শিখা-র সহযোগী *মাসিক জাগরণে* (১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৫) প্রকাশিত একটি পত্রে ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯—১৯৩১) লিখেছেন :

"মোল্লাকি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানদিগকে শিক্ষিত ও অবহিত করিতে না পারিলে জাতির অভ্যুত্থান কদাপি সম্ভবপর নহে। প্রাচীন মত, প্রাচীন শিক্ষা ও প্রাচীন সংস্কার লইয়া কোনো জাতি নবীন করিয়া জাগিতে পারে না। মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা কর্তব্য। সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও কলকাতা মাদ্রাসা হইতে উল্লেখযোগ্য কোনো লোক জন্মায় নাই। স্বাধীন চিন্তাশীলতা বা rationalism জিনিসটা উহাতে একবারে নাই। নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা ব্যতীত বর্তমান world-competition-এ কোনো জাতি দাঁড়াইতে পারে না। ... সুদের প্রচলন করিতে এবং বহুসংখ্যক জাতীয়-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ভীষণ দারিদ্র্য সমস্যাতেই আগামি ৫০-বছরের মধ্যে বাঙালি মুসলমান ক্রীতদাসের জীবন বহন করিবে। ... আপনাদের দলের আমি সমস্ত খবরই রাখি। আপনারা এখনো ভয়ে ভয়ে লিখিতেছেন। কিন্তু সত্য বজ্রনাদে প্রকাশ করাই কর্তব্য। সত্য একদিন জয়যুক্ত হইবেই। আপনারা সামাজিক ও ধর্মমূলক বহুল কুসংস্কারের আবর্জনা পরিষ্কৃত করিয়া লউন।"

এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৩৫) প্রকাশিত 'মোল্লা-ধ্বংস প্রস্তাব' শীর্ষক একটি পত্রে জনৈক মোহাম্মদ তোয়াহের লিখেছেন :

"জাগরণে সিরাজী সাহেবের একখানা চিঠি পত্রস্থ করিয়াছেন যে, দশ বৎসরের মধ্যে মোল্লাদের প্রাধান্য খর্ব করিতে না পারিলে মুসলমান সমাজের অস্তিত্ব থাকিবে না। ইহাতে আমরা খুব খুশি হইয়াছি। বাস্তবিক এই কাজ

যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু ইহার জন্য আপনারা কতদূর করিতেছেন? আমরা বলি, ইহা কার্যে পরিণত করিতে বিপুল চেষ্টা করুন। ধর্ম, সমাজ বা শিক্ষা বিষয়ে আলোচনায় তাহাদের কোনো হাত না থাকুক। মোল্লাদের সীমা শুধু নামাজ পড়ানো, খতম পড়ানো ও মিলাদ শরিফ পাঠে নির্দিষ্ট থাকুক। মোল্লারা একবার ইংরেজি শিক্ষা হারাম বলিয়া ও বাংলা শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মুসলমান সমাজের মস্তক চর্বণ করিয়াছেন। যেই পর্যন্ত মোল্লাদের প্রাধান্য খর্ব করা না যাইতেছে, সেই পর্যন্ত সমাজের আর কল্যাণ নাই।"

এই রকম অনেক উক্তি ছড়িয়ে আছে প্রগতিশীল ধারার পত্র-পত্রিকাসমূহে। তবে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল-উভয় ধারার প্রধান চিন্তকেরা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও, তাঁদের লেখায় নিজ নিজ ধারার অনুকূলে কম-বেশি বিবেক, জ্ঞান ও যুক্তিপরায়ণতারও পরিচয় দিয়েছেন। সবটাই কেবল উত্তেজনা নয়। স্কুলপন্থীরা তখন উদীয়মান ও বর্ধিষ্ণু, তবে সংখ্যায় ও শক্তিতে ছোট। মাদ্রাসাপন্থীরা তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, সংখ্যায় ও শক্তিতে বড়, কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু। চিন্তার শক্তি মাদ্রাসপন্থীদের নয়, স্কুলপন্থীদের বেশি। তরুণসমাজে নব্যপন্থীদের বক্তব্যেরই আবেদন ক্রমবর্ধমান। তবে প্রথম পর্যায়ে প্রাচীনপন্থীরা অবলম্বন করেছিলেন জুলুম-জবরদস্তির, নির্যাতনের ও নোংরামির পথ। তা সত্ত্বেও আমাদের আলোকিত করার মতো অনেক মূল্যবান উক্তি বিগত শতাব্দীর বিশের ও ত্রিশের দশকের বাঙালি মুসলমান লেখকদের রচনাবলি ও পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সঙ্কলন করা সম্ভব।

উন্নত ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রয়োজনে অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও ধারণাকে পুনর্গঠিত ও নব্যায়িত করতে হবে; অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি বর্তমানে যাতে না হয়, তার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; 'আত্মবিস্মৃত', 'আত্মভ্রষ্ট', 'আত্মঘাতী' থাকলে চলবে না। অতীতের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় ধারাকেই আমাদের আগে পক্ষপাতমুক্ত অবস্তান থেকে ভালো করে জানতে হবে, তারপর অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নতুন কালের নতুন প্রগতির সম্ভাব্য যাত্রাপথ নির্ণয় করতে হবে। যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের সমাজে সব সময় কেবল প্রগতিশীল শক্তিরই কর্তৃত্ব থাকবে, রক্ষণশীল কোনো শক্তির কোনো কর্তৃত্ব কখনো থাকবে না, তাহলে আমরা ভুল করব। অপরদিকে রক্ষণশীলেরা যদি মনে করেন যে, সমাজে কেবল রক্ষণশীল শক্তিরই কর্তৃত্ব থাকবে, প্রগতিশীল কোনো শক্তির কখনো কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, তাহলে তাঁরাও ভুল করবেন। প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিবেক ও যুক্তি নির্ভর অহিংস প্রতিযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে কাজী আনোয়ারুল কাদির, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখের সেকালের রচনাবলিতে। উত্তরকালে যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁরা আজীবন ওই ভাবধারার অনুকূলে কথা বলেছেন এবং ওই আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে লিখেছেন। পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ শেষ পর্যন্তই তাঁদের মধ্যে ছিল। পরিবেশের পারিবর্তন আর নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে বিকশিত হয়েছিল তাঁদের চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব। এখানে তাঁদের সবচেয়ে বিতর্কিত কয়েকটি লেখা ও কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন তিনজনেরই বেশ কিছু লেখায় দেখা যায় তাঁরা প্রচলিত কোনো কোনো মৌলিক ইসলামি বিশ্বাস ও আচরণকে বাতিল করার কিংবা পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। জীবনের দাবি ও ধর্মের দাবি যেখানে মুখোমুখী হয়েছে সেখানে বিচার-বিবেচনাপূর্বক তাঁরা জীবনের দাবিকেই সমর্থন করেছেন। আলেম সমাজের নেতৃত্ব কোথাও কোথাও আক্রান্ত হয়েছে তাঁদের লেখায়। আল্লাহ, রসুল, কোরআন, হাদিস ও ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে তাঁদের মতামত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তাঁরা শাস্ত্রনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন সব-কিছুকে। হজরত মুহম্মদের মানুষ পরিচয়ই তাদের কাছে মূল। তাঁরা হজরত মুহম্মদকে দেখেছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে, রাষ্ট্রনায়ক রূপে, সেনাপতি রূপে, আইন-প্রণেতা ও নীতিপ্রবর্তক রূপে, স্বামী ও পিতা রূপে, দূরদর্শী গণনায়ক ও শোষিত-বঞ্চিত-নির্জাতিত মানুষদের ত্রাতা রূপে-মানবজাতির এক মহান সন্তান রূপে। রিসালাত বা প্রেরিতত্বের ধারণা তাঁরা গ্রহণ করেননি। অলৌলিক বিষয়গুলোকে তাঁরা বুঝতে চেয়েছেন, এবং না-বুঝে কোনো কিছুতেই তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চাননি। তাঁদের কোনো কোনো লেখা পড়ে মনে হয়, তাঁরা কেবল যে বাঙালি মুসলমান সমাজের কতিপয় বিশ্বাস ও আচরণকেই বাতিল করতে চেয়েছেন, তা নয়, কালের দাবিতে তাঁরা ইসলামের

সীমাও অতিক্রম করেছেন। ইসলামকে তাঁরা মনে করেছেন দেশ-কালের অধীন। আবার তাঁদের কোনো কোনো লেখা পড়ে মনে হয়, তাঁরা ইসলামের পরিধিতেই থাকতে চেয়েছেন। তবে ইসলামের বিধি-বিধান যেগুলো অকেজো কিংবা প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সেগুলোকে শেষ পর্যন্তই তাঁরা মানতে চাননি। তাঁদেরকে কাজ করতে হয়েছে ভীষণ চাপের মধ্যে—প্রবল প্রতিপক্ষ সামলে নিয়ে। নতুন চেতনার আগুন দিয়ে তাঁরা আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন, অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে চাননি।

আবুল হুসেন লিখেছেন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, মুসলিম সংস্কৃতি, শিক্ষা, বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা, বাংলার নদ-নদী, কৃষিব্যবস্থা, কৃষক ও কৃষির উন্নতি, বৃহদায়তন শিল্প ও শ্রমিক, আইন ও বিচারব্যবস্থা, ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম আইনের বিকাশ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চা, মনীষীদের জীবনচরিত ইত্যাদি বিষয়ে। বাংলা লেখার তুলনায় তাঁরা ইংরেজি লেখার পরিমাণ কম নয়। তাঁরা লেখায় পরিমার্জনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচিত শতকরা পঁয়তাল্লিশ (সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৩৩), আদেশের নিগ্রহ, নিষেধের বিড়ম্বনা প্রভৃতি প্রবন্ধের বক্তব্য তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদের জন্য শতকরা পঁয়তাল্লিশটি সরকারি চাকুরি সংরক্ষিত রাখার দাবির বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে অগ্রসর হলেই মুসলমানদের উন্নতির সম্ভাবনা বাড়বে, সংরক্ষিত পদের সুযোগ তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করে দেবে-উদ্যোগ ও চেষ্টাকে কমিয়ে দেবে। তাঁর এই বক্তব্যে ছিল তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমানদের একটি জনপ্রিয় দাবির বিরোধিতা। কবি গোলাম মোস্তফা *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*-তে এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকার ফলেই আবুল হুসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পেরেছেন, অন্যথায় এটা সম্ভব হত না। এই বক্তব্যে অপমানিত বোধ করে আবুল হুসেন বছর দেড়েকের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ঝঞ্ঝাট চাকুরি ত্যাগ করে অনিশ্চিত আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। কাজী আবদুল ওদুদের নবপর্যায় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মওলানা আকরম খাঁ স্বয়ং *মাসিক মোহাম্মদী*-র পর পর চার সংখ্যায় আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করে 'নবপর্যায় না নবপর্যয়' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে এর বক্তব্য খণ্ডন করেন। মওলানার বক্তব্য খণ্ডন করে এবং ওদুদের বক্তব্যের সমর্থনেও লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। আবুল হুসেনও এই বিতর্কে অংশ নেন। ওদুদও আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধের বক্তব্য নিয়েও তখন তুমুল বিতর্ক চলে। এই বিতর্কের ধারায় এক চরম উত্তেজনাকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। তখন বালিয়াদির জমিদার খান বাহাদুর কাজেমউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকির (১৮৭৬—১৯৩৭) উদ্যোগে ঢাকার বালিয়াদি হাউজে সংরক্ষণবাদীরা এক বৈঠকের আয়োজন করেন। আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদকে বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। যথাসময়ে তাঁরা বৈঠকে উপস্থিত হন। কয়েকদিন ধরে বৈঠক চলার পর চরম বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ২০.৮.১৯২৮ তারিখ সোমবার আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী আলাদা আলাদা 'ঘোষণাপত্র' লিখে দিয়ে বেরিয়ে আসেন। ঘোষণাপত্রে আবুল হুসেন ত্রুটিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন, আর কাজী আবদুল ওদুদ ত্রুটি প্রায় স্বীকার না করে নিজের ভাষাগত অসামর্থ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

১৯২৯ সালের ৮ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধটির জন্য আবুল হুসেনকে আবার ঢাকার নবাব বাড়িতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। একটি অপ্রকাশিত গবেষনাপত্রে (সিদ্দিকুর রহমান, পরে ডক্টর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত সহযোগী অধ্যাপক, ১৯৭৬ সনে রচিত) পাচ্ছি :

"১৯২৯ সনে আবুল হুসেনের প্রতি মানসিক অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে তাঁর 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধটি (মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বছরের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে পঠিত, ১৯২৮) ১৩৩৬ সালের আশ্বিনের *শান্তি* পত্রিকায় প্রকাশিত হলে প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বিশেষত সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী*তে প্রবল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। ফলে স্থানীয় উর্দুভাষী মহলেও তার অনুকীর্তন ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার নবাব বাড়ি তখনো হৃতপ্রভাব হয়নি। ঢাকার জীবনে নানা ব্যাপারে তাঁরা তখনো রীতিমতো মুরুব্বিয়ানা করতেন, ... মহল্লার সরদার থেকে পুলিশের বড় কর্তা, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট, ভাইস-চ্যান্সেলার পর্যন্ত তাঁদের কথায় উঠতেন-বসতেন। এই সুযোগে ঢাকার নবাব পরিবার, বিশেষত নবাব হাবিবুল্লাহ, পূর্বোল্লিখিত উর্দুভাষী মহলের

প্রচারণাকে কেন্দ্র করে আবুল হুসেনকে লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত করেন। তৎকালীন গাড়োয়ান সম্প্রদায়ের 'বাইশা সমিতি' নবাবদের ডান হাত হিসেবে এ বিষয়ে অগ্রণী হয়। ৮/১/১৯২৯ তারিখে ঢাকার আহসান মঞ্জিলের ইসলামিয়া আঞ্জুমান থেকে আবুল হুসেনের উদ্দেশ্যে তথাকথিত নাস্তিক বা ধর্মদ্রোহী মতবাদের জবাবদিহিতার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর বাইশা সমিতি-র কতিপয় নেতৃত্বকারী গাড়োয়ান আবুল হুসেনকে হুমকি দেয় যে, তিনি যদি আহাসান মনজিলে না যান তবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং গেলেও তাঁর রেহাই নেই। তাঁকে একা যেতে হবে, কোনো সঙ্গী বা আত্মরক্ষামূলক কিছু সঙ্গে নেওয়া চলবে না। সেই সঙ্গে সর্বক্ষনের জন্য তাঁর বাড়িতে পাহারা বসানো হয় যাতে তিনি আত্মরক্ষার্থে ঢাকার বাইরে কোথাও পলায়ন করতে না পারেন। এই হুমকির মুখে আবুল হুসেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তিনি স্ত্রী ও পরিজনদের কাছ থেকে সম্ভাব্য মৃত্যুর জন্য চিরবিদায় নিয়ে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক বাইশা সমিতির দুই গাড়োয়ানের সঙ্গে আহসান মনজিলে উপস্থিত হন। তিনি উক্ত মনজলি অবস্থিত ইসলামিয়া আনজুমানের সভায় উপস্থিত হলে 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধটির উর্দু অনুবাদ সভায় সকলের সামনে পড়া হয়। প্রবন্ধটি পড়ার পর নবাব হাবিবুল্লাহ ও কতিপয় আলেম আবুল হুসেনকে উর্দু ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলে তিনি উর্দুতে ওইসব প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশ্নের উত্তরে হোক, আর অন্য কোনো কারণেই হোক, নবাব হাবিবুল্লাহ বলেন যে, 'আপনি জীবনে আর ককনো কিছু লিখবেন না– যদি এই শর্তে মুচলেকা দেন, তবেই আপনার দণ্ড শিথিল হতে পারে বা আপনাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।' এর উত্তরে আবুল হুসেন বলেন, 'আমি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কিছু লিখব না, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে লিখব– এই শর্তে আমাকে মুখি দেওয়া হোক।' অবশেষে তাঁরা আবুল হুসেনকে মুক্তি দিতে রাজি হন এবং আবুল হুসেন এই বলে ক্ষমাপত্র লিখে দেন যে, 'ওই প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ আঘাত দিয়েছি সেজন্য আমি অপরাধী।' এই মুচলেকা লিখে ক্ষমা চাওয়ার পর রাত সাড়ে চারটায় ইসলামিয়া আনজুমানের দুজন সদস্যের পাহারায় তাঁকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।"

কায়েমি-স্বার্থবাদী সংরক্ষণবাদীরা এই ঘটনাকে তাঁদের বিজয় মনে করে উল্লসিত হন। তখন আবুল হুসেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ছিলেন। আহসান মনজিলের বিচারসভায় হুমকির মুখে ক্ষমাপত্র লিখে দেওয়ার পর তিনি আর ওই পদে থাকা সমীচীন মনে করেননি। তিনি সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। তবে সংগঠনের সকল কাজে তিনি সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের আরো কোনো কোনো ঘটনাকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে সামসুল হুদা লিখিত এক প্রবন্ধের বক্তব্য নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে 'লেখকের জন্য কিছু সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা করে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়।'

ইসলামে যেসব কাজ মুসলমানদের জন্য অবশ্যকরণীয় বা ফরজ এবং যেসব কাজ নিষিদ্ধ বা হারাম, সেগুলোর যৌক্তিক বিচার আছে 'আদেশের নিগ্রহ' ও 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধ দুটিতে। আবুল হুসেনের মতে, দেশ-কালের ভিন্নতার কারণে বাংলা ভাষার দেশে মুসলমানদের জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য বা হালাল-হারাম নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে। তাঁর মতে যুগধর্ম মেনে চলাই মুসলমানদের কর্তব্য। দুঃসাহসের পরিচয় আছে দুটি লেখাতেই। সিদ্দিকুর রহমান আহসান মনজিলের বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

"আবুল হুসেনের প্রতি এই আঘাত পরোক্ষভাবে ইউরোপের মধ্যযুগের গির্জার নিপীড়নমূলক ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনো প্রমুখের উপর গির্জার ধর্মযাজক সম্প্রদায় কর্তৃক অত্যাচারের যে উদ্দেশ্য ছিল, বিংশ শতাব্দীর ভারতে আবুল হুসেনের প্রতি নির্যাতনেরও সেই একই উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষিত হয়, এবং এই উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চশ্রেণির মুসলিম সমাজ কর্তৃক নিম্ন শ্রেণির সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের জন্য ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। আবুল হুসেনের প্রতি নির্যাতন ছিল নিম্ন শ্রেণির মুসলিম সমাজের উত্থানে ক্ষয়িষ্ণু উচ্চ শ্রেণির মুসলিম সমাজ কর্তৃক বাধাদানের একটি প্রচেষ্টা মাত্র।"

ক্ষমাপত্র লিখে দেওয়ার পরেও আবুল হুসেন চিন্তাচর্চা ও লেখা ত্যাগ করেননি; তবে অভিজ্ঞতার আলোকে সতর্ক হয়ে পথ চলেছেন। নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে নীতির সঙ্গে নমনয়িতা অবলম্বন করেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের রচনা অনেক। মুসলিম সাহিত্য সমাজের তিনিই প্রধান চিন্তক। ইসলাম, বাঙালি মুসলমান, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির ইতিহাস, রেনেসাঁস ও রেনেসাঁসের মনীষীদের জীবনকথা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনেক লেখা আছে। বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্ভব

ও বিকাশের মোটামুটি একটি ঐতিহাসিক পরিচয় তাঁর লেখাতেই প্রথম পাওয়া যায়। উনিশ শতকের বাঙালির জাগরণ এবং ইউরোপের রেনেসাঁস তাঁর প্রিয় বিষয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, বাংলার মুসলিম মানস, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনেক মূল্যবান লেখা আছে। হজরত মুহম্মদের জীবন ও কর্মের বিচার তিনি করেছেন প্রেরিতত্ব বা রিসালাত পরিহার করে। 'কোরআনের আল্লাহ' প্রবন্ধে আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাস্তবসম্মত কথা বলেছেন। ইতিহাস সৃষ্টিতে নেতা বা নায়কদের ভূমিকাকে তিনি কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়েছেন। তরুণ বয়সে তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে ও হজরত মুহম্মদের জীবনকে তিনি বুঝবার চেষ্টা করবেন এবং বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য তাঁদের জীবনী লিখবেন। এই সঙ্কল্প তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। দুই খণ্ডে গ্যেটের জীবন ও ভাবধারা, দুই খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ভাবধারা এবং এক খণ্ডে *হজরত মুহম্মদ ও ইসলাম* বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। হজরত মুহম্মদের স্ত্রী হজরত আয়েশা বলতেন, মুহম্মদকে বুঝতে হলে অবশ্যই কোরআন বুঝতে হবে। এই কথার মর্ম সন্ধান করতে গিয়ে তিনি হজরত মুহম্মদের জীবন ও কর্মের তাৎপর্য বুঝবার ও বোঝাবার উদ্দেশ্যে সহজ ভাষায় সমগ্র কোরআন বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এতে প্রতিটি সুরার অনুবাদের আগে তার পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে তিনি তাঁর বিচারপ্রবণতার বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রেও বজায় রেখেছেন। তবে তিনি লিখেছেন সতর্কতার সঙ্গে; জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে তিনি ছেষ্টা করেছেন। বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের দুর্গে যতটা সম্ভব আঘাত না করে সত্য প্রকাশ করতে।

কাজী মোতাহার হোসেনের 'আনন্দ ও মুসলমানগৃহ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সেকালে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। গান শোনা, সিনেমা ও নাটক দেখা, অভিনয় করা, উপন্যাস পড়া, ছবি আঁকা, শিশুদের জন্মদিন পালন করা, উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি আনন্দজনক কাজের প্রতি মোল্লা-মৌলবিদের মনোভাব ছিল বিরূপ। কাজী মোতাহার হোসেন এই বিরূপতা কাটিয়ে আনন্দচর্চার প্রতি মুসলমানদের মানকে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যেই রচনা করেছিলেন 'আনন্দ ও মুসলমানগৃহ' প্রবন্ধটি। সংরক্ষণবাদীরা এই প্রবন্ধের বক্তব্যের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেনের মনের বিচরণ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায়। তাঁর রচিত 'মানবমানের বিকাশ', 'ধর্ম ও সমাজ', 'ধর্ম ও শিক্ষা', 'ধর্মের বাহ্যরূপ ও আদর্শরূপ', 'কোরানের মোমেন আল্লাহ ও কাফের', 'মানুষ মুহম্মদ' 'নাস্তিকের ধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধের বক্তব্য মোটেই নিরীহ নয়। 'মানুষ মুহম্মদ' প্রবন্ধে তিনি হজরত মুহম্মদকে অলৌকিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে মানুষ রূপে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন।

বাংলা ভাষার দেশে বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলন যে অগ্রসর-চিন্তার সূচনা করেছিল, সেই চিন্তা অগ্রগতি হারিয়ে বাংলাদেশে আজো অগ্রসর চিন্তা রূপেই বিরাজ করছে আর পুরাতন চিন্তার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর গত ষাট বছরের মধ্যে মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি অল্পই সাধিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাইরের জগত থেকে উন্নত চিন্তাও যে আমরা যথেষ্ট আত্মস্থ করতে পেরেছি, তাও নয়। বিদেশি আধিপত্যবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া চিন্তা নিয়ে অন্ধভাবে চললে কোনো ব্যক্তির কিংবা জাতির স্বকীয়তা বজায় থাকে না। স্বকীয়তা হারালে নিজের কিংবা নিজেদের সত্তাকেই হারাতে হয়। বাইরের জগত থেকে উন্নত চিন্তা ও উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতিকে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিচার-বিবেচনাপূর্বক আত্মস্থ করতে পারলে ব্যক্তি কিংবা জাতি ঋদ্ধ হতে পারে। বাইরের জিনিসকে, উন্নতির আন্তরিক তাগিদে, স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আত্মস্থ করা আর চাপের মধ্যে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করা এক রকম ব্যাপার নয়।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যে-সময়টাতে ঢাকা থেকে প্রচারিত হচ্ছিল 'বুদ্ধির মুক্তিবাদ' সেই সময়ে ও তার পরে *কল্লোল, কবিতা* প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতা থেকে প্রচারিত হচ্ছিল আধুনিকতাবাদ' (modernism)। আধুনিকবতাবাদীরা শিল্প-সাহিত্যের রূপ-রীতির দিক দিয়ে নতুনত্ব ও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন; তবে তাঁদের জীবন-জগতদৃষ্টি ছিল নেতিবাদী-নৈরাশ্যবাদী। তাঁরা রবীন্দ্রপ্রবাব অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টির উপায় সন্ধান করেছিলেন এবং তাতে তাঁদের সাফল্য আছে। ইউরোপের রেনেসাঁস, উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ এবং বিশ শতকের বাংলার গণজাগরণের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অপ্রসন্ন। রাজনীতির প্রতি তাঁরা তাকিয়েছিলেন বিরূপ দৃষ্টিতে। বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ধর্মেও তাঁদের আস্থা ছিল না। ব্যর্থতা, পরাজয়, বিকার-বিকৃতি ও রুগ্নতাকে (morbidity) বিষয়বস্তু করে তাঁরা সাহিত্য রচনা

করেছেন; পাঠককে তাঁরা নিয়ে গেছেন হতাশার অতল গহ্বরে। সাফল্য, বিজয়, স্বাভাবিকতা ও সুস্থতার প্রতি তাঁরা তাকাতে চাননি-তাঁরা আলো সহ্য করতে পারতেন না, মনে হতে পারে যে তাঁরা কামনা করতেন অন্ধকার। তাঁদের কোনো কোনো লেখার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে প্রচলিত অপব্যবস্থা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে। তবে জীবন-জগতের প্রতি তাঁরা তাকিয়েছিলেন নিতান্ত একপেশে দৃষ্টি নিয়ে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রুশ বিপ্লবকে তাঁরা মনে করতেন সাময়িক অস্থিরতার ব্যাপার-দুই বিশ্বযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক অশুভ ব্যাপারাদি তাঁদের মনকে রেখেছিল আচ্ছন্ন করে। কোনো রকম নৈতিক প্রশ্ন কিংবা নৈতিক বিবেচনাকে তাঁরা সাহিত্যের অঙ্গনে স্থান দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের অনেক বর্ণনা ও চিন্তা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর অবসথার সঙ্গে সঙ্গতিহীন-বাস্তবতা-বর্জিত। তাঁরা ছিলেন কলাকৈবল্যবাদী। আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা ভাষা ও রচনারীতির অসাধারণ উৎকর্ষ দিয়ে পাঠকদের মন জয় করেছিলেন। বুদ্ধির মুক্তিবাদীরা আধুনিকতাবাদী জীবনদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হননি। রেনেসাঁসের স্পিরিট নিয়ে তাঁরা কাজ করতেন। রেনেসাঁসকে তাঁরা কেবল ইউরোপের মাত্র একবারের ব্যাপার মনে করতেন না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ১৯৪০-এর দশকের সূচনায় প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ছিল 'পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক মঞ্চ'। দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহাম্মদীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এর পেছনে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনুকূলে এই সংগঠনে জ্ঞানানুসন্ধান ও চিন্তার চর্চা ছিল। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মুজিবুর রহমান খাঁ ও আরো কয়েকজন চিন্তক এই সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন। এ ধারায় ঢাকায় সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ প্রমুখ 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠন করে কাজ করেছেন। এই ধারার চিন্তক ও কর্মীরা 'বাংলার মুসলিম সংস্কৃতি'কে 'হিন্দু-সংস্কৃতি' থেকে আলাদা করে বিকশিত করার কথা ভাবতেন। ভবিষ্যতের পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে বাংলা ভাষার একটা স্বতন্ত্র পাকিস্তানি (ইসলামি নয়) রূপ তাঁরা কল্পনা করতেন। ভবিষ্যতের পশ্চিম পাকিস্তানের তাহজিব-তমদ্দুনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পূর্ব পাকিস্তানের তাহজিব-তমদ্দুনকে সম্পর্কযুক্ত ও সমন্বিত করার উপায় সম্পর্কেও তাঁরা চিন্তা করতেন। ভবিষ্যত পাকিস্তানের রূপ ও প্রকৃতি নিয়েও তাঁরা লিখেছেন। রেনেসাঁ সোসাইটির চিন্তক ও কর্মীরা পাকিস্তানবাদী হলেও মোল্লাতন্ত্রের অনুকূল ছিলেন না। তবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের স্পিরিটকে তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তাঁরাও রেনেসাঁসেরই সাধক ছিলেন, তবে তাঁরা নিজেদের জন্য রেনেসাঁসের একটা স্বতন্ত্র, হিন্দুয়ানিমুক্ত, পাকিস্তানি চারিত্র কামনা করতেন।

পাকিস্তানকালে তমদ্দুন মজলিশ (প্রতিষ্ঠা : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) সচেতনভাবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্যকে পরিহার করে এগিয়েছে। এই সংগঠন পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও মার্কসবাদের বিরোধিতা করে খিলাফতের আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং খিলাফতের পক্ষে জনমত গঠন করতে চেয়েছে। তমদ্দুন মজলিশ সহযোগী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলেছিল খিলাফতে রব্বানি দল। খিলাফতে রব্বানির প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাশিম ১৯৪০-এর দমকে বেঙ্গল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মুসলিম লীগে তাঁর অবস্থান ছিল নাজিমউদ্দিন-আকরম খাঁ গ্রুপের বিরুদ্ধে-শহিদ সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিকআগে সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর প্রমুখ– পাকিস্তান ও ভারতের বাইরে-স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র (independent and sovereign State of Bengal) প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। আবুল হাশিম মুসলিম লীগের নেতা হয়েও ১৯৪০-এর দশকে 'খাজা-গজা'দের নেতৃত্বের বিরোধিতায় অত্যন্ত সরব ছিলেন। তমদ্দুন মজলিশ পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি সন্ধান করতে গিয়ে সপ্তম শতাব্দীর আরবের খেলাফতের অভিজ্ঞতার আলোকে পাকিস্তানকে একটি উন্নতিশীল আধুনিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার চিন্তা করত। এই সংগঠন স্বকীয় ধারায় জ্ঞানানুসন্ধানে ও চিন্তাচর্চায় সক্রিয় ছিল। তমদ্দুন মজলিশের প্রধান সংগঠক ছিলেন বাঙলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মাহবুবুল হক, হাসান জামান, শাহেদ আলী, মোফাখখারুল ইসলাম, আশরাফ ফরুকী, মযহারুল ইসলাম, আবু হেনা মোস্ত ফা কামাল, আসকার ইবনে শাইখ, বদরুদ্দীন উমর, আবদুল গফুর, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোবায়দুর রহমান প্রমুখ। 'প্রগতি সাহিত্যে'র বিরোধিতা করত এই সংগঠন। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষাকে পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য থেকে আলাদা করতে

প্রয়াসপর ছিল তমদ্দুন মজলিশ। তবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও কাজী মোতাহার হোসেনও এ সংগঠনের কোনো কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এই সংগঠন গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী প্রথম পাঁচ-ছয় বছর তমদ্দুন মজলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের এবং উদীয়মান লেখক-শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে তাঁদের মধ্যকার মেধাবিরা এই সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাগত ঐতিহ্য থেকে সরে যান। সেকালে পাকিস্তানে এবং মুসলিম সংস্কৃতিতে আস্থা নিয়ে ছোট ছোট আরো কিছু সংগঠন চিন্তাচর্চায় সক্রিয় ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশি আন্দোলন পর্যন্ত জাতীয়তাবোধের যে ক্রমবর্ধমান অভিব্যক্তি, তার সবটাই হিন্দু জাতীয়তাবাদের (বলা যায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের) ভিত্তি রচনা করেছে। বাংলা কংগ্রেসের এবং বাংলার বিপ্লববাদী ধারার দলসমূহের চিন্তা-ভাবনায় বাংলার পশ্চাৎবর্তী মুসলমান সমাজ যথোচিত বিবেচনা পায়নি। বিপ্লববাদী ধারায় অনুশীলন, যুগান্তর, শ্রীসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কোর ইত্যাদি অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গুপ্ত সমিতি ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তৎকালীন বাংলায় হয়েছিল। এক দল ভেঙেই এত দল হয়েছিল। এগুলোতে মন্ত্রগুপ্তি ও বিভিন্ন কর্মনীতি এতটাই হিন্দুধর্মভিত্তিক ছিল যে, কোনো মুসলমানের পক্ষে এগুলোতে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। উল্লেখ্য যে, যে-বছর হিন্দু মহাসভা গঠিত হয় (১৯০৬) সেই বছরই মুসলিম লীগও গঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশগুলোতে নির্বাচিত (সীমিত ভোটাধিকার, পৃথক নির্বাচন) সরকার গঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর, বাংলা প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি হওয়ার ফলে ফজলুল হক, নাজিমউদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দি পর পর প্রধানমন্ত্রী হন। এতে হিন্দু বাঙালিদের মনে এই ধারণা দেখা দিল যে, বাংলায় কোনো হিন্দু আর কখনো প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। বর্ণ হিন্দুদের কাছে এটা ছিল দুঃসহ। এই বাস্তবতা বাংলায় মুসলিম লীগের শক্তিশালী হওয়ার এবং জাতীয়তাবাদের স্থলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। মনে হয়, বর্ণ হিন্দুদের ধারণা ভুল ছিল, সাময়িক ব্যাপারকে তাঁরা স্থায়ী ব্যাপার মনে করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাথাব্যথা দূর করার জন্য মাথা কেটে ফেলার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু তা দ্বারা কি সমস্যার সমাধান হয়েছে?...

... ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রতি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রসন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহর হোসেন ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে এই সংগঠনের যোগাযোগ দেখে। ১৯৪০ সনের মাঝামাঝিতে গেণ্ডারিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক ও শিল্পীদের প্রথম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা, মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম সংগঠক কাজী আবদুল ওদুদ'। ১৯৪১ সনের অক্টোবরে সদরঘাট এলাকার ব্যাপ্টিস্ট মিশন হলে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্গ ঢাকা জেলা শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক স্মেলনেও সবাপতি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইসব সভায় প্রধানত প্রগতিশীল চিন্তা ও প্রগতি সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথম পর্যায়ে এই সংগঠনের রবিবারের সাপ্তাহিক সভায়ও যোগ দিতেন। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ আব সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী যে গণসমাবেশে যোগদানের জন্য রেলওয়ে শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে আসার পথে সোমেনচন্দ প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান, সেই সমাবেশে সুধী ব্যক্তিদের মধ্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও কাজী আবদুল ওদুদ উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে কাজী মোতাহার হোসেনকে সভাপতি করে গঠিত হয় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। প্রগতিশীল চিন্তাচর্চায় ও সাহিত্যদৃষ্টি গঠনে এ সংগঠনও পালন করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এঁদের আগ্রহ ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের স্থলে বাঙালি জাতীয়তাবাদে এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রতি। আধুনিকতাবাদের প্রতিও কারো কারো অনুরাগ ছিল। কারো কারো অনুরাগ ছিল সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের প্রতিও। এই সংগঠনের প্রকাশিত কোনো পুস্তক-পুস্তিকার কথা জানা যায় না, এর সাংগঠনিক দৃঢ়তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরদিকে তমদ্দুন মজলিশের অনেক প্রকাশনা ছিল, সাংগঠনিক দৃঢ়তাও ছিল— তার কার্যবিবরণও পাওয়া যায়।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে নানাভাবে সক্রিয় ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, জয়নুল আবেদিন (শিল্পচার্য), অজিতকুমার গুহ, বেগম সুফিয়া কামাল, কামরুল হাসান (চিত্রশিল্পী), মুনির চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মুতী, লায়লা সামাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজলে লোহানী, আবদুল গনি হাজারী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, আতোয়ার রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, খান সারওয়ার মুরশিদ, সরদার জয়নুদ্দীন, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, এম আর আখতার মুকুল, শেখ লুৎফর রহমান (গণসঙ্গিত শিল্পী), খালেদ চৌধুরী, আবদুল লতিফ, দৌলতুননেসা খাতুন, আমিনুল ইসলাম (চিত্রশিল্পী), ফয়েজ আহমদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আনিস চৌধুরী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শাসুল হক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান প্রমুখ। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ এবং সওগাত সাহিত্য মজলিস-দুয়েরই উত্তরাধিকর অবলম্বন করে কাজ করেছে এই সংগঠনের কর্মীরা।

প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্গের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার নিয়ে পরবর্তীকালে ঢাকায় সংস্কৃতি সংসদ, সৃজনী, ক্রান্তি, উন্মেষ, উদীচী, বাংলাদেশ লেখক শিবির, সুকান্ত একাডেমি, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ ইত্যাদি বহু সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এই ধারায় চট্টগ্রামে ও আরো কোনো কোনো শহরেও গড়ে ওঠে কিছু সংগঠন। তবে চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে এসব সংগঠনের কোনোটাই মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কাছাকাছিও যায়নি। এই ধারার কোনো কোনো সংগঠন কেবল গণসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান ও নাট্যনুষ্ঠানে গুরুত্ব দিয়েছে। মার্কসবাদী ধারার রাজনীতি সাফল্যের দিকে গেলে তার অনুষঙ্গী চিন্তাচর্চা ও সাহিত্য-আন্দোলনও অবশ্যই আরো ফলপ্রসূ হত।

ঘটনাপ্রবাহ সরল রৈখিক গতিতে এগোয়নি। প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল শক্তির উপর কাজ করেছে সরকারি মহল এবং সাম্রাজ্যবাদী মহল। সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার এবং পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ দিয়ে বাঙালি জাতীযতাবাদকে নিস্প্রভ ও নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ (পূর্বাঞ্চল শাখা), জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (BNR) পাকিস্তান জাতীয় সংহতি পরিষদ (Pakistan Council for Natinal Integration) প্রভৃতির তৎপরতার কথা আসে। প্রগতিশীল লেখকেরাও দ্বিচারী ভূমিকা নিয়ে এসবের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী শক্তিগুলো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে লেখকদের পরিচালনা করতে, স্বাধীন চিন্তাশীলতা থেকে বিরত রাখতে এবং অকাজে-কুকাজে ব্যস্ত রাখতে তৎপর ছিল। এ প্রসঙ্গে রকফেলার ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনস, জার্মান (পশ্চিম জার্মানি) কালচারাল সেন্টার, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, পিইএন (Poets Essayists Novelists), কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম প্রভৃতির তৎপরতার কথা আসে। প্রগতিশীল লেখকেরাও দ্বিচারী কিংবা ত্রিচারী ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে এসবের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। এসব সংস্থা নিজেদের আড়ালে রেখেও বুদ্ধিজীবীদের আর্থিক মদদ দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছে। তারা মূলত কাজ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এবং ওয়াশিংটন-কেন্দ্রিক কথিত ফ্রি ওয়ার্ল্ডের পক্ষে। নিজেদের প্রকাশনা তারা প্রচার করেছে, সেই সঙ্গে তারা স্থানীয় ব্যক্তিমালিকানার কোনো কোনো প্রকাশককে আর্থিক মদদ দিয়ে অনেক পুস্তক প্রকাশ করিয়েছে এবং সেগুলোকে ক্রমাগত সারা দেশের শহরগুলোর হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়েছে। কমিউনিস্ট রাশিয়া ও কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে এই দুই রাষ্ট্র ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনুবাদিত ও লিখিত মার্কসীয় আদর্শের অনেক বই স্বল্প মূল্যে এদেশে রফতানি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত , এই দুই রাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদ প্রচার অব্যাহত ছিল। সরকারি, সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কসবাদী মহলের এসব কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত সাধারণভাবে এদেশের লেখকদের মধ্যে স্বকীয় সত্তার পরিচয় পাওয়া যেত। এখন সে পরিচয় ক্ষুদ্র এক অংশের মধ্যে দেখা যায় এবং তাও ক্ষীয়মান।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের স্পিরিট পাকিস্তান-আন্দোলনের অনুকূল না-হলেও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক অনেকেই পাস্তিান আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। বুদ্ধির মুক্তিবাদের উদ্ভাবক ও পরিচালকেরা পাকিস্তান-আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে পাকিস্তানকে মেনে নেন। কাজী আবদুল ওদুদ কলকাতায় থেকে গেলেও পাকিস্তানের প্রতি কৌতূহল ও কল্যাণ-কামনা নিয়ে এ রাষ্ট্রের অগ্রগতির ধারা অবলোকন করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখিতবাবে মত প্রকাশ করেছেন। ...

... সেকালের বাংলা ভাষার প্রধান মুসলিম লেখকদের অধিকাংশেরই পাকিস্তান আন্দোলনের ও পাকিস্তানের প্রতি এই ধরনের মনোভাবই ছিল। ১৯৪০-এর দশকে প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ধারায় চিন্তা প্রকাশের সুযোগ অল্পই ছিল। সে ধারায় চিন্তা করলে চিন্তা করতে হত স্বদেশে জাতিরাষ্ট্র গঠন এবং তার জন্য গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র নিয়ে। তখন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সেটাই হত যৌক্তিক অগ্রগতি।

... মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরক্ষণে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ-বিরোধী শক্তি দুর্বল ছিল না। অবিভক্ত পাকিস্তান ছিল এমন এক রাষ্ট্র যাতে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রভাষার সমস্যা সমাধান, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সীমা নির্ধারণ, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান, কার্যকর শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কোনোটাই সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার চিন্তাও পাকিস্তানে বিকশিত হয়নি। পাকিস্তানকালে পাকিস্তানবাদী ধারায় এদেশে চিন্তার বিকাশ নগণ্য। তবে তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তমদ্দুন মজলিশ ছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আস্থাহীন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন জারি পর্যন্ত কালে পাকিস্তানকে রক্ষা করার ও গড়ে তোলার লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিশ চিন্তাচর্চায় অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং কিছু সময়ের জন্য মেধাবি ছাত্র-তরুণদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও এই সংগঠন এগিয়েছিল পাকিস্তানবাদী চিন্তা-চেতনা নিয়েই। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন কিংবা বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে এই সংগঠনে কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল না। বাংলা ভাষার হিন্দুয়ানিমুক্ত স্বতন্ত্র মুসলমানি রূপের কথা তাঁরা ভাবতেন এবং সে লক্ষ্যে কাজ করতেন। 'পাকিস্তানবাদ' কথাটা এই সংগঠনের চিন্তকেরাই চালু করেছিলেন। বাঙালি চেতনার বিকাশের ফলে এই সংগঠন আকর্ষণশক্তি হারিয়ে ফেলে। ওই পরিবেশে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান দ্রুত শক্তিশালী হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতির আবেগ। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তক ও কর্মীরা এই আবেগের উদ্‌গাতা ও অংশিদার ছিলেন। পাকিস্তানকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় এক ধারায় গণতন্ত্রের আবেগ এবং অপর ধারায় সমাজতন্ত্রের আবেগ। আবেগদীপ্ত জনগন উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ও একাত্তরের মার্চের জাতীয় অভ্যুত্থানে অসাধারণ বিক্রমে নিজেদের শক্তির জানান দেয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয়দফা আন্দোলন (১৯৬৬-৭১) ও নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তখনকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না। প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ভবিষ্যত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে সফল করার অনুকূল জ্ঞানগত বা চিন্তাগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল অপ্রতুল। এই অভাব ও প্রস্তুতির প্রয়োজন সম্পর্কে উপলব্ধিও ছিল না। ছয়দফা আন্দোলনের মূল নেতা শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে না যাওয়াতে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে উপদলীয় প্রবণতা প্রবল হয়েছিল এবং তার ফলে নেতৃত্বের সমস্যা অত্যন্ত জটিল হয়েছিল এবং তার পরিণতি মর্মান্তিক হয়েছে। গোটা জাতির জন্যই তা হয়েছে মর্মান্তিক। শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ফজলুল হক মনি, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান প্রমুখের মৃত্যুর পর ঘটনাপ্রবাহ মোশতাকদের নেতৃত্বেও থাকেনি। খালেদ মোশাররফ, আবু তাহের, এম কে বাসার, জিয়াউর রহমান, আবুল মনজুর প্রমুখ সামনের সারির মুক্তিযোদ্ধারাও একে একে প্রাণ হারালেন। ন্যাপ কিংবা জাসদও নেতৃত্ব নিতে পারল না। দেশি প্রচারমাধ্যমগুলো বিবিসি রেডিওর অনুগামী হয়ে পড়ল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার অনুচরেরা ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। এ-অবস্থায় ইতিহাসের গতি উল্টে যেতে লাগল।

প্রতিষ্ঠার অনতিপরেই বাংলাদেশের যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় তাতে বাংলাদেশকে অভিহিত করা হয় জনগণের রাষ্ট্র বা People's Republic বলে। বাংলাদেশের জনগনকে এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক বলে নির্দেশ করা হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে শাসনতন্ত্রে ঘোষিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। এই শাসনতন্ত্রকে অবলম্বন করে চলার শক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করেনি। শাসনতন্ত্রে ঘোষিত আদর্শ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে চলার জন্য সহায়ক বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বও গড়ে ওঠেনি। অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় অপব্যবস্থা দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রের ভেতরকার রাজনৈতিক

ও বৌদ্ধিক চরিত্রবল শেষ হয়ে যায়– বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি (সব দল) বাংলাদেশকে চালিয়ে নেয়ার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় নানাভাবে ক্রিয়াশীল ছিল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চেতনা। ১৯৫৬ সনের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে ১৯৭২ সনের বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রকে তুলনা করে দেখলে দেখা যায়, শুধু রাষ্ট্র ভেঙে নিজেদের রাষ্ট্র গঠন নয়, শাসতন্ত্রের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের প্রকৃতিতেও ঘটানো হয় যুগান্তকারী পরিবর্তন। মনে হয়, এই পরিবর্তন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনেরই যৌক্তিক অগ্রগতি। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির আর চরিত্রবলের অভাবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ নিতান্তই কাগুজে ব্যাপারে পর্যবসিত হয়, বাস্তবে ঘটে চলে ঘোষিত আদর্শ ও বিধি-বিধানের বিপরীত সব ঘটনা। শাসনতন্ত্রের যে-ধরনের সংশোধন দ্বারা শাসনতন্ত্রকে তার মূল স্পিরিটের ধারায় কার্যকর করা যেত, বাস্তবে আজ পর্যন্ত সব সংশোধনই করা হয়েছে ঠিক তার বিপরীত ধারায়। দুর্নীতি ও অপব্যবস্থার কারণে প্রগতির ধারায় ইতিহাসের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। তাতে পরাজিত সব শক্তি ও পরিত্যক্ত সব চিন্তা-ভাবনা পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। 'প্রগতিশীলদের' দুর্বলতা এবং বুল ও অনুচিত কর্মধারা আর বিদেশি আধিপত্যবাদীদের উপর তাদের নির্ভরশীরতার কারণে পরাজিত শক্তি পুনরুজ্জীবনের চমৎকার সুযোগ পায়। পরাজিতেরা স্বাভাবিক জীবনধর্মের তাড়নায়ই উঠতে চায়– রাতের অন্ধকার থেকে দিনের আলোতে আসতে চায় তারা উঠে দাঁড়াবার ও মোকাবিলা করার সুযোগ পায় তখনই যখন তাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিজয়ীরা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ...

স্বাধীন বাংলাদেশ আমলের পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্বকীয় পর্যবেক্ষণ এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি আক্ষেপের সুরে লিখেছেন :

> *বিচিত্রা* 'মৌলবাদ'-এর বিরুদ্ধে– জামায়াতে ইসলামীকে তখন মৌলবাদী বলা হত–সর্বাত্মক প্রচারাভিযান চালিয়েছিল। প্রচারের বেলায় জামায়াতকে সব সময় অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। তাতে ফল এই দেখা গেছে যে, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য 'প্রগতিবিরোধী শক্তি'র দ্রুত প্রসার ঘটেছে, 'প্রগতিশীল শক্তি' হয়ে পড়েছে নিষ্প্রভ। *বিচিত্রা* মার্কসবাদীদের (বামপন্থীদের) পক্ষে প্রচারকার্যে ভীষণভাবে তৎপর ছিল। এক্ষেত্রেও ফল উল্টো হয়েছে, মার্কসবাদীরা (বামপন্থীরা) দ্রুতগতিতে ক্ষীয়মান হয়েছে। *বিচিত্রা*-র বিপুল প্রচারে বাস্তবে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়েছে। কেন এমন হয়েছে? বিস্ময়ের ব্যাপার, এ-পত্রিকার 'প্রগতিশীল লেখকদের' একজনের মনেও এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জাগেনি! প্রগতির ছদ্মাবরণ নিয়ে *বিচিত্রা* কি ইতিহাসের সম্মুখগতিকে উল্টিয়ে দিতে তৎপর ছিল না? ওই সময়ে দেখা গেছে বিবিসি রেডিও আর সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* যেন পরস্পর যোগসাজসে থেকে একই ধারায় সমান উৎসাহে প্রচারকার্য চালিয়েছে। দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিবিসি রেডিও-র ভূমিকা কল্যাণকর নয়। এদেশে কোনো প্রগতিপ্রয়াসী শক্তি যদি নতুন করে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, কাজ করতে চায়, তাহলে তাকে *বিচিত্রা*-র ঐতিহাসিক ভূমিকার রহস্য উদঘাটন করে, অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সামনে চলতে হবে। তা করা না হলে প্রগতির নামে আবার প্রতারণার ফাঁদে পড়তে হবে। 'প্রতারক প্রগতিশীলতা' প্রগতির পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রয়োজনে অতীত সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। অতীত সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে অটুট রেখে নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির কাজে এগোনো যাবে না। অতীতের আন্দোলন, বর্তমানের সঙ্কট ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। কেবল *বিচিত্রা*-র কথাই নয়, বাংলাদেশের গত পঁয়তাল্লিশ বছরের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? প্রচলিত ধারণা, প্রচলিত অভ্যাস, প্রচলিত চিন্তা, প্রচলিত আবেগ, প্রচলিত হুজুগ– কোনটা বাংলাদেশে উন্নত নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির অনুকূল? বাংলাদেশে আজ উন্নতির বা প্রগতির সংগঠিত প্রয়াস কোথায়?
>
> বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকালের ঘটনাবলি সম্পর্কে ক্রমাগত নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে, নতুন গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হচ্ছে– চারপাশে নতুন কৌতূহল দেখা যাচ্ছে। এ-অবস্থায় এ-বিষয়ে কিছু বলা

সহজসাধ্য নয়। মনে রাখতে হবে, আমার এই আলোচনা সর্বাঙ্গীন নয়, পূর্ণাঙ্গও নয়, কোনো দিক দিয়ে পর্যাপ্তও নয়। এতে যেসব মত আছে সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে নিতান্তই একজন মাত্র ব্যক্তির মত হিসেবে। আর এ মতও পরিশোধনযোগ্য।

অনেক কথা আমি বলছি, কিন্তু অনেক কথাই বলছি না। যেসব কথা বলছিনা কিংবা বলতে পারছিনা, সেগুলো আমার বলা কথাগুলোর চেয়ে বেশি বই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজনের কাজ নয়– বিবেকবান ও চিন্তাশীল সকলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কথিত আছে, দস্যু রত্নাকার 'রাম' নাম উচ্চারণে অসমর্থ ছিল। তারপর সে 'মরা' 'মূরা' বলতে বলতে 'রাম' উচ্চারণে সমর্থ হয়েছিল এবং ঋষি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছিল। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তেমনি কোনো উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন গত তিন দশকের মধ্যে ঘটে গেছে। অত্যুন্নত প্রযুক্তির এই কালে বাংলাদেশের সামনের সারির বুদ্ধিজীবীরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত বিশ্বায়ন– প্রক্রিয়ায় কাজ করতে করতে বাংলাদেশের ইতিহাস ও কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন এমনকি অজ্ঞ হয়ে পড়েছেন। কার্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের চেয়ে বিশ্বায়নকে তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরাই আবার বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে নীতিনির্ধারক, এমনকি গত তিন দশক ধরে রাজনীতির গতি-প্রকৃতিরও নির্ধারক। বিশ্বায়নের শক্তি সমূহের দিক থেকে বাংলাদেশের জন্য চাপিয়ে দেওয়া নানা কিছু তাঁরা নির্বিচারে গ্রহণ করে নিচ্ছেন এবং উন্নতি ও প্রগতির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেবল উন্নয়নের ধ্বনি তুলছেন। দেশি-বিদেশি প্রচারমাধ্যমের সুযোগ নিয়ে তাঁরা কতকগুলো বদ্ধ বিশ্বাস দিয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমনকে বেঁধে রেখেছেন। উন্নয়নপ্রবাহে নিবেদিত এই বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-চেতনার উৎস বাংলাদেশ নয়। তাঁদের উন্নয়ন চিন্তা ও উন্নয়নতৎপরতা যত এগিয়েছে, বাংলাদেশ ততই ব্যর্থরাষ্ট্রের অভিধা লাভ করেছে। এই উন্নয়ন-উচ্ছ্বাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যতকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। রাষ্ট্র না থাকলে আমাদের থাকবে কী? আমার মনে হয়, বাংলাদেশের উন্নয়নবিদেরা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের তথা জাতীয় ইতিহাসের তাৎপর্য উপলব্ধিতে অক্ষম। সে-ইচ্ছাও তাঁদের নেই। আর সে-বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রও (intellectual character) নেই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল্যে পেতে হয় যে উন্নয়ন, তার দিকেই তাঁরা অন্ধভাবে ধাবিত। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্গতির কারণে বাংলাদেশের জনগণ এখন কেবল সাংস্কৃতিক নয়, ethnic decline-এর প্রক্রিয়ায় পড়ে গেছে! পতন যত গভীরই হোক, শক্তি সঞ্চয় করে এ থেকে উদ্ধার পাওয়াই আমাদের মূল বিষয়।

আমাদের এখন দরকার ওয়াশিংটন পরিকল্পিত বিশ্বরাষ্ট্রে খাপ-খাওয়ানোর দুশ্চিন্তা পরিহার করে, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতার পর্যাপ্ত উপলব্ধি নিয়ে, বাংলাদেশে শক্তিমান, সমৃদ্ধিমান, জনগণের গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তায় মনোযোগী হওয়া। জাতিরাষ্ট্রকে সফল করতে হবে আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কের মধ্যে-মূলত বাংলাদেশের উৎপাদনশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষদের কেন্দ্রীয় বিবেচনায় রেখে। এজন্য দরকার প্রগতিশীল রাষ্ট্রচিন্তা এবং রাষ্ট্রচিন্তা-সম্পৃক্ত জনগণের রাজনীতি (Politics of the people, by the people, for the people)। রাজনীতির মতোই জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে জ্ঞান ও চিন্তাচর্চার ইতিহাসকে। অভীষ্ট রাষ্ট্রগঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে অনুকূল রাজনৈতিক দল গঠনে। পুরাতন দলগুলোও পুনর্গঠিত হতে পারে। উন্নয়নবিদদের ধারণা যাই হোক, অচিরেই পৃথিবী থেকে জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয় কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে– এটা বিশ্বাস করার কারণ দেখি না। বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা বহিরারোপিত যেসব ক্ষতিকর বিশ্বাসের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি এবং রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের দুর্গতির কারণে যে দুর্যোগে পড়েছি, তা থেকে উজ্জ্বল উদ্ধারের জন্য বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

মর্মচেতনাকে আত্মস্থ করে নিজেদের পুনর্গঠিত করা আজ আমাদের একান্ত দরকার। সবচেয়ে বড় বিষয় বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্র (intellectual character) অর্জন।

... কিছু লেখক ধর্মনিরপেক্ষতার নামে 'মৌলবাদবিরোধী' ও 'নারীবাদী' অবস্থান নিয়ে এমনসব লেখাও লিখেছেন যেগুলো সাধারণ মানুষের ধর্মবোধকে ক্রমাগত আঘাত করেছে। এতে অনেক মানুষ বিপরীত ধারায় চলে গিয়েছে অথবা হতাশ হয়ে আছে। এ-অবস্থায় একদিকে দেখা যাচ্ছে পুরাতন পরাজিত সব শক্তির পুনরুজ্জীবন—পুরাতন শাস্ত্রানুগত্য, বদ্ধ সংস্কার ও ক্ষতিকর সব প্রবণতার নবউত্থান; আর অপরদিকে দেখা যাচ্ছে জেএমবি-র মতো গোপন জঙ্গি সংগঠন ও সহিংস কার্যক্রম। ধর্মপরায়ণতার চেয়ে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ধর্মব্যবসায় এবং ধর্মের নামে গোপন ও প্রকাশ্যে সহিংসতা। দেখা যাচ্ছে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেসব শক্তি পরাজিত হয়েছিল তাদের পুনরুজ্জীবন। এর জন্য 'বাংলাদেশের প্রগতিশীল সব শক্তি' 'মৌলবাদীদের' দায়ী করে তাদের উদ্দেশে ক্রমাগত তিরস্কার বর্ষণ করে আসছে। 'প্রগতিশীলেরা' নিজেদের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিপথগামিতা নিয়ে একটুও ভাবছে না। তাদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার, আত্মবিশ্লেষণের কিংবা আত্মসমালোচনার, কিংবা আত্মগঠনের কোনো বোধই দেখা যাচ্ছে না।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কালের অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য, বদ্ধ কুসংস্কার ও কায়েমি স্বার্থবাদের চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার বাংলাদেশে একালে দেখা দিয়েছে। তা হল, চিন্তাক্ষেত্রে নির্বিচার পরবশ্যতা ও আত্মবিক্রয়।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন ও মন্তব্য

মহানবী (স.) একাধারে ধর্মীয় শীর্ষ ব্যক্তিত্ব পাশাপাশি একজন সফল রাষ্ট্রপতি ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। বর্তমান বিশ্বে অনুরূপভাবে একটি মুসলিম দেশও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থা চালু নেই। অথচ একসময় সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং এর বাইরেও ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রসারিত ছিল। প্রথম হিজরীর ১২ ই রবিউল আউয়াল মহানবী (সা:) এর মদিনা গমন ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। মদিনায় নওমুসলিমগণ মহানবী (সা:) প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে শুধু আশ্রয় পেলেন তাই না, তাদের সহায়-সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়েছিল । মহানবী (সা:) এর মদিনায় হিজরতের অব্যবহিত পরই মদিনার সনদ জারি করা হয়। আর এ সনদের ভিত্তিতেই মূলত মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

লক্ষ্যনীয় যে, ৬৩০ খ্রি. মক্কা বিজয়ের পূর্বে মহানবী (সা:) এর প্রশাসন নীতিতে পরিবর্তন আসে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মহানবী (সা:) আরবের গোত্রগুলোর সরাসরি সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করতেন এবং এতে কেউ কেউ ব্যর্থ হলে তিনি তাদের নিরপেক্ষতা চাইতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবীজী অমুসলিমদের প্রতি সামান্যতম আধিপত্যতা দেখাননি বরং মক্কা বিজয়ের পরক্ষণই কাবা শরীফের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন-

আজ আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরীব কারো প্রতি কারো আধিপত্য নেই। মর্যাদার দিক দিয়ে সকলেই সমান। এ কথাগুলো ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে। মহানবী (সা:) এর বিদায় হজ্জের ভাষণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে মৌল নির্দেশনা ছিল। মহানবী (সা:) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নির্দেশনা। আজকের এ যুগেও এর উপযোগীতা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে ৫৭টির অধিক মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে যার একটিতেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই। দু-একটি রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করা হলেও বাস্তবে হযরত মুহম্মদ (সা:) যে প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার অস্তিত্ব বর্তমান বিশ্বে কোথাও নেই। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ২০% অধিক মুসলিম বসবাস করলেও এবং মুসলামানের সংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটির বেশী হওয়া সত্ত্বেও কেন ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছেনা, পাশাপাশি আধুনিক প্রশাসনের প্রয়োগ কীভাবে হয়েছে, ইসলামী প্রশাসন এবং আধুনিক প্রশাসন এ দুয়ের মধ্যে কোনটি মানব কল্যাণে বেশী কার্যকর তা বর্তমান সময়ে নতুন করে ভাবার বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে এবং এ বিষয়ে আরো গবেষণা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

হযরত মুহম্মদ (সা:) এর বিদায় হজ্জের বাণীর মর্মানুসারে অনেক পরে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করতে থাকেন। অতঃপর ষোড়শ শতকে এর বাস্তবায়ন কোন কোন দেশ হতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, ধর্ম উদ্ভাবন যারা করেছে ধর্মের বিকাশ সাধনে যারা যত্নবান ছিলেন, তাদের সবার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মের মঙ্গলময় রূপ, মানব সভ্যতায় ধর্মের মহাৎ অবদান ইত্যাদির একটি সুদীর্ঘ এবং সমুজ্জ্বল ইতিহাস আছে। কিন্তু পাশাপাশি ধর্মের অপব্যবহার যে মানুষের কতবড় অকল্যাণ করেছে, তারও একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস ও অন্ধকারময় দিকের ইতিবৃত্তকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না। ধর্মীয় শ্রেণীবিদ্বেষ ও পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি (ইহুদী, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম) ধর্মের কোনটিতেও মুক্ত নয়।

ইউরোপে রেনেসাঁসের পূর্বে বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ধর্মীয় গোড়ামী থেকে বেড়িয়ে এসে জীবন জগতের বিকাশ ও মানব কল্যাণে যে ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন সে সকল মনীষিদের উপর তৎকালীন ধর্মযাজক, প্রশাসক, পোপ কর্তৃক যে অমানবিক নির্যাতন-অপমান হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো:

মুসলিম দার্শনিক ইবনে খলদুন ইতিহাস বিজ্ঞানের এবং সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের একজন প্রথম ও বলিষ্ঠ হিসেবে মুসলিম সভ্যতার মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি দুইবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, বন্দী হন, দেশ থেকে নির্বাসিত হন এবং বিদেশে মৃত্যুবরণ করেন। দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ এবং পদার্থ বিজ্ঞানী ইবেন সিনা যিনি আজও বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিতদের নিকট শ্রদ্ধেয়, তিনিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, নির্বাসিত হন এবং দেশে দেশে ঘুরে জীবনাবসান ঘটে। আরব সভ্যতার বিখ্যাত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ইবনে রুশদ এর অনেক গ্রন্থই পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং তার জীবনে নির্যাতনের অন্ত ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে তাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বহু দুঃখ কষ্টে প্রাণ রক্ষা করতে হয়। এমনকি ইমাম আবুহানিফা (র.) এর মৃত্যু ঘটে কারাঘরের ভিতরে। আহলে হাদীস আন্দোলনের নেতা মীর আব্দুল্লাহ গজনবী মাতৃভূমি আফগানিস্তানে থাকতে পারেননি। ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

এক সময় ইকবাল ও নজরুল কাফের বলে নিন্দিত হন। মুসলিম বিশ্বে শুধু ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যুগ থেকেই যে হত্যা, নির্যাতন ও বর্বরতা শুরু হয়েছে তা নয়। মধ্য যুগে তার বৃদ্ধি ঘটেছে এবং বর্তমান যুগে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের মতলবি ব্যবহারকারীদের দ্বারা ধর্মের নামে দেশে দেশে মানুষের উপর নির্যাতন এখনও বিদ্যমান। পাশাপাশি ইহুদী, খ্রিস্ট ধর্মেও বহুকাল ধরে ধর্ম নিয়ে বাক-বিতাণ্ডা, ব্যখ্যা-অপব্যাখ্যা, দ্বন্দ-সংঘাত, রক্তক্ষয়ী ক্রুশেড পর্যন্ত হয়েছে। ধর্মের নামে মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ এক সময় ধর্মের অপব্যবহার থেকে নিস্কৃতি খুঁজেছে।

এভাবে ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যের ধর্মের ও চার্চেরও পরাজয় এবং ক্রমে ক্রমে ঐশ্বরিক তত্ত্বের বুলিবাগিশ রাজতন্ত্রের বিনাশ হয় রেনেসাঁন্স- রিফরমেশন আন্দোলনের প্রগতি বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শনের বিকাশ ঘটে।

উল্লেখ্য, ইউরোপের লোক যখন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে তখন ধর্মগুরু ও ধর্মযজ্ঞের প্রতি তাদের সকলের আনুগত্য দেখে খ্রিস্ট রাজ্য নামক ধারণাটি মানুষের মনে বসে যায়। রাজ্য একাধিক কিন্তু পোপ এক। রাষ্ট্র একাধিক কিন্তু চার্চ এক। প্রত্যেক দেশেই পোপের অধীনস্থ ধর্মযাজকদের দল একজোট হয়ে কাজ করে যায়। এক দেশ থেকে আর এক দেশে বদলী হয়। ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা করে, ল্যাটিন ভাষায় নাম রাখে। চার্চের তুলনায় রাষ্ট্র অনেকটা ক্ষীণবল, রাজা অনেক সময় চার্চের হাতের পুতুল। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চার্চ নিজেই তার আদালত বসায়, বিচার করে, দণ্ড দেয়, আগুনে পোড়ায়, খাজনা আদায় করে। এমন এক সময় আসে যখন দেখা যায় পোপের হাতে কেবল নৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতাও এসে পড়েছে। কেউ যদি বিধর্মী হয় তাকে তিনি কেবল সমাজচ্যুত করে ক্ষান্ত হননা, তাকে ধনে-মানে-প্রাণে ধ্বংশ করে দেয়ার নজীরও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, "পৃথিবীর চারদিকে সুর্য ঘুরছে"। কেউ যদি এ তত্ত্বও অস্বীকার করে বলে সুর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরেছে তাহলে আর রক্ষা নেই অমনি বিধর্মী হয়ে গেল।

ইতালীর বিখ্যাত পদার্থবিদ গ্যালালিও ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরেছে। এ তত্ত্ব প্রদানের ফলে পোপের নির্দেশে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাকে বলতে হয় যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য নয়। বন্দী অবস্থায় পরবর্তীতে তিনি মারা যান। হাজার বছর ধরে এই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট চললো। এর ভালো দিক যে ছিল না, তা নয়। মধ্যযুগের অসভ্যতার অন্ধকারে সভ্যতার দ্বীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল চার্চে, যদিও তাতে অন্ধকার যায়নি। এভাবে দেখা যায় যে, পরবর্তীতে পোপের রাজকীয় ক্ষমতাই তার কাল হলো। ইংল্যান্ডের অষ্টম হ্যানরি ব্যক্তিগত স্বার্থে তিনি এক সময় পোপের শত্রু হন। প্রজারা তাকে সর্মথন করেন। ইংল্যান্ডের খ্রিস্টানরা দেখতে দেখতে প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে যায়। ক্যাথলিকরা হয়ে দাড়ায় সংখ্যালঘু। অবাককাণ্ড বহু দেশ পোপের সংঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। চার্চ থেকে বহুলোক নাম কাটিয়ে নেয়। অবশ্য এ সকল ঘটনা ঘটে ধর্মের ক্ষেত্রে।

এসব ঘটনা একদিনে হয় নি। বিনা দ্বন্দে হয়নি। ঘোরতর মারামারি কাটাকাটি দীর্ঘ ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে চলে। আমরা আর কতটুকু রক্তারক্তি করেছি। মানুষের মাংসতো আর খাইনি? জার্মানরা না কি তাও খেয়েছে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্থির হলো যে, ইংল্যান্ডের মত দেশে পোপের চেয়ে রাজা বড়, রাজার চেয়ে প্রজা বড়। প্রথম চালর্সের মাথা কেটে দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ইংল্যান্ডের লোক কেবল পোপকে নয় রাজাকেও সমজিয়ে দেয় যে, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নেই"। প্রজা প্রভাবিত রাষ্ট্রেই হলো চার্চের চেয়ে বড়ো। প্রজাদের রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

ধীরে ধীরে সেকুলার স্টেট হয়ে ওঠে। এর এক শতক পরে যখন আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার মূল নীতি হয় সেকুলারিজম। তার কিছুদিন পর যখন ফরাসী বিপ্লব ঘটে তখন সেকুলারিজমের জয় জয়কার।

ধর্মের বিকৃতি এবং অভিশাপ ইউরোপের ন্যায় এ মহাদেশেও কম প্রত্যক্ষ করিনি। ধর্মের নামে ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে হত্যা করেছে। ফলে ধর্মীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতের স্বাধীনতা আসে। সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও ভারত। কিন্তু দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তান একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, ধর্মীয় নিরাপত্তাকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের মূল কথা বলে বাহ্যিকভাবে দৃশ্যতঃ ঘোষণা করা হয়, মুসলমান-মুসলমান হানাহানিতে সেই তত্ত্বের ভিত্তি মূল চুরমার হয়ে যায়। আবার প্রমাণিত হয় ধর্ম সংস্কৃতির একটি অঙ্গমাত্র। ধর্মই সংস্কৃতির সব কথা নয়। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এ যুগে অচল।

মূলতঃ একটি রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণে ভাষা-সংস্কৃতির ভূমিকা ব্যাপক। এ সব কথা পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ভাবা হয়নি বলেই পরবর্তীকালে হিন্দুতে-মুসলমানে নয়, মুসলমান মুসলমানই ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। দুই লক্ষ নারীর ইজ্জত নষ্ট করেছে। অর্থনৈতিক সমতা ও সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধাবোধকে অস্বীকার করবার এবং ধর্মকে স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য প্রধান্য দেবার পরিণাম এরকমই হয়ে থাকে।

বস্তুত: দুই পাকিস্তান ভিত্তিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব বাঙলার বাঙালি বুঝতে পারে যে, তারা প্রতারিত হয়েছে। এখন তারা শোষণ-নির্যাতন ও জাতিগত নিপীড়ণের শিকার। তাই অতি দ্রুতই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি শুরু করে নৃতাত্ত্বিক জাতিস্বত্তা ভিত্তিক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জাতিয়তাবাদী আন্দোলন। সে আন্দোলনে বাঙালির সংস্কৃতি ও রাজনীতি একত্ব হয়ে যায়। ফলে বাংলা ভাষা ও বাংলার ভূ-প্রকৃতি ভিত্তিক, নব চেতনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে প্রকৃত ধার্মিক এবং বিবেকবান পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন কার্জন হল, ঢাকা (৩১/১২/১৯৪৮)। সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতী স্বত্তার স্বরূপ এভাবে নির্ধারণ করে দেন যে,

"আমরা হিন্দু-মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।
এটি কোন আদর্শের কথা নয়। এটি একটি বাস্তব কথা"

প্রখ্যাত এই প্রকৃত ধার্মিক এবং বিবেকবান ও ইতিহাসনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই তাত্ত্বিক সূত্র ধরেই মূল আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৮-১৯৫২ র ভাষা আন্দেলনের এক সূত্রপাত। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্তরে উন্নীত করে ১৯৬৯ এ গণ অভ্যুত্থানে পরিণত করে। এই গণ অভ্যুত্থান ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের রিহার্সাল স্বরূপ। অবশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু ও তার যোগ্য সহযোগী, অন্যান্যদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙালির হাজার বছরে স্বপ্নের, সংগ্রামের, সাধণার, গণতান্ত্রিক, জাতিয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্যমূলক অথনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

পরবর্তী পাকিস্তান বন্দী শিবির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে ১৯৭২ এর ১০ ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন: আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর এর ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তিক হবেনা। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তাই বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে এমন জীবন বা দৃষ্টিভঙ্গি যা ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়করণ, ধর্মের নামে রাজনীতির অবসান এবং রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ পক্ষপাত শূন্য অবস্থান। এই তিনটি শর্তকেই স্বীয় সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করে। আর এই তিনটি শর্তের ভিতর দিয়ে তা মানুষকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। পরমত সহিষ্ণুতা ও মানবিকতাকে বাঞ্ছিত লক্ষ্য বলে ঘোষণা দেয় এবং রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অবস্থানের মাধ্যমে ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে পরিকল্পিত উপায়ে সমাজ প্রগতি নিশ্চিত করার সুযোগ পায়।

সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে সন্নিবেশিত হবার পর সাথে সাথেই সরকার বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী শক্তিসমূহ একজোট জয়ে অপপ্রচার চালাতে থাকে যে, বাংলাদেশকে ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গরাজ্য পরিণত করার চেষ্টা চলছে। ধর্মনিরপেক্ষ নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কৌশলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলেছে। সে সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স এক বছর হয়নি। তখন সবাইকে রীতিমত অবাক করে বর্ষিয়াণ জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্বশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাতের ডাক দেন। ভারতকে বাংলাদেশের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এ দেশের মুসলমানদেরকে হিন্দুবাদী আগ্রাসন থেকে প্রতিহত করার আহ্বান জানান।

এভাবেই পরিবর্তীতে ১৯৭৩ এ শেখ মুজিব ১৯৭১এর ঘৃণিত যুদ্ধাপরাধিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা করে, আর এ সাধারণ ক্ষমার সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী এবং পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর দালালদের অনেকে মুক্তি পায় এবং তারা গোপনে সংঘঠিত হতে থাকে। জামায়াত ও মুসলিম লীঘ নিজেদের পরিচয়ে মাঠে না নামলেও তারা একেবারে মাঠের বাহিরে ছিল না। ধর্মীয় জলসা, ওয়াজ-নসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠিত হতে থাকে। এ সকল তৎপরতা সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের তেমন কোন উদ্বেগ ছিলনা।

ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির যোগসাজোসে পচাত্তরের সামরিক অভ্যুত্থানের শুরুতেই বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয় এবং ক্ষমতা দখল করেন খন্দকার মোস্তাক আহমেদ। মাত্র ত্রিশ দিন ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে তার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সংবিধান ও শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণ। কিন্তু কিছু দিন পরই পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তারপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন বিচারপতি সায়েম। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান। তার আমলেই ধর্মীয় রাজনৈতিক কর্ম-কাণ্ডের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে জিয়ার সামরিক সরকার এক অধ্যাদেশ জারি করে যার ফলে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের পূর্ণাঙ্গ পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধাপরাধিরা বিনা বিচারে মুক্তি পেয়ে যায়। এ বছরই আগস্ট মাসে আর একটি অধ্যাদেশ জারি করে যার ফলে নিষিদ্ধ ঘোষিত ধর্মভিত্তিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় এবং তারা ধর্মভিত্তিক দল হিসেবে মাঠে নামে এবং জাতীয় নির্বাচনেও অংশ নেয়।

এভাবে বাংলাদেশে এই ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানে নতুন ভিত্তি প্রদান করেন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের অসম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ভাঙ্গার মূলে আঘাত হেনে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান এবং বাংলাদেশ সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস এর সংযোজন ঘটান। এর মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ধারাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাজনীতিতে ধর্মের এ ব্যবহার ধারাবাহিকতা আমরা দেখি আরেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ। তিনি সংবিধানে "রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" সংক্রান্ত বিধি সংযোজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতির পুরাপুরি অবসান ঘটান। ধর্মের এ রাজনৈতিক ব্যবহার শুধু সামরিক শাসণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ৯০ উত্তর ক্ষমতা লড়াইয়ে বিএনপি-আওয়ামীলীগের ঐসব ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মিত্রের সন্ধান, নিজেদের কথা-আচরণে ধর্ম পরিচয়কে উর্ধ্বে তুলে ধরা, এমনকি সংবিধানে ধর্মীয় ঐ ধারাগুলো বহাল রেখে দেওয়ার উদাহরণও আমরা দেখতে পাই। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলো যে ভিত্তি পেয়েছে তাই আজ তাদের এখন, এক প্রায় দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত করেছে।

অর্থাৎ ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানে নতুন ভিত্তি প্রদান করেন প্রথমে জেনারেল জিয়াউর রহমান। জেনারেল এরশাদ জিয়ার ন্যায় রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন এবং পূর্ণতা দেন। পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংযোজনের মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িকতা আরো একধাপ এগিয়ে দেন। জেনারেল জিয়া ও এরশাদ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ণঅবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

অথচ ১৯৮৮ সালের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় এ দেশের প্রধান দুটি বিরোধী দল আওয়ামীলীগ ও বিএনপি এই সংশোধনীর সমালোচনা করেছিল। সে সময়ে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেনঃ 'রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম বিল সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যাখান করেছে। স্বৈরাচারের ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করার কৌশল হিসেবে পবিত্র ধর্মকে ব্যবহারের চক্রান্ত চলেছে।' অন্যদিকে বিএনপির সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য ছিলঃ 'রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এবং ধর্মের নামে জাতিকে বিভক্ত করে অনৈক্য সৃষ্টি ও জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। (ইত্তেফাক ০৮/০৬/১৯৮৮) কিন্তু বিগত বছরগুলোতে এই সংশোধনীর সুযোগ থাকলেও এ দুটি প্রধান দলের একটিও এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। তাদের আশঙ্কা, এ ব্যাপারে যেই উদ্যোগ নিবে তবে তার ভোটের সংখ্যা কমে যাবে।

বাংলাদেশের জনগণ শতকরা ৮৮ জনই মুসলমান। রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া হবে সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু সংবিধানতো কোন ধর্মীয় দলিল নয়। এটা রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল। কেননা সংবিধান ছাড়াই মুসলমান এবং অমুসলমান শাসন আমলে অর্থাৎ সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধরে বাঙালি মুসলমানের ঈমান ও আকিদা নষ্ট হয়নি। ব্রিটিশ আমলেও মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হয়নি। সংবিধানে বা শাসনতন্ত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস যখন লেখা ছিল না তখনও মুসলমানদের ঈমান অটুট ছিল।

বলাবাহুল্য, হযরত মুহম্মদ (সা:) মদীনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ সমাজে রাষ্ট্র কীভাবে অন্যান্য ধর্মকে দেখবে এবং রাষ্ট্র যে ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না সে বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন। তথাপি ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি এখনও মিমাংসিত নয়। যে সকল রাষ্ট্র শরীয়তকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে সেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সংগে সাংঘর্ষিক। এ ছাড়া ইসলামে নানারকম মাজহাব আছে, গোষ্ঠী আছে, বৈচিত্র আছে, সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ সর্বসম্মত ইসলামী রাষ্ট্র এখনও পৃথিবীর কোথাও নেই। ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে যেগুলো পরিচিত তারাও কিন্তু পারস্পারিক হানাহানি ও যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে নি। কারণ শিয়া-সুন্নী বিরোধ ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করেছে। অথচ রাষ্ট্র তার সকল ধর্মের নাগরিকদের এমনকি একই ধর্মের নানাগোষ্ঠির অনুসারীদের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য।

সর্বপোরি দেখা গেছে বাংলাদেশ সংবিধানে যতদিন ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল ততদিন সাম্প্রদায়িক হানাহানি কম ছিল এবং ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ জোড়দার ছিল। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ওআইসির কোন সদস্য রাষ্ট্র এ ব্যাপারে আপত্তি করেনি।

উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালগিষ্ঠ জনগণের ধর্মচর্চা রক্ষাকবচ যে ধর্মনিরপেক্ষতা- তা ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের অবদান। বাংলার ইলিয়াস শাহী শাসন আমলে এবং ভারতে মোঘল শাসনের বড় উদাহরণ। সম্রাট আকবর তার শাসনকালে মোল্লাতন্ত্রের বিপরীতে ভারতে সর্বধর্ম সমন্বয় শুধু নয়, ধর্মীয় সম্প্রতির প্রতি জোড় দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। আওরঙ্গজেব মোল্লাতন্ত্র দিয়ে মোঘল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাও প্রমাণ করল, ধর্মীয় রাষ্ট্র সমাধান নয়।

তাই শ্রীলংকা ও মিয়ানমারের মুসলমানেরা এখনও ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রাম করে। কারণ তারা জানে ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের ধর্মচর্চার গ্যারান্টি দিবে। ভারত, নেপাল কমিউনিস্ট চিনেও মুসলমানরা অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে হজ্জ ব্রত পালনে সহযোগীতা পাচ্ছে।

অবশেষে ১৯২৬-১৯৮৮ সময়কালে ধর্মনিরপেক্ষতা চিন্তার অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা অনুসন্ধান করে একটি বিষয়ে উপনীত হয়েছি যে, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্র পরিচালনায় নিরাপদ নয়। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাই সংযোজন হওয়া অধিকতর শ্রেয় এবং নিরাপদ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অনুপ সাদী সম্পাদতি : *বাঙালির ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ*, কথা প্রকাশ, ঢাকা

অন্নদা শংকর রায় : *সংহতির সংকট*,কলকতা, ১৯৮৪

অন্নদা শংকর রায় : *বাংলার রেনেসাস*,কলিকাতা–১৩৮১

অমলেন্দু দে : *বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলকতা, ১৯৭৪, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, কলকাতা ১৯৭৩

অজিত কুমার ঘোষ : *বঙ্গসাহিত্য হাস্যরসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৬৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা,১৯৮৫

অজয় রায় : *বাঙালি ও জড়ের সন্ধানে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা–২০০৯

অনিল মুখার্জি :*স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি*, ঢাকা: স্বদেশ প্রকাশনী– বৈশাখ– ১৩৭৯

অক্ষয়কুমার দত্ত : *বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*, দুই খণ্ড, কলিকাতা,১৮৫১-৫২

ধর্ম্মনীতি, দুই খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৮৫৫-৫৬

অঞ্জলী কাঞ্জিলাল : *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম*, কলিকাতা : মর্ডান বুক, ১৯৮৯

অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা) : *রামমোহন রচনাবলী*, কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৮

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,১৯৬৫

অতুল সুর : *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৯২

অধীর দে : *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, প্রথম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ,কলিকাতা: উজ্জ্বল মন্দির, ১৯৮৮

অনিরুদ্ধ রায় (সম্পা) : *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা : কে. পি.বাগচি, ১৯৯২

অনিলচন্দ্র বদ্যোপাধ্যায় : *বঙ্কিম-বীক্ষা*, কলিকাতা : এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, ১৯৮৯

অমল কুমার রায় : *বিদ্যাসাগর ও পরমসংহ*, কলিকাতা : চব্বিশ পরগণা, ১৩৬১

মহাভারতের কথা, কলিকাতা : আর্যভারতী, ১৯৯০

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য(সম্পা): *বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*, নতুন দিল্লী: বুক ট্রাস্ট,১৯৯৩

অরবিন্দ ঘোষ : *গীতা-নিবন্ধ*, ৩য় সংস্করণ, পণ্ডিচেরী : শ্রী আরবিন্দ আশ্রম, ১৯৮১

অরবিন্দ পোদ্দার : *রেনেসাঁস ও সমাজমানস*, কলিকাতা : উচ্চারন, ১৯৮৩

মানবধর্ম ও বাঙলাকাব্যে মধ্যযুগ, কলিকাতা : উচ্চারণ,১৯৮৯

আহমদ শরীফ : *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭ *বাঙলা*,

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৮

আহমদ শরীফ : *বিচিত্র চিন্তা*, ঢাকা ১৯৭৫ (২য় সং)

আহমদ শরীফ : *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ ফেব্রুয়ারি*, অনন্যা ২০০৪

আহমদ শরীফ : *মানবতা ও গণমুক্তি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ–১৯৯০

আহমদ শরীফ : *বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালির সাহিত্যলোক (কলিকাতা)*, ১৯৯২ অনন্যা ঢাকা-২০০২

আহমদ শরীফ : *প্রগতির বাধা ও পন্থা*, সন্দেশ, ১৯৯৪

আহমদ শরীফ : *স্বদেশ চিন্তা*, সন্দেশ, ১৯৯৭

আহমদ শরীফ : *বিশ শতকে বাঙালি*, ঈক্ষণ, ১৯৯৮

আহমদ শরীফ : *কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা*, আগামী, ২০০০

আহমদ শরীফ : *মানবতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা (প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস) সন্দেস*, ২০০৪

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা-১৯৬৪, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা ১৯৬৯,

আনিসুজ্জামান : *সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি- ২০১৫

আলী আনোয়ার : *ধর্মনিরপেক্ষাতা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা– ১৯৭৩

আবু সায়ীদ আইয়ুব : *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা*– ১৩৭৭

আবু সায়ীদ আইয়ুব : *পথের শেষ কোথায়*, কলিকাতা- ২০০৭

আনোয়ার পাশা : *সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল*–১৯৬৭

আবুল কালাম শামসুদ্দীন :*অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান–১৯৬৮ ।

আবুল মনসুর আহমদ : *আয়না*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা–১৯৭৩

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *নজরুল ইসলাম*, ঢাকা–১৯৭৭

আবুল কাসেম ফজলুল হক: *উনিশ শতকের মধ্যে শ্রেনী ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৭৯; আশা আকাঙক্ষার সমর্থনে, ঢাকা–১৯৯৩

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, ঢাকা–২০১৫

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন উত্তরকাল*, ঢাকা–২০০৮

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্যে শ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, জাগৃতি সংস্করন, ২০০১

আবুল কাসেম ফজলুল হক :*রাজনিতীতে ধর্ম মতাদর্শ ও সংস্কৃতি*–২০১৬

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *আবুল হুসেন*– বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আমিনুল ইসলাম : *বাঙালির দর্শন ও অনন্যা প্রবন্ধ*, ঢাবি–১৯৯৪

আবদুল করিম : *বাঙলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল (২য় সংস্করন ১৯৯৪)*, ঢাকা–১৯৮৭

আহমদ ছফা :*বাঙালি মুসলমানের মন*, ঢাকা–১৯৮১

আবদুল হক :*সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ (২য় সংস্করন)*, ঢাকা–১৯৭৬; নঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা–১৯৮৪;
ভাষা-আন্দোলনের আদি পর্ব, ঢাকা (২য় সংস্করন)–১৯৮৪

আবদুল কাদির (সম্পাদনা) : *রোকেয়া-রচনাবলী (২য় মুদ্রণ)* ঢাকা–১৯৮৪; মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী ঢাকা–১৯৬৩

আবদুল কাদির : *কাজী আবদুল ওদুদ*, ঢাকা

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি–ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ : *বাংলাদেশের কালচার*

আবুল মনসুর আহমদ : *আত্মকথা*, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ : *আয়না*, ষষ্ঠ সংস্করন, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস,১৯৭৩

আবুল হুসেন : *বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা*, ঢাকা– ১৯২৬

আহসান উল্লাহ(খানবাহদুর):*বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য* , যশোর, ১৯১৮

আবুল মনসুর : *আহমদ-আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* ,ঢাকা-১৯৬৪

আবুল ফজল : *নির্বাচিত প্রবন্ধ* ,ঢাকা-১৯৮১; সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী,ঢাকা -১৯৮০

আবুল ফজল : *সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি*,ঢাকা

আবুল ফজল : *শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত রচনাবলী*-ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল : *রেখচিত্র*, চট্টগ্রাম; বইঘর-১৯৬৮
আবু জাফর : *মওলানা আকরম খা*, ঢাকা–১৯৮৬
উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা : ব্রাদার্স, ১৯৭৯
আবদুল মতীন : *শিক্ষা সহায়িকা*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪
যুক্তির আলোকে, ঢাকা : বুক সোসাইটি, ১৯৭৫
আমিনুল ইসলাম : *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫
বাঙালির দর্শন অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯৪
(সম্পা) : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি,১৯৮৪
আরতি বসু : *বিবেকানন্দ : অন্য চোখে*, কলিকাতা : উৎস মানুষ, ১৯৮৯
আশুতোষ বাজপেয়ী : *রামেন্দ্র সুন্দর জীবন-কথা*, কলিকাতা : গুরুদাস এ্যান্ড সন্স, ১৩৩০
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ: *ইসলামাবাদ*, ঢাকা বাঙলা একাডেমি, ১৩৭১
(সৈয়দ মুর্তাজা আলী সম্পাদিত)
আবদুল কাদির : *দিলরুবা*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৫
আবুল ফজল : *আবুল ফজল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, চট্টগ্রাম,বইঘর, ১৩৮২
চৌচির, তৃতীয় সংস্করন, ঢাকা, ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স,১৯৪৮
জীবন-পথের যাত্রী, প্রথম কলেজ সংস্করন,ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮
আবুল হাশেম : *কথিকা*, ঢাকা, ইতিকথা বুক ডিপো, ১৯৩৮
আবুল হুসেন : *আবুল হুসেনের রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় (আবদুল কাদির সম্পাদিত) প্রকাশ, ঢাকা, বর্ণ মিছিল, ১৩৮৩
আবুল হুসেন : *নব-বসন্ত*, দ্বিতীয় সংস্করন, ঢাকা, মুক্ত ধারা,১৯৭৭
আহছান উল্লা, খানবাহাদুর : *আমার জীবন ধারা*, পঞ্চম সংস্করন, ঢাকা, পাবলিশার্স, ১৯৮২
আজিজুন্নাহার ইসলাম
ও
কাজী নূরুল ইসলাম : *তুলনামূলক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করন, ২০০২)
ইসরাইল খান : *বাংলা সাময়িকপত্র : পাকিস্তান পর্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা–২০০৪
ইসরাইল খান : *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা-২০০৫
ইসরাইল খান : *ভাষার রাজনীতি ও বাঙলার ভবিষ্যৎ*, ঢাকা, ২০১১ (২য় সংস্করণ)
ইসরাইল খান : *এরশাদের আমলে ভাষা কেন্দ্রিক রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক*, ঢাকা–২০১১
ইন্দু মিত্র : *ইতিহাসে আনন্দবাজার*, কলকাতা–১৯৭৫
ইব্রাহিম খাঁ : *বাতায়ন*, ঢাকা–১৯৬৭
ইব্রাহিম খাঁ (সংকলিত) : *আনোয়ার পাশা কলিকাতা*, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী কলিকাতা–১৯৩৫
ইবনে তাইমিয়্যাহ : *মাজমু ফাতাওয়া* (রিয়াদ: দারু আলমিল কুতুব, ১৪১২ হি।)
উমাকান্ত তিওয়ারী : *দি মেকিং অফ দি ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশন*, এলাহাবাদঃ সেন্ট্রাল বুক ডিপো-১৯৬৭
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *মুক্তি-সাধনায় বাঙালি*, কলিকাতা : আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৬
বাঙলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা :ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪
উমা সেন : *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ*,কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭১
ঋষিদাস : *রাজা রামমোহন*, কলিকাতা : অশোক পুস্তকালয়, ১৩৯৯

Dhaka University Institutional Repository

এমদাদ আলী : *মোসলেম মালা* [ভাণ্ডারিয়া, ১৩২৭]

এস ওয়াজেদ আলী : *এস ওয়াজেদ আলী রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত) ঢাকা,বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫

ওয়াকিল আহমদ : *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (১-২ খণ্ড)* ঢাকা–১৯৮৩

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবি*, ঢাকা–১৯৮৯

ওয়াকিল আহমদ (সম্পা) : *বাঙালির চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০

কীথ কালার্ড পাকিস্তান : *এ পলিটিক্যাল স্টাডি*, লন্ডন ঃ জর্জ এ্যালেন এ্যান্ড আনইউন– ১৯৫৭

কাজী আবদুল মান্নান : *আধুনিক সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা–১৯৬১/১৯৬৯

কাজী আবদুল ওদুদ : *বাংলার জাগরণ*, কলকাতা, ১৯৫৬; শ্বাশত বঙ্গ (২য় সং) ঢাকা–১৯৮৩

কাজী আবদুল ওদুদ : *রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি ঢাকা

কাজী মোতাহার হোসেন : *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*

কামরুদ্দীন আহম্মদ : *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা ঃ নওরজ কিতাবিস্তান– ১৯৮২

কায়কোবাদ : *মহাশ্মশান কাব্য*–১৩৫৯

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : *ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর*,কলিকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮০

কেশবচন্দ্র সেন : *জীবন-বেদ*, কলিকাতা : নববিধান পাবলিকিশন্স, ১৮৮৩

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : *রামমোহন-ডিরোজিও মূল্যায়ন*, কলিকাতা : বর্ণালী, ১৯৯১

কাজী আকরম হোসেন : *আমরা বাঙ্গালী*, কলিকাতা, ইতিকথা বুক ডিপো

কাজী আবদুল ওদুদ : *নদীবক্ষে*, প্রথম বইঘর সংস্করণ

কাজী ইমদাদুল হক : *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী*, প্রথম

(আবদুল কাদির সম্পাদিত) : খণ্ড,ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড,১৯৬৮

কাজী নজরুল ইসলাম : *নজরুল রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, ঢাকা, কেন্দ্রীয় (আবদুল কাদির সম্পাদিত) বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৬

(আবদুল কাদের সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭

কাজী মোতাহার হোসেন : *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড,

(আবদুল হক সম্পাদিত) ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪

: *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, মুক্ত ধারা, ১৯৭৬

কায়কোবাদ : *অমিয়-ধারা কাব্য*, ঢাকা

কাব্য সংকলন ঃ কায়কোবাদ, ঢাকা, বাঙলা একাডেমি, ১৩৭৪

খোন্দকার সিরাজুল হক : *মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*–ঢাকা–১৯৮৪

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন : *মুসলিম বীরঙ্গনা*, তৃতীয় মুদ্রণ

গোলাম মোস্তফা : *কাব্য গ্রন্থাবলী*, ১ম খণ্ড, ঢাকা– ১৯৭১

গোপাল কৃষ্ণ :*'রিলিজিয়ন ইন পলিটিকস'* ইন্ডিয়ান ইকোনমিক এ্যান্ড সোস্যাল হিস্টোরী রিভিউ, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭১

গোলাম লতিফ : *সমাজ-চিত্র অর্থাৎ মুসলমান জাতির সর্ববিধ অবনতির সংক্ষিপ্ত কারণ*, যশোহর, গ্রন্থকার, ১৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : *শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ*, কলিকাতা, ১৯৫৬

গোলাম মুরশিদ : *বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা : বিদ্যোদয়, ১৯৭১

জিল্লুর রহমান খান : *মার্শাল ল টু মার্শাল ল লীডারশীপ ক্রাইসি ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি প্রথম প্রকাশ–১৯৮৪

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *ধর্ম প্রগতি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা–২০০৮

জসীম উদ্দীন : *ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়*, কলিকাতা, গ্রন্থ প্রকাশ,১৩৬৮

জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ : *আস- সিহাহ* (বৈরুত: দারুল গারব, তা.বি)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া : *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০১)

জগদীশচন্দ্র ঘোষ : *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, কলিকাতা : প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৮৬

জওহরলাল নেহেরু : *ভারত-সন্ধানে*, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১

জীবেন্দু রায় : *বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতচিন্তা*, কলিকাতা : সাহিত্য শ্রী, ১৯৮৪

জ্যোতির্ময় ঘোষ (সম্পা) : *বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য*, কলিকাতা : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ,১৯৭৫

ঝরা বসু : *ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র*, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮০

তালুকদার মনিরুজ্জামান : *দি পলিটিকস অফ ডেভেলপমেন্ট দি কেইস অফ পাকিস্তান*, প্রথম প্রকাশ–১৯৭১

দিলীপকুমার বিশ্বাস : *রামমোহন-সমীক্ষা*, কলিকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৮৩

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : *বাঙালির সারস্বত অবদান*, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : *ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত*, কলিকাতা, ১৮৬৪

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত*, কলিকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৩৮১

নরহরি কবিরাজ (সম্পা) : *ঊনিশ শতকের বাংলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, কলিকাতা : কে. পি বাগচী এ্যান্ড কোং, ১৯৮৪

নিরঞ্জন ধর : *বিবেকানন্দ : অন্য চোখে*, কলিকাতা : উৎস মানুষ, ১৯৮৮

নির্মলকুমার রায় : *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে, কলিকাতা* : দেজ পাবলিশিং,১৯৭৯

নির্মল সেন গুপ্ত : *রাজর্ষি রামমোহন*, কলিকাতা : সাধারন ব্রাহ্মসমাজ,১৯৭২

নির্মলেন্দু ভৌমিক : *রামেন্দ্র রচনা সঞ্চয়ন*, কলিকাতা : মর্ডান বুক, ১৯৮৫

নীরুকুমার চাকমা : *বুদ্ধ : তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, ঢাকা, ১৯৯০

নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব*, কলিকাতা : দেজ সংস্করণ, ১৯৯৪

প্রমথ চৌধুরী : *বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়*, গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪, প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা–১৯৯০

প্রমথ চৌধুর : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলিকাতা–১৯৭৪

প্রভা দীক্ষিত : *কমিউনালিজম এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার*, নিউ দিল্লি ঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৭৪

প্রণবরঞ্জন ঘোষ : উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির মনন ও সাহিত্য,কলিকাতা: লেখাপড়া, ১৯৮৬

বিবেকানন্দ ও বাঙলা সাহিত্য, কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৮৯

প্রণবেশ চক্রবর্তী : *শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন*, কলিকাতা মর্ডান কলাম, ১৯৮৫

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা, কলিকাতা : অনন্য প্রকাশন, ১৯৮৫

প্রদীপ রায় : *রামমোহন রায় : এক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা*, কলিকাতা : বুক ট্রাস্ট, ১৯৮১

বিদ্যাসাগর : সামাজিক ব্যক্তিত্ব,কলিকাতা : বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত : *রামেন্দ্র সুন্দর ও বাঙলা সাহিত্য*, কলিকাতা : পুস্তক বিপণী, ১৯৮৫

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : *রামমোহন : তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*, কলিকাতা : বিশ্ববাণী, ১৯৮৬

প্রসুন বসু ও শচীন্দ্রনাথ : *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, অখণ্ড সংস্করণ, কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন ১৩৯১

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ*, কলিকাতা : মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৮৬

ফুলরেণু গুহ : *বাঙালির সমাজ চিন্তা*, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩

বদরুদ্দীন উমর : *সংস্কৃতির সংকট*, ঢাকা ১৯৭৪

বদরুদ্দীন উমর : *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা–১৯৭০

বদরুদ্দীন উমর : *সাম্প্রদায়িকতা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৩৭

বদরুদ্দীন উমর : *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*,৩য় সংস্করন, কলিকাতা : চিরায়ত, ১৯৮৮

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *বঙ্কিম রচনাবলী*, নবম মুদ্রণ, কলকাতা-১৩৯২

বিপান চন্দ : *কমিউনালিজম ইন মর্ডান ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী : বিকাশ পাবলিশিং-১৯৮৪

বিনয় ঘোষ : *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, কলকাতা ঃ প্রকাশ ভবন-১৯৭৩

বিনয় ঘোষ : *বাংলার নবজাগৃতি*, কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৭৯
বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, তিন খণ্ড কলিকাতা : ওরিয়েন্ট সংস্করণ, ১৯৫৭-৫৯

বিপিনচন্দ্র পাল : *নবযুগের বাংলা*, কলিকাতা : যুগযাত্রী প্রকাশক,১৯৫৫

বারিদবরন ঘোষ : *ব্রাহ্মণসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৯০

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ ও রামমোহন*, কলিকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৭

ভূপেন্দ্রনাথ আদিত্য : *উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-জীজ্ঞাসায় ভূদেব ও তাঁর সাহিত্য*, কলিকাতা : ভারত বুক, ১৯৮৫

মুনতাসীর মামুন : *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১-৭ খণ্ড)* ,ঢাকা, ১৯৮৫-১৯৯৭

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সংকলিত) : *ভাষা ও সাহিত্য*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৪৮

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ : *সমকালীন সাহিত্যের ধারা*

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ : *সাহিত্য সংস্কৃতি-জাতীয়তা*

মুহম্মদ আবদুল্লাহ সম্পাদিত : *রাজনীতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*- তৃতীয় সংস্কারণ–২০০৯

মুহম্মদ আবদুল হাই ও
সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা-১৯৬৪

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর : *মাওলানা মুহম্মদ আকরাম খা*, ঢাকা-১৯৮৭

মোহাম্মদ আবদুল হাই
সংকলন ও সম্পাদনা : *বাঙালির ধর্মচিন্তা*, প্রথম প্রকাশ-২০০৪

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ :*'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা'* আজাদ, শ্রাবণ–১৩৫৪

মীর মশার্‌রফ হোসেন : *গো-জীবন*, টাঙ্গাইল– ১২৯৫

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন : *বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান* কলিকাতা–১৩১৭

মোহম্মদ আকরম খা : *মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য*, কলিকাতা–১৩৩৯

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : *ইসলামের আদর্শ*, ঢাকা–১৯৪৯

মোহাম্মদ বরকতুল্লা : *মানুষের ধর্ম*, সিরাজগঞ্জ–১৩৪০

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

Dhaka University Institutional Repository

এছলামাবাদী : *এছলাম জগতের অভ্যুত্থান*, কলকাতা–১৯৮০
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : *মহৎজীবন*, ঢাকা–১৯৭৮
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : *রায়হান*, ঢাকা–১৯৭৮
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ : *এছলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার*–১৩৩৪
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : *ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, ইসলাম দর্শন–১৩৩১
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী : *মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুর জাতীয়তা*, সওগত–১৩৩৪
মুহম্মদ এনামুল হক : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা–১৯৬৮
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ঢাকা, বাংলা একাডেমি–১৯৭০
মো: আবদুল হালিম : *মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮
মোহিতলাল মজুমদার : *বাংলার নবযুগ*, কলিকাতা : বিদ্যোদয়, ১৯৬৫
মিত্র ও কৌটিল্য : *বিবেকানন্দ ও আজকের সমাজ*, কলিকাতা : সেলস্ এ্যালায়েন্স, ১৯৮৮
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম :*ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, *ইসলাম দর্শন*, আশ্বিন, ১৩৩১
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী : *ভারতীয় মুসলমান ও স্বদেশীকতা*, *সওগাত*, শ্রাবন, ১৩৩৩
মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুর জাতীয়তা, *সওগাত*, আষাঢ়, ১৩৩৪
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : *মহাশ্মশান সম্বন্ধে দুই একটি কথা*, *সওগাত*, শ্রাবন, ১৩২৬
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ : *আদর্শ উপন্যাস*, *ইসলাম দর্শন*, আষাঢ়, ১৩২৭
বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে উপন্যাসের বন্যা, *আল- এছলাম*, আশ্বিন, ১৩২৭
মর্তুজা খালেদ : *যরথুস্ট্রবাদ ও প্রাচীন পার্সীক ধর্ম; একটি ঐতিহাসিক পযালোচনা*, বাংলাদেশএশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা, ২০০৪।
মুহম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম : *দীন*, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৩শ খণ্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর,১৯৯২
মুহম্মদ আফাজ উদ্দীন : *তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬
মো: ইবরাহীম খলীল ও রেজাউল করিম : *ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ৪২বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৩
যতীন সরকার :*পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা–২০০৮
যোগানন্দ দাস : *রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন*, কলিকাতা : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৩৫০
যোগেশচন্দ্র বাগল : *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা*, কলিকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩
বাংলার জনশিক্ষা, কলিকাতা : ১৯৪৯
রমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, ১–৪ খণ্ড, কলকাতা–১৯৫৭
রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : *রোকেয়া রচনাবলী*
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *ভারত-পথিক রামমোহন রায়*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৭৫
রমাপ্রসাদ চন্দ্র : *ইতিহাসে বাঙালি*, কলিকাতা : কে. পি. বাগচী এন্ড কোং, ১৯৮১
রমেন্দ্রনারায়ন সেনগুপ্ত : *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা*, কলিকাতা : পুস্তক বিপণী, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

রাজনারায়ন বসু : *আত্ম-চরিত*, কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,১৯৬১

শামসুজ্জামান খান : *মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল*, মনন প্রকাশ, ঢাকা–২০১০

শীতাংশ্য চট্টোপাধ্যায় : *অস্তিত্বের সংকট ও বিবিধ প্রবন্ধ*, নচিকেতা প্রকাশন, কলকাতা–২০০৫

শামসুন নাহার : *রোকেয়া-জীবনী*, প্রথম স্কুল সংস্করণ, ঢাকা, শ্রী রমেশ চন্দ্র, দত্ত মজুমদার, ১৯৫৮

শামসুন নাহার : *রোকেয়া জীবনী*, ঢাকা–১৯৮৫

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : *বিদ্যাসাগর : জীবনচরিত ও ভ্রমনীরাশ*, কলিকাতা : বুক ল্যাণ্ড, ১৯৭৪

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙলা ও বাঙালি, পাটনা : বিহার বাঙলা একাডেমি,১৯৯০

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় : *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, কলিকাতা :সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় : *নবযুগের প্রবর্তনায় স্বামী বিবেকানন্দ*, কলিকাতা : প্রাইম, ১৯৯২

শিপ্রা লাহিড়ী : *ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা : কবি ও কবিতা, ১৯৭৬

শিবনাথ শাস্ত্রী : *রামতনু লাহিরী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলিকাতা : নিউ এজ, ১৯৫২

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ : *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি*, পণ্ডিচেরী : শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ১৯৮৬

শেখ আবদুর রহিম : *শেখ আবদুর রহীম গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড,ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৭

শেখ হবিবুর রহমান : শেখ হবিবুর রহমান গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড,ঢাকা, বাঙলা একাডেমি, ১৯৭০

সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১-৪ খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করন, বৈশাখ–১৪০১-৩, ইসলামী বাংলা সাহিত্য, কলকাতা–১৪০০

সনৎ কুমার সাহা : *সমাজ সংসার কলরব*, ঢাকা–১৯৭৩

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী : *অভিভাষণ*, ইসলাম দর্শন–১৩৩১

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী : *এছলাম ও ধনবল*, আল-এসলাম––১৩২৬

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও : *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা–১৯৮৬

সত্যনারায়ন সেন গুপ্ত : *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা*, কলিকাতা :জিজ্ঞাসা,১৯৭৪

স্বামী বিবেকানন্দ : *বাণী ও রচনা, দশ খণ্ড*, কলিকাতা : উদ্বোধন, ১৩৬৪-৭০

সুকুমার সেন : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, তিন খণ্ড, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স সংস্করন, ১৪০১

সুকুমারী ভট্টাচার্য : *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৬

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *বাঙালির সংস্কৃতি*, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯০

সুনীলকুমার দাস : *প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকদর্শন*, কলিকাতা : আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ১৩৮১

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্য-বিদ্যার ভূমিকা* , কলিকাতা : সারস্বত, ১৯৮০

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৫৩

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৫২

বাঙলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ ও নবজাগরণ, কলিকাতা : পিরামিড প্রকাশনী, ১৯৮৬

সুনিল সেন ও প্রদীপ সিংহ : *বাংলার আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা : চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, ১৯৯২

সুনীলকুমার গুপ্ত : *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাগরণ*, কলিকাতা : এ মুখার্জী এন্ড কোং, ১৯৭৬

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা*, ১ম খণ্ড,৩য় সংস্করণ কলিকাতা : জি.এ.ই পাবলিশার্স ১৯৯০

বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা,২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ কলিকাতা : জি.এ.ই পাবলিশার্স১৯৯১

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী : *শিরাজী-রচনাবলী*, উপন্যাস খণ্ড, ঢাকা, কেন্দ্রীয়(আবদুল কাদির সম্পাদিত) বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৭

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী :*অভিভাষণ*, *ইসলাম দর্শন*, ভাদ্র, ১৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

মোছলমানদিগের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান,ছোলতান, জৈষ্ঠ, ১৩৩০
হিন্দু- মোছলমানের একতা, রওশন হেদায়েৎ,ফাল্গুন, ১৩৩২
সৈয়দ এমদাদ আলী : *বঙ্গভাষা ও মুসলমান, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, শ্রাবন, ১৩২৫
বঙ্গভাষা মোছলেম প্রভাব, ছোলতান, ফাল্গুন,১৩৩২
হাসান উজ্জামান :*সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া : পটভূমি*, ঢাকা, পটভূমি প্রকাশনী, তৃতীয় বর্ষ– ১৯৭৯
হাবিব রহমান : *প্রগতিশীলতা রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব*, বাঙালি মুসলমান সমাজ, ঢাকা– ২০১২
হোসেনুর রহমান : *আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, কলকাতা*–২০০১
হুমায়ন কবির : *বাংলার কাব্য*, ঢাকাই সংস্করণ ১৯৭০, মোসলেম রাজনীতি, কলকাতা– ১৯৪৩
হুমায়ন আজাদ : *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ*, ঢাকা– ১৯৭১
হরিসাধন গোস্বামী : *মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৮৮
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, নতুন দিল্লী : সাহিত্য একাডেমি ১৯৭১
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, কলিকাতা : জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ,১৯৭১